সময় তোমার হাত ধরে

বনানী শিকদার

বাস্তবের আড়ালে ২য় খণ্ড

indranil ghosh

সময় তোমার হাত ধরে বনানী শিকদার বাস্তবের আড়ালে ২য় খণ্ড

সময় তোমার হাত ধরে

(বাস্তবের আড়ালে দ্বিতীয় পর্ব)

বনানী শিকদার

প্রিয়া বুক হাউস
৬৪, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

SAMAY TOMAR HAAT DHORE
An Autobiographical Novel Part-2
by Banani Sikdar

₹ : 300.00

গ্রন্থস্বত্ব : লেখিকা

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০২০

প্রকাশক
দুলাল চন্দ্র সিংহ
৪, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
মোবাইল : ৯৪৩৩৩২৪৪৬৩
E-mail: priyabookhouse64@gmail.com
Website: wwwpriyabookhouse.org
ISBN : 978-93-81827-96-3

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ে (যেমন গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক, বা অন্য কোনও মাধ্যম যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় রাখার কোনও পদ্ধতি)-এর মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না অথবা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অক্ষর বিন্যাস
ড্রিম স্কেচ
২১ই ঝিল রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৩১

মুদ্রক
এন. বসাক অ্যান্ড এসোসিয়েটস
৯এ, রামধন মিত্র লেন, কলকাতা -৭০০ ০০৬
প্রচ্ছদ
ইন্দ্রনীল ঘোষ

মূল্য : ৩০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার কলকাতার বাড়িওয়ালি মাসিমা রাণী ভট্টাচার্যকে
যাঁর কাছে আমি অনেক পেয়েছি

ভূমিকা

বনানী শিকদারের প্রথম উপন্যাস 'বাস্তবের আড়ালে' পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমার বিশ্বাস বইটি অন্যদেরও খুব ভালো লাগবে কারণ বইটিতে আমাদের অসম সমাজের একটি চিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন যাতে আছে সংঘাত ও মাধুর্য দুই-ই। প্রেমের নির্মলতাকে ধনের অহংকার ও দারিদ্রের সচেতনতা কীভাবে করে মলিন, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের মধ্যে আনে ব্যবধান তাই তিনি দেখিয়েছেন। এই থিমটি ফিরিয়ে তিনি দেখছেন পরবর্তী খণ্ডে। 'সময় তোমার হাত ধরে'তে তাঁর নিজের জীবন ছায়া ফেলেছে। বাস্তব হাত ধরেছে কল্পনার। প্রথম খণ্ডের সৌরভের রেশ এখনও আমার মনে লেগে আছে। সেই আবেশ যেন আরও ঘনীভূত হল দ্বিতীয় খণ্ডে। লেখকের চিন্তা আধুনিক। তাঁর চিন্তার আরও বিকাশ ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

লেখকের কথা

একটা তিনশো পাতার উপন্যাস লিখে ফেলা আমার কাছে যতটা সহজ একটা অর্ধেক পাতার প্রাককথন লেখা ততটাই কঠিন। উপন্যাস লেখা হলেই প্রাককথনের বোঝাটা মাথায় ভয়ংকরভাবে চেপে বসে। ভাবি কি দরকার এর! যা বলার তা তো উপন্যাসেই বলে ফেলেছি। আবার কেন! 'বাস্তবের আড়ালে' প্রকাশিত হওয়ার সময় একটু বেশিই আবেগগ্রস্ত হয়ে কিছু একটা লিখে দিয়েছিলাম। কিন্তু এবার, 'সময় তোমার হাত ধরে' যা কিনা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবের আড়ালের দ্বিতীয় খণ্ড আমার সমস্ত আবেগকে এমন এক অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে নির্বাসিত করে রেখেছে যে আমি তাদের একদমই খুঁজে পাচ্ছি না।

বাস্তবের আড়ালে 'মাইকেল মধুসূদন স্মৃতিসম্মান' পেয়েছে। প্রকাশক জানান আমার এখনকার কম্পোজার দ্বিতীয় খণ্ডের পাতা টাইপ করে বলেছেন বইটি ভালো হয়েছে। নিঃসন্দেহে খুশির ব্যাপার। কিন্তু আমার খুশি, দুঃখ কিছুই অনুভব হচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে একটা দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। কিছু কথাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিতে পেরেছি। ছোটবেলায় একবার অনেক মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগে শেষপর্যন্ত কালু নামের একটি বাচ্চা ছেলেকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম বটে কিন্তু তাকে পৃথিবীর আয়ুর সমান লম্বা আয়ু দিতে পারিনি। বইয়ের কথাগুলো পাবে সেই আয়ু।

বনানী শিকদার

সূচি

পরিচয় থেকে পরিণতি ৯
গ্রাম থেকে শহরে ১৩
হোস্টেল ১৬
ক্লাসমেটস ৩৮
সিঙ্গারার খিদে ৪৯
যেমন স্যার তেমন স্তুতি ৫৪
হাসি ৫৯
পড়া, প্রেম, বন্ধুত্ব ৬৫
বিরহ ভাবের খেলা ৭৭
স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ ৮৪
ভয়ঙ্কর প্রেম ৯৫
বিজ্ঞানচেতনা এবং আমি ১০০
প্রেম বিরহ ১১১
ভাঙা হৃদয় ১১৯
ব্রা-চুরি ১২৬
পরীক্ষার প্রস্তুতি ১২৯
শহরের টান ১৩১
প্রথম ভালবাসা ১৩৭
ষড়যন্ত্র ১৪৮
একটি সম্পর্কের মৃত্যু ১৬৭
লেখার হাতে খড়ি ১৭২
শুধু মৌনতা ১৭৭
অতিমেধাবী সে ১৯৩
ছেলে দেখা ২০০
হিড়িম্বার খাঁচা ২০৭
বাবার ছেলের বিয়ে ২১৪
অসময়ের তারা ২২১
বিয়ে ২৬৭

পরিচয় থেকে পরিণতি

বিয়ে তো আমি তোমাকেই করব রাজু।

মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। সেই দিনগুলোর মধ্যে একটি দিন ছিল সেইদিন। সেই দিনগুলোতে আমি কোথায় ভেসে যাচ্ছিলাম আমি নিজেই জানি না। ভেসে যাচ্ছিলাম নাকি আসলে বিপর্যয়ের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিলাম তাও বলতে পারব না। শুধু বলতে পারব আমি খারাপ হয়ে যাচ্ছিলাম। খারাপ থেকে খারাপতর, খারাপতর থেকে খারাপতম। তবে কখনও আমার মনে হয়নি যে সেখান থেকে আমি বেরোতে পারব না। শুধু একটা সাহায্যের হাতের প্রয়োজন ছিল। একটুখানি সাহায্য। গর্ত থেকে সমতলে পা রাখার জন্য। আমি জানতাম সমতলে একবার পা রাখতে পারলেই আবার গর্তে আমাকে নামাবে এমন সাধ্য কারও নেই।

গর্ত থেকে মুখ না বাড়িয়েই আমি বাইরের আলো দেখেছিলাম। আশ্চর্য! কখনই মনে হয়নি যে সেই আলোর ভাগ আমি পেতে পারব না। আমি জানতাম সাহায্য আমি পাবই। অনেকেই সঙ্গে নিয়ে চলার প্রস্তাব রাখবে আমার কাছে। আমাকে শুধু বেছে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে কে সামনে ঢেলে দেবে সেই আলো যেই আলোতে আমি আমার জীবনকে দেখতে চাই।

সেই দিন কিন্তু দিনের বেলা ঠিক নয়, বিকেল বেলা। না, ঠিক বিকেলও নয়। সন্ধের আগে আগে। কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে সুইমিং পুলের রেলিং-এ পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুধাকর বিশ্বাস। আমরা অর্থাৎ রাজু এবং আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সুধাকর বিশ্বাসের সামনে। সুধাকর বিশ্বাস ওরফে রাজুর জামাইবাবু হলেন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল তাঁকে আমি রাজুকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বলে কিংবা রাজু আমাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে। না, আমি আজকে কিছুই ঠিক করে বলতে পারছি না। সত্যি বলতে গেলে সিদ্ধান্ত আমার বা রাজুর কারো একার ছিল না। সিদ্ধান্ত ছিল আমাদের দু'জনের। আগের দিন সকালে রাজু আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল আর আমি তাতে সম্মতি জানিয়েছিলাম। সিদ্ধান্তটা তাহলে তো দু'জনেরই হল।

অ্যাডভোকেট আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘সজল বলেছে তুমি নাকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জার্নালিজম-এ এম এ করেছ?’’ সজল হল রাজুর ভালো নাম অর্থাৎ অফিশিয়াল নাম।

‘‘হ্যাঁ।’’

‘‘তুমি জানো সজলের কোয়ালিফিকেশন কি?’’

‘‘হ্যাঁ, ইন্টারমিডিয়েট পাশ।’’

‘‘এত বড় গ্যাপ মেনে নিতে পারবে?’’

‘‘ও আমাকে বলেছে কোয়ালিফিকেশন বাড়াবে এবং পনেরো বছর পর ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নেবে, সিভিলে ভালো জবের চেষ্টা করবে।’’

আমি যা বলেছি তার সত্যতা যাচাই করতে অ্যাডভোকেট রাজুর দিকে তাকালেন। রাজু মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানালো। তবু উনি ‘ঠিক আছে’ বললেন না। বললেন,

"বাবুকে আমি জানাবো। দেখি উনি কি বলেন।" সুধাকর বিশ্বাসের বাবু হলেন তাঁর শ্বশুর। উনি আমাকে উপদেশ দিলেন, "তুমিও তোমার বাড়িতে বলো। বাবু রাজি থাকলে তোমাকে জানানো হবে। তখন তোমাদের বাড়ি থেকে তোমার অভিভাবককে সজলদের বাড়িতে আসতে হবে বিয়ের ব্যাপারে আলোচনার জন্য।"

অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কথা শেষ হলে রাজু এবং আমি বিপরীত দিশায় প্রস্থান করি। আমার যাওয়ার ছিল কেষ্টপুর, প্রফুল্ল কাননে। রাজুর যাওয়ার ছিল সন্তোষপুরে। ওর বন্ধুর বাড়িতে। সে গোরখপুর থেকে কলকাতায় এসেছিল মূলত আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমার মন তো তাই বলে। ১৯৯২তে আমার এম এ পরীক্ষার পর আমি ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম। সেজদার কাছে। রাজু তখন আম্বালাতে। আমার মন বলে সে আমার ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার খবর পেয়ে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ইচ্ছে নিয়েই সেজদাকে চিঠি পাঠিয়েছিল—তা না হলে সেই ইনল্যান্ড খামের পেছনের পাতায় আমায় লিখবে কেন!

চিঠির কয়েকটি কথা ছিল এরকম, "বনানী, আশা করি তুমি ভালো আছ এবং ব্যাঙ্গালোরে খুব মজা করছ। মিন্টুকে চিঠি লিখতে গিয়ে মনে হল তোমাকে না লিখলে খারাপ দেখায়, তাই লিখছি। তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক দিনের জন্য আম্বালা থেকে ঘুরে গেলে আমার ভালো লাগবে...।"

রাজু আমাকে প্রথম দেখেছে মেজদার বিয়েতে। আমি তখন বীডন স্ট্রিটের ইউনিভার্সিটি ইউ জি হোস্টেলে থাকতাম। সেখান থেকে বিয়ে উপলক্ষ্যে কয়েকদিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি একটা পাঁচ আট উচ্চতার, শ্যামলা মেদশূন্য চটকদারি কেতাদুরস্ত চেহারার যুবক স্কিনি জিনস, শার্ট এবং পাটিয়ালা জুতো পরে সবার সামনে ঘোরাফেরা করছে। সবাই তাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, রাজু রাজু করছে যদিও রাজু ফ্যাশন মেরে মুচকি হেসে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া বিশেষ কিছুই করছে না। সবার কথাবার্তা থেকে বুঝেছিলাম সে ছিল এয়ার ফোর্সে সেজদার এন্ট্রিমেট (ব্যাচমেট)—শুধু এন্ট্রিমেটই নয়, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। আমি বাড়ি যাওয়ার পর রাজুর একটা কাজ বেড়েছিল—কথা বলার ইচ্ছেতে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকানো। রাজুর এই অতিরিক্ত কাজের চাপ আর কেউ না বুঝুক আমি বুঝেছিলাম। আমার অসুবিধে হচ্ছিল তাই ওর এই চাপটি আমি কম করতে চেয়েছিলাম। ভেতরে ভেতরে কাতরালেও ওপরে গররাজি দেখিয়ে সরে সরে যাচ্ছিলাম। বহিরাগত লোকজনে পরিপূর্ণ ছয়টি শোবার ঘর, একটি ঠাকুর ঘর, একটি রান্নাঘর এবং একটি উপরের তলার ঘর। কোন ঘরেরই আনাচ-কানাচ বাদ দিচ্ছিলাম না একা হয়ে চুপচাপ বসে থাকার জন্য। আমি লক্ষ্য করছিলাম যেখানেই আমি যাই না কেন রাজুও একটু পরেই সেখানেই কোন না কোন কাজের বাহানা নিয়ে হাজির হয়—এই যেমন রসগোল্লার বালতিটি কোথায়। রসগোল্লার বালতি ঠাকুর ঘরে থাকবে, না হলে বাসর ঘরে, না হলে রান্নাঘরে, কিন্তু রাজু ঢুকে গিয়েছিল টিভির ঘরে। টিভির ঘর হল পরিষ্কার ঝকঝকে নিরলংকার একটা ঘর যেখানে একটা খাট, এক দুটো কাঠের চেয়ার এবং একটা টিভি ছাড়া আর কোনকিছুরই প্রবেশাধিকার নেই, তবুও সেখানে

খোলা জায়গায় রাজু মিষ্টির বালতি খোঁজে। রাজুর এমন আচরণ দেখে আমার গোয়ালঘরে গিয়ে লুকোতে ইচ্ছে করছিল।

সবাই রাজুকে নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে যেন কেউ চেনে না। আগেও বাড়িতে আমার কোন দাম ছিল না। এখনও নেই। নিজের বিয়ের ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য না করে বধির থেকে কয়েক বছর ধরে দাদা সবাইকে একরকম বুঝিয়েই দিয়েছিলেন যে বিয়েতে তাঁর সম্মতি নেই। বয়স হয়ে যাচ্ছে ভেবে মা-বাবা দাদার বিয়ের জন্য যত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তার চেয়ে মেজদা বেশি ব্যস্ত হয়েছিল নিজের বিয়ের জন্য। নানা কথায় বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছিল তার বিয়ের আগে দাদার বিয়ে না হওয়ার প্রাচীরটি সরাতে হবে। তাই অবশেষে তার জন্য মেয়ে খোঁজা শুরু হয়েছিল।

আমার কলকাতা যাওয়ার পরে মেজদা ও দিদি কখনও যে আমার ফ্যাশন সেন্সের ওপর দৃষ্টিপাত করে তার তারিফ করেনি তা নয়। কিন্তু সেসব তারিফ তাৎক্ষণিক ছিল। কলকাতা থেকে বাড়ি গেলে আমার কেতাদুরস্তপনা বাড়ির গ্রাম্য সংস্কৃতি এবং শাসনের মধ্যে হারিয়ে যেত। কিন্তু বিয়ে ঠিক হলে দেখলাম মেজদা আমাকে কলকাতা থেকে সব প্রণামী শাড়ি কেনার দায়িত্ব দিল। দিদি বলল, "তাহলে ঝুমির ড্রেসটাও ওখানেই কেনা হোক।" আমি মহাখুশি। ঝুমি অর্থাৎ দিদির মেয়ের বয়স তখন তিন বছর। হাতে টাকা পেয়ে তাড়াহুড়ো করে প্রণামী শাড়ির ঝামেলা মিটিয়ে বীডন স্ট্রিট থেকে থেকে গড়িয়াহাটে গিয়েছিলাম ঝুমির জন্য জামা কিনতে। একটা সিল্কের জামার ডিজাইন খুব পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু সাইজ বুঝে উঠতে পারছিলাম না, বাড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার সময় ওর উচ্চতা মেপে নিয়েছিলাম তবু। মনে হচ্ছিল ছোট সাইজটা ছোট হবে এবং বড় সাইজটা বড়। ছোট সাইজটা পিংক রঙের ছিল। আমার পছন্দের। বড়টা সবুজ। আমার অপছন্দের। বিভ্রান্ত হয়ে হোস্টেলে ফিরে আসি। রাতটা খুব বাজে কাটে। ঘুমোতে পারি না। বারবার উঠে পড়ি। আমার স্টাডি টেবিলের লাইট জ্বালাই। লোহার খাটের স্ট্যান্ডে মাটি থেকে ঝুমির উচ্চতার সমান দুই ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতা মেপে দাগ দিই। সেখান থেকে মাথা আর গলার জন্য আট ইঞ্চি বাদ দিয়ে নিচে আসি যেখান থেকে ঘাড় শুরু হবে। মাটি থেকে আবার আট ইঞ্চি বাদ দিই ঠ্যাঙের জন্য। বেঁচে থাকে ষোলো ইঞ্চি। মনে হয় পিংকটা দুই ইঞ্চির জন্য ছোট পড়ছে। আমার রুমমেট ডলি আমাকে বোঝায়, "কিনে নাও বনানীদি, দেখবে ঠিকঠাক গায়ে বসে গেছে।" আমার চিন্তার কারণ হল সওয়া দু'শো টাকার জামা মেয়েটা সওয়া দু'মাসও পরতে পারবে না। সবুজটা নিলে সমস্যা নেই। ডিজাইনটা আমি ছাড়তে চাই না। তাই তিনদিন চক্কর লাগিয়ে দোকানদারকে তিনবার আমার পেছনে সময় নষ্ট করতে বাধ্য করে অবশেষে বড় সাইজের জন্য আরও পঁচিশ জুড়ে করে অর্থাৎ আড়াইশো টাকা দিয়ে সবুজটা কিনে হোস্টেলে ফিরি। তারপর রাতের বাসে চেপে সোজা বাড়ি। প্রণামী শাড়ি দেখে মা বললেন, "দেখেছ, মেয়ে কি সুন্দর বাজার করতে শিখেছে!" মেজদা হাসে, যেন কৃতিত্বটা ওরই, কেননা বাজার করার দায়িত্ব সে-ই আমায় দিয়েছে। টাকাও দিয়েছে সে। দিদি মেয়ের জামা পেয়ে খুশি। খুশি থেকে আমার প্রতি সবার কৃতজ্ঞতা নিতান্তই সাময়িক ছিল। সবাই অবিলম্বে

তাদের মনোযোগ ফিরিয়ে নিয়ে গেল রাজুর দিকে। আমি পড়ে রইলাম সেই নগণ্য হয়েই।

আমরা সবাই বরযাত্রী গিয়েছিলাম। সবাই মানে আমি, রাজু, ছোটদা, সেজদা, মামা, মাসি, পিসি এবং আরও অনেকে। রাতে ছাদনাতলার পাশে শাড়ি পরে চেয়ারে বসে আছি। বিয়ে দেখছি। রাজু গলায় একটা বড়সড় ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছে। সে বর-বউয়ের চেয়ে আমার ফটো তুলতে বেশি আগ্রহী। যখনই বুঝতে পারছিলাম ফটোর কেন্দ্রবিন্দু আমি, মাথা পেছনে ঘুরিয়ে নিচ্ছিলাম। আমার মস্তকহীন শরীর নিশ্চয় ধরা পড়ছিল ওর ক্যামেরায়। বউয়ের বাড়িতে বিশ্রামের জন্য মেয়েদের একটা আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছিল। বাসি বিয়ের দিন দুপুরে আমি শোব বলে সেখানে ঢুকেছি, দেখি কিছু একটা খোঁজার বাহানা নিয়ে রাজুর হঠাৎ প্রবেশ। বিরক্তি নিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে বসি। বুঝতে পেরে সে বলে, "তোমাকে বাইরে যেতে হবে না। আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি।"

বিয়ের পর রাজু কবে ফিরল এবং আমিই বা কবে কলকাতা এলাম মনে নেই। তবে মনে আছে একবার রাজু হোস্টেলে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। সেজদার কাছ থেকে দু'শো টাকা পকেটে বহন করেছিল আমাকে দেবে বলে। তখন রাজু এবং সেজদা দু'জনেরই আম্বালাতে পোস্টিং। মেজদার বিয়ের আগেও অন্ততপক্ষে বার দুয়েক রাজু আমার অজান্তে আমাদের বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছে। তাই সে আমাদের বাড়ির লোকের সঙ্গে এত পরিচিত।

আমি তখন হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে কেষ্টপুরে ভাড়াবাড়িতে থাকি। সবে এম এ পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সেজদা ব্যাঙ্গালোর থেকে বালুরঘাটে গিয়ে ছুটি কাটিয়ে ফেরার পথে কেষ্টপুরে এল। আমাকে বলল ব্যাঙ্গালোরে যেতে। বলল, "আর দেরি না করে তোর বিয়ে করে নেওয়া উচিত।"

আমার পরিকল্পনা ছিল অন্য। তবু আমি সেজদার কথামতো ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে দু'মাস থাকি। সেখানে সে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে আমার বিয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্র খোঁজাখুঁজি করে। পেয়েও যায় একজনকে। আমার অনেক 'হ্যাঁ না হ্যাঁ না'র পরে শেষপর্যন্ত কলকাতায় বড়মামার বাড়িতে ছেলের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে মিটিং-এর তারিখ ঠিক হয়। সেই উপলক্ষ্যে ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতা ফেরার প্রাক্কালে রাজুর সেই চিঠি পাই।

রাজুকে আমি উত্তর লিখি, "এখন আমার কলকাতায় ফেরার সময়, কাজেই আম্বালাতে যাওয়া সম্ভব নয়। তুমি কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারো।"

তাই রাজু কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। চিঠিতে আমি ওকে শুধু আমার কলকাতার পোস্টাল অ্যাড্রেস দিয়েছি। ওটা আসলে ছিল প্রদীপদার মেসের ঠিকানা। রাজু সেখানে গিয়ে প্রদীপদার কাছ থেকে আমার কেষ্টপুরের ঠিকানা সংগ্রহ করেছে। উদ্দেশ্য আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া।

গ্রাম থেকে শহরে

১৯৮৫ সাল। বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে বড়মামার ভাড়াতে নেওয়া বাক্সের মতো ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাটে থাকতে থাকতে অশান্ত হয়ে উঠেছিল আমার মন।

হ্যাঁ, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে বাড়ি ছাড়ার পরে আমি বড়মামার বাড়িতেই উঠি। কলকাতায় ছোটদাই সদ্য বাড়ি থেকে দুটো সুটকেস নিয়ে আলাদা হয়ে আসা আমাকে তাঁর তিন সদস্যের পরিবারে ফেলে দিয়েছিল। বড়মামার বাড়িতে ছোটদাও ছিল। তিনবছর আগে। সেখানে থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের হিন্দু হোস্টেলে বেড পাওয়ার অপেক্ষা করছিল। তখন মামার মেয়ে রুম্পার বয়স মাত্র দু'বছর। মামার নতুন সংসারে নতুন আগন্তুককে সামলাচ্ছেন কলকাতার বড়লোক ঘর থেকে নিয়ে আসা বউ। দু'মাসে নিজেকে খুব মানিয়ে নিয়েছিল ছোটদা মামার পরিবার এবং পরিবারের নতুন আগন্তুকের সঙ্গে। সে আমার চাইতে বেশি বুদ্ধিমান, অনেক বেশি সামাজিক। ছোটবেলা থেকে বাড়িতে কথা বলার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করার কারণেই সামাজিক। তবুও বাড়ির বাইরে আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের সঙ্গে ছোটদার কথা বলা, মেলামেশার কায়দা-কানুন দেখেশুনে আমি নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম যে এমন মেলামেশায় ওর মতো সফল না হলেও একেবারে বিফলও হব না।

বালিগঞ্জের স্টেশন রোডে মামার বাড়ির প্রসঙ্গে মাকে অনেকবার বলতে শুনেছিলাম, ''বাড়ি তো নয়, বাক্স।''

পাড়াগাঁয়ে জন্ম, পাড়াগাঁয়ে বিয়ে এবং পাড়াগাঁয়েই জীবন কাটিয়ে দেওয়া মা এতদিন বাড়ি বলতে যা বুঝেছিলেন মামার কলকাতার বাসস্থান তার সঙ্গে একদমই খাপ খায় না। মা বুঝেছিলেন বাড়ি হল কাঁচাপাকা রান্নাঘর, শোবার ঘর, ঢেঁকিঘর, ধানঘর ও গোয়ালঘরসহ একটি জায়গা যেখানে নানাবিধ ঘরের মাঝখানে থাকে উঠোন—সেই উঠোনের মাটি গ্রীষ্মের রোদ লেগে ফেটে চৌচির হয়, বর্ষার জলে পচে গিয়ে শেওলার জন্ম দেয় ও শরতে চতুর্দিকে প্রস্ফুটিত সুগন্ধি ফুলের পাপড়ি থেকে প্রতিফলিত হওয়া সূর্যের আলোতে ঝলমল করে, এবং শীতকালে পরিবেশ থেকে শীতলতা শোষণ করে বরফসমান ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে—পা রাখা দায় হয় তার উপর। এছাড়াও সেখানে থাকবে কলপাড়—দুই প্রধান দিশার মধ্যে চেপে যাওয়া অন্য কোন দিশায়—যেমন, ঈশান কিংবা অগ্নি কিংবা নৈঋত কিংবা বায়ু। কলপাড়ের ওই দিকটাতেই থাকবে পায়খানা এবং স্নানের ঘর। উঠোনে দাঁড়ালে মাথার ঊর্ধ্বে থাকবে উন্মুক্ত আকাশ এবং অধস্থে থাকবে এঁটেল মৃত্তিকা।

মামার বাড়িতে আমি দু'মাসের জন্য খুঁটি গাড়ার আগে কি কারণে ঠিক মনে পড়ছে না মায়ের সৌভাগ্য হয়েছিল দু'দিনের জন্য কুটুম্বিতা করার। বাড়ি দেখে মোটেও খুশি নন তিনি। অখুশি ইচ্ছা না অনিচ্ছাকৃতভাবে বোঝা যায় না। আমার মনে হত মায়ের খুশি না হওয়াটা ইচ্ছে ও অনিচ্ছে দুটো দিয়েও প্রভাবিত হয়েছিল। সেখানে মা পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-ঈশান-অগ্নি-নৈর্ঋত-বায়ু-ঊর্ধ্ব-অধঃ এই দশদিকেই কংক্রিটের দেওয়াল দেখেছেন। তাতে উঠোন নামে আপদের কোন চিহ্নমাত্র নেই। তাই উনি তাঁর স্বল্প কাজের ফাঁকে উঠোনে দাঁড়িয়ে মাথার উপরে অনেক দূরের

তারার সঙ্গে মিলিয়ে যাওয়ার জন্য আকাশের হাতছানি শুনতে পাননি। পিত্রালয়, শ্বশুরালয় থেকে প্রাপ্ত ব্যথা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ধরণী ধরিত্রীকে কাতরকণ্ঠে 'মা দু'ফাঁক হয়ে যাও মা, টেনে নাও আমায় তোমার ওই অতল গহ্বরে' বলে মিনতি করার সুযোগ পর্যন্ত পাননি। বাড়ির বাইরের উঠোন যাকে খলা বলা হয়, সেই খলা, কাঁঠালগাছ, আমগাছ, পাড়া প্রতিবেশী, হাবুপালের ইটভাটা, পালবেকারি—কিছুই নেই কলকাতায়। কেমন যেন একা একা, নিঃসঙ্গতায় মোড়ানো বদ্ধ পরিবেশ। শহুরে লোকের সংস্কৃত চলাফেরা তাঁর অশোধিত দরদি চলাফেরাকে খোঁচা দিয়েছে। শহরের মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা গ্রামের মধ্যবিত্তের চেয়ে উন্নতমানের তা মানতে অসুবিধে হয়েছে মায়ের।

বিয়ের আগেই বড়মামার ত্বকে কলকাতার বাবুয়ানার ছোঁয়া লেগেছিল। বিয়ের পরে তা ত্বক ভেদ করে শরীরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এত আলাদা উনি আমাদের থেকে যে তাঁকে আমার মামা বলে মনে হয় না, দুলাল ঘোষ বলেই মনে হয়। অবশ্য আমি তাঁকে মামা বলে ডাকি। জিভ চায় না, মন চায় না তবু। ছোটদা আমার অভিভাবক হয়ে যখনই তাঁর বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে আমি জিজ্ঞেস করি, ইউনিভার্সিটি আর কতদিন সময় নেবে বোর্ডার লিস্ট বের করতে? ছোটদা উল্টে আমায় প্রশ্ন করে, ''কেন?''

''এমনি।''

''এমনি কেন?'' ছোটদা ভয় পায় আমি হয়ত মামা-মামিমার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে থাকতে পারছি না অথবা রুম্পার সঙ্গে আমার কোন সমস্যা হচ্ছে। রুম্পার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর, কিন্তু দাপট অনেক। ভীষণ ফর্সা সে। ভীষণ যত্নে উজ্জ্বল ননীর মতো মোলায়েম গায়ের ত্বক তার। কানের নিচ থেকে বাটিকাটে ছেঁটে দেওয়া চুল। চেহারায় সামান্য স্থূলতা। রুম্পার চেহারাই বলে দেয় সে ধনী পিতা-মাতার সন্তান। ছোটদা যখন তাঁদের বাড়িতে ছিল তখন রুম্পা সবে আধো আধো কথা শিখেছে। তাকে সম্বল করেই সে ছোটদার সঙ্গে খুনসুটিতে মেতে থাকত। ছোটদাকে পড়াশোনা করতে দিত না। ছোটদা পড়তে বসলে তার বই খাতা ধরে টানটানি করত। পেনসিল নিয়ে টানাটানি করত। কলম নিয়ে বই-এ, খাতায় পড়ার অযোগ্য লেখা লিখত। মা মানা করলে হেসে হেসে বেশি করে অকাজে মন দিত। মৃদু বকলে জেদ করে আরও বেশি পাতা নষ্ট করত, কখনও পেন পেনসিল খাতা বই ছুঁড়ে ফেলত। ছোটদা যতই না বলুক আমি অনুমান করতে পারি মেয়ের ওপর মায়ের শাসন কম বলে ওর মনে একটু হলেও রাগ হত। গ্রামের মানুষ আমরা। আমরা বিরক্ত করাকে বিরক্ত করা বলেই জানি। মানি যে বিরক্ত করা একটা ছোটখাটো অন্যায় হলেও অন্যায়। ছোট বাচ্চা বিরক্ত করলে এক দু'বার ক্ষমা করে দেওয়া যায়। বারবার নয়। তৃতীয়বার সে ধমকানি খায়, চতুর্থবার পিটুনি। পিটুনি খেয়ে বাচ্চা ভ্যাবা-কান্না শুরু করলে যিনি পিটুনি দেবেন তিনি নিজেই বিপদে পড়বেন জেনেও পিটুনি দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন না।

বাড়িতে মা-বাবার দ্বারা বাচ্চাদের শারীরিক শাস্তি বাইরের অনেক দেশে বেআইনি

মানা হয় এমন জ্ঞান তখন আমাদের ভারতের গ্রামে-গঞ্জে কেন শহরের লোকজনেরও ছিল না। জানা ছিল না যে সুইডেন অনেক আগেই বাচ্চাদের শারীরিক শাস্তি বেআইনি ঘোষণা করে দিয়েছে। সুইডেন নামে যে একটি দেশ আছে সেটাই তারা জানত কিনা সন্দেহ। তবু মা-বাবা চণ্ডাল মূর্তি দেখিয়ে বাচ্চার পিঠে দুমদাম বসালে মা-বাবার শরীরের দৃষ্টিমধুর শৈলী বিকৃত হয়। দেখতে মোটেও ভালো লাগে না। তাই অন্ততপক্ষে নিজেদের কথা মাথায় রেখেই শহরের মা-বাবা সতর্ক থাকেন, বাচ্চাকে আদর করে সামলান।

রুম্পা শহরের বাচ্চা। মার খায়নি। মৌখিক 'না' করাতেই রেগে গিয়েছিল। পেনসিল নাকি ছুঁড়ে ফেলেছিল। বলেছিল, ‘‘আমি ধত্তি (ধরছি) না।’’ আর তার ছুঁড়ে দেওয়া পেনসিল কুড়িয়ে নিয়ে আসতে আসতেই ছোটদার মাথায় রুম্পাকে সামলানোর কৌশল উঁকি মেরেছিল। রুম্পা একটা কলমে হাত দিলেই ছোটদা আরেকটা কলম হাতে উঠিয়ে আবার টুক করে ফেলে দিত। বলত, ‘‘বলো তো ধত্তি না।’’ হাতে ধরা কলম রেখে দিয়ে রুম্পাও বলত, ‘‘আমি ধত্তি না।’’

রুম্পার সঙ্গে আমার এসব সমস্যা হয়নি যদিও আমার সময় সে অনেকটা বড়—পাঁচ বছরের মোটাসোটা শরীরে শক্তি জমা হয়েছিল অনেক বেশি, মাথায় দুষ্টুমি বুদ্ধিও জমে উঠেছিল ভয়ানক। আমি চুপচাপ থাকতাম বলে রুম্পা আমার পেছনে লেগে মজা পেত না। তবু আমি ভেতরে সংকুচিত হতে হতে একা হয়ে গিয়েছিলাম খুব। দুলাল ঘোষের নতুন সংসারে বিজাতীয় মনে হত নিজেকে।

ছোটদাকে শুধু বলতাম, এখানে ভালো লাগছে না।

আমি জানতাম ইউনিভার্সিটির প্রথম বোর্ডার লিস্টেই আমার নাম উঠবে। কলকাতা থেকে বালুরঘাটের দূরত্ব চারশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার। কুচবিহার, শিলিগুড়ি, ইসলামপুর এবং আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডের মেয়ে হলে শুধু তারাই আমার থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে, আর কেউ পাবে না। কিন্তু ওসব জায়গা থেকে ক'জনই বা আর থাকবে!

হোস্টেল

অবশেষে কলকাতা বীডন স্ট্রিটের ইউনিভার্সিটির ভি এল মিত্র ইউ জি হোস্টেলের কুড়ি নম্বর রুমে একটি বেড বরাদ্দ হল আমার জন্য এবং সেটাকে দখল করতে এক সন্ধ্যায় একটা ট্রাঙ্ক এবং শতরঞ্চিতে মোড়া তোষক, বালিশ, বিছানার চাদর নিয়ে আমি সেখানে পৌঁছে গেলাম। সেগুলোকে রুমে রেখে একটু পরেই ছুটলাম কমনরুমে। অ্যাটেনডেন্স নেওয়া হবে। আমার খুব খিদে পেয়েছিল। মামার বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছিলাম কিনা, কেন পেট এত খালি হয়ে গিয়েছিল মনে নেই। শুধু মনে আছে নাড়িভুঁড়ি পাক খেয়ে খেয়ে ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছিল পেটে। মনে আছে ভেবেছিলাম হোস্টেল তো আর বাড়ি নয় যে খিদে পেল কি রান্নাঘরে গিয়ে ভাতের হাঁড়ি খটখটিয়ে বাটিতে ভাত বের করব, মিটসেফ থেকে রাতের জন্য সাজিয়ে রাখা সবজি, ডাল থেকে হাতা দিয়ে খাবলা মেরে কিছুটা উঠিয়ে নেব আর তা দিয়ে ভাত মেখে পটাপট মুখে পুরব। বাড়িতে আমার কার্যকলাপকে আমি নিজে ভালো করে লক্ষ্য করিনি, বাকি সবাই করেছে—আমি নাকি রেগে গেলে রান্নাঘরে চলে যাই, ভরা পেটে আরও ভাত, ডাল গুঁজে দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করি। মা অবশ্য বলতেন, “খিদা পাবে নাই বা ক্যান! খায় তো একটুখানি, অর থ্যাকে একটা শালিকেরও আহার বেশি।”

কলকাতায় আসার আগে দিদি বলেছিল, “মামিমাকে আগেই বলে দিস তোকে অল্প অল্প করে দিনে দশবার খ্যাতে দিবে।” কিন্তু আমি মামিমার সামনে আমার খাওয়ার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে পারিনি। দ্বিধা হয়েছিল। কারণ আমার তাঁকে নিজের বলে মনে হত না, দুলাল ঘোষের ধনী বউ বলে মনে হত। যদিও উনি আমার দেখভাল খুব খারাপ করেননি। ঘরে একটি কাজের মেয়ে ছিল। নাম বাসন্তী। ডুপ্লেক্সে ঢুকলেই ডানদিকে ইন্ডিয়ান টয়লেট কাম বাথরুম। বাথরুমের পাশেই শু-স্ট্যান্ড। বাথরুমকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেলে একটা সিংগল বেড বাসন্তীর জন্য এবং ডানদিকে রান্নাঘর। বেডের পাশ দিয়ে উঠে গেছে আট দশটা ধাপের সিঁড়ি। সিঁড়ি অতিক্রম করলেই ডাইনিং টেবিল। তার বাঁ পাশে দুটো দরজা—একটা বেডরুমের জন্য। অন্যটা ড্রয়িং রুমের জন্য। বেডরুমে একটা প্লাইউডের উপর সাদা ফরমাইকা বসানো ছয় বাই সাতের ডিভান, একই জিনিসের তৈরি ছয় ফুট উচ্চতার দুটো আলমারি এবং আলমারির পাশে শেল্‌ফ।। জানালায় সাদা রঙের ভারি পর্দা। ড্রয়িং রুমটি বেডরুমের তুলনায় ছোট। সেখানে মেরুন রঙের টু প্লাস থ্রি সোফা সেট, জানালায় মেরুন রঙের মেঝে পর্যন্ত লম্বা পর্দা এবং একটি সি আর টি (ক্যাথোড রে টিউব) সাদা-কালো টেলিভিশন। তাতে শাটার ছিল। সেটিকে আমার তখন বিশ্বের আধুনিকতম টেলিভিশন বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল দুলাল ঘোষের লাইফস্টাইল হল কলকাতা শহরের সর্বাৎকৃষ্ট লাইফস্টাইল।

বাসন্তী ঘরের সব কাজ করত। কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘর মোছা থেকে শুরু করে জামাকাপড় রোদে মেলা, শুকোলে সেগুলোকে তোলা এবং গুছিয়ে ডিভানে

রাখা, রাতের বেডকভার উঠিয়ে মশারি ফেলে দেওয়া, সকালে মশারি উঠিয়ে বেড কভার পেতে দেওয়া, জামাকাপড় ইস্ত্রি করা সব। বিছানার চাদর, বালিশের কভারও ইস্ত্রি করত সে। আমার সমান উচ্চতার কালো ছিপছিপে চেহারার মুখে একগাদা ব্রোনোর দাগওয়ালা আমারই বয়সি মেয়েটিকে কলকাতার বাইরে কোন গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল দিনরাত থাকার জন্য। দিনরাতের হাজিরার বিনিময়ে সে খাওয়া-দাওয়া, পোশাক ছাড়া তিরিশ টাকা করে বেতন পেত। শুনেছিলাম মামা তার জন্য একটা স্যালারি অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। সেখানে জমা পড়ত বেতন। সেই অ্যাকাউন্টের টাকা বাসন্তী যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারত না। তার সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য তার স্যালারি অ্যাকাউন্টের ওপর মামার নিয়ন্ত্রণ ছিল। শুনে আমার মন্দ লাগেনি। মামা মায়ের নিজের ভাই হয়েও, উন্মত্তপ্রায় দিদিমার গর্ভজাত সন্তান হয়েও কত আলাদা। বিশ্বাস হতে চাইত না যে তাঁর শরীরে আমাদেরই পরিবার থেকে পাওয়া রক্ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বিশ্বাস হতে চাইত না যে উনি তার জীবনের প্রথম আঠারোটি বছর দিদিমার বাড়িতে কাটিয়েছেন, দিদিমার সঙ্গে। কলকাতায় তাঁর ভাড়াবাড়িতে কাজের মেয়ের মান আমার চেয়ে উপরে। সেখানে একমাত্র রুম্পা ছাড়া বাকি তিনজন মেপে মেপে কথা বলত। আমাদের গ্রামে আমি দেখেছি বাড়িতে বাচ্চারা বড়দের শাসনের চাপে চোরের মতো ঘুরে বেড়ায়, যেমন প্রবীর, যেমন আমি। একমাত্র বড়দের স্বাধীনতা থাকে উচ্চকণ্ঠে কথা বলার, হাসাহাসি করার, ঝগড়াঝাঁটি করার। কিন্তু কলকাতা শহরে উল্টো। এখানে মা-বাবার বাচ্চার কারণেই যতটুকু বেশি কথা বলা। আমার অবশ্য চুপচাপ থাকতে বেশি অসুবিধে হত না। আমাদের বাড়ির পরিবেশ অনেক আগেই আমার চারপাশে শামুকের শক্ত খোল তৈরি করে দিয়েছিল। সেই খোল নিয়েই আমি মামার বাড়িতে পা রেখেছিলাম। শুধু খারাপ লাগত বাসন্তীর সঙ্গেও কথা বলতে দ্বিধা অনুভব করে পাছে কোন গ্রাম্য আচরণ প্রকাশ পেয়ে যায় এই ভয়ে।

রান্নার সময় বাসন্তী সবজি কেটে দিত, তেল হলুদ নুন মশলা জল আগে বাড়িয়ে দিত, মামীমা শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেসব কড়াইয়ে ঢালতেন এবং খুন্তি নাড়তেন। উনি শাসিয়ে ধমকিয়ে আমাকে একবারে অনেকগুলি করে ভাত খাওয়াতেন, রোজ দুটো একশো গ্রামের সমান ওজনের আয়তকার করে কাটা রুই মাছের পেটি আমার পেটে ঢোকাতেন। আমার জ্বর হলে গড়িয়াহাটে ডাক্তারের কাছেও নিয়ে গিয়েছিলেন মামীমা। ডাক্তার আমাকে বেডে শুইয়ে লজ্জা দিয়ে পেটের চেয়ে বেশি আমার বুক টিপেছিলেন এবং বলেছিলেন আমার নাকি ম্যালেরিয়া হয়েছে। সেই সত্যি বা মিথ্যে ম্যালেরিয়া নিয়ে আমি মামার ছয় বাই সাতের একমাত্র খাটটা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য দখল করে নিয়েছিলাম। বাকি তিনজন কেবলমাত্র দুপুরে এবং রাতে সেখানে ঘুমনোর অনুমতি পেত। রুম্পার তা মোটেও ভালো লাগত না। আমাকে বিছানা থেকে তাড়াবার জন্য মাঝে মাঝেই সে ধুমধাড়াক্কা শুরু করে দিত। আমি তখন আরও টেঁসে গিয়ে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে দিতাম। ভেতরে যা-ই থাকুক মামীমার মুখে আমি কখনও বিরক্তি দেখিনি। মুখের রুচি হারিয়ে গিয়েছিল। উনি আমাকে বলেছিলেন, "সেকি

রে, না খেলে তো আরও দুর্বল হয়ে পড়বি! কি খেতে ইচ্ছে করছে বল।” আমার তখন মায়ের কথা খুব মনে পড়ছিল। মায়ের হাতে ধরা যে দুধসাবুর প্রতি সবসময় তিড়বিড় করে বিরক্তি দেখিয়েছি সেই দুধসাবুর কথা মনে পড়ছিল। আমি মামীমাকে দুধসাবুর কথাই বলি। শহুরে লোক আমার রুচির কথা জেনে মনে মনে আমাকে গাঁওটি ভাবতে পারেন সে লজ্জা না রেখেই। উনি আমার মুখের সামনে দুধসাবুর বাটিই তুলে ধরেছিলেন। সেই মহিলা আমাকে একেবারে খালি পেটে হোস্টেলে পাঠাতে পারেন না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। ভালবাসার আধিক্য না দেখালেও ন্যূনতম ভদ্রতা রক্ষা উনি করতেন।

বিছানায় ভিড় কম করতে মাঝে মাঝে মামা ড্রয়িং রুমের মেঝেতে নিজের জন্য শোবার জায়গা করে নেন। মামীমার দুধসাবু, ওষুধ খেয়ে আমি ভালো তো হই কিন্তু এমনই এক রাতে যখন মামা ড্রয়িং রুমে ঘুমে আচ্ছন্ন, সশব্দে চালিয়ে যাচ্ছেন শ্বাসপ্রশ্বাস বেডরুমে আরেক গণ্ডগোল পাকিয়ে আমি মামীমাকে ডেকে তুলি। করুণ স্বরে বলি, “ঘুমোতে পারছি না।”

উনি ধড়ফড় করে উঠে বসেন, “কেন রে? কি হয়েছে?”

“বিছানা ভিজে গেছে।”

“বিছানা ভিজে গেছে! কেমন করে?”

“রক্তে।”

তখনও মেয়েদের মাসিকে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। কিংবা লেগেছে কিন্তু তার প্রভাব আমাদের পরিবার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়নি। উনি উঠে গিয়ে লাইট জ্বালালেন, “যা উঠে গিয়ে কাপড় পাল্টে আয়।”

“কিন্তু ভেজা বিছানায় শোব কি করে?”

“এদিকে সরে এসে শো।”

আমি তা করতে পারি না। অশৌচ শরীর নিয়ে বড় ঘরের ফিটফাট মহিলার এত কাছে এসে শুতে দ্বিধা হবে আমার। উনি বলেছেন, আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু উনি আমার অনেক কাছের নন। আমার মা নন উনি। মা হলেও অস্বস্তি হত। বাড়িতে মাসিকের কাপড় কাচতে আমার যারপরনাই ঘেন্না করত। কল থেকে দু’বালতি জল পাম্প করে নিয়ে বাথরুমে ঢুকতাম। সেই জল মগে করে সমানে ফেলতাম কাপড়ের উপর যতক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে লাল রঙ বেরোনো বন্ধ না হয়। তারপর ওটাতে সার্ফ ঢেলে বাঁ হাত দিয়ে কোনওরকমে এদিক ওদিক করে ধুয়ে নিতাম। ঘেন্নাকে অতিক্রম করে ধোয়া রীতিমত কঠিন হত আর তার চেয়েও কঠিন হত ওগুলো মেলার জন্য জায়গা খুঁজে পাওয়া। দিদিকে দেখতাম বাথরুমের দড়িতেই টাঙিয়ে দিত কাপড়। অথবা কখনও ছাদে নিয়ে গিয়ে জামাকাপড় মেলার তারের একপাশটাতে শুকোতে দিত। দিদি অনেক বড়। অনেক বছর ধরে সে এমন করে এসেছে। লজ্জা নিশ্চয় কেটে গেছে তার। কিন্তু আমি ছোট। বাড়িতে আমার স্বাধীনতা কম। এমনিতেই সবার শাসনের মাঝে চোরের মতো থাকা, মাসিক হলে চোখ মুখ আরও শুকিয়ে যায়। মনে হয় বড় কিছু একটা অপরাধ করে ফেলেছি। মনে হয়

এত নগণ্য, এত অবহেলিত মেয়ের মাসিক হওয়াই উচিত নয়। এই জিনিসটা সবার সামনে আমাকে যেন আরও ছোট করে দেয়, বয়সে নয় 'মান'এ। এই জিনিসটা আমার স্বাধীনতা আরও খর্ব করে। আমি বাথরুমে কাপড় মেলতে পারি না লজ্জায়, এই একই বাথরুমে ছেলেরা সব স্নানে ঢুকবে বলে। সবার স্নান শেষ হলে ঢুকব ভাবি। কিন্তু স্কুলের দিনেই হোক আর ছুটির দিনে, বাবা সবার আগে আমাকে স্নানে যাওয়ার জন্য তাড়া লাগান। দেরি করলে চিৎকার করেন। কাপড় মাটির দোতলার ঘরে মেলেছিলাম, মা দেখে বলেছিলেন ওখানে মেলতে নেই। তাতে ঠাকুরের অপমান হয়। উপরের ঘর হল মায়ের ঠাকুরের বাসস্থান। কোথায় মেলি তাহলে? ছাদে মেললে কে কখন গিয়ে দেখে ফেলে, বুঝে যায় তার ঠিক নেই। লোকের বাথরুমে স্নানে ঢোকার সময় অনুমান করা যায়, ছাদে যাওয়ার সময় অনুমান করা মুশকিল। বাড়ির উঠোনের তারে মেলার কথা ভাবাই যায় না। উঠোনে ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত সবার অবাধ ঘোরাফেরা। এমন একটি ঘর নেই যেখানে ছেলেদের যাতায়াত নেই। শেষে একদিন নিষিদ্ধ মাটির দোতলার ঘরেই গেলাম। মায়ের পুরনো কাপড়ের পোঁটলার মধ্যে সেই কাপড় দলা পাকিয়ে ঢুকিয়ে রাখলাম। পরদিন দেখলাম সেই দলা শুকিয়ে গেছে। ভাবলাম মাকে ধোঁকা দিয়ে মাঠের ঠাকুরকে অবমাননা করে শেষপর্যন্ত একটা জায়গা খুঁজেপেতে পেলাম তাহলে। বেশ কয়েকমাস ভালোই কাটল। তারপর একদিন মা তাঁর পোঁটলাতে কিছু খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন আমার কাপড়। আমাকে ডেকে মুখে মোনালিসার হাসি টেনে জিজ্ঞেস করলেন, "কি এটা?"

লজ্জায় নিশ্চয় মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল আমার। কষ্ট করে বলার কোন প্রয়োজন নেই। মা জানেন ওটা কি, তবু জিজ্ঞেস করেছেন এটাই বোঝাতে যে এর পর আর যেন ওই অপৃশ্য জিনিসটা ওখানে না ঢোকে। মা শুধু 'না' করে গেছেন—এখানে মেলবে না, ওখানে মেলবে না, এখানে রাখবে না, ওখানে রাখবে না। কিন্তু কখনও বলেননি কোথায় মেলব, কোথায় রাখব। রক্ষণশীল স্বৈরাচারী প্রভুত্ব চলে এমন বাড়িতে ছোট মেয়ে হয়ে জন্মানোর সমস্যা অনেক। অনেক ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে তর্ক করতে চাইলেও এব্যাপারে মুখ খুলতে পারিনি, জিজ্ঞেস করতে পারিনি তাহলে মেলবটা কোথায়? তাই তারপর মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর মেলব না, ফেলব। খবরের কাগজে মুড়িয়ে বাথরুমের ছাদের উপর দিয়ে বাঁশঝাড়ে ফেলতে শুরু করলাম কাপড়। পুনঃব্যবহৃত না হওয়ায় প্রতি মাসে আমার নতুন কাপড়ের দরকার পড়ল। ছোট হতে থাকল উপরের ঘরের মায়ের পুরনো কাপড়ের পোঁটলার সাইজ। তাতেও মায়ের কাছে চোরের মতো ধরা পড়ে গেলাম। উনি আমাকে আড়ালে ধমকালেন, "লাটসাহেবি! এত কাপড় আমি পাই কোথায়!" তারপর তাঁর বিলাপ শুনলাম, "হেই, আমার কাঁথার কাপড় সব শেষ করল। হায় ভগবান!" বাবার পুরনো ধুতিও ব্যবহার করতে দেন না মা। তার পেছনে যুক্তিটা হল—কোন ছেলেরই কাপড় ব্যবহার করতে নেই, বাবার তো নয়ই, তাতে নাকি বাবাকে অপমান করা হয়।

রক্তে বিছানা ভেজানোর পর মামীমার ঠাণ্ডা প্রতিক্রিয়া দেখেও আমি লজ্জা পাই।

লজ্জা তাঁর প্রতিক্রিয়া ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য নয়। লজ্জা এই ভেবে যে উনি দুলাল ঘোষের বউ, আমার মা নন। মনে হয় এর চেয়ে মায়ের তিরস্কার ভালো। মায়ের তিরস্কার কম লজ্জা দেয়। যাই হোক, তখনও পর্যন্ত আমি বিছানার রক্তমাখা অংশটাকে আড়াল করে রেখেছি। মুখে বলেছি ভিজে গেছে, শুনে মনে মনে উনি কল্পনা করে নিন কেমন ভেজা, দেখতে দেব না। বোঝাই জল চাই, আগে দাগ ওঠাবো তারপর বিছানা ছাড়ব। উনি বাসন্তীকে ডাকেন। বলেন একটা ছোট বালতিতে সার্ফ-জল এবং একটা ছোট কাপড়ের টুকরো নিয়ে আসতে। আমি বালতির সার্ফ-জলে কাপড় চুবিয়ে চুবিয়ে বিছানার চাদর এবং ম্যাট্রেস থেকে দাগ ওঠাই, তারপর কাপড় পাল্টিয়ে বাকি রাত পার করি।

এমন মহিলা, হোক না বড়লোক বাড়ির কন্যা, আমাকে না খাইয়ে হোস্টেলে পাঠাবেন এমন তো হতে পারে না।

কমনরুমে যাওয়ার আগে সুস্মিতাদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম খাওয়ার কি পাওয়া যেতে পারে।

সুস্মিতাদি হেসে বলেছিল, ‘‘কাছেই দোকানে একরকমের কেক পাওয়া যায়। প্যাকেটে। এক টাকা দাম। তার সাইজটা এমনই যে একটা খেলে পেট ভরে না, আবার দুটো খেলে পেট বেশি ভরে যায়।”

‘‘কি করি তাহলে?”

‘‘আপাতত একটাই খেয়ে দেখ। তোকে নিচে যেতে হবে না। অষ্টমীদিকে বললে এনে দেবে।”

‘‘অষ্টমীদি!”

‘‘হেল্পার। বয়স্কা বিধবা।”

সুস্মিতাদি ছোটদার বান্ধবী। ইংলিশ অনার্স পড়ে। আমার চেয়ে দু’বছরের সিনিয়র। হোস্টেলে ছোটদার আরও দু’জন বান্ধবী ছিল—সুমিতাদি এবং রুমাদি। ওরা কি করে ওর বান্ধবী হল তা আমার কাছে কোন প্রশ্ন নয়। আমি বিস্মিত হয়েছি ওরা ছোটদার বান্ধবী হওয়ার ভাগ্য রেখেছে বলে। আমাদের বাড়ির ছেলে ছোটদা—তার বান্ধবী। একমাত্র দাদার (বড়দার) ওই রমলাদি ছাড়া আমাদের বাড়ির আর কোন ছেলের কোন মেয়ে বন্ধু আছে বলে আমার জানা ছিল না। আমি যখন হোস্টেলে পা রাখি তখন মেজদা ও সেজদা এয়ার ফোর্সের স্টেশনে স্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বৈমানিকদের মধ্যে বান্ধবীহীন জীবন যাপন করছে। সুরার বোতল সামনে পেয়েও সুরাতে অনাসক্তি দেখাচ্ছে, ককটেল পার্টিতে স্কচের সঙ্গে সোডা মিশিয়ে বন্ধুদের পরিবেশন করছে কিন্তু নিজেরা মুখে ওঠাচ্ছে না।

ছোটদা বান্ধবীদের বলেছিল হোস্টেলে আমার ওপর দিদিগিরি করতে। আমার চেয়ে তিন বছরের সিনিয়র হওয়ায় সুমিতাদি, রুমাদি অবশ্য আমি ঢোকার কয়েকদিনের মধ্যেই হেস্টেল ছেড়ে দেয়। সুস্মিতাদি তার নিজের জগত নিয়ে মগ্ন, নিজেই প্রায়ই

হোস্টেলের বাইরে রাত কাটায়। আমার ওপর দিদিগিরি খাটানোর সময় ও আগ্রহ নেই তার।

হোস্টেলে আরেকজন হেল্পার ছিল। নাম সরস্বতী। অষ্টমী ও সরস্বতী দু'জনেই খিটখিটে। কাজের জন্য আছে। কিন্তু কাজ করতে বললেই বিরক্তি। ডেকে সামনে বসিয়ে গল্প করো, তাহলে এদের মেজাজ ঠিক থাকে। প্রথম দিন অবশ্য অষ্টমীদি মুখ বুজে ফরমায়েশ খেটেছিল। একটা কেক আনতে বলে দেখলাম ভুল করেছি। যেন দানবের হুংকারে মেতে আছে শরীরের মধ্যপ্রদেশের অন্দরমহলটি। তাই নাম ডাকার পরে অষ্টমীদিকে আরেকটা কেক আনতে বলা হয়েছে। সে না করেনি। সুস্মিতাদির কারণেই হবে। ফরমায়েশটা আসলে আমার হয়ে সে-ই করেছে। সুস্মিতাদি ছিল একটি শক্ত সবল মনের বহির্মুখী চরিত্রের মেয়ে। মানব চরিত্র নিয়ে সমালোচনার আসরে বহির্মুখ বা অন্তর্মুখ শব্দ দুটো আমরা ছেলেদের ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহার করি না। মেয়েদের ক্ষেত্রে করি। বহির্মুখের অর্থ হল বিমুখ, পরাঙ্মুখ, বাহ্যবিষয়াসক্ত। বিমুখ সম্পর্কে আমাদের পরিচিন্তনহীন বোধ হল ঘরের প্রতি স্পৃহা কম। পরাঙ্মুখ সম্পর্কেও তাই। বাহ্যবিষয়াসক্ত সম্পর্কে আমাদের পরিচিন্তনহীন বোধ আরও গভীর এবং ভয়ংকর। সেখান আমরা মেয়েদের অস্তিত্ব ছেলেদের সঙ্গে দেখি এবং আরও স্পষ্ট করে বোঝাতে হলে বলতে হয় ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখি। আমাদের প্রায় সবাই অনেক মেয়ের চরিত্রকে খারাপ বলে কিন্তু প্রায় কেউই কোন ছেলের চরিত্রে খারাপ কিছু দেখে না। তারা ছেলেদের মধ্যে খুব বেশি হলে বাঁদরামো দেখে, তাই তাদের 'বাঁদর' আখ্যা দেয়। ছেলে বেশি বাঁদর হলে বলে 'বান্দর'। সুস্মিতাদির বীডন স্ট্রিটের সংখ্যায় পঞ্চাশোর্ধ মেয়ের আপাতকালীন বাসস্থানটির ওপর মোহ কম ছিল এবং তার যৌবনের ব্যক্তিত্ব দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল এ নিয়ে মাতামাতি করে কোন লাভ নেই, তাকে তার পথ বুঝে চলতে হবে।

হোস্টেলে প্রথম সন্ধ্যায় ভালো মেয়ে ভালো মেয়ে ভাব, রাতে গুটিসুটি হয়ে নিচে লম্বা ডাইনিং টেবিলে খেতে বসা, রুমমেটদের সঙ্গে পরিমত কথা বলা এবং প্রথম সকালে দ্বিধা নিয়ে বাথরুমের লাইনে দাঁড়ানো—এক কথায় লাজুক ব্যক্তিত্ব সব মেয়েরাই দেখিয়ে থাকে। আমিও দেখিয়েছি। এই লাজুক ব্যক্তিত্ব খুব ক্ষণস্থায়ী। কয়েকদিনের মধ্যেই মেয়েরা সাপের খোলস ত্যাগের মতো ভালোমানুষির খোলস পরিত্যাগ করে, তাদের আসল রূপ দেখিয়ে ফেলে। এব্যাপারে আমিও কোন ব্যতিক্রম হইনি। ব্যতিক্রমই যদি হব তাহলে দুলাল ঘোষের ডুপ্লেক্স ছাড়া কেন! আমার রুম নম্বর ছিল কুড়ি। রুমে চারজন। আমি, তপতী, দিব্যানি এবং দেবারতি। আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রুমে ঢুকেছে তপতী। কয়েকদিনের মধ্যেই তপতীর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব জমে ওঠে। উচ্চতায় সে আমার বিপরীত—আমার চেয়ে একমাথা লম্বা কিন্তু গায়ের রঙ আমরাই মতো। আমারই মতো সে ছিপছিপে কিন্তু বেশি উচ্চতার কারণে বেশি রোগা লাগে। মুখের চেহারায় বিদেশিদের কিছু বৈশিষ্ট্য ঢুকে পড়েছে। ভালো লাগে ওকে দেখতে। কয়েকদিন পরে আমার এবং তপতীর বন্ধুত্বের মাঝখানে দিব্যানির প্রবেশ ঘটে। তারপরে প্রবেশ ঘটে দেবারতির। এরা দু'জন সেকেন্ড ইয়ারের। বাড়ি

কলকাতা থেকে এক দু'ঘণ্টার দূরত্বে হওয়ায় ফার্স্ট ইয়ারে বেড পায়নি। দেবারতির উনিশ নম্বর রুমের একটি মেয়ের সঙ্গে মনের মিল হওয়ায় সে অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের রুম ছেড়ে দেয়। তার জায়গায় আসে তনিমা। আমাদের ডানপাশে বাথরুমের সঙ্গে প্রায় লাগানো উনিশ নম্বর রুম এবং বাঁ পাশে একুশ নম্বর। হোস্টেলে আমার এক মাস হতে না হতেই উনিশ নম্বরে রোগা চেহারার একটি নতুন মেয়ে এল। নাম কৃষ্ণা। কৃষ্ণা আমার মতো স্কার্ট-টপ, চুড়িদার পরে না, শাড়ি পরে। গায়ের রঙ মাঝারি, দেখতেও মাঝারি। বাথরুমে লাইন দিতে গিয়ে আমি ওর সঙ্গে এক দুটো কথা বলি।

হোস্টেলে দেখছিলাম কিছু মেয়ে আমার মতো স্কার্ট-টপ, চুড়িদার পরে ঢুকছে আবার কিছু মেয়ে ঢুকছে শাড়ি পরে। যেমন কৃষ্ণা। যারা শাড়ি পরে ঢুকছে তারা রোজ পরবে বলে ট্রাঙ্কভর্তি শাড়ি ব্লাউজ বহন করে দু'তিন দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলছে, রুমমেটের সঙ্গে হাতিবাগানে গিয়ে নাইটি, চুড়িদার কিনে নিয়ে আসছে। আমিও গিয়েছিলাম হাতিবাগানে, তবে চুড়িদার কিনতে নয়, নাইটি কিনতে। মাত্র তেরো চৌদ্দ টাকায় পাওয়া যায় নাইটি। আমার চোখে নাইটি হল শহুরে পোশাক। নাম থেকেই বোঝা যায় পোশাকটি রাতে পরার জন্য। কিন্তু হোস্টেলের মেয়েরা এটা দিনের বেলাতেও পরে, পরে হোস্টেলের মধ্যে এপাড়া ওপাড়া করে, নিচের তলায় কিচেনে যায়, ফোকলা আধময়লা ধুতি-গেঞ্জি পরা রোগাটে বড় ঠাকুর এবং ওই একই রকম কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ধুতি-গেঞ্জি পরা বেঁটে নধর ছোট ঠাকুরের সঙ্গে নিঃসংকোচে কথা বলে, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে, ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে এমনকি ভিজিটরস' রুমে ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও দেয়। কয়েকটি মেয়েকে আমি নাইটি পরে হোস্টেলের বাইরে গিয়ে দোকান থেকে চাল, ডিম, দুধ, কেক, টোস্ট কিনে নিয়ে আসতেও দেখি। ওই পোশাকটি আমার গায়ে চড়ে আমাকে তিনতলা দোতলা একতলায় ঘোরাঘুরি করার অনুমতি দিলেও ভিজিটরস' রুমের চত্বরে পা রাখার অনুমতি দেয় না। অবশ্য হোস্টেলে এসে আমার সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার কষ্ট ওঠাবে এমন বান্ধবীও আমার নেই। বন্ধু তো নেই-ই। মাঝে মাঝে ছোটদা আসে দেখা করতে কিন্ত ছোটদার সামনে নাইটি পরে হাজির হয়ে আমার গায়ে শহরের হাওয়া লাগার সুখবরটি দেওয়ার সাহস হয় না। আমি আমার প্রথম নাইটিটি কিনেছিলাম চল্লিশ টাকা দিয়ে। সবুজ রঙের হাতকাটা, গোল গলা, গলা থেকে ঝুরঝুরে কুঁচি পা পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার গলায় ছিল সাদা চওড়া লেস বর্ডার। প্রথমবার পরতে দেখেই আঠারো নম্বর রুমের ইলাদি বলেছিল, "কিরে বনু, বড় রোম্যান্টিক লাগছে তোকে দেখতে!" শুনে তপতী খুব হেসেছিল, "খেয়ে দেয়ে আর কাজ পেলে না ইলাদি। নাইটির ভেতরে রোমান্স দেখছ।"

ইলাদি অল্পস্বল্প মজা করলেও আদপে গম্ভীর। 'তোরা ছোট আছিস তাই আর কিছু বললাম না' বলে ছেড়ে দেয়।

গ্রামের মেয়ের গায়ে শহরের হাওয়া লাগার অর্থ আধুনিকতার ছোঁয়া লাগা। কলকাতা আমায় দিয়েছে সেই আধুনিকতার ছোঁয়া। হোস্টেলে একমাসও হল না

কিন্তু নিজেকে আমার বিশেষ কেউ মনে হল। সেই বিশেষ কেউ মনে হওয়া থেকে মনে কৃষ্ণাকে নিয়ে চুপিচুপি একটু গোলমাল করার ইচ্ছে জাগল। দুপুরে ওর সঙ্গে করে কথা বলে এসে রুমমেটদের বললাম, ‘‘মেয়েটিকে ডেকে একটু মজা করলে কেমন হয়?’’ প্রস্তাব শুনে রুমের বাকি তিনজন আনন্দে লাফিয়ে উঠল, ‘‘খুব ভালো।’’

তপতী বলল, ‘‘ওকে ডেকে নিয়ে আয়।’’

‘‘আমি যাব না।’’

তপতী দিব্যানির পেছনে পড়ে, ‘‘তুই ডাক।’’

‘‘আমি এসবের মধ্যে নেই। যে প্ল্যান করেছে সে ডাকবে,’’ মুচকি হাসে দিব্যানি।

রাতে অ্যাটেনডেন্সের আগে শেষপর্যন্ত তপতীই কৃষ্ণাকে ডেকে নিয়ে আসে। সে আসতেই শুরু হয় আমাদের প্রশ্ন উত্তরের আসর—

নাম কী?

কৃষ্ণা।

পুরো নাম কী?

কৃষ্ণা মণ্ডল।

বাড়ি কোথায়?

চব্বিশ পরগনায়।

কোন কলেজে পড়ো?

সেন্ট পলস-এ।

কীসে অনার্স?

বাংলা।

কয় ভাই বোন?

চার।

ঠিক করে বলো, কয় ভাই কয় বোন?

দুই ভাই দুই বোন।

ভাইবোন তোমার থেকে বড় না ছোট?

দুই দাদা বড়, বোন ছোট।

বাবার নাম কী?

এবার কৃষ্ণা চুপ। অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছে সে।

কী হল? বলছ না কেন?

তোমাদের নাম বলো।

কৃষ্ণা আসার আগেই আমি হয়ে গিয়েছলাম দিব্যানি, দিব্যানি হয়ে গিয়েছিল তনিমা, তনিমা হয়ে গিয়েছিল তপতী এবং তপতী হয়ে গিয়েছিল বনানী। কৃষ্ণার সামনে আমরা আমাদের নতুন পরিচয় পেশ করি।

গান জানো?

কৃষ্ণা চুপ।

গাও না একটা গান।

কৃষ্ণা চুপ।

নাচ জানো?

কৃষ্ণা চুপ।

হা হা করে হাসো তো দেখি।

কৃষ্ণা চুপ।

কৃষ্ণা আমাদের আসল নাম জানল অ্যাটেনডেন্সে গিয়ে। মাত্র কয়েক মিনিট পরেই। হোস্টেলে প্রচার হয়ে গেল আমরা কৃষ্ণাকে র‍্যাগিং করেছি। কয়েকদিন সিনিয়র মেয়েদের মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস হওয়ার পর খবর গেল সুপারিন্টেনডেন্ট-এর কাছে। সুপারিন্টেনডেন্ট এমনিতেই খুব শান্ত মহিলা, শহরতলীর একটি মেয়েদের স্কুলের শিক্ষিকা। অবিবাহিতা। চিরভগ্নস্বরে তীক্ষ্নতার মাত্রা নিচুতে রেখেই কথা বলেন। তাই সব কথা বোঝা যায় না। উনি কখনও রাগেন না। একেবারে নিরুপদ্রব জীবন তাঁর খুব পছন্দ যেখানে তর্কাতর্কি তো দূরের কথা এতটুকু উচ্চস্বরেও কথা হয় না, ছাড়াছাড়ি তো দূরের কথা কারও সঙ্গে এতটুকু ভুল বোঝাবুঝিও হয় না, কান্নাকাটি তো দূরের কথা এতটুকু শোকতাপও হয় না। তর্কাতর্কি, ছাড়াছাড়ি, কান্নাকাটি থেকে নিজেকে মুক্ত থাকতে চান বলেই হয়ত উনি পরিবারের সীমানা থেকে অনেক দূরে, চলার পথে কেউ সোজা রাস্তা থেকে একটু হড়কে গেলেই নিজেকে তার সীমানা থেকেও বহির্ভূত রাখতে চান। কিন্তু হোস্টেল এবং হোস্টেলের মেয়েরা তা হতে দেয় না। স্কুলের বাইরের সময়টুকু তাঁকে এখানেই কাটাতে হয় আর এখানেই মেয়েরা গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে থাকে। মেয়েরা একটু জোরে কথা বললেই সুপারিন্টেনডেন্ট চাপে পড়ে যান। রুম থেকে বেরিয়ে আসেন, বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়ান, চিৎকার করে বলতে চান, ‘‘আস্তে আস্তে।’’ চাপে পড়া তাঁর সেই আওয়াজ আমাদের কানের পর্দা পর্যন্ত পৌঁছয় না। আমরা বুঝে নিই।

র‍্যাগ করার অপরাধে একদিন সেই সুপারিন্টেনডেন্ট-এর ঘরে আমাদের চারজনকে হাজির করা হয়। আমাদের প্রতিপক্ষ হল কৃষ্ণা, কিছু সিনিয়র মেয়ে এবং মেট্রোন উমাদি। সিনিয়র মেয়েদের যে আশা নিয়ে আসা সেই আশা পূরণ হল না। সুপারিন্টেনডেন্ট পারলেন না আমাদের কেস হ্যান্ডেল করতে। আগে থেকেই চারটে সমাজবিরোধী উপাদানের খবর পেয়ে মনে মনে সিটকে ছিলেন। সামনে দেখে ভয়ে ডুকরে উঠলেন, ‘‘কি করেছ তোমরা? জানো না এসব করার অনুমতি এই হোস্টেলে নেই?’’ গলায় আওয়াজ সেই চিরভগ্ন এবং শুষ্ক।

উমাদি বললেন, ‘‘কি বলছেন ম্যাডাম! এই হোস্টেলে নেই! তার মানে এই হল যে অন্য হোস্টেল ছেলেমেয়েদের র‍্যাগিং করার অনুমতি দেয়।’’

শুনে সুপারিন্টেনডেন্ট চমকে উঠলেন। একে তো র‍্যাগিং নিয়ে মেয়েদের দুঃসাহসীপনায় উনি আতঙ্কিত। পুরো হোস্টেলের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। হোস্টেলে এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে জানলে ইউনিভার্সিটির বোর্ড অফ রেসিডেন্স-এর কাছে কি জবাবদিহি করবেন তার চিন্তা, তার উপর নিজেই এক চূড়ান্ত ভুল মন্তব্য করে বসেছেন।

সুপারিন্টেনডেন্ট-এর শুকনো চোখে আতঙ্কের মাত্রা আরেক ডিগ্রি বাড়ল, ‘‘না

না তা কেন হবে!" আরও কাঁপল গলা। আরও অস্পটতার দিকে গেল তাঁর স্বর, "আমি বলছিলাম তোমরা ফার্স্ট ইয়ারের মেয়েরা ফার্স্ট ইয়ারের মেয়েকেই..."

উমাদি আবার প্রতিবাদ করেন, "কি বলছেন! তার মানে সেকেন্ড, থার্ড ইয়ারের মেয়েরা কোন ফার্স্ট ইয়ারের মেয়েকে র‍্যাগিং করতে পারে।"

এবার সুপারের অবস্থা আরও করুণ। উনি সবলে মাথা ঝাঁকান। দেখলাম চোখদুটো তাঁর একবার বন্ধ হয়ে খুলে গেল। সঙ্গে মুখ থেকে ফিচ করে আওয়াজ, সিনেমার ফলির মতো কাজ করল সেটা। হতাশ হয়ে বিড়বিড় করলেন, "এবার আমাকেই হোস্টেল ছেড়ে দিতে হবে মনে হচ্ছে। তোমাদের মা বাবা জানতে পারলে তাঁরাই বা কি ভাববেন..."

উমাদি বোঝেন হোস্টেলে ঢুকে বখে যাওয়া এই মেয়েগুলোকে শাসন করার ক্ষমতা সুপারিন্টেনডেন্ট-এর নেই। তাই দায়িত্ব উনি নিজের হাতে তুলে নেন। যেচে। বাকি মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলেন, "এই মেয়েরা, তোমরা যে যার রুমে যাও। আমি দেখছি কি করা যায়।" সুপারিন্টেনডেন্ট-এর রুমে থাকলে উনি দোষীদের শাসন করা ছেড়ে নিজের ভীতি প্রদর্শনই করে যাবেন, উল্টোপাল্টা মন্তব্য করে যাবেন এবং তার প্রত্যুত্তর দিতে দিতে উমাদির আমাদের ধমকানোর জন্য মহাউদ্যমে সঞ্চয় করে রাখা শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে ভেবে উনি আমাদের কমনরুমে নিয়ে যান। এই কমনরুমেই হোস্টেলে আমার প্রথম সন্ধ্যায় নামডাকার সময় উমাদির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। নামডাকার পরে উনি আমার শর্ট স্কার্টের নিন্দে করেছিলেন, "এত ছোট স্কার্ট এখানে চলবে না।" শুনে আমি মুখ বন্ধ রেখেছিলাম। মনে মনে ভেবেছিলাম, চলবে কি চলবে না পরে দেখব। নিরীহ মেয়ের মতো মুখে অপরাধবোধের বিকাশ ঘটিয়ে তিনতলার সিঁড়ির দিকে আস্তে আস্তে পা বাড়িয়েছিলাম। উমাদি পেছনে থেকে ডেকেছিলেন আমাকে। চেয়ারে একইভাবে বসা। ফিরে দেখি ওনার রাগান্বিত মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে, "তোমার জামাটা কিন্তু ভারি সুন্দর। শুধু লম্বায় একটু ছোট এই যা। কোথায় থেকে কিনেছ? নিউ মার্কেটে?"

"না। আমার দাদা মুম্বাই থেকে নিয়ে এসেছে।"

"আমার জন্য একটা নিয়ে আসতে বলবে। লম্বায় একটু বড় দেখে।"

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম উমাদির দিকে। আমার চোখে ফুটে ওঠা প্রশ্ন পড়ে উনি বলেছিলেন, "আমার মেয়ের জন্য। ও ক্লাস সেভেনে পড়ে।"

কমনরুমে গিয়ে আমাদের চারজনের বাকি তিনজন 'সরি, আর কখনও এমন হবে না' বলে উমাদির কোপ থেকে মুক্তি পেল। আমি সরি বলি না। বোঝাতে চাই এটাকে আসলে র‍্যাগিং বলেই না। সুপারিন্টেনডেন্টের কথা টেনে বললাম, কৃষ্ণা আমাদেরই মতো ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। একটি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রীকে অন্য একটি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী র‍্যাগ করতে পারে না।

—অন্য একটি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী...তুমি তো একা ছিলে না, তাই না? তোমার সঙ্গে আরও তিনজন ছিল।

—তাতে কি এসে যায়? আমরা শুধু একটু মজা করে বন্ধুত্বের সূত্রপাত করতে

চেয়েছি।

—একে মজা বলে না। শাস্তি বলে।

—শাস্তি সেই ব্যবহারকে বলে যে ব্যবহার অন্য কারও শারীরিক কিংবা মানসিক ক্ষতি করে। ওর কি কোন...

—ওর মানসিক ক্ষতি হয়েছে। ভয় পেয়েছে ও।

—কৃষ্ণাকে এখনই ডেকে আমার সামনে জিজ্ঞেস করুন কীসের ভয় পেয়েছে।

উমাদি আমার আগে হোস্টেলে একশ লড়াকু মেয়েকে টাইট দেওয়াতে সাফল্য লাভ করেছেন। তাই তো সুপারিন্টেনডেন্ট-এর উপরে গিয়ে কথা বলেন। উনি দু'দিন আগে হোস্টেলে আসা এতটুকু মেয়ের মুখ থেকে কয়েকটি যুক্তি শোনার ধৈর্য রেখেছেন এটাই অনেক। আমার দাদাকে দিয়ে মেয়ের জন্য পছন্দের জামা আনাতে পারবেন এই আশাতে। একমাসে অন্ততপক্ষে আটবার অর্থাৎ সাতদিনে গড়ে দু'বার আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন দাদাকে বলেছি কিনা, কবে আসছেন দাদা এসব। কিন্তু এখন আমার কাছ থেকে কৃষ্ণাকে ডেকে জিজ্ঞেস করার প্রস্তাব উমাদির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয়। "এখানে লেখাপড়া করতে এসেছ, লেখাপড়া করবে। এর পরে আর একবারও যদি তোমার বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ ওঠে তাহলে লোকাল গার্জেনকে জানানো হবে," শাসান আমাকে। আমার লোকাল গার্জেন হলেন বড়মামা। দুলাল ঘোষ। নামটা মনে পড়তেই তাঁর বালিগঞ্জের সেই বাক্সের মতো ভাড়াবাড়ির ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তাঁর বউয়ের কথা মনে পড়ে, তাঁর মেয়ের কথা মনে পড়ে। কেউই খারাপ নন, তবু আমার ওখানে ওঁদের আভিজাত্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোণঠাসা হয়ে থাকা, অতি পরিমিত কথা বলা, অমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা—এতটাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যে দশবার পা ধুয়ে চপ্পল পরে গিয়েও বিছানায় উঠতে সংকোচ বোধ হয় পাছে তাঁদের বিশেষত রাতের সেই ইস্ত্রি করা সাদা ধবধবে বিছানার চাদর নোংরা হয়ে যায় ভেবে—সব মনে পড়ে, অস্বস্তি হয়। মনে পড়ে যায় আমার মাসিকের রক্তে বিছানা ভিজে যাওয়ার কথা। রুম্পা তখন কার্মেল স্কুলে পড়ে, এল কে জি কিংবা ইউ কে জিতে। সাদা শার্ট, নীল স্কার্ট, সাদা মোজা এবং কালো বেলি জুতো হল তার স্কুলের ইউনিফর্ম। রোজ শার্ট-স্কার্ট মোজা সার্ফজলে কেচে শুকোনো, রোজ শার্ট-স্কার্ট ইস্ত্রি করা, রোজ জুতো পালিশ করা, রোজ রুম্পার একগাদা হোমওয়ার্ক নিয়ে স্কুল থেকে ফেরা, মামীমার বিছানায় মেয়ের সঙ্গে বসা, মেয়ের দুষ্টুমিকে মেকি ধমকানি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে সেসব করানো, তারপর রাতে খাওয়া, শোওয়া—এসব স্মৃতি উমাদির সামনে আমাকে নিস্তেজ করে দেয়। তাঁর তিরস্কারের প্রত্যুত্তর না দিয়ে গুটি গুটি পায়ে প্রস্থান করি।

উমাদির বয়সের আন্দাজ লাগানো মুশকিল। তাঁর চেহারাটাই এমন। শুধু আমি কেন, হোস্টেলের কেউই জানত না উমাদির বয়স কত। মহিলা লম্বায় পাঁচ চার কি পাঁচ পাঁচ হবেন। শ্যামবর্ণ স্লিম চেহারা। তাঁর মুখের শ্রী আর কারও চোখে না

পড়লেও আমার চোখে পড়েছে। অন্যের ওঁকে সুশ্রী না মনে করার কারণ আছে। উমাদির মাথার চুলের ঘনত্ব খুব কম। সেই কম ঘনত্বের চুলগুলি সবদিক থেকে টেনে উনি মাথার উপর তুলে নেন। নিয়ে তাতে পরচুলা মিশিয়ে খোঁপা বাঁধেন। ওই শিরোস্থিত খোঁপাকে আমি ওনার শিরোমণি বলে মনে করি। খোঁপার কারণেই উমাদিকে আমার দেখতে সুন্দরী লাগে। তপতীকে সেই কথা বলাতে সে হেসে ওঠে, "মাথার খোঁপাটাই দেখলি? খোঁপার চারপাশে হাঁ হয়ে থাকা উলঙ্গ জায়গাগুলো দেখলি না?"

তপতীর মুখে উলঙ্গ কথাটা শুনতে আমার ভালো লাগে না। তাই বলি, "আমি উমাদির ছাড়া চুল দেখেছি। কোমর পর্যন্ত লম্বা।"

তপতী আরেক ডিগ্রি উপরে গিয়ে উত্তর দেয়, "এমন লম্বা চুলের চেয়ে নিচের বেঁটে কোঁকড়ানো ঘন চুলগুলো ভালো রে। চামড়া ঢেকে দেয়।"

আমার বুকের ভেতরটায় কেমন যেন চিলিক দিয়ে ওঠে। আমারও চুল পড়ার ব্যামো আছে। বংশগতভাবে পাওয়া। আমাদের বংশের ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধিতে এই রোগ পেয়ে বসে। বয়ঃসন্ধি হল শৈশব ও যৌবনের মিলনকাল। তখন যৌবনের আগমন ঘটে। যৌবন শরীরে তার প্রবেশ ঘটিয়ে কিশোর কিশোরীকে আবেগপ্রবণ করে তোলে, মনে কামের ইচ্ছা জাগায়। ভেতরের যৌন আবেদন ঢেকে রেখেই হোক আর প্রকাশ করেই হোক ছেলেমেয়েরা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী হয়, প্রেম জাহির করে অথবা প্রেম জাহির করতে গিয়ে লুকোচুরি খেলে। সবটাতেই মজা। পেয়েও মজা, না পেয়েও মজা। এই সময়, জীবনের এই চূড়ান্ত রোমাঞ্চকর দিনগুলোতে মাথার চুল যদি সঙ্গে না থাকার ঘোষণা করে ফেলে এবং অনেক অনুরোধ, কাকুতি-মিনতি, কান্নাকাটির পরেও যদি গোঁ ধরে ব্রহ্মপ্রদেশের চামড়াকে নির্মমতার সঙ্গে বয়কট করা জারি রাখে তাহলে জীবনের আনন্দ আর কি বেঁচে থাকে অথবা থাকবে বলে মনে হয়! অনেকভাবে চুলের পুজো করে তাদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেছি। মায়ের পরামর্শ মেনে। আমার মনে হত আমার চুলের অসহযোগ আন্দোলন দিদির চুলের অসহযোগ আন্দোলনের থেকেও ভয়ংকর। নির্দয় হৃদয় নিয়ে নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে দল বেঁধে তারা পরিত্যাগ করে আমাকে। আমি কাঁদি। আমার করুণতর অবস্থা দেখে নিজে অপেক্ষাকৃত ভালো আছি ভেবে দিদি কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু মায়ের মনে অনুকম্পা জাগে আমার জন্য। "শিলপাটাতে পেঁয়াজ ব্যাটে তার রস চুলের গোড়ায় লাগা। পেঁয়াজের রস মাথা ঠাণ্ডা রাখে। মাথা ঠাণ্ডা থ্যাকলে দেখবি আর চুল পড়বে না," বলেন মা। মা দিদিকেও একই কথা বলেছিলেন। দিদিও একই জিনিস করেছিল। কি উপকার পেয়েছে দিদিই জানে। আমার মনে হত কোন লাভ হয়নি। কিন্তু আমি এখন আমার মনে হওয়ার ওপর নির্ভর করব না। আমি করে দেখব, দিদির ওপর না হলেও আমার ওপর পেঁয়াজের রস অলৌকিক জাদু দেখিয়েই ফেলতে পারে। আমাদের বাড়িতে রান্নার জন্য কোনদিন পেঁয়াজ বাটা হয় না। কোনও পদের জন্য না। যে পদ অন্যরা পেঁয়াজ বেটে রান্না করে, মা রান্না করেন বঁটিতে পেঁয়াজ কুঁচিয়ে নিয়ে। তাতেই অপূর্ব স্বাদ।

মায়ের সর্বপ্রশংসিত ডিমের ঝোল রান্নার পদ্ধতিও ওই একইরকম।

রান্নাঘরের বারান্দার দিকে উঠোনের এক কোণায় যেখানে মাছ কাটার বঁটি রাখা হয়, সেখানে অবহেলায় পড়ে থাকা অতিরিক্ত একটি শিলপাটা টেনে ধুয়ে নিয়ে তাতে পেঁয়াজ বাটি। এই শিলপাটা এমন এমন দুঃসময়ের মোক্ষম মুহূর্তগুলোতে কাজে আসে তবু তার এত অনাদর। মাথায় পেঁয়াজের রস শুকিয়ে গেলে চুল দড়ি পাকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। জল ঢেলে চুলকে বন্ধনমুক্ত করতে গিয়ে দেখি বাথরুমের ড্রেন দিয়ে গোছা গোছা চুল জলের সঙ্গে আমাকে টাটা করে চলে যায়। মাকে বলি, হবে না।

"ক্যান? হোবে না ক্যান?"

"দেখছ না বেশি চুল পড়ছে?"

"যেগল্যা পড়ার পড়ুক। তার জায়গায় নতুন চুল গজাবে।"

"সত্যি গজাবে তো মা?"

"সত্যি না তো কি মিথ্যা?"

আমার মিথ্যাই মনে হয়। তবু মনকে শান্ত হয়ে মায়ের ঘরোয়া ডাক্তারির ওপর ভরসা রাখতে বলি। আরও কয়েকদিন পেঁয়াজের শুকিয়ে যাওয়া রসের সঙ্গে চুলের ধস্তাধস্তি চলে। মাথা আরও ফাঁকা হয়ে যায়। তারপরের কিছুদিন মায়েরই মৌখিক প্রেসক্রিপশন মেনে জবাফুলের পাপড়ি বেটে নাকের পোঁটার মতো সেই হড়হড়ে জিনিসটা দিয়ে চুলের একইরকম চিকিৎসা করি। তাতেও একই লোকসান হয়। হাঁসের ডিম ভেঙে ফেটিয়ে মাথায় ঢেলে দুর্গন্ধময় মাথা নিয়ে ঘুরি কিছুদিন। কিন্তু কোনই উপকার পাই না। বরং অপকার পাই। এত টানাটানির ধকল সহ্য করতে না পেরে মাথার চামড়া আরও চুলশূন্য হয়ে পড়ে। একদিন মুক্তিমাসি বলেন, "হাঁসের ডিমে কাজ হবে না বনদেবী। মুরগির ডিম লাগাও।"

আমাদের বাড়িতে মুরগির ডিম ওঠে না। কেউ হাতে ধরে না মুরগির ডিম। আশপাশের মুরগিরও সাধ্য নেই ডিম পেড়ে লাথি মেরে বেড়ার নিচ দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঠেলে দেয়। কি করি, কিভাবে করি ভেবে ভেবে মাথার আরও কিছু চুল ঝরিয়ে ফেলি। আমার মাথার এমন করুণ অবস্থার দিনে আরও একটি সমস্যা হাজির হল। বেঁচে থাকা গুটিকয়েক চুলে পাক ধরল। মায়ের ডাক্তারির ওপর থেকে আস্থা হটে গেল আমার। মামার বাড়ির কাছে রঘুনাথপুরের বাজারের মধ্যে সুনীল মাস্টারমশায়ের হোমিওপ্যাথি চেম্বার। সেখানে যাই।

সুনীল মাস্টারমশায় অমানিতার বাবা যাঁর ছেলেকে পড়িয়ে দিদি একসময় তার টাইপিং স্টেনোগ্রাফি শেখার টাকা জুটিয়েছে। ভদ্রলোক নদীর ওপারে কালিকাপুর ইস্কুলের শিক্ষক। লম্বা ফর্সা চেহারা, ধুতি পাঞ্জাবি পরেন। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা ব্যবহার করেন এবং কাঁধে এটা লম্বা ফিতের সাইড ব্যাগ নিয়ে সাইকেল চালিয়ে ইস্কুলে যান। ক্লিনিক খুলে প্রথম প্রথম রোগীর সমস্যা শুনে বই পড়ে ওষুধ দিতেন এবং একটি রোগী বিদায় নিলে পরের রোগীর জন্য চেম্বারে বসে অপেক্ষা করতে করতেও বই পড়তেন সেই জ্ঞান তার ওপর কাজে লাগাতে পারবেন বলে।

এভাবেই ধীরে ধীরে সুনীল মাস্টারমশাই সুনীল ডাক্তারেরও খেতাব অর্জন করেন এবং মাস্টার ও ডাক্তার এই যৌথ পরিচিতির এক ভারসাম্য অবস্থায় সাইকেল নিয়ে স্কুলের বাইরেও যত্রতত্র নিরুপদ্রবে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। মাস্টার কি করে বই পড়ে নিজে নিজে ডাক্তার হন এ নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন ওঠায় না। রোগের কাছে সবাই কাহিল। আমিও। ছাত্রছাত্রীদের কাছে উনি মাস্টার, রোগীদের কাছে ডাক্তার।

আমি আমার চুল পাকার সমস্যা নিয়ে সুনীল ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে উনি আমাকে আধ ঘণ্টা সামনে বসিয়ে রেখে বই পড়ে অতি যত্ন সহকারে জলের মধ্যে কিসব তরলাকার ওষুধের কয়েক ফোঁটা ঢেলে তা শিশিতে পুরে দেন, দিনে দু'বার মাথায় লাগাতে বলেন। খালি পেটে মুখে ঢালার জন্য পুরিয়াও দেন। আমি সুনীলবাবুর স্কুলে কখনও পড়িনি। তাঁর সামনে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে আমার প্রথম হাজির হওয়া। তবু তাঁকে ডাক্তার মনে হয় না। ছয় মাস ওনার চিকিৎসাধীন থাকি। রোজ মাথায় তাঁর দেওয়া ওষুধগোলা জল লাগাই, রোজ পুরিয়ার ওষুধ খাই আর রোজ দেখি মাথায় সাদা চুলের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, কচি বয়সেই বুড়িয়ে যাচ্ছি। রোজ আমি মায়ের কাছে দুঃখের গান গাই, "ও মা, সুনীল মাস্টারের ওষুধও কিসু করতে পারে না দেখো। কি করি?"

দাদা আমার হতাশায় নুনের ছিটা দেন, "তুই ডাক্তারকে মাস্টার কোস। তাই তার ওষুধ কাজ করে না।"

দিনরাতের গতির চেয়ে আমার চুল পাকার গতি বেশি। একদিনে চার পাঁচটি করে চুল পাকে। পাকা চুল নিয়ে বাইরে বেরোতে লজ্জা করে। মনে হয় এর চেয়ে ন্যাড়া মাথা নিয়ে বেরোনো কম লজ্জাকর। মা অবশ্য তা মনে করেন না। মা'র মতে আমার মাথা ন্যাড়া হোক, সাদা হোক কোনকিছুতেই আমার কোন লজ্জা থাকা উচিত নয়। মাকে বলি পাকা চুল তুলে দিতে। কিন্তু মায়ের আপত্তি। তেলচিপচিপে চুল হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যায় বলে আঙুলের ডগায় ধান নিয়ে তার সঙ্গে চেপে ধরে অনেকদিন মায়ের পঞ্চাশ-ষাটখানা করে পাকা চুল তুলে দিয়েছি। মা তাতে করে মাথার চুলকুনি থেকে সাময়িক রেহাই পেয়েছেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে উনি স্বার্থপর। মানতে চান না আমার মাথাতেও পাকা চুলের চুলকুনি হতে পারে। বাবা বলেন, "একটা পাকা চুল তুলব্যা তো আরও দশটা চুল প্যাকবে।" বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না বাবার কথা।

বালুরঘাটে একদিন একটা সাদা চামড়ার সাদা চুলের বাচ্চা ছেলেকে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম ইংল্যান্ড না হলে আমেরিকা থেকে কারও বাড়িতে কুটুম্বিতা করতে এসেছে। কুটুম্বিতা তো সে করতে এসেইছিল, কারণ পরে আর তাকে বালুরঘাটে দেখা যায়নি। অন্ততপক্ষে আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু কুটুম্বিতা সে ইংল্যান্ড বা আমেরিকা থেকে করতে আসেনি, আমাদের ইন্ডিয়া থেকেই এসে থাকবে এবং ইন্ডিয়ার সেই জায়গাটি আমাদের পশ্চিমবঙ্গই হবে। বালুরঘাটের আশপাশও হতে পারে। পরে বুঝেছিলাম। তখন জানতাম না যে অকিউলোকিউটেনিয়াস অ্যালবিনিজম বলে মানুষের কোন জেনেটিক ডিজঅর্ডার আছে যার ফলে মানুষের চুলে, চোখে এবং

ত্বকে মেলানিন পিগমেন্ট একদমই থাকে না অথবা খুব কম থাকে। তখন জানতাম না যে বিদেশিগুলোর সাদা চুলকে ব্লন্ড হেয়ার বলে এবং এই ব্লন্ড হেয়ার আসলে বিশুদ্ধ সাদা রঙ নয়। সাদা এবং ব্লন্ডের মধ্যে টোনের পার্থক্য আছে। সাদা হল কোল্ড এবং ব্লন্ড হল ওয়ার্ম। চুল আইস ব্লন্ড, হোয়াইট ব্লন্ড অথবা প্লাটিনাম ব্লন্ড যে ব্লন্ড-ই হোক না কেন সাদা অর্থাৎ পাকা চুলের সঙ্গে তার পার্থক্য থাকেই। এই পার্থক্যহেতুই পেকে যাওয়া সাদা চুলকে আলাদা গোত্রে ফেলে বলা হয় গ্রে হেয়ার। তাই তখন হতাশায় ডুবে গিয়ে মাঝে মাঝে আমার অবুঝ মন ভাবত শ্বেতাঙ্গরা কত সুখী। তাদের চুল পাকার চিন্তা নেই। চুলের রঙ বাদামি হোক, খয়েরি হোক অথবা কালো অথবা সাদা কোনকিছুতেই কোন অস্বাভাবিকতা নেই।

বাবা কিসে চুল পাকা বাড়ে তা বলেছেন কিন্তু কিসে চুল পাকা কমে তার কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত দেননি। চুল পাকা বন্ধ করার ওষুধ আমি আবিষ্কার করেছিলাম। দোতলার নির্জন মাটির ঘরে উঠে গিয়ে দাদুর কবিরাজি বই ঘেঁটে। তাতে লেখা ছিল লাল করবীর শিকড় দুধের সরের সঙ্গে মিশিয়ে বেটে চুলের গোড়ায় লাগালে অকালে চুল পাকা বন্ধ হয়। এখানেও আমার এক সমস্যা থেকে যায়। আমাদের বাড়ি, মামার বাড়ি এবং আমাদের গ্রামের লোকজন যেটাকে করবী ফুল বলে জানে আমার স্কুলের বান্ধবীরা সেটাকে করবী ফুল বলে মানে না। তারা তাকে বলে কলকে ফুল। করবীর নাম বললে তারা অন্য ফুলের ছবি দেখায়। মামার বাড়িতে ধুতুরা ফুলের মতো কিন্তু অনেকটা ছোট আকারের লালচে রঙের ফুলের গাছ ছিল যেটাকে আমরা লাল করবী বলে জানতাম। কলেজের বান্ধবীরা সেই ফুলের নাম নিয়ে আমার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিলেও আমি সেই ফুলকে মনের জোর দিয়ে করবী ফুল বলেই মানি এবং সেই ফুলের গাছের শিকড় নিয়ে এসে দুধের সরের সঙ্গে বেটে মাথায় দু'তিন মাস ধরে লাগাই। আমার চুল পাকা বন্ধ হয়। এই প্রথম আমার জীবনে কোন রোগে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় অবিশ্বাস্যভাবে সুফল পাওয়া। করবী বা কলকে যে গাছই হোক না কেন তার শিকড় আমার মাথা থেকে একগাদা সাদা চুলও অদৃশ্য করে দেয়। কিন্তু চুল পড়ার কাছে তা পুরোপুরি হার মেনে বসে থাকে।

উমাদি বিধবা ছিলেন। কিন্তু উনি বৈধব্য পালন করতেন না। কেবলমাত্র মাথার সিঁদুরটি ছাড়া তাঁর বাকি সবকিছুই সধবার মতোই—সাজপোশাক, খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ। উমাদির প্রেমিক আছে এবং প্রেমিকের সঙ্গে তাঁর সহবাস আছে বলে হোস্টেলের অনেক মেয়ের বিশ্বাস। দারোয়ান নৃপেনদার সঙ্গে উমাদির হেসে হেসে ন্যাকামি করে কথা বলার মধ্যেও মেয়েরা প্রেমের রস খুঁজে পায়। উমাদির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমার কোন কৌতূহল নেই। তাঁর ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। উমাদির সঙ্গে আমার অন্য সমস্যা। উনি আমার স্বাধীনতা খর্ব করেন, করতে চান। হোস্টেলের নিয়মতন্ত্রের কাছে বাঁধা পড়েই করতে চান, তবু তাঁর নির্দেশের কাছে মাথা নত করে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না।

আমি প্রায়ই সন্ধ্যায় অ্যাটেনডেন্সের সময় হোস্টেলে উপস্থিত থাকি না। উমাদির সঙ্গে আমার শত্রুতা বাড়তেই থাকে।

হোস্টেলে ঢুকেই একতলায় বাঁ দিকের কোণার ঘরটিতে উনি তাঁর ডিউটির এক রাত কাটাতেন। পরের রাতে সেই খাটের বিছানা গুটিয়ে রাখা হত। তার বদলে অন্য খাটটিতে খুলে যেত আরেকটি বিছানা। হোস্টেলে আরেকজন মেট্রোন ছিলেন—মাসিমা—মাঝখানে কেটে অর্ধেক করা আলুর মতো চ্যাপ্টা গোল ফর্সা মুখে কালো চওড়া ফ্রেমের চশমা পরা মোটাসোটা এক বিধবা। বয়স ষাট পঁয়ষট্টি হবে। মাসিমার তিনটে মেয়ে। তাদের সাক্ষাৎ মুখদর্শনের সুযোগ আমার হয়নি কিন্তু মাসিমা বারবার তাঁর গল্পের ঝুলি খুলে তাদের চেহারা শব্দে সাজিয়ে আমার চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনজনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তিনজনেরই একটি করে ছেলে ছিল। তাদের নাম ছিল লাল, নীল, সবুজ। আগের দিন উমাদির শাসনের দংশনে আমার গায়ে ধরা জ্বালা পরের দিন মাসিমার রূপকথার মতো গল্প দিয়ে প্রশমিত হত। কিন্তু তার বদলে শরীরে শুরু হত অন্য প্রতিক্রিয়া। রুমে ফিরলেই তপতী ছ্যাবলামির হাসি হেসে জিজ্ঞেস করত, ‘‘আজ আবার কোন ঢপের চপ খেয়ে এলি রে?’’

আমি বলতাম, ‘‘মাসিমার জামাইরা নাকি মাসিমাকে খুব ভালবাসেন। হঠাৎ করে পেছন থেকে এসে কোলে তুলে নিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের মতো চরকিপাক খাওয়ান।’’

তপতী শুনে হাসত।

আমি বলতাম, ‘‘মাসিমার মেয়ের বাড়ির কুকুর বেড়ালগুলো নাকি খুব ভদ্র।’’

তপতী হাসত, ‘‘বেড়াল কুকুর কি করে ভদ্র হয় রে? আমার জানা নেই তো! কি বললেন উনি তোকে?’’

‘‘এই আর কি! শিষ্টাচারের কথা। কুকুরগুলো লাল, নীল, সবুজের সঙ্গে একই থালায় ভাত খায়...’’

‘‘হা হা। আর বেড়ালগুলো?’’

‘‘বেড়ালগুলো পেচ্ছাবখানায় গিয়ে পেচ্ছাব এবং পায়খানায় গিয়ে পায়খানা করে।’’

‘‘হা হা হা হা,’’ এবারের হাসিটা বেশ লম্বা। ‘‘ধন্য তোর পেট! এত বড় ঢপের চপ অনায়াসে হজম করে ফেলল!’’

‘‘না, করতে পারেনি। গুলোচ্ছে পেট, বমি বমি লাগছে। কি করি?’’

‘‘শুনত হবে না ওইসব কথা। প্রেম কর। রোজ রাত দশটায় হোস্টেলে ঢোক।’’

হোস্টেলের অনেকেই প্রেম করছে। ক্লাসমেটের সঙ্গে, কলেজে যাতায়াতের পথে রাস্তায় আলাপ হয়ে যাওয়া কোন ছেলের সঙ্গে, বান্ধবীর দাদার সঙ্গে, বান্ধবীর মামা-কাকার সঙ্গে। কেউ আবার ছোটবেলার প্রেমিকের পেছন পেছন এসে কলকাতায় ঢুকেছে। ঢুকে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে আগের মতোই, কিংবা আগের চেয়ে আরও মধুর করে। এখানে মা-বাপের শাসন নেই। পরিচিতদের শকুনি চোখ ঘুরে বেড়ায় না রাস্তায় রাস্তায়, লোকজনের ভিড়ে দৃষ্টিপাত করে কেউ তা থেকে ছেঁকে উঠিয়ে নেয় না ছেলের শরীরের সঙ্গে লেগে থাকা মেয়ের শরীর। মেয়েদের গ্রাম থেকে যারা জীবিকার অথবা অন্য প্রয়োজনে কলকাতায় আসে তারা শহরের তালগোলে নিজেদেরই

অস্তিত্ব খুঁজে পেতে হিমশিম খায়, অন্যের অস্তিত্বের কি খবর রাখবে! শুধু লোকাল গার্জেনকে আড়াল করে চলতে পারলেই হল। প্রেমিকের সঙ্গে হাতিবাগান থেকে বীডন স্ট্রিট এবং বীডন স্ট্রিট থেকে হাতিবাগান সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত পঁচিশবার আপডাউন করলেও কেউ কিছু বলতে আসবে না। হোস্টেলের মেয়েরা স্কুলের নাবালিকা নয়, তারা এখন কলেজের ছাত্রী। মাঝে মাঝে কলেজ কামাই করলেও ধরা পড়ে না। কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করে না কামাই কেন হচ্ছে বলে। সন্ধে সাড়ে ছ'টায় হোস্টেলে উপস্থিতিও সবদিনের জন্য প্রযোজ্য নয়, অ্যাটেনডেন্সের সময় মুখ দেখাতে না পেরে পরে হাজির হলে উমাদির মতো মাসিমার মুখ বিকৃত হয় না। উমাদির মেয়েদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার নেই যেমন মাসিমার আছে। মেয়েরা বেঁকে বসলে মাসিমাই তাঁর লাল, নীল, সবুজের গল্পের, তাদের সভ্য-ভদ্র-সংস্কৃতিবান প্রগতিশীল কুকুর বেড়ালের গল্পের শ্রোতা পাবেন না।

প্রেম করার এত অনুকূল পরিস্থিতিতেও আমি একা। প্রেম নেই আমার জীবনে। প্রফুল্ল শিকদারের বাড়িতে জন্ম নেওয়া মেয়ে—আমার শরীরেও যে অন্য মেয়েদের মতো ভালবাসার উষ্ণ স্রোত বয়ে চলেছে তা বুঝে উঠতেই সময় নিয়েছি। অন্যের প্রেম-প্রণয়ের গল্প শুনি আর ভাবি এটা তাদের জন্য ঠিক, আমার জন্য ঠিক নয়—যেন তারা অন্য জাত, তারাই শুধু মেয়ে, আমি মেয়ে নই। চেহারা বলে আমি ছেলেও নই। কি তাহলে আমি? আমি কি তাহলে ক্লীব? ইংরেজিতে যাকে বলে হার্মফ্রোডাইট? বাংলায় উভলিঙ্গ? না, ক্লীব নই, ক্লীব হল কেঁচো। উভলিঙ্গ কেঁচোও প্রেম করে। নিজের সঙ্গে। আমি তাও করি না। ধ্যুস, কি ভাবছি! মানুষ কখনও কেঁচোর মতো নিজের সঙ্গে প্রেম করে না। না, না করে। হোস্টেলের ছোট বাথরুমের জানালা দিয়ে আমি গলির মধ্যে একটি লোককে নিজের সঙ্গে প্রেম করতে দেখেছিলাম। লুঙ্গির ফাঁক দিয়ে ওটা বের করে উপরে তাকিয়ে ছিল। উপরে মানে আমাদেরই জানালার দিকে। তাকিয়ে থেকে মাঝে মাঝে হাত দিয়ে ওটা নড়াচ্ছিল। দেখে ঘেন্নায় আমার গা গুলিয়ে উঠেছিল। জানালা বন্ধ করে দৌড়ে গিয়ে তপতীকে দুঃসংবাদটি দিয়েছিলাম। দুঃসংবাদ পেয়ে তপতী উল্টোমুখে ছুটেছিল, অর্থাৎ বাথরুমের দিকে। সেও দেখেছিল লোকটিকে, একই কাণ্ড করে চলেছিল তখনও। আমার ও তপতীর পরে দিব্যানিও তাকে দেখেছিল, তারপর তনুশ্রী, তারপর অপূর্বা, তারপর আরও অনেকে। লোকটির কথা মনে হতেই আমি আমার সিদ্ধান্তের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম—ওই লোকটি বা ওই লোকটির মতো আরও যারা আছে তারা তাহলে হার্মফ্রোডাইট। সেক্স ডিজায়ারকে মাথায় রেখে খুলতে চাইলাম মানুষের এক নতুন শ্রেণী কিন্তু তপতী তাতে বাধ সাধল। বলল, "ওরা নিজে নিজে করে না রে।"

"নিজে নিজে করে না মানে? করছে তো নিজের হাতেই!"

"আরে করে ওরা নিজেরই হাতে। কিন্তু...কি বলব...সেই অনুভূতিটা নিয়ে আসার জন্য মেয়েদের দেখার দরকার পড়ে।"

দিব্যানি হাসে, "কেউ মেয়েদের দেখে করে, কেউ মেয়েদের কথা ভেবে করে।"

বয়ঃসন্ধিতে অনেক মেয়েরা মাসিকের আগমনকে ভালোভাবে নিতে পারে না।

নিজেকে দিয়ে বুঝেছি, অন্য মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করো বুঝেছি। সৃষ্টিকর্তার ওপর অনেক অভিমান হয়েছে আমার। মনে হয়েছে উনি তুমুল পক্ষপাতিত্ব করেছেন ছেলেদের এসব বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত রেখে। এমনিতেই ছেলেরা গড় উচ্চতায় মেয়েদের থেকে এগিয়ে, তাদের পেশী বেশি বলশালী, মন বেশি শক্ত অর্থাৎ অনেক বেশি আবেগমুক্ত আর এসব কারণেই তারা সর্বদায় বেশি প্রভুত্বকামী। ছেলেরা যে মাসিক জাতীয় বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত এটা আমি জেনেছিলাম বয়ঃসন্ধির বেশ কিছুদিন পরে। আগে ভাবতাম ওদেরও নিশ্চয় কিছু না কিছু হয় প্রতি মাসে। আমাদের পাশের বাড়ির ম্যাঝলা মণি মানে মুক্তি মাসির মেয়েই আসলে আমার মনে এমন ভাবনা গুঁজে দিয়েছিল। অনেকদিন এই বিশ্বাস নিয়ে চলার পরে সেই জিনিসটা কি জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল মন। ম্যাঝলা মণিকে সেই প্রথম দিনই—যখন সে আমায় বলেছিল জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলেনি। অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিলাম, তবু। অবশেষে লজ্জার মাথা খেয়ে মায়ের কাছেই যাই। মা দাঁত চেপে, ঠোঁট চেপে মিনমিন করে উল্টে প্রশ্ন করেন, ‘‘কে কোলো তোকে?’’

‘‘ম্যাঝলা মণি।’’

‘‘খ্যায়ে দ্যায়ে কাম নাই। শুধু উল্টাপাল্টা আলোচনা। কিসু হয় না অদের।’’ আমার সৃষ্টিছাড়া কৌতূহলের অবসান ঘটাতে মা আমাকে ভাতের চাল ধুয়ে আনতে বলেন আর আমি তা-ই করি।

আড়াই যুগ আগের সেই যুগ ছিল অন্য এক যুগ। তখন প্রেম ছিল প্রেম—ছিনালি নয়, মনের ভালবাসা ছাড়া দেহভোগের কিংবা দেহ ভোগ করতে দেওয়ার ইচ্ছে নয়। তখন প্রেম মানে ছিল বিয়ের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এগরোল ফুচকা বা মোগলাই খাওয়া, সিনেমা দেখা আর খুব কাছাকাছি আসতে চাইলে রাস্তার ধারে অথবা ওলিগলি বেছে একটু আধটু চুমু খাওয়া অথবা বুকে হাত রাখা আর রাতে কল্পনায় প্রেমিক-প্রেমিকাদের একে অন্যকে পাশে শুইয়ে সারা শরীরে তার স্পর্শ অনুভব করা অথবা করানো অথবা আরও কিছু যা ওই কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে যে কখনোই ভ্রষ্ট হয়ে যেত না প্রেমিক বা প্রেমিকা তা নয়। কিন্তু আমার দ্বারা তো প্রতিশ্রুতি দেওয়াই সম্ভব হত না। মনে জোর লাগিয়ে প্রতিশ্রুতির রাস্তার দিকে পা ফেলতে চেয়ে দেখতাম মনে সেই প্রেম ভালবাসার আকাঙ্ক্ষাই নেই। আমার ভালো লাগা ছিল অন্য কিছুতে—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায়, পোশাকের বিচিত্রতায়, ঘরেও সারাদিন নতুন পোশাক গায়ে চড়িয়ে ঘুরে বেড়ানোতে। কৃষ্ণা আমাকে মধুর তিরস্কার করে, ‘‘দেখো মহারানিকে, সবসময় ডাক্তার ডাক্তার ভাব—এই বুঝি কল এল, ছুটতে হবে পেশেন্টের ঘরে।’’ যে কৃষ্ণার অভিযোগে উমাদির আমাদের কুড়ি নম্বরের মেয়েদের র‍্যাগিং-এর অপরাধে ডেকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সেই কৃষ্ণার সঙ্গেই আমার গভীর সখ্যতা গড়ে উঠেছে। কৃষ্ণা অবশ্য মানতে নারাজ যে সে আমাদের নিয়ে অভিযোগ করেছিল। তার বক্তব্য সে আমাদের নাম নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ায় উমাদির কাছে আরেকবার জানতে চেয়েছিল। তাতেই উমাদি সন্দেহ করেছেন। যাই হোক, আমি কৃষ্ণার রুমে গিয়ে

ওর সঙ্গে অবসর সময় কাটাই, কখনও কৃষ্ণাও আসে আমার রুমে। আমার রুমমেটরা কৃষ্ণার ব্যাপারে বিশেষ কোন আগ্রহ রাখে না। আমি ওকে পছন্দ করি সে বুদ্ধিমতী কিন্তু চলাফেরায় কোন শহুরেপনা নেই, তাই।

আমার রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়িয়ে, চানাচুর বাদাম ভাজা খেয়ে সন্ধেকে রাতের কোলে শুয়ে পড়ার অবসর দিয়ে হোস্টেলে ফেরাটা আসলে ইচ্ছাকৃত ছিল। উমাদিকে রাগানোর জন্য। হিন্দু হোস্টেল ছিল ছোটদার বেশিরভাগ বন্ধুর আস্তানা। তাদের মধ্যে দু'চারজন আবার আমার বয়সি। বিশেষত সেই কারণেই সেখানে আমার অবাধ যাতায়াত। হিন্দু হোস্টেলে ছেলেদের জন্য রাতে ফেরার সময় নির্ধারিত ছিল না। অ্যাটেনডেন্সের বালাই ছিল না। তারা যখন খুশি হোস্টেলে ফিরত, যখন খুশি হোস্টেল থেকে বেরোত। যখন খুশি রান্নাও করত। রাত দশটায় পায়রার মাংস রান্না শুরু করে সকাল ছ'টায় শেষ করত। বুড়ো পায়রা সেদ্ধ না হতে চাইলে আশপাশের খড় কাঠি পাতা শেষ করে, রাস্তা থেকে নো এন্ট্রি বোর্ড নিয়ে এসে তার ডান্ডা উনুনে ঢোকাত। এ নিয়ে হোস্টেলে কোন মাতামাতি হত না। তাদের মেট্রোন ব্যাপারটাকে কানেই নিতেন না, ভাবতেন নো এন্ট্রি বোর্ডের বিনাশ নিয়ে যখন পুলিশেরই কোন মাথাব্যথা নেই তখন ওঁর হাঙ্গামা সৃষ্টি করে কাজ বাড়ানোর কি আছে! হিন্দু হোস্টেলের মেট্রোনের পদটা আমাদের উমাদিকে দেওয়া হলে আমরা নিশ্চয় অনেক আলাদা চিত্র দেখতে পেতাম। তবে সেটা ঠিক কেমন হত তার অনুমান লাগানো মুশকিল।

কৃষ্ণা ছাড়াও হোস্টেলে আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হয়। যেমন তনুশ্রী, অপূর্বা, সম্পা, কুহেলী, অরুণিমা। এদের মধ্যে বেশিরভাগই প্রেম করে। কেউ খোলা মনে প্রেমিকের গল্প করে, কেউ চেপে যায় গল্প। তনুশ্রী আমাকে বলে ওর প্রেমিকের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা, ভিক্টোরিয়া ঘুরতে যাওয়ার কথা। অপূর্বা বলে প্রেমিকের সঙ্গে ওর হবু শাশুড়ির জন্য নাইটি কিনতে যাওয়ার কথা, বলে শাশুড়ির কাছে ছেলের প্রেম নাকি একটা ওপেন সিক্রেট। বাংলা মিডিয়ামের মেয়ে হওয়ায় ওপেন সিক্রেট শব্দ দুটো আমার কানে আধুনিকতার খুব ঢোল পেটায়। সম্পা নিজে প্রেম করে না, তাই সে গল্প করে তার দিদির আবাল্য প্রেমের। দিদি 'পি এইচ ডি' করার জন্য কলকাতায় আছেন। খুব গম্ভীর দায়িত্ববতী মেয়ে, মাঝে মাঝে বোনের সঙ্গে হোস্টেলে দেখা করতে আসেন। দিদির ছত্রছায়ায় সম্পার কলকাতায় হোস্টেলে থাকা। মার্কেটিং করতে গেলে দিদির অনুমতির দরকার পড়ে, সিনেমা দেখতে গেল দিদির অনুমতির দরকার পড়ে। কলেজ এবং হোস্টেলের বাইরে কিছু করতে গেলেই সম্পার দিদির অনুমতির দরকার পড়ে। ওর দিদির দিদিগিরির গল্প শুনে আমার মনে হয় দিদির অনুমতি পায়নি বলেই সম্পার প্রেমের ক্ষেত্রে পা রাখার সাহস হয়নি। ওর দিদি ওর লোকাল গার্জেন। কলকাতায় খাতাকলমে দুলাল ঘোষকে লোকাল গার্জেন বানিয়ে বস্তুত ছোটদাই আমার লোকাল গার্জেনের ভূমিকা পালন করে। ছোটদা সম্পার দিদির মতো এত কড়া নয়। সে আমায় যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে। সেই যে কোন সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রেমের সিদ্ধান্ত

আসে কিনা জানি না। তবু সেই স্বাধীনতার বলে বলবতী হয়ে আমি অনেকদিন ধরে অনেক ধৈর্য রেখে 'এক্স ওয়াই জেড'-এর কথা মনে করে মনে শিহরণ তোলার চেষ্টা করি, মনকে বোঝাই প্রেম করার প্রয়োজনীয়তা। অনেকদিনের প্রচেষ্টায় মনে ফুরফুরে হাওয়া লাগে বটে কিন্তু মন সেই হাওয়া শরীরে বিস্তার না করে 'না বাচক' উত্তরের সঙ্গে মুখ দিয়ে বের করে দেয়। বলে, ''ছোটদার যে কোন সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রেম করার সিদ্ধান্ত আসে না। মনে রেখো শিকদার বাড়ির মেয়ে তুমি। ছোটদার উপরে আরও অনেক অভিভাবক আছে। তারা নালাগোলার মতো অজপাড়াগাঁ থেকে শুরু করে দিল্লি, বোম্বে, মাদ্রাসের মতো মেট্রোপলিটন শহরে ছড়িয়ে আছে। তুমি তাদের অভিভাবকত্ব পছন্দ না করলেও ওরা পছন্দ করে তোমার অভিভাবক হতে। বিনা বেতনের পদ হলেও সম্মান আছে এতে—উপার্জিত সম্মান। আর সবচেয়ে বড় আদালত বসে আছেন বালুরঘাটে।''

কিন্তু আমি মনের কথা বুঝতে চাই না। আমার ব্রেন বলে জীবনে প্রেম দরকার। প্রেম করলে একাকীত্ব দূর হয়, প্রেম করলে শরীরে জৌলুস বাড়ে। মনকে বলি প্রেম করলে মনের চাপ কমে এবং মানসিক সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে। মানসিক সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে—তার মানে হল শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। মনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমার টানাপোড়েন। এমনই এক টানাপোড়েনের দিনে সুমিত্রা নামে পাশের রুমের একটি মেয়ে যে আমারই কলেজে বোটানি নিয়ে পড়ে আমাকে বলে, প্রেম করবি নাকি?

হঠাৎ এই প্রশ্ন? অবাক হয়ে তাকাই সুমিত্রার দিকে। মুখ বধির।

''আমার কবি মামার তোকে খুব পছন্দ।''

''কোথায় দেখেছে সে আমাকে?''

''কলেজে যাতায়াতের পথে।''

সে আমায় জানায় আমাদেরই কলেজের কাছাকাছি একটি হোস্টেলে ওর কবি মামা থাকে।

এক সন্ধ্যায় বিধান সরণি ধরে হাঁটাতে হাঁটাতে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের সামনে নিয়ে গিয়ে আমায় দাঁড় করায় সুমিত্রা। সেখানে কবিমামার জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমার মনে পড়ে জীবনে প্রথমবার প্রেমের প্রস্তাব পাওয়ার উত্তেজনায় উনি কি করেন সেটাই সুমিত্রাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। নাম শুনে মনে হয় কবিমামা কবিতা লেখেন। আমার মধ্যে তখনও কবিতার প্রতি কোনও আকর্ষণ জন্মায়নি। কাজেই আমাদের হোস্টেলের ভিজিটরস' রুমে এসে উনি 'আজি মেঘমুক্ত দিন, প্রসন্ন আকাশ, হাসিছে বন্ধুর মত সুমন্দ বাতাস...চলো কোথাও থেকে বেরিয়ে আসি' বলবেন আর আমি সঙ্গে সঙ্গে মুখে ছলাৎ হাসির ঝলক দিয়ে শরীর দুলিয়ে তাঁর হাত ধরে উমাদিকে টাটা করে বেরিয়ে যাব তা সম্ভব নয়। মেঘমুক্ত দিন আমাকে উৎসাহিত করতে পারে না। অনেক কালো মেঘ ঘনিয়ে আসা অথবা ঝরঝরে বৃষ্টি ঝরা দিনে আমি আমাদের মাহিনগরের বাড়িতে একা কাটিয়েছি, চরম নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে করতে শক্ত করে ফেলেছি নিজেকে। বাড়ির আকাশে বাতাসে প্রসন্নতা

কমই দেখেছি, অভ্যস্ত হয়ে গেছি অপ্রসন্ন পরিবেশে থাকতে। শৈশব, কৈশোর কেটে গেছে মাত্র গুটিকয়েক বন্ধু নিয়ে এবং এক প্রবীর ছাড়া বাকি সবার সঙ্গে পরিমিত মেলামেশা করে। কাজেই সুমিত্রার কবিমামা যদি শুধু কবিই হন তাহলে তাঁর আকাশ থেকে নেমে ছাদ চুঁয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়া কবিতায় আচ্ছাদিত হয়ে আমার দিন অতিবাহিত হবে না, এটা ভালো বুঝি। অথচ কি দিয়ে হবে তা বুঝতে পারি না। চেহারা? কি জানি!

কবিমামার চেহারা দেখেই আমি আমার জীবনে প্রথম প্রেমের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছিলাম, তৎক্ষণাৎ মুখে বলে নয়—পরের বেশ কয়েকদিন নীরব থেকে। সুমিত্রা আমাকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে, ‘‘কি রে, পছন্দ হয়নি তোর কবিমামাকে?’’ আমি হেসে নীরব থেকেছি।

সুমিত্রা কবিমামার কাছ থেকে কবিতাভরা চিঠি বহন করে আমার হাতে দিয়েছে, আমি হেসে চিঠি গ্রহণ করেছি কিন্তু নীরব থেকেছি।

সুমিত্রা কবিমামার কাছ থেকে তীক্ষ্নধার গদ্য নিয়ে এসে বলেছে উত্তর দে, আমি হেসে সেটা নিয়ে পড়ে ঘেন্নায় মুখ কালো করে দিয়েছি, তবুও থেকেছি সেই নীরবই। অনেকদিন পরে সুমিত্রা আমাকে নীরব থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে সরব হয়েছি। বলেছি, ‘‘ওগুলো আবার কি ধরনের কথা!’’

‘‘কোনগুলো?’’

‘‘আমরা মেয়েরা নাকি ছেলেদের আখের কাণ্ডের মতো মনে করি। দাঁত দিয়ে ভেঙে, চিবিয়ে, চুষে, তার সব রস নিংড়ে নিয়ে ফেলে দিই।’’

সুমিত্রার মুখে খিলখিল হাসি, ‘‘তাই লিখেছে?’’

‘‘তো কি! আমি ওঁকে কখন দাঁত দিয়ে ভাঙলাম, চিবোলাম, চুষলাম, রস নিংড়ে ফেলে দিলাম?’’

‘‘ব্যাটা প্রেমে ভালোই হাবুডুবু খাচ্ছে মনে হচ্ছে,’’ হাসি থামিয়ে চিকন স্বরে বলে সে।

সুমিত্রার মুখ থেকে ব্যাটা শুনে আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হয়। জিজ্ঞেস করি, ‘‘উনি কি তোর নিজের মামা?’’

‘‘ধ্যুৎ!’’

‘‘তাহলে?’’

‘‘তাহলে কি! তপন মামার বন্ধু?’’

তপন মামাও সুমিত্রার আপন মামা নন—মায়ের খুড়তুতো নাকি মামাতো ভাই।

সেদিন সুমিত্রার কবিমামা, তপন মামা, সুমিত্রা এবং আমি হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের সামনে থেকে বিধান সরণি ধরে বীডন স্ট্রিট পর্যন্ত হেঁটেছিলাম। কবিমামার চেহারা আমার ভালো না লাগার কারণ তাঁর স্বল্প উচ্চতা এবং শ্যামলা গায়ের রঙ ছিল না। ভালো না লাগার কারণ ছিল তাঁর মধ্যে পুরুষ মানুষের ব্যক্তিত্ব না দেখা। কেন এমন হল তার ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। বরং তার তপন মামাটিকে পাতে দেওয়ার মতো মনে হয়েছে। ফর্সা মেদহীন চেহারা। গালে চাপদাড়ি। কবিমামার চেয়ে ইঞ্চি চারেক

লম্বা। তাঁর হাতে ছিল ফিঙে পাখির লেজের মতো সরু সোনালি পাছাওয়ালা সবুজ রঙের একটা বল পেন। কোনও কারণে উনি তা আমাকে ধরতে দিয়েছিলেন। আমি ওটাকে ডান হাতে ধরে অকারণে বা হাতের তালুর উপর আস্তে আস্তে বাড়ি মারছিলাম। বারবার। বারবার পাছাটা সবুজ দেহাংশ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছিল। তাদের আমি জোড়া লাগাতে চাইছিলাম এই আশা নিয়ে যে এবার তারা আর আলাদা হবে না। এটা দেখে তপন মামা বলেছিলেন, ‘‘একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ—তুমি কলমের ভেঙে যাওয়া অংশ দুটোর বন্ধন শক্ত করতে চাইছ, কিন্তু পারছ না?’’

মাথা ঝোঁকাই।

ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক কখনও জোড়া লাগে না সে তুমি যতই চেষ্টা করো।’’ সামান্য পর্যবেক্ষণ। আমাকে বলার কোন প্রয়োজন ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল না কিছু। তবু ভালো লেগেছিল। শুরু এমন জায়গা থেকেই হতে পারে, বাড়তে পারে পর্যবেক্ষণ আগে, অনেক আগে। কবিমামা এসব পর্যবেক্ষণ থেকে অনেক দূরে। আমার থেকেও। দূরে দূরে হাঁটছিলেন উনি। ভাবটা এমন যে সুমিত্রাকে দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি আমার ইচ্ছা, এখন শুধু উত্তরের অপেক্ষা। উত্তর পেলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।

সুমিত্রা কবিমামার আসল পরিচয় দিলে আমারও মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, ‘‘হবে না।’’

‘‘কি হবে না?’’

‘‘এমন লোকের সঙ্গে প্রেম হবে না।’’

ক্লাসমেটস

বাড়ি ছাড়ার চূড়ান্ত ইচ্ছেতে গ্রাম থেকে মায়ের অপছন্দের শহর কলকাতায় এসে পড়েছি। প্রয়োজন বুঝে আমারই মনে ইচ্ছে জেগেছিল আসার তবু শহরের লোকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারব কি পারব না সেবিষয়ে নিঃসংশয় ছিলাম না। মুখে প্রকাশ না করলেও ছোটদা পড়ে নিয়েছিল আমার মনের কথা। বলেছিল, "কলেজে তুই তোর মতোও মেয়ে পাবি। এ ছাড়া হোস্টেলে সবাই তো শহরের বাইরে থেকেই আসবে। সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই।" ছোটদা একদিনই বালিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে দোতলা টু-বি বাসে করে আমায় বিদ্যাসাগর কলেজে নিয়ে গিয়ে ছেড়েছিল। আবার ক্লাস শেষ হলে টু-বি করেই ফেরত নিয়ে এসেছিল বালিগঞ্জে। বাসের সব প্যাসেঞ্জারকে তখন আমার অযথা গায়ে পড়ে কথা না বলা অভিজাত মনুষ্য প্রজাতি বলে মনে হয়েছিল। তাই আমি জানালার সমান্তরাল সীটে রাস্তার দিকে পেছন ফিরে বসে সোজা বাসের ভেতরের লোকজনের দিকে মুখ রেখেও দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিলাম ওদের থেকে। গম্ভীর মুখের সেই দৃষ্টি কোথায় আটকে ছিল নিজেই জানি না। ছোটদা স্বল্প লোকের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থেকে আমায় লক্ষ্য করেছিল। মামাকে গিয়ে বলেছিল, "এ তো বাসের জানালা দিয়ে কখনও বাইরে তাকিয়ে দেখে না। রাস্তাঘাট চিনবে কি করে!" মামা জ্বলন্ত সিগারেটে একটা লম্বা টান মেরে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "রাস্তা চিনতে হবে...রাস্তা চিনতে হবে।"

রাস্তা আমি চিনে নিয়েছিলাম। যেভাবেই হোক। কলেজে যাওয়াআসা ভালোই রপ্ত করে নিয়েছিলাম। কলেজ শুরু হওয়ার মাত্র তিনদিন পরেই টু-বি আমায় প্রতারণা করল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়েও এল না। শেষে হতাশা নিয়ে ধর্মতলার বাস ধরলাম। সেখান থেকে পেলাম বালিগঞ্জের বাস। সেদিন জীবনে প্রথমবার ধর্মতলা দেখলাম, তবু মনে হল জায়গাটার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচিতি। বস্তুতপক্ষে পুরো কলকাতা আমার একেবারে অচেনা হয়েও চেনা-ই লাগে। নতুন পা রাখা কোনও জায়গা দেখে মনে হয় না যে এখানে আমি আগে কখনও আসিনি। কিন্তু সমস্যা থাকে অন্য জায়গাতে। বাস পরিবর্তন করে করে যাতায়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আর যেদিন 'টু-বি'র জন্য জেদ ধরে থাকি বাসের প্রতীক্ষায় কাটে এক ঘণ্টা, বাসে কাটে তিন ঘণ্টা। ক্লান্তি সেই একই।

ক্লাসে বান্ধবী পেতে আমার বিশেষ দেরি হল না। বিদ্যাসাগর কলেজ তখন শুধু বিদ্যাসাগর কলেজই নয়। বিদ্যাসাগর কলেজের আরেকটি বড় পরিচয় ছিল আমার কাছে—কলকাতার কলেজ। কলকাতা আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর এক অত্যাধুনিক শহর। ছোটদা বলেছে কলেজে আমি আমার মতোও মেয়ে পাব। তাই প্রথম দিন সকালবেলা ক্লাসে পা রেখেই আমি জুওলজি অনার্সের চৌদ্দ পনেরো জন মেয়ের মধ্যে আমার মতো মেয়ে খুঁজে বেড়াই। বোটানি এবং কেমিস্ট্রি আমার কম্বিনেশন সাবজেক্টস। প্রথম ক্লাসটা হবে বোটানির। তিনতলার উপর বোটানির একটা বড় লেবরেট্রি রুমে আমাদের পড়ানো হবে। সেদিকে আগ্রহ নেই। আমার আগ্রহ মেয়ে খোঁজাতে। খুঁজতে

খুঁজতে একটি মেয়ে পেয়েও গেলাম। বসলাম তার পাশে। জিজ্ঞেস করে জানলাম তার নাম মৌ। সেও আমার নাম জিজ্ঞেস করল। নামের পরে ধামও জিজ্ঞেস করল সে। বললাম আমি বালুরঘাটের মেয়ে।

মেয়েটি বালুরঘাটকে বাবুঘাট শুনেছে। বাবুঘাট কলকাতারই একটি জায়গা। গ্রামের মেয়ে বলে পাছে সে আমাকে অবহেলা করে এই ভেবে ডাঁহা মিথ্যে কথা বলার সাহস না হলেও আমি নিজেই বালুরঘাটকে বাবুঘাট বলতে পারতাম 'বালুর'-এর 'র'-এর জায়গাটা চেপে দিয়ে। রামায়ণের যুধিষ্ঠিরের 'ইতি গজ'র মতো। কিন্তু মাথায় আসেনি। মৌ নিজেই ভুল বোঝায় ভালোই হল। শহুরে চালে মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, "কিছুদিন হল বালিগঞ্জে মামার বাড়িতে থাকছি।"

কথা অনেক বলছিল মেয়েটি। ভালোই লাগছিল ওকে। কিন্তু ভালো লাগা মোটেও দীর্ঘস্থায়ী হল না। মৌ বলল, সে খুব সম্ভব প্রেসিডেন্সি কলেজে অ্যাডমিশন পেয়ে যাবে। আমি একদমই চাইছিলাম না সে আমাদের কলেজ ছেড়ে দিক। তাই বাবা আমাকে যা বলেছেন, ছোটদা আমাকে যা বলেছে তাই আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করি। কলকাতায় আসার আগে বাবা আমার সামনে কলেজের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরতে চেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "যেই কলেজে ভর্তি হইসো সেই কলেজ লইয়া কিসু জানো?"

"না তো!" বিদ্যাসাগর কলেজ নিয়ে আমার জ্ঞান একেবারে শূন্য। "কি কি জানা দরকার?"

"অনেক কিসু। জানার তো শেষ নাই।" বাবা চালিয়ে যান, "নাম শুনেই নিশ্চয় বুঝতে পারতাসো পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে তৈরি হইসে কলেজ?"

"হুঁ।"

"কত সালে?"

"জানি না।"

"জানো না?" বাবা হাসেন। "১৮৭২ সালে। বিদ্যাসাগর কলেজ হল ভারতের প্রথম বেসরকারি কলেজ...শুরুতে তার নাম ছিল ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল, ১৮৫৯ সালে যার পরিচালনার জন্য বিদ্যাসাগরের সাহায্য চাওয়া হয়েছিল...১৮৬৪ সালে সেই স্কুলের নাম হয় হিন্দু মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন...কলেজ আগে পুরোপুরি ভারতীয়দের দ্বারাই পরিচালিত হত...কলেজের তহবিল চালানো হত ভারতীয়দের টাকা দিয়ে...কলেজে পড়ানো হত ভারতীয় শিক্ষকদের দিয়ে...।"

ছোটদা কলেজের জন্মের ইতিহাসে না গিয়ে বলেছিল, বিদ্যাসাগর কলেজের জুওলজি ডিপার্টমেন্টের নাম আছে।

মৌ আমার কথাকে মোটেও গ্রাহ্য করেনি। ও খুব ছটফট করছিল। আমরা কোথাও যাওয়ার তাড়াতে অস্থির হয়ে যেমন ছটফট করতে করতে রিকশার অপেক্ষা করি তেমন করে সে চারিদিকে দেখছিল। মনে হচ্ছিল রিকশার মতো এই বুঝি প্রেসিডেন্সি কলেজ তিন চাকার উপর গড়াতে গড়াতে হাজির হবে তার কাছে। সে তাতে চড়ে বসবে কি ফুঁ করে ছুটবে আর আমি মুখ মেরে ইচ্ছে করবে না তবু ব্লেড দিয়ে

টেরিডোফাইটা স্টেম-এর ডিসেকশন করতে থাকব, ভাবব—না ঠিক হল না, আরও পাতলা হবে—আরও পাতলা—আরও—তা না হলে মাইক্রোসকোপে কিছুই দেখা যাবে না।

অনার্সের প্রথম ক্লাসটি নিয়েছিলেন একজন ম্যাডাম। সকাল বেলাতেই কলেজের তিনতলার একটি ছোট্ট ঘরে আমরা সবাই বসে রয়েছি। উনি ক্লাসে ঢুকলেন। শাড়ি পরে। ক্লাসরুমের চেহারা যত ছোট তাঁর চেহারা তত বড়। উচ্চতা কম করে ছয় ফুট। চওড়ার হিসেব দেওয়া কঠিন। ওজনে আমার আড়াই-তিন গুণ হবেন। উনি নিজের পরিচয় দিতে শুরু করলে বুঝলাম বেশ ন্যাকা। ন্যাকামি করে বললেন, "আমার নাম কুমকুম দাস। তোমরা আমাকে কে ডি বলেই জেনো।" কে ডি আমাদের এক এক জনকে দাঁড় করিয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। জিজ্ঞেস করেন কেন আমাদের জুওলজি নিয়ে পড়ার আগ্রহ। সবাই নিজের নাম বলে কিন্তু অনার্সের বিষয় হিসেবে জুওলজিকে নির্বাচন করার কারণ কেউ ভালমত ব্যাখ্যা করতে পারে না। আমি তো একেবারেই পারি না। আমার পালা আসে সবার শেষে। আমি আমার নাম বলে দাঁড়িয়ে থাকি। অপেক্ষা করি কখন বসতে বলবেন তার জন্য। কিন্তু কে ডি আমায় বসতে বলেন না। আমার পরে আর কেউ বেঁচে নেই যার কাছে উনি প্রশ্ন পাস করতে পারেন। তাই প্রশ্ন আরেকবার আমার জন্যই রিপিট করেন, "কেন জুওলজি পড়ার ইচ্ছে?" মুখে কৌতূহল। আমি দাঁড়িয়ে আছি। কে ডি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি বলতে চাই না, কে ডি আমাকে দিয়েই বলাতে চান ক্লাসের সব মেয়ের মনের কথা।

"জয়েন্ট এন্ট্রান্সে বসেছিলে?"

মেয়েরা আমার হয়ে মাথা নড়ায় যার অর্থ হয় তারা বসেছিল। আমি মাথা না ঝাঁকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। তারও অর্থ হয় হ্যাঁ।

কে ডি আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই ওদের জিজ্ঞেস করেন, "কেন বসেছিলে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে? ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্য না মেডিক্যালের জন্য?"

দু'য়েকটি মেয়ে ফিসফিস করে, "মেডিক্যালের জন্য।"

"মেরিট লিস্টে নাম আসেনি তো?"

মুখে লজ্জা টেনে বসে থাকে ওরা।

"নিজেদের মনের কথা নিজেরাই বলতে পারলে না। ভেরি ব্যাড। ঠিক আছে আমি-ই বলছি। মেডিক্যালে চান্স হয়নি, তাই জুওলজি পড়তে এসেছ। জুওলজিকে ডাক্তারির ছোট ভাই মনে হয়। তাইতো?" মেয়েরা হাসে। 'কে ডি'র মুখে এমন একটা ভাব যেন ঠাট্টার ছলে খুব একটা বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলে ফেলেছেন। এমন ঠাট্টা করতে না শিখলে কলেজের লেকচারার হওয়া কেন! মুখের ভাব দিয়ে বোঝাতে চাওয়া, এতদিন তোমরা স্কুলে বা জুনিয়র কলেজে পড়েছ, স্কুল বা জুনিয়র কলেজ থেকে ডিগ্রি কলেজ অনেক উপরে। আর এই কলেজে যাঁরা পড়ান তাঁরাও অনেক উপরে—শিক্ষাদীক্ষায়, ঠাট্টা-ইয়ারকিতে। মেডিক্যাল কলেজে তোমাদের ভর্তি হওয়ার সুযোগ না আসুক ডিগ্রি কলেজে তো এসেছে—ফার্স্ট কাম ফার্স্ট অ্যাডমিশন বেসিসেই

হোক না কেন, একটা সম্মানীয় জায়গায় এসে পড়েছ।

বিদ্যাসাগর কলেজ তখন চেহারায় প্রেসিডেন্সির মতো বড় না হলেও বড় কলেজ। আমার মোটেও ভালো জায়গায় এসে পড়ার অহংকার হয় না, বরং লজ্জা হয়। যেন এর আগে যেখানে ছিলাম সেটা খারাপ জায়গা, সেখানে গিয়ে ভীষণ ভুল করে ফেলেছি—ছি ছি, লজ্জা লজ্জা। আমি যখন ক্লাস ফাইভে বাবার স্কুলে যেতাম তখন দেবব্রত মাস্টারমশায়, যিনি পরিমলকে প্লাস্টিকের সাপ দিয়ে ভয় দেখাতে চাওয়ার কারণে বেদম মেরেছিলেন, মারতে মারতে তাকে প্রায় ধরাশায়ী করে দিয়েছিলেন, প্রায়ই বলতেন, "তোদের গা থ্যাকে প্রাইমারি প্রাইমারি গন্ধ ব্যাড়াচ্ছে রে।" বলতে বলতে উনি নিজের নাকটাকে বীভৎসভাবে কুঁচকে দিতেন, যাতে নাকে প্রাইমারির গন্ধের অবাধ প্রবেশ না ঘটে। আমার পিরিয়ডস-এর সময় প্যান্টের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়া সেজোমাসিমার ছেলে প্রদীপদা আগেই বলেছিল, "এখন বি এম ইস্কুলে যাবি তো, বুঝবি।"

"কী বুঝব?"

"দেবব্রতবাবু কোবে তোর গা থ্যাকে প্রাইমারির গন্ধ ব্যাড়াচ্ছে," নাকভরা পোঁটা নিয়ে ফ্যা করে হেসেছিল সে।

"কিন্তু আমি তো প্রাইমারি ইস্কুলে পড়িইনি।"

"ইস্কুলে না পড়লে কি হোসে! ঘরে তো পড়ছিস টু, থ্রি, ফোর।"

"আমাকেই ক্যান কোবে?"

"ওই আর কি!"

"মানে?"

"মানে পুরা ক্লাসকেই।"

প্রদীপদা আমাকে এত কিছু বোঝালো, কিন্তু বলতে ভুলে গেল যে দেবব্রতবাবু শুধু বলেনই না, বলতে বলতে নাকও কোঁচকান। তাই প্রথম দিন আমার হঠাৎই মনে হয়েছিল ক্লাসে বুঝি কেউ হেগে ফেলেছে, কারও মিষ্টি মিষ্টি তিরস্কার এবং কারও মলত্যাগ—দুটো অপকর্ম যুগপৎ ঘটেছে। পেছন ফিরে তাকিয়েছিলাম কার দ্বারা এই অকাজ হয়েছে দেখতে। খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। লজ্জা পরে খারাপ লাগায় পরিণত হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলাম এই ক্লাসটাকে টা টা বাই বাই করে নতুন ছেলেমেয়েদের প্রবেশাধিকার দিয়ে দেবব্রত মাস্টারের মুখের সামনে তাদের পিঠ ফেলতে না পারলে এই খারাপ লাগা থেকে আমার মুক্তি নেই। বালুরঘাট গার্লর্স হাই স্কুলে ক্লাস সিক্স-এ ভর্তি হওয়াতে ওখানে তেমন কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি। জুনিয়র কলেজে গিয়ে বুঝলাম সেখানকার স্যারেরাও আমাদের গা থেকে স্কুলের গন্ধ পান। শিক্ষক-শিক্ষিকার তুখোড় ঘ্রাণশক্তির কবলে পড়ে আমরা ছাত্রছাত্রীরা একেবারে নাজেহাল।

'কে ডি'র মুখ থেকে ডাক্তারির ছোট ভাই—কথাটা শুনতে আমার কেমন যেন লাগে। মেডিক্যাল পড়ার ইচ্ছে আমারও খুব ছিল। কিন্তু তাতে সুযোগ হয়নি বলেই যে আমি জুওলজি পড়তে এসেছি তা নয়। আমার জুওলজি নিয়ে পড়তে চাওয়ার

কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। উচ্চমাধ্যমিকের পর জয়েন্ট এন্ট্রাস দিয়ে ছোটদা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চার হাজার র্যাঙ্ক পেয়েছিল। আমিও বসেছিলাম জয়েন্ট এন্ট্রান্সে। কোচিং ক্লাস ছাড়া প্রাইভেট টিউশন ছাড়া, এক কথায় কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়া বসার ভদ্রতা করেছিলাম মাত্র। মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কোনটিরই রেজাল্ট শীটে আমার রোল নম্বর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ইচ্ছে মনের কোণে চাপা পড়ে থেকে মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। মনে হয়েছিল একটু যত্ন পেলেই লক্ষ্যে তীর ঠিক লেগে যেতে পারত। সেই মনে হওয়া শরীরের তন্ত্রে অঙ্গে বিস্তৃত হয়ে তাদের কর্ম-উদ্দপনীকে শিথিল করে দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার আগেই মনকে উত্তেজিত করে দিয়েছিল অন্য আরেক মনে হওয়া—বাড়িতে আর থাকা যাবে না কিছুতেই।

'কে ডি'র আদেশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পায়ে ব্যথা ধরছিল আমার। এমনিতেই বালিগঞ্জ থেকে 'টু-বি'তে আসার সময় দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। তাই ভাবছিলাম বলেই দিই বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করেনি বলে। উত্তর পেলে উনি বসার অনুমতি দেবেন। আবার এটাও ভাবি এতটুকু বললে উনি কিছুই বুঝতে পারবেন না, ভ্রু কুঁচকে ন্যাকা ন্যাকা চোখে তাকাবেন আমার দিকে। তখন আমাকে বিশ্লেষণ করতে হবে কারণ—আমাদের বালুরঘাট কলেজে জুওলজিতে অনার্স নেই, তাই ভেবেছিলাম জুওলজিতে অনার্স নিতে চাইলে তবেই ওই বাড়ির দম বন্ধ করা পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা খুলে যাবে। শুনে কে ডি চোখ কপালে তুলবেন, ন্যাকামিকে ঠোঁটের কোণে সন্তর্পণে সীমাবদ্ধ রেখে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, "ওমা কেন? বাড়িতে থাকতে চাও না কেন?" সাধারণত বখাটে ছেলেমেয়েরাই বাড়িতে থাকতে পছন্দ করে না। তাই ক্লাসের মেয়েরা আমাকে বখাটে ভেবে মুখ খুলে হি হি করে হাসবে আর আমি মুখ চুন করে তাদের হাসি থামার অপেক্ষা করব, লজ্জা পেয়ে ভাবব বলেই ভুল করলাম। তারপর কে ডি জানতে চাইবেন বাড়ি কোথায়। আমি বলব বালুরঘাটে। মৌ প্রেসিডেন্সি কলেজের তালে পড়ে বালুরঘাটকে বাবুঘাট শুনেছে, কে ডি নিশ্চয় তাই শুনবেন না। তারপর নিশ্চয় আমার সম্ভ্রমনাশক আরও কিছু একটা হবে, কে ডি জিজ্ঞেস করবেন, বাবা শেষ পর্যন্ত তোমার জুওলজি নিয়ে পড়ার ইচ্ছেটাকে মেনে নিলেন নাকি তুমি নিজেই ওখান থেকে পালিয়ে এলে?

শুনে মেয়েরা তাদের ডাক্তারিতে চান্স না পাওয়ার দুঃখ ভুলে হাসিতে জোয়ার তুলবে—হাসতে হাসতে দু'সেকেন্ডের জন্য থেমে যাবে, বলবে, "ওহ্, পেট ব্যথা করছে, বাপরে রে বাপ!" আবার হাসবে, মা-বাবার আদরে গুদুগুদু সব মেয়ে। হতে পারে তারা অতিরিক্ত শাসনে বড় হয়েছে কিন্তু আমার মতো অতিরিক্ত অবহেলায় নয়। তাদের সেই হাসির জোয়ারে বিশালাকার 'কে ডি'কে উপেক্ষা করে ক্ষুদ্রাকার ক্লাসরুমের দেওয়াল ভেঙে পড়তে চাইবে। ঝুলে পড়বে দেওয়াল মেয়েদের হাসির গমকে যোগদান করবে বলে। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে দেওয়ালকে স্বস্থানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন কে ডি। অনার্সের প্রথম দিনেই ক্লাসে এমন দুর্ঘটনা ঘটাতে চাওয়ার অপরাধে কি শাস্তি আমাকে পেতে হবে কে জানে!

অনেক সাতপাঁচ ভেবে 'কে ডি'কে আমার জুওলজিতে অনার্স নিয়ে পড়তে

চাওয়ার কারণটা না বলে ভালো করেছি। তাঁর ক্লাস শেষ হলে পুরস্কার হিসেবে মণিকাকে পেয়েছি। মণিকার সঙ্গে আমার পরিচয়টা হয় এইভাবে—

ক্লাসের পরে চারতলার সিঁড়ির কাছে আমি দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে থেকে দেখছি নিচে মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনের একটি অংশ যা আজও কলেজের গায়ে লেগে আছে কলকাতা মেট্রোপলিটন স্কুলের পরিচয় নিয়ে। শুনছি প্রাণবন্ত ছাত্রদের হইচই আর কলরব। কলরবের একটিও শব্দ স্পষ্ট হয়ে আমার কানে ঢুকছে না। খিদে পেয়েছে। খিদে মনের না পেটের জানি না। খুব ইচ্ছে করছে ক্যান্টিনে যেতে। ক্যান্টিন কোথায় তাও জানি না। শুধু শুনেছি কলেজে ক্যান্টিন আছে। ছোটদাই বলেছে। বালুরঘাট কলেজে নেই সেটা আলাদা ব্যাপার। বালুরঘাট ছোট জায়গা—আধুনিকতায় একেবারে পিছিয়ে থাকা শহর। কলকাতা হল আমাদের রাজ্যের রাজধানী। ভাবছিলাম কাকে জিজ্ঞেস করি, কাকেই বা সঙ্গে নিয়ে যাই। মৌ নামের যে মেয়েটির সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করেছিলাম সে তো প্রেসিডেন্সি কলেজের মোহে পড়ে ফুটে গেল। আমার বন্ধুত্ব তৈরির প্রথম প্রয়াস জলে ডুবল। ভাবতে ভাবতেই দৈবযোগে আরেকটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। একে আমি আমাদের ক্লাসেই দেখেছি। একটু আগেই। নাম জেনেছি—মণিকা। মণিকা আমাকে দেখে হাসল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘ক্যান্টিনে যাবে?’’

‘‘চলো,’’ তখনই সে রাজি।

আর তখনই আমার মনে পড়ল আমার কাছে বালিগঞ্জে ফেরার জন্য ‘টু-বি’র পঞ্চান্ন পয়সা ভাড়া ছাড়া অতিরিক্ত এক পয়সাও নেই। বালিগঞ্জে থাকাকালীন আমার হাতখরচা আসত ছোটদার কাছ থেকে। ছোটদা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে হাতে কুড়ি পঁচিশ টাকা ধরিয়ে দিত। বাবারই পয়সা—ছোটদার হাতে ফিল্টার হয়ে আসে। মামার বাড়িতে সকালে কলেজ যাওয়ার আগে আমার জন্য থাকত মেশিনের পাতলা চিড়ে। দুধের সঙ্গে। কলেজের জন্য টিফিন থাকত না। এই কথা ভেবেই আমার ওপর ছোটদার এই অর্থনীতি—‘টু-বি’র ভাড়া ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত টাকা দেওয়া। বরাদ্দ টাকার প্রয়োগ নিয়োগ আমার হাতে। অপারদর্শী হাত। অকালে বেশি খরচা করে ফেলে তহবিল শূন্য করে রেখে দেয়।

নিচে নামবে বলে মণিকা হাসি হাসি মুখে সিঁড়ির দিকে এক পা ফেলে। আমি পিছোই এক পা।

‘‘কি হল?’’

‘‘আমার কাছে পয়সা নেই। ভুলে গিয়েছিলাম।’’

‘‘ও ম্যানেজ হয়ে যাবে,’’ সরল হাসিতে খুলে যায় ওর মুখ। দেখা যায় অর্ধগোলাকার ঝকঝকে দাঁতের সারি। আমি মোহিত হয়ে যাই ওই দাঁতের সারি দেখে। কলকাতার মেয়েরা যে এইভাবে হাসতে পারে তা আমার কল্পনার অতীত। মণিকার হাসি আমার মনে আশার আলো জাগায়। একই সঙ্গে ভয়ও ঢেলে দেয়। বুঝতে পারি না এই হাসির সঙ্গে চলতে চাওয়া ঠিক হবে কিনা, দু’পা এগিয়েই আবার ফেরত আসতে হবে কিনা, ফেরত আসতে হলে হতাশাগ্রস্ত চিত্তে আবার

কোনদিন নতুন কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ার মনোবল পাব কিনা। বালুরঘাট থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে মাহিনগর গ্রাম, যাকে গার্লস হাই স্কুলের মেয়েরা অজপাড়াগাঁ ছাড়া আর কোন অধিকতর ভালো আখ্যা দিতে কখনও রাজি হয়নি, যাকে তারা খাদিমপুর, মঙ্গলপাড়া, এমনকি চকভৃগুরও সমকক্ষ বলে কখনও স্বীকার করতে চায়নি—সেই গ্রাম থেকে উঠে আসা মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে কলকাতা শহরের মেয়ে বলছে, ‘‘তোমার কাছে পয়সা নেই তো কি হয়েছে! আমি তো আছি, পয়সা ম্যানেজ হয়ে যাবে’। এটা বলছে না যে ঠিক আছে আজ আমি দিয়ে দেব, পরে তুমি আমাকে ফেরত দিয়ে দিও।

মণিকার কথায় এক নিরহংকার বন্ধুত্বের প্রস্তাব। তবু আমি সন্ত্রস্ত। জীবনে কোন জিনিস যে এত সহজে, এত অল্প সময়ে বিনা পরিশ্রমে লাভ করা যায় বিশ্বাস হতে চায় না। তাই ‘থ’ মেরে দাঁড়িয়ে থাকি।

মণিকা বলে, ‘‘চলো না।”

‘‘কাল যাব।”

‘‘না আজই চলো,” হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলে সে আমাকে।

আমরা নামতে থাকি—নামতে থাকি—নামতেই থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সিঁড়ির শেষ ধাপ অতিক্রম করি। আমরা ক্যান্টিনে যাই। আমরা ক্যান্টিনে গিয়ে একটা টেবিলের দু’প্রান্তে চেয়ার টেনে বসি, মুখোমুখি। আমরা মুখোমুখি বসে ভেজিটেবল চপের অর্ডার করি।

ভেজিটেবল চপের অর্ডার আসলে মণিকা-ই করে। আমি তাকিয়ে থাকি ওর দিকে। ওর চোখ দেখি—বড় বড় উজ্জ্বল ওর চোখ, আমার মতো ছোট নয়। ওর নাক দেখি—উন্নত ওর নাক, আমার মতো ইট দিয়ে থেঁতলে দেওয়া নয়। ওর ভ্রূ দেখি—সরু লম্বা চোখের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ওর ভ্রূ—আমার মতো মোটা ও খর্ব নয়। ওর ঠোঁট দেখি—হাল্কা গোলাপি রঙে রাঙানো টান খাওয়া ধনুকের ছিলার মতো ওর ঠোঁট, একটু মাংসল এবং আমার মতো বিবর্ণ ও মিহি নয়। ওর চুল দেখি—কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ওর চুল, পোনিটেল করা—বিশেষ ঘন না হলেও আমার মতো পাতলা নয়। মণিকার গায়ের রঙ শ্যামলা। এই প্রথম কাউকে দেখি যার মুখশ্রীতে শ্যামলা রঙই বেশি শোভা দেয়। আমার মতো ফর্সা হলে নিশ্চয় ওকে দেখতে এত সুশ্রী লাগত না।

বালুরঘাট ছাড়ার পর এই দু’মাস সেখানকার কোন ক্লাসমেটকে আমার মনে পড়েনি। সুমনাকেও না। আজ মণিকার সামনে বসে তাপসীকে মনে পড়ল। তাপসী আমারই ক্লাসে পড়ত। স্কুলে এবং কলেজে।

আমাদের বালুরঘাট কলেজের ভেতরে বিশাল মাঠ। মাঠের চরিদিকে সীমানা ঘেঁষে একতলা এবং দোতলা বিল্ডিং। মাঠটা এতই বড় যে বিল্ডিংগুলোকে দেখতে ক্ষুদ্র লাগে। ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার অবাধ স্বাধীনতা আমাদের ছিল কিন্তু কলেজের ভেতরের অনেকটা জায়গা মাঠ দখল করে রাখায় সেখানে লুকোনোর কোন জায়গা

ছিল না। আর লুকবোই বা কার সঙ্গে! এমন কোন বন্ধু তো দূরের কথা, বান্ধবীও নেই। সুমনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা অন্য মেয়েদের তুলনায় বেশি, তাই বলে যে একে অন্যের জন্য পাগল হয়ে যাব এমন নয়। আমরা একটু বেশি কথা বলি, একটু বেশি পরস্পরকে বুঝি এই যা। সেই একটু বেশি কথা বলা এবং একটু বেশি বোঝানোর মধ্যে বাড়ির সেইসব সদস্য বা গুরুজনের নাম থাকে না যাঁরা আমাদের স্বাধীনতা খর্ব করছেন, যাঁরা আমাদের সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের দোলনায় দোলার অভিজ্ঞতা নিতে দিচ্ছেন না, যাঁরা মানছেন না যে আমাদের চোখ দুটোর উপরে যে কপাল আছে সেটা আমাদেরই, তাতে কি রঙের টিপ থাকবে গেরুয়া না সাদা নাকি লাল নাকি গোলাপি নাকি চিরসবুজ হয়ে বিরাজ করবে টিপের সেই স্থান সেই সিদ্ধান্ত নিতে আমাদেরই পছন্দের প্রাধান্য পাওয়া উচিত। বস্তুত এসব বোঝার বয়সও তখন আমাদের হয়নি। তাছাড়া সুমনার এমন কোন বক্তব্য ছিল কিনা আমি জানতাম না। আমার বাড়িতে শাসনের চাপে পড়ে আমি প্রায় বধির ছিলাম। মুখের ফিজিওথেরাপি করে অনেক কষ্টে মুখ খুলতে পারলেও কি আর বলতে বা বোঝাতে পারতাম সুমনাকে! মা সারাদিন কাজ নিয়ে আমার সঙ্গে খিটমিট করেন? রাগ হলেই দিদি আমার পিঠে কিলঘুষি বর্ষণ করে? দাদারা সবসময় আমাকে বাঁদরের নাচ নাচায়? বাবা ভীষণ রাগী তাই এসবের প্রতিকার চেয়ে তাঁর কাছে কোন অভিযোগও করতে পারি না? সুমনা শুনেই বা কি করত? কি সমাধান দিত? কতখানি বুঝত সে আমাকে? বরং উল্টোটা হতে পারত। এমনিতেই গ্রামের মেয়ে বলে ক্লাসে আমার বদনাম। সেই বদনামকে প্রশ্রয় না দিয়ে সুমনা আমাকে বন্ধুর সম্মান দিয়েছে। বাড়বাড়ি করলে আমাকে দেওয়া সেই সম্মানটাই সে হয়ত ফিরিয়ে নিত।

তখন আমাদের ক্লাসে তাপসীর একার রাজত্ব। হবে নাই বা কেন! সুন্দরী বলে তার খ্যাতি কলেজের কোণায় কোণায়। তাপসী আমাদের গার্লস হাই স্কুলেরই ছাত্রী। আমাদের এ ডিভিশনের। রোল নম্বর একটু পেছনের দিকে। চব্বিশ কি পঁচিশ। তবু ক্লাসের মেয়েরা তাকে খুব আগলে রাখত। ওর রূপের জন্য। স্কুলে লাল পাড় সাদা শাড়ি, বেলি শু বা পিটি শু এবং লাল ফিতেতেই সুন্দরী। বয়স সুইট সিক্সটিনে পৌঁছনোর আগেই বেশ ঝলক এসে গিয়েছিল ওর চেহারায়। আমার শরীরে তখনও ছোটবেলায় খালি গায়ে রোদে ঘুরে বেড়ানোর কারণে পুড়ে যাওয়া ত্বকের উপরে কালচে স্তরের বিশাল রাজত্ব। হাঁটু ও কনুই থেকে ধুলো বালির বিদায় নেওয়া রীতিমত বাকি। আমার মনে হত তাপসী ওর রূপ নিয়ে খুব সচেতন ছিল, ঘরের আয়নায় খুব সূক্ষ্ম ভাবে দেখে নিয়েছিল সে নিজেকে। বুঝে নিয়েছিল কি করলে ভালো লাগে ওকে দেখতে। না হলে সবসময় পানের আকারের মুখের তিনকোণা থুতনিটা আরও ছুঁচোলো করে দুই ইঞ্চি নামিয়ে রাখবে কেন? থুতনি নিচে নামালে ঠোঁট প্রসারিত হয়, এটাই তাপসীর হাসি। হাসির কথা হলে তাপসী হাসে, রাগের কথাতেও তাপসী হাসে, পড়া না করলে শাস্তির ভয়ে তাপসী হাসে, শাস্তির পরেও হাসে তাপসী।

কলেজে যেতে না যেতেই তাপসীর চেহারার জৌলুস আরও বেড়ে গেল। গা

থেকে বিদায় নিল লাল পাড় থান। তার বদলে চড়ল রঙিন শাড়ি। পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি উচ্চতার শরীরের সঙ্গে যোগ হল তিন ইঞ্চি হিল। তাপসীর ঝুলিয়ে দেওয়া থুতনি এবং প্রসারিত ঠোঁট কলেজে উত্তম স্যারের চোখ দুটোকে চুম্বকের মতো টেনে নিল। উত্তম স্যার রোজ ক্লাসে ঢুকেই তাপসীকেই জিজ্ঞেস করেন বইয়ের কথা। তাপসী বেঞ্চের প্রথম সারিতে বসে। স্যার বই চাইলে সে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় স্যারের দিকে। এগিয়ে দেয় বই। হাত বাড়ান স্যারও। চোখ তাঁর হাত দেখে না, চোখের দৃষ্টি সেঁটে থাকে তাপসীর মুখের ওপর। ঠোঁট দুটো খোলা। চোখ এবং হাতের কাজের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় তাপসীর এবং স্যারের হাতের স্থানাঙ্ক মেলে না। আমরা মেয়েরা মুখ টিপে টিপে হাসি, স্যারের কাছে সেই খবরও থাকে না।

উত্তম স্যারের চোখে বিশেষ হয়ে ওঠায় মেয়েদের কাছে তাপসীর দাম আরও বেড়ে গেল। ডানে, বাঁয়ে অনেক সাঙ্গপাঙ্গ, চেলা-চামুণ্ডা জুটে গেল ওর। ভি আই পি চালে জনবেষ্ঠিত হয়ে থুতনি আরও নিচে নামিয়ে ঠোঁট আরও প্রসারিত করে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল সে। 'হায় হায়, মরি মরি, রূপের আগুনে জ্বলে সবাই, কি করি করি' ভাব। ডান হাত দিয়ে মাঝে মাঝে সে নিচে নামানো থুতনি এবং প্রসারিত ঠোঁটে হাওয়া দেয়। তাপসী তখন 'এই রূপ দেহ যৌবন চিরদিন রবে না মোর, একদিন সবই হারাবে, সুন্দর দেহটা চিতার আগুনে একমুঠো ছাই হয়ে যাবে' ভাবনার পরিধি থেকে অনেকই দূরে। আমি ভাবি সেই তাপসী আমাদের এই বিদ্যাসাগর উইমেন'স কলেজে এসে পড়লে কি হত। বিদ্যাসাগর কলেজের ভেতরে কোন মাঠ নেই। বিদ্যাসাগর কলেজ হল কংক্রিটের জঙ্গল। ঘোরাফেরার ইচ্ছে হলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠো নামো, চারতলা, তিনতলা, দোতলা, একতলা করো। প্রেম করার ইচ্ছে হলে খালি ক্লাসরুম দেখে ঢুকে পড়ো, বসে বসে গল্প করো। নীরব নিভৃত দেখে চুমু খেতে বা জড়াজড়ি করতে যেও না, তাহলেই হবে। এসব কথা অবশ্য বিদ্যাসাগর ডে কলেজের জন্য প্রযোজ্য। ডে কলেজ হল কো-এড কলেজ। আমাদের ডিপার্টমেন্টে উত্তম সারের মতো কোন স্যারও নেই যে তাপসীর মতো সুন্দরী মেয়ের দিকে তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে থাকবেন। যদিও আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এস কে এস কালো প্যান্ট, কালো ব্লেজার পরে, ব্লেজারের পকেটে প্রতিদিন তাজা লাল গোলাপ লাগিয়ে নায়কসুলভ ভাব নিয়ে কলেজে আসেন, মাঝেমধ্যেই হাল্কা হাল্কা আমিষ রসিকতার উষ্ণ হাওয়া ছড়িয়ে দেন ক্লাসে কিন্তু মেয়েরা তাঁকে ডিপার্টমেন্টের অভিভাবক ছাড়া আর কিছুই মনে করে না।

মণিকাকে পেয়ে আমি খুশি। আমার ছেলেতে আকর্ষণ নেই। আমার একাধিক বান্ধবীর লোভ নেই। শুধু মণিকাই আমার জন্য যথেষ্ট। সবে তো শুরু। জানছি আমি ওকে ধীরে ধীরে। না ধীরে ধীরে নয়, অনেক তাড়াতাড়ি। বলছি আমি ওকে আমার অনেক কথা একদিনে এক বছরের সিলেবাস শেষ করে দেওয়ার মতো গতিতে। তবু জ্ঞান হওয়া থেকে শুরু করে প্রবহমান বছর পর্যন্ত এত দীর্ঘ সময়ের এতগুলো ঘটনা সিলেবাসে ঢুকে পড়েছে, এত কথা শোনার আছে, বলার আছে এত কথা যে বলার ভাষা মুখে এলেও, কলকাতায় আসার এই দু'মাসের মধ্যেই বক্তব্য পরিবেশনে

পোক্ত হয়ে উঠলেও শেষ হয় না তা। এটা জীবনের এমন এক মোক্ষম সময় যখন ছেলেমেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি অনেক কিছু বুঝে নিতে পারে, অনেক কিছু করার ইচ্ছে জাগে তাদের মনে, অনেক কিছু না করারও ইচ্ছে জাগে। অনেক কিছু না করার ইচ্ছেতে ভয়ানক অনেক কিছু করেও ফেলতে পারে তারা। আমরা ক্লাস না করার ইচ্ছেতে ক্লাস মিস করছি। গল্প করার ইচ্ছেতে গল্প করছি। পাসের সব ক্লাস মিস করেও সময় কম পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে, তাই অনার্সের ক্লাসেও উপস্থিত থাকছি না। গল্পপাগল হয়ে ক্যান্টিনে ঢুকে পড়ছি, কলেজে যে কোন খালি রুম দেখে সেখানে ঢুকে পড়ছি এবং আরও কি না কি করছি। তার পরেও ছুটির বেল পড়লে অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে ঘরে ফিরছি। মনে হচ্ছে কিছুই শোনা বা বলা হল না। ফাঁকা গেল দিনটা।

মাসখানেক পরের কথা। মণিকাকে দেখছিলাম রোজ কলেজে শাড়ি পরে আসছে। ওর হঠাৎ শাড়ির ভীমরতি কেন হল বুঝতে পারছিলাম না। শাড়ি আবার পরিবর্তন হয় রোজ। শাড়ি পরলে সাজগোজও একটু বেড়ে যায়। চোখের কাজল ঘন হয়, ঠোঁটের লিপস্টিক গাঢ় হয়, এছাড়া হাতে চুড়ি গলে, গলায় মালা ঝোলে। মণিকাকে যদি জিজ্ঞেস করি সে বলে, কারণ আছে।

“কি কারণ?”

“বিশেষ কারণ।”

“প্রেম করছিস?”

“না।”

‘জন্মদিন আসছে?” যদিও জন্মদিনের আগে এরকম সাজগোজের প্রথা পৃথিবীর কোন প্রান্তে আছে বলে আমার জানা নেই তবু জিজ্ঞেস করি। কি জানি মণিকাই হয়ত প্রবর্তন করতে চলেছে জন্মদিনের এক অভিনব ধারার।

“আরে না, জন্মদিন এখনই কেন? সে তো ১২ মার্চ। অনেক দেরি আছে।”

“তাহলে?”

“তাহলে কিছু না।”

“বিয়ের কথাবার্তা চলছে?” কারণ না জেনে শান্তি পাই না। জোঁকের মতো ওর সঙ্গে লেগে থাকি।

“কি যে বলিস! তাছাড়া হলেও বা ছেলেপক্ষ আমাকে কলেজে দেখতে আসছে নাকি!”

“কি জানি ওরা রাস্তাঘাটে কোথাও যদি তোকে দেখে ফেলে তার জন্য সতর্ক থাকছিস।”

মণিকা শাড়ি পরার কারণ বলে না। বলে ‘এমনি’ আর আমি ভাবি এমনি হতেই পারে না, কারণ তো কিছু আছেই। শেষপর্যন্ত কারণ জানলাম চৈতালির কাছে। সেও আমাদের ক্লাসেরই একটি মেয়ে। সেদিনও প্র্যাকটিক্যাল শেষে আমি এবং মণিকা যথারীতি ক্যান্টিনের দিকে পা ফেলেছি এমন সময় দেখি চৈতালিও পেছন থেকে পা বাড়িয়ে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। জিজ্ঞেস করছে মণিকাকে, “এই কোথায় যাস?”

“ক্যান্টিনে।”

“আমিও যাব।”

ক্লাসে মণিকার সঙ্গে চৈতালির বিশেষ কথাবার্তা হতে দেখিনি। দলে ছিলাম আমরা দু’জন। হঠাৎ সে মণিকার এত কাছের কি করে হল বুঝলাম না। যাই হোক, ক্যান্টিনে গিয়ে চৈতালি বলল, “ওকে ট্রেন থেকে শাড়ির আঁচল দেখাতে হয়।”

“কে দেখায় শাড়ির আঁচল? কাকে দেখায়?”

“মণিকা আমাকে দেখায়।”

“কেন?”

“ওমা, আমরা ট্রেনে একসঙ্গে আসি যে! জানিস না তুই?”

“না তো!”

বুঝলাম কলেজে আমার এবং মণিকার মাঝখানে আরেকজন ঢুকে পড়েছে। এমন কোন গুরুতর ব্যাপার নয়। ক্লাসমেটই তো। বাইরের তো কেউ নয়। তবু আমার মন ছোট হয়ে যায়। রাগ হয় মণিকার ওপর চৈতালির কথা এতদিন আমার কাছে গোপন রেখেছে বলে। সঙ্গে এক অজানা ভয়ও অনুভব করি—মণিকার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ফিকে হয়ে যাবে না তো!

চৈতালির বাড়ি দমদমে। মণিকা বিরাটিতে ট্রেনে চেপে দমদম স্টেশনে পৌঁছতেই ট্রেনের গার্ডের ফ্ল্যাগ দেখানোর মতো শাড়ির আঁচল উড়িয়ে দেয় বাইরে আর তা দেখে চৈতালি প্ল্যাটফর্মের যেখানেই দাঁড়িয়ে থাকুক না কেন ছুটে এসে একই কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়ে। তারপর শিয়ালদায় নেমে ওরা একসঙ্গে কলেজে আসে। আমার আফসোস হয়—আমারও বাড়ি বিরাটিতে কিংবা দমদমে হতে পারত। অন্ততপক্ষে উল্টোডাঙ্গায়! কম করেও একটা স্টেশন তো একসঙ্গে আসতে পারতাম ট্রেনে! অতঃপর শিয়ালদা থেকে সূর্য সেন স্ট্রিট—কলেজ স্ট্রিট—ঠনঠনিয়া—বিদ্যাসাগর কলেজ।

সিঙ্গারার খিদে

আমাদের ফার্স্ট ইয়ারেই কলেজে আরেকজন স্যার এসেছিলেন। অতনু ভট্টাচার্য। সংক্ষেপে এ বি। গায়ের রং ফর্সা। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। গোল এবং মাংসল মুখ। 'এ বি'কে দেখে আমার ছাব্বি চিকস, ডিম্পল চিন, রোজি লিপস, টিথ উইদইন কবিতাটির কথা মনে পড়ত। 'এ-বি'র ঠোঁটগুলো পিংক ছিল এবং সন্দেহাতীতভাবে উনি উঁচু দাঁতের মাড়ির লোক ছিলেন না। এ বি হলেন ছাব্বি চিকস, ডিম্পল চিন, রোজি লিপস, টিথ উইদইন মেয়েটির পরিণত পুরুষ সংস্করণ। লম্বায় অনেকটা। ডিপার্টমেন্টে একমাত্র 'এ বি'ই লম্বাতে 'কে ডি'র মোকাবেলা করতে পারেন। কে ডি অর্থাৎ কুমকুমদি অবিবাহিতা। কারণ আমাদের অজানা তবে 'এস কে এস'-এর বিশ্বাস কে ডি তাঁর সঙ্গে উচ্চতায় মানানসই পাত্র পাননি। প্রায়ই কলেজে এসে গুড মর্নিং সেরে উনি 'কে ডি'কে জিজ্ঞেস করেন, "কি হে কুমকুম, কোন খবর আছে নাকি?" উনি জানেন কোন নতুন খবর তৈরি হওয়া চারটিখানি কথা নয়। তবু শুধু জিজ্ঞেস করা। ওয়ালটেয়ারে এক্সকারশনে গিয়ে পর্যন্ত এস কে এস 'কে ডি'কে নিয়ে বেশ চঞ্চল। কে ডি ওখানে একবার হারিয়ে গেলেন। অসম্ভব খিদে পেটে নিয়ে আমাদের তখন একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বিরিয়ানি অর্ডার করার কথা। হাঁটছিলাম সব মহানন্দে। মুখে 'বিরিয়ানি খাব, বিরিয়ানি খাব' মন্ত্রের জপ চলছে। হঠাৎ পেছন থেকে কে ডি উধাও। আশপাশে কোথাও কে ডি নেই। ফেলে আসা ওলিগলিতেও নেই। ছ'ফুট উচ্চতার এত বড় শরীরটা এত তাড়াতাড়ি কি করে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে বুঝে ওঠা মুশকিল। এস কে এস নিশ্চয় একবারের জন্য হলেও ভেবেছিলেন কে ডি উপযুক্ত কাউকে পেয়ে গেছেন। কিন্তু তা যদি হয়ও না জানানোর কি আছে! এস কে এস ওয়ালটেয়ারে পা রাখার পর থেকেই ওনাকে বারবার উদ্বুদ্ধ করেছেন, 'কি হে কুমকুম, তোমার সাইজের কাউকে কি দেখা যায়?' জিজ্ঞেস করে। ডিপার্টমেন্টে এ বি জয়েন করলে আমরা ভয় পেয়েছিলাম এই ভেবে যে এস কে এস 'কে ডি'কে 'এ বি'র সঙ্গে জুড়ে দেবেন।

একটা বছর আমি, মণিকা এবং চৈতালি তিনজনের একদমই না পড়াশোনা করে কেটে গেল। ক্লাসের মেয়েরা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে বা না পড়ে অনেক এগিয়ে। আমার মনে হয় শুধু আমরাই পিছিয়ে আছি। এমন মনে হওয়া নিয়ে চলতে চলতে আমি 'এ বি'র ক্লাসে মণিকাকে পেস্ট-এর সুন্দর ডেফিনিশন লিখতে দেখি। মণিকা মেধাবী। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে আমার চেয়ে অনেক ভালো রেজাল্ট করেছে। তবু গত একবছর ক্লাসে ওর পড়াশোনার বহর দেখে হলফ করে বলা যায় এত উন্নতমানের ডেফিনিশন ও নিজে থেকে লিখতে পারে না। কারও না কারও সাহায্য নিশ্চয় সে নিয়েছে। কিন্তু কার সাহায্য? কে সেই ব্যক্তি? অনুমানের জগতে বিচরণ করতে করতে শেষে ওকেই জিজ্ঞেস করি। জিজ্ঞেস করে যা জানি তা রীতিমত হৃদয়বিদারক। মণিকা বলে, "আমি এ বির কাছে পড়তে যাই।"

"কবে থেকে?"

"এক সপ্তাহ হল।"

চৈতালি আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। বুঝতে বাকি রইল না যে সেও যায়। সে বলে, ‘‘এ বির বাড়ি পড়তে গিয়ে আমরা রোজ সিঙ্গারা চপ খেয়ে আসি।’’

মণিকাকে জিজ্ঞেস করি, কি করে সে জেনেছে ‘এ বি’র কথা।

‘‘প্রবোধদা বলেছেন।’’ প্রবোধদা আমাদের ডেমন্সট্রেটর।

‘‘কি বলেছেন প্রবোধদা?’’

‘‘বলেছেন এ বি নাকি প্রাইভেট পড়াতে আগ্রহী।’’

‘‘আর?’’

‘‘শুরুতে মাইনে নাও নিতে পারেন। তুমি বলে দেখতে পারো।’

‘‘আর তুই বললি?’’

‘‘হ্যাঁ।’’

‘‘উনি রাজি হলেন?’’

‘‘রাজি হলেন বলেই তো যাচ্ছি।’’

‘‘আমাকে কেন বলিসনি?’’

‘‘তোকে পড়াতে রাজি নাও হতে পারেন, তাই।’’

‘‘চৈতালির কথা কে বলেছে?’’

‘‘ও নিজে।’’

‘‘ও কার কাছে জেনেছে?’’

‘‘আমার কাছে।’’

‘‘তোরা কেউ আমায় বললি না!’’

‘‘এখন জানলি। এখন বলে দেখ।’’

চৈতালি-মণিকার রোজ রোজ ফ্রীতে সিঙ্গারা-চপ খেতে পাওয়ার সৌভাগ্য আমাকে আহত করে। সঙ্গে একই সৌভাগ্য অর্জন করার দুর্বার ইচ্ছেও জাগে মনে। আমি হোস্টেল আসার পর ছোটদা জানিয়ে দিয়েছিল এবার বাবা সরাসরি আমায় টাকা পাঠাবেন এবং তার জন্য বীডন স্ট্রিটের স্টেট ব্যাংকে আমাকে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। খুললাম অ্যাকাউন্ট। তাতে তিনশো টাকা এল। তিনশো টাকা দিয়ে আমাকে মাস চালাতে হবে। হোস্টেলে দিতে হবে মোট একশো পঁচিশ টাকা—একশো টাকা খাওয়ার এবং পঁচিশ টাকা থাকার। বাকি একশো পঁচাত্তর দিয়ে বই-খাতা-পেন-পেন্সিল কেনা, কলেজের মাইনে ভরা, জামাকাপড় কেনা, টিফিন ব্রেকফাস্ট করা, বাস-ট্রামের ভাড়া দেওয়া যাবতীয় কিছু। আমার মনে হয়নি খুব সহজ ব্যাপার। হোস্টেলে একশো টাকার বিনিময়ে শুধু দুপুর এবং রাতের খাবার পাওয়া যায়। তাছাড়া সেই খাবারের মানের ওপর নির্ভর করে থাকলে কার্যাভাবে পাচনতন্ত্র যে কয়েকদিনেই দুর্বল হয়ে পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমতাবস্থায় সকাল বিকেলের খাওয়াকে বিদায় দেওয়ার অর্থ হল অবিলম্বে নিজেরই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করা। লিস্ট বানাতে বসি একশো পঁচাত্তর টাকা কার কার পেছনে খরচা করা উচিত।

সকালে সুস্মিতাদির বর্ণনার ‘একটা খেলে পেট ভরে না আর দুটো খেলে পেট

বেশি ভরে যায়' সাইজের একটা কেক খেয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। হেদোর মধ্যেকার সংক্ষিপ্ত রাস্তা ধরি তবু কলেজের গেট পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই খালি হয়ে যায় পেট। খালি পেট নিয়েই ক্লাস করি। মণিকা পাউরুটিতে বাটার চিনি মাখিয়ে নিয়ে আসে টিফিনে খাবে বলে। তার অর্ধেকটা আমিই সাবাড় করে দিই। ক্যান্টিনে সব দিন যাওয়া হয় না। গেলে কখনও আমি বিল ভরি কখনও মণিকা। তবু কম করেও মাসে তিরিশ টাকা লেগে যায়। বিকেলে একটা সিঙ্গারা বা একটা চপ খেলে পাকস্থলীর বিন্দুমাত্র অংশও ভরে না। দুটো লাগে। বেরিয়ে যায় এক টাকা। রাতের মেনুতে সবার জন্য রুটি থাকে। কারও পছন্দ না হলে সে চাল কিনে দিতে পারে—ছোট ঠাকুর রান্না করে দেবেন। দুপুরের মাছের পিসটা নিতান্তই ছোট, কারও যথেষ্ট মনে না হলে সে ডিম কিনে নিজে সেদ্ধ করে নিতে পারে। তরকারির স্বাদ কারও মুখে খাবারের প্রতি বিরাগ তৈরি করলে তেল-আলু কিনে সে আলু তেলে ভেজে নিতে পারে। সব সমস্যা সমাধানের জন্য রাস্তা খোলা আছে, কেউ চাইলে সেইসব রাস্তাকে আপন করে নিতেই পারে। কিন্তু সবের জন্যই টাকার প্রয়োজন।

যা হোক করে চলে যায় মাস। কখনো দেখি বই-খাতা-কলম-পেনসিল-প্র্যাক্টিক্যাল শীট কেনা বাকি, কলেজের মাইনে দেওয়া বাকি, বাস-ট্রামের ভাড়া আলাদা করে রাখা বাকি, পেস্ট-সার্ফ-সাবান-তেল কেনা বাকি, প্রতিদিনের ছোট ছোট অনেক খরচ বাকি। অন্য অনেক কথা ভাবাই যায় না—যেন আমি কখনও অসুস্থ হই না, ডাক্তারের কাছে আমার যাওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না, ওষুধ কেনার প্রয়োজন হয় না, যেন পোশাক বা অন্তর্বস্ত্র কেনার প্রয়োজন নেই, অন্ত্রর্বস্ত্র ছাড়াই কলেজে যাওয়া যায়, ঘুরে বেড়ানো যায়, যেন এগরোল, মোগলাই-এর লালচ থেকে আমি অনেক দূরে। হোস্টেলে দেখতাম অনেকের মা-বাবা এসে মেয়েকে হরলিক্স, বিস্কুট-সাবান-তেল-পেস্ট দিয়ে যান, অনেক মেয়ে তাদের মা-বাবার সঙ্গে বেরিয়ে নাইটি-ব্রা-প্যান্টি-চুড়িদার-সালোয়ার কিনে নিয়ে আসে। এসব তাদের মাসের বরাদ্দ টাকার বাইরে অতিরিক্ত পাওয়া। আমার সেরকম হয় না, আমার মা-বাবা কখনও হোস্টেলে আসেন না, সম্ভব হয় না, সম্ভব হবে বলে মনেও হয় না। তাঁদের দেখতে ইচ্ছে করে না মেয়ে কোথায় আছে, কেমন আছে।

বাবার নিশ্চয় মনে হয় আমাকে উনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা পাঠাচ্ছেন। তাই মাঝে মাঝে আমার মাসে বরাদ্দ তিনশো থেকে কমিয়ে আড়াইশো বা দু'শো পঁচাত্তর করেন। সেসব মাস অতিবাহিত করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। কিছুদিন হল হোস্টেলে মঞ্জু ডিকোস্টা নামে একটি মেয়ে এসেছে। তার গায়ের রঙ যত না ময়লা তার চেয়ে বেশি ময়লা তার চালচলন। সে স্নান করে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেও মনে হয় না স্নান করেছে। হয়ত গায়ে সাবানও মেখেছে কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। আমি ওর গলার ভাঁজে, কানের পেছনে, কনুই-এ, ঘাড়ে নোংরা দেখি। সে নিশ্চয় দাঁত ব্রাশ করে, তবু তার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে সাদাকালো কিসব লেগে থাকে। লম্বা লম্বা স্কার্ট পরে সে। নিশ্চয় কাচে স্কার্টগুলো, কিন্তু মনে হয় না কেচেছে। মঞ্জু ডিকোস্টা কলেজ থেকে চুরি করা কেমিস্ট্রির ট্রাইটেশনের বিকারে কুড়ি পয়সার

চা কিনে লম্বা স্কার্ট ও ঢিলে হাফ-হাতা টপ পরে একপাশে অনেকটা ক্ষয়ে যাওয়া কাঠের হিলে পা চড়িয়ে খটখট আওয়াজ তুলে পাছা ডানে বাঁয়ে উঠিয়ে নামিয়ে জোরে জোরে আমার কাছে হেঁটে আসে, কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করে, ‘‘এই আমার কাছ থেকে দশ পয়সার চা কিনবে গো?’’ আমি ওকে ‘না’ বলি।

‘‘কেন?’’

‘‘আমার চা ভালো লাগে না।’’

সে ফিরে যায়। আবার আসে, ‘‘নাও না।’’

‘‘নারে মঞ্জু, আমি চা খেতে পছন্দ করি না।’’

আবার সে ফিরে যায়। আবার আসে। চায়ের প্রতি আমার নিরাসক্তির কথা ভুলে বারবার অনুরোধ করে। আমি বিরক্ত হই। রেগে যাই। শেষে শাসিয়ে ফেরত পাঠাই। পরে খারাপ লাগে। ভাবি, বেচারি। ওর পয়সাকড়ির অবস্থা নিশ্চয় আমার চেয়েও খারাপ। কি জানি পয়সার অভাবেই হয়ত মঞ্জু আধপাগল। তারপর উল্টোদিক থেকে বিচার করি—আমি ওর মতো আধপাগল নই, তার মানে আমার পয়সার অভাব নেই। আমি ভালোই আছি।

ভালো থাকলেও ‘এ বি’র বাড়ির সিঙ্গারা-চপের লোভ সামলানো দায়। মণিকার পেস্ট-এর ডেফিনিশন আমার মনে ‘এ বি’র কাছে পড়তে যাওয়ার আগ্রহের উদ্রেক করেছে। সিঙ্গারা চপের লোভে দ্বিগুণ হয়েছে সেই আগ্রহ। সেদিনই কলেজের পরে আমি ওদের সঙ্গে ‘এ বি’র বাড়ি যাই। আমার হয়ে ‘এ বি’কে মনিকা-চৈতালিই সুপারিশ করে। এ বি মুখে কিছু বললেন না দেখে আমরা ধরে নিই উনি রাজি।

শুনেছি এ বি বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ থেকে পিএইচ ডি করছেন। তাই ড্রয়িং রুমে টেবিল থেকে শুরু করে লোকজনের বসার জায়গাগুলো পর্যন্ত দখল করে নিয়েছে বইপত্র, ফাইল। পাহাড়সমান বইপত্র, ফাইলে ভরা টেবিলের ওপাশটাতে তাঁর চেয়ার। এপাশে বেঞ্চে কোনওরকমে চাপাচাপি করে বসে আছি আমরা তিনজন। নিয়মশৃঙ্খলাহীন বসা এবং বসানো। বইয়ের পাহাড়ের ফুটোফাটা দিয়ে কখনো তাঁর মুখ দেখা যায়, কখনো বা শরীরের কোন অংশ। উনি আমাদের পড়িয়ে কলেজের ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ানোর প্রথম অভিজ্ঞতা নেন, আমরাও ওঁর ঘরে গিয়ে কলেজের অধ্যাপকের কাছে প্রাইভেট পড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা নিই। যদিও চৈতালি-মণিকা আগে চার-পাঁচদিন এসেছে আমি তাকে ধর্তব্যের মধ্যে ফেলি না। এ বি নিজে পড়েন, পড়ে আমাদের পড়ান। কোন নোট তৈরি নেই, পড়ানোতে কোন কুশলতা নেই। একাধিক বই ঘেঁটে ভেবে যোগবিয়োগের সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করে উনি আমাদের মৌখিক নির্দেশ দেন, আমরা অনুসরণ করি, লিখিত রূপ দিই সেই মৌখিক নির্দেশকে। ‘‘এটা লেখো, ওটা লেখো, না না কাটো এটা, কি বললাম একটু পড়ে শোনাও তো।’’ ওঁর সঙ্গে যোগবিয়োগের সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে করতে আমাদের খাতাও নোংরা হয়। অনেক কসরতের পর অনেকটা সময়কে অতিবাহিত হতে দিয়ে খাতাকলমে শেষপর্যন্ত তৈরি হয় প্যাডি পেস্ট ‘ট্রাইপোরাইজা ইনসারটুলাস’-এর অর্ধেক জীবনচক্র। অংগঠিত সব। আমার জীবনচক্রে অনেক আগেই সিঙ্গারা গলাধকরণ হওয়ার কথা। পেট সিঙ্গারার খিদেতে চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু সিঙ্গারাকে লাইনে পেছনে পাঠিয়ে

এক গ্লাস জল পর্যন্ত ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করে না। চৈতালি ফিসফিস করে মণিকাকে জিজ্ঞেস করে, ‘‘কিরে মণিকা, আজকে কি তাহলে সিঙ্গার-চপের প্রোগ্রাম বাতিল?’’

স্যার আবার বই ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছেন। ‘ট্রাইপোরাইজা ইনসারটুলাস’-এর জীবনচক্রের অর্ধেকটা এখনও বাকি। হোক দেরি, দু’ঘণ্টার পাঠ্যক্রম শেষ হতে নিক চার ঘণ্টা সময়, মনে হচ্ছে এ বি ট্রাইপোরাইজাকে আজই শেষ ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে তবেই চেয়ার ছাড়বেন। এদিকে চৈতালির মন আর মানে না। আমার চেয়ে বেশি উতলা হয়ে পড়েছে সে। মণিকাকে গুঁতিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে, ‘‘কি রে, সিঙ্গারা-চপের কি হবে?’’

‘‘কি করে বলব?’’

‘‘বনানী এসেছে বলে খাওয়ানো বন্ধ নাকি! টাকা বেশি খরচা হবে তাই?’’

আমাদের অস্থিরতা দেখে অস্বস্তিতে পড়েন স্যার, ‘‘দাঁড়া দাঁড়া, হয়ে যাবে। আর বেশি সময় লাগবে না।’’

খুশি হই। আসছে সিঙ্গারা। কিন্তু আসলে তা নয়। স্যার আমাদের জিজ্ঞেস করেন, ‘‘যতটুকু লিখিয়েছি মনে আছে তো?’’

‘‘হ্যাঁ।’’

‘‘ট্রাইপোরাইজার ফাইলাম কী?’’

‘‘আর্থপোডা।’’

‘‘ক্লাস?’’

‘‘ইনসেক্টা।’’

‘সাব ক্লাস?’’

‘‘জানি না।’’

‘‘অর্ডার?’’

‘‘লেপিডোপটেরা।’’

‘‘এরপর আমি একটা হুইট পেস্ট পড়াবো *পুকিনিয়া গ্র্যামিনিস।*’’

‘‘ঠিক আছে।’’

‘‘তারপর একটা মেইজ পেস্ট।’’

‘‘ঠিক আছে।’’

‘‘তারপরে সেরিকালচার।’’

‘‘ঠিক আছে।’’

‘‘তারপর আমরা পিসিকালচার শুরু করব।’’

‘‘ঠিক আছে।’’

‘‘সবই তো ঠিক দেখছি।’’

‘‘একটা জিনিস ঠিক নেই।’’

‘‘কি হয়েছে?’’

‘‘খিদে পেয়েছে।’’

‘‘ওহ্,’’ স্যার লজ্জা পেয়ে ভেতরে যান।

একটু পরেই ঘরে ঢোকে সিঙ্গারা-চপ।

যেমন স্যার তেমন স্তুতি

'কে ডি'র কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতার এস কে এস নিজেও কালো। নিগ্রোর রঙ না হলেও নিগ্রোর কাছাকাছি রঙ পেয়েছে ত্বক। মেলানিনের ঘনত্বকে ভিত্তি করে নিগ্রোরা যদি কুড়িতে কুড়ি পায় এস কে এস পাবেন আঠারো। শরীরে সামান্য কিছু অন্য রঙের অংশ আছে যেমন হাতের সাদা নখ, চোখের সাদা স্ক্লেরা, গলা থেকে ঝোলানো বুকের উপর পড়ে থাকা সাদা টাই এবং ব্লেজারের বাঁ পকেটের উপর পিন দিয়ে আটকে থাকা লাল গোলাপ। দুঃখের বিষয় হল 'এস কে এস'-এর শরীরের দৃশ্যমান একটি চুলও সাদা নয়।

সন্তোষপুর থেকে আসেন উনি। আমি আসি বীডন স্ট্রিট থেকে। কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি ইউ জি হোস্টেলের দূরত্ব মাত্র মাত্র সওয়া এক কিলোমিটার। হেঁটে আসতে দশ মিনিট সময় লাগে, ট্রামে অথবা বাসে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট। এস কে এস যেখানে ক্লাস শুরু হওয়ায় অন্ততপক্ষে দু'ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে ওঠেন সেখানে আমি উঠি মাত্র কুড়ি মিনিট আগে। তাতেও ঘুম ঘুম ভাবে কাটে না। ফ্রেস হই আসার পথে হেদোর চারপাশে ঘি-মাখন খাওয়া দৈত্যাকার মারোয়াড়ি মহিলাগুলোকে ছোটাছুটি করতে দেখে। কলেজে এস এক এস বেশ সতেজ থাকেন। ট্রেন জার্নি, হাঁটা, বাস জার্নি করার পরেও। জার্নি এবং হাঁটার ধকল তাঁর লাল গোলাপেও পড়ে না। লাল গোলাপকে দেখে মনে হয় এখনই বাগান থেকে উড়ে এসে 'এস কে এস'-এর বুকের উপর বসে গেছে।

কলেজে এসে আগে কুমকুমদির দিকে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে তাঁকে গুড মর্নিং জানান এস কে এস। তারপর শুরু করেন তাঁর জেনেটিক্সের ক্লাস। না, 'এস কে এস'-এর জেনেটিক্স বলা যাবে না। শুনলে উনি নিশ্চয় জোরালো গলায় প্রতিবাদ করবেন, ''আমার জেনেটিক্স! কি হে বনানী! এটা আমার তোমার সবার জেনেটিক্স।'' বলবেন, ''ডি এন এ ডাবল হেলিক্যাল স্ট্রাকচার আমার মধ্যেও আছে, তোমার মধ্যেও আছে। ওয়াটসন-ক্রিকের মডেল শুধু আমার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, তোমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শুধু আমার 'ডি এন এ'রই রেপ্লিকেশন হয় না, তোমার 'ডি এন এ'রও রেপ্লিকেশন হয়।'' নিজের সঙ্গে অন্যের মিল যেমন তাঁর ধরে ফেলতে বিলম্ব হয় না, অমিলও। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে অনেক স্পেসিমেন-এর অনেকরকম তন্ত্র বের করে দেখাতে হয় যেমন ব্যাঙের পাচনতন্ত্র, পাইলার স্নায়ুতন্ত্র, গিনিপিগের জননতন্ত্র। আরশোলার তন্ত্রের সংখ্যা সবথেকে বেশি—শ্বসনতন্ত্র, পাচনতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, জননতন্ত্র। প্র্যাকটিক্যাল ট্রে থেকে আরশোলা প্রজাতির ছুটি নেই। স্পর্শ পেলেই শরীর কেমন যেন কিড়বিড় করে তবু ওগুলোকে হাতে ধরতেই হবে। কাটতেও হবে হাত দিয়েই। হাত দিয়েই চার-পাঁচটার স্টক উঠিয়ে নিজের ট্রের পাশে রাখতে হবে। ছোট বস্তু, যত সাবধানতাই অবলম্বন করি না কেন শরীরের তন্ত্রগুলো অক্ষত থাকে না। এত সরু নালী, এত ছোট গ্রন্থি ছিঁড়ে যায়ই যায়। একটার, দুটোর, তিনটের, চারটের—শেষ হয়ে যায় স্টক। তখন যে কাজটি বেঁচে থাকে তা হল অন্যের ট্রে পরিদর্শন করা—কারও

ভালো বেরোলে তার সফলতাকে হিংসে করা ও দুঃখ পাওয়া এবং কারও আরশোলার তন্ত্র ছিঁড়ে গেলে তাকে আমাদের সমগোত্রীয় ভেবে আনন্দ পাওয়া।

পার্ট ওয়ানের ফাইনাল পরীক্ষা সামনে। সেদিন আমরা পড়েছি আরশোলার জননতন্ত্র নিয়ে। সকালবেলায় এস কে এস ডিপার্টমেন্টে ঢুকেই প্রবোধদার উদ্দেশ্যে চিৎকার ছুঁড়ে দিয়েছেন, "ও হে প্রবোধ, স্পেসিমেনগুলো বের করো।" নির্দেশানুসারে প্রবোধদা একটা ট্রেতে শখানেক জ্ঞানহীন আরশোলা ঢেলে দিতেই আমরা মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ি ট্রের ওপর। চার পাঁচটা করে উঠিয়ে নিয়ে টেবিলে নিজের নিজের ট্রের পাশে রেখে দিই। তারপর শুরু করে দিই কাটাকুটির কাজ। প্র্যাক্টিক্যালে আমি কোনকালেই পটু নই, তাই আজও আত্মবিশ্বাসের একান্তই অভাব। টেনশনে হাত কাঁপে। প্রথম আরশোলাটার অভিডাক্ট ছিন্ন হয়ে কোথায় চলে গেল বুঝতে পারলাম না। দেখি ওভারিওল জলের ওপর নৌকার মতো ভাসছে। ট্রে ধুয়ে নিয়ে এসে লাইনে অপেক্ষারত দ্বিতীয় জ্ঞানহীন আরশোলাটাকে চিৎ করে শোওয়াই, পিন দিয়ে গেঁথে দিই ট্রের মোমের সঙ্গে। কেটেকুটে দেখি ওটার স্পার্মাথিকাটা গায়েব। কি করে হল কে জানে। বেচারি অযথাই অজ্ঞান অবস্থায় মরল। তৃতীয়টা একটা ছেলে। ওটার আবার ভাস ডেফারেন্স নেই, আর চতুর্থটার শুধু কনগ্লবেট গ্ল্যান্ড দেখে বোঝা যায় যে ওটাও একটা ছেলেই ছিল। মন খারাপ করে বসে আছি। ভাবছি প্রবোধদাকে গিয়ে বলি আরেকটা স্পেসিমেন জোগাড় করে যদি আমায় দিতে পারেন। হঠাৎ ঝিল্লীর উত্তেজনা মেশানো চিৎকার কানে আসে, "স্যার দেখুন, স্তুতির টেস্টিসটা কি দারুণ বেরিয়েছে!"

লিঙ্গ তন্ত্রের অমিল ধরে ফেলেন এস কে এস। বিন্দুমাত্র দেরি না করে কৃত্রিম উদবিগ্নতা মিশিয়ে ভারি গলায় বলেন, "স্তুতির টেস্টিস! সে তো থাকবার কথা নয়!" কৃত্রিম আশ্বস্তপ্রদানকারী গলায় তৎক্ষণাৎ আবার আমাদের সান্ত্বনাও দেন, "তবে যাক, ভালোই হয়েছে, ছিল যখন বেরিয়ে গেছে।"

খুব পড়ুয়া মেয়ে স্তুতি। ছোটখাটো চেহারা, গায়ের রঙ চাপা, বেশি পাওয়ারের চশমা, চুল এলোমেলো, কাঁধে ঢাউস ঝোলা ব্যাগ এবং গায়ে প্রায়ই একটা চুড়িদারের সেমিজের সঙ্গে অন্য সেমিজের চুড়িদার। গুছিয়ে গল্প করতে সে একদমই অপটু। কখন কোন প্রসঙ্গ থেকে কোন প্রসঙ্গে লাফিয়ে পড়বে স্তুতির মুখ দেখে তার অনুমান করা প্রায় অসম্ভব। সাধারণ কোন গল্পের মাঝখানে সে যে লেখাপড়ার কথা ঢুকিয়ে ফেলবে না তাও জোর গলায় একদমই বলা যাবে না। সিনেমার গল্পের মাঝখানে লাম্বার ভার্টিব্রি অথবা মেকানিজম অফ ব্লাড ক্লটিং-এর কথা কি করে টেনে নিয়ে আসতে হয় তা স্তুতির কাছ থেকেই যে কেউ শিখতে পারে।

পার্ট টু পরীক্ষার ঠিক আগের কথা। এস কে এস আমাদের জোর গলায় জানিয়ে দিয়েছেন প্র্যাকটিক্যালে গিরগিটির সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ আসবেই আসবে। পরীক্ষা দিতে অন্য কলেজে যেতে হবে আমাদের। এস কে এস আমাদের বারবার সাবধান করেন নম্বর না পাওয়া পর্যন্ত আমরা যেন ট্রে ছেড়ে না যাই। যে কোন সময় যে কেউ এসে বদমাশি করে নার্ভ ছিঁড়ে দিয়ে যেতে পারে। মেয়েরা যারা বেশি সিরিয়াস তারা ভাবে ট্রে পাহারা দেওয়ার কথা পরে ভাবা যাবে, আগে ভালো করে ডিসেকশনটা

তো শিখি। ভালো ডিসেকশন শেখার জন্য অনেকবার প্র্যাকটিসের দরকার। কয়েকটি মেয়ে কিনে অথবা বানিয়ে বাড়িতে ডিসেকশন ট্রের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। সেই মেয়েদের দলে স্তুতি এবং চৈতালিও আছে। আরশোলার মতো অন্য সব স্পেসিমেনগুলো বাড়ির রান্না ও ভাঁড়ার ঘরে সহজলভ্য নয়। কলেজ থেকে স্পেসিমেন কিনে নিয়ে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি, চৈতালি ও মণিকা একবার 'ধীরা দে'র খোঁজে বেথুন কলেজে গিয়েছিলাম। ওনার কাছে প্রাইভেট পড়ার বিষয়ে কথা বলব বলে। উনি ছিলেন বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা। প্রাইভেট টিউটর হিসেবেও তখন ওনার খুব নামডাক। বছর দু'য়েক আগে ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়া মধুমিতা নামের একটি মেয়ে তাঁর নাম আরও ছড়িয়ে দিয়েছিল। আমাদের সবার মনে বদ্ধ ধারণা জন্মেছিল যে ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে গেলে 'ধীরা দে'র কাছে পড়তেই হবে অথবা 'ধীরা দে'র কাছে পড়লেই ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়া যাবে। 'ধীরা দে' নামের প্রস্তাব আসলে 'এ বি'ই আমাদের দিয়েছিলেন। তিনমাস ধরে সেরিকালচার এবং পেস্টদের জীবনচক্র পড়িয়ে যখন দেখলেন জেনেটিক্স, এভলিউশন, অ্যাডাপটেশন, ক্লাসিফিকেশন অথবা সিলেবাসের অন্য কোন বিষয়ই পড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না তখন। যাই হোক, কলেজে গিয়ে সেদিন 'ধীরা দে'র দেখা পাই না কিন্তু ডিপার্টমেন্ট ফাঁকা দেখে সেখান থেকে বেশ কিছু পাইলা চুরি করে নিয়ে আসি।

আমার স্থির বিশ্বাস স্তুতি এমন চুরির কথা কখনও ভাবতেও পারে না। সেদিন ও আমাদের সঙ্গে থাকলে চুরিতে আমরা কিছুতেই সাফল্য পেতে পারতাম না। 'পার্ট টু'র আগে গিরগিটির সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ ঘরে প্র্যাক্টিসের জন্য কলেজের পরে কলেজ থেকে উনিশ টাকা দিয়ে গিরগিটি কিনে বাসে বাড়ি ফিরছিল স্তুতি এবং চৈতালি। ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করা সব। বিধান সরণি দিয়ে শ্যামবাজারে যাবে বাস। বাস চলছে। বেশ ভিড়। তারই মাঝখানে স্তুতি এবং চৈতালি দু'জনেই কোনওরকমে নিজেদের জন্য দখল করে নিয়েছে দুটো সীট। বই-খাতার ব্যাগগুলো কোলের উপর রাখা, হাত থেকে ঝুলছে গিরগিটির প্যাকেট। একটু পরে একজন স্থূলাঙ্গী মারোয়াড়ি মহিলা বাসে উঠে দু'হতে ভিড় ঠেলে চৈতালির সামনে এসে দাঁড়ান। মাঝে মাঝে বাস ব্রেক কষে এবং উনি পেছনে হেলে গিয়ে চৈতালির উপর পড়েন। চৈতালি ভাবে, বসেও শান্তি নেই। ওকেই বরং সীটটা দিয়ে দিই, আমি দাঁড়িয়েই ঠিক থাকব। পরের স্টপে বাসে আরও কিছু প্যাসেঞ্জার চড়লে মহিলাটি কন্ডাকটরের ওপর ক্ষেপে ওঠেন, "আরে ভাই অউর কিতনে প্যায়সা কামাওগে? ব্যস করো অভী।" নিজের মধ্যে বিড়বিড় করেন মহিলা, *লোগোকো ভী দেখো, ইতনে ভীড় দেখকর ভী কই ফিকর নহী হ্যায়। চড় রহা হ্যায় বাস মে!* বিড়বিড় এত জোরে হয় যে কন্ডাকটরের কানে পৌঁছে যায় তা।

"আপনি নিজেও তো ভিড় দেখেই চড়েছেন! এত অসুবিধা হলে নেমে যান," জবাব দেয় সে।

"কিউ উতরূ? এ তুমহারে বাপ কা গাড়ি হ্যায় ক্যা? বিনা প্যায়সে সে লে যা

রহে হো?"

"তাহলে মুখ বন্ধ রাখুন।"

তবু মুখ বন্ধ রাখেন না মহিলা।

বাত-বিতর্কের মধ্যে হঠাৎ চৈতালির মনে হয় ঝোলা কেমন যেন নড়ে উঠল। বুঝতে পারে না সে কার ঝোলা। নিজেরটার ফাঁক দিয়ে দেখে নেয় ভেতরে মরার মতো পড়ে আছে গিরগিটি। সন্দেহ—তাহলে কি স্তুতিরটাতে কিছু গড়বড় হচ্ছে!

"এই স্তুতি, তোর ব্যাগটা ফাঁক করে একটু দেখে নে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা।"

বাসের ঘড়ঘড় আওয়াজ এবং তর্কাতর্কির মধ্যে স্তুতি চৈতালির কথা শুনতে পায় না। না শুনতে পাওয়ার আরও কারণ থাকবে। পড়ুয়া মেয়ে মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যায়। নিজের খুশিমতো ঢুকে পড়ে সিলেবাসের মধ্যে। আমার তো মনে হয় পৃথিবীর রেভলিউশন বন্ধ হয়ে গেছে শুনেও স্তুতির পড়ার মুড এসে যেতে পারে।

চৈতালি জানে না এমুহূর্তে গিরগিটির প্যাকেট হাতে ঝুলিয়ে রেখে মেয়েটি কি ভাবছে।

"কিরে স্তুতি, তুই কি এখন আবার রেপ্টিলিয়ার ক্লাসিফিকেশন নিয়ে পড়লি?" স্তুতির ঘাড়ে মৃদু টোকা মারে সে। চৈতালি ভাবে এমন হওয়া বিচিত্র নয়, গিরগিটি তো রেপটাইলসই। ওকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে না কাটা পর্যন্ত তার মাথা থেকে রেপটাইলসের ভূত নামবে না।

ঘাড়ে ঝাঁকুনি খেয়ে স্তুতির হুঁশ ফেরে। সে ব্যাগের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে ব্যাগ খালি। জ্ঞান ফিরে গেছে গিরগিটির। সে এখন চৈতালির সামনে দাঁড়ানো মহিলার কাঁধে। মহিলা ঝগড়ায় ডুবে আছেন। গিরগিটি এদিক ওদিক দেখছে। তার মনে এখন অনেক প্রশ্ন—*জঙ্গল থেকে কে ওঠালো আমাকে? এটা কোন জায়গা এতগুলো বড়বড় কি সবের মাঝখানে? এত হইচই-বা কেন? আমাকে নিয়ে না তো? আমার বাসস্থানটা ঠিক কোথায়? কতদূরে? কি করে যাই সেখানে? এ কি জ্বালা! যাই হোক, যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। দেরি করেছি কি মরেছি।* মহিলা কাঁধে কাঁটা কাঁটা অনুভূতি পেয়ে উসখুস করেন, ঝাঁকান কাঁধ। একটু ভারি ভারিও লাগে জায়গাটা। তবু তাতে মনোযোগ দেওয়া যায় না। তাহলে ঝগড়ায় ব্যাঘাত ঘটবে। চৈতালি স্তুতিকে খোঁচা দিয়েই দেখে স্তুতির চোখ তার মোটা কালো ফ্রেমের হাই পাওয়ারের চশমার ভেতর দিয়ে ঠুকরে বেরিয়ে গিরগিটির ওপর সেঁটে আছে। মহিলা ভাবেন, না কিছু তো গড়বড় হচ্ছে জায়গাটাতে। উনি অবশেষে মাথা পেছনে ঘোরান। 'ওরে বাবারে! ক্যা চীজ হ্যায় এ! গিরগিটি!' আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ নিয়ে ডুকরে ওঠেন মহিলা। কাঁধে তাঁর হাত পৌঁছনোর আগেই কাঁধ খালি হয়ে যায়। প্যাসেঞ্জার নামাতে থেমেছিল বাস। কিন্তু প্যাসেঞ্জারের আগেই লাফ দিয়ে নামে গিরগিটি। দৌড়য়। আর এদিকে ভয়ে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে গিয়ে মহিলা উল্টোদিকে চৈতালির সামনের লোকগুলোর উপর ট্যারা হয়ে পড়েন। পড়তে পড়তে পাছা লেগেই যায়

তাঁর বাসের মেঝের সঙ্গে। সবকিছু এক নিমেষে ঘটে যায়। এত দ্রুত যে স্তুতি তার উনিশ টাকা দিয়ে কেনা গিরগিটির ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। গিরগিটি থামে একেবারে রাস্তার ওপাশে গিয়ে। তারপর পেছন ফিরে স্তুতির দিকে এক পলক রেখে পালাই পালাই করে আবার দৌড় লাগায়। বাসের বাকি লোকজনও চঞ্চল হয়ে ওঠে, ঘটনার আগা-মাথা বোঝার চেষ্টা করে। মহিলা যাদের ওপর উল্টে পড়েছিলেন তাঁরাই আবার ধরাধরি করে তাঁকে দাঁড় করায়। চৈতালি দেখে স্বস্থানে ফিরে মহিলা কন্ডাক্টরের সঙ্গে ঝগড়ার বিষয়বস্তু পাল্টে ফেলেছেন। উনি এখন 'একি! আপনি পয়সার লোভে গিরগিটিও ওঠাতে শুরু করেছেন বাসে' বলে কলহ করছেন, চিৎকারে মাতিয়ে দিচ্ছেন বাস। আর স্তুতি রাস্তা দিয়ে পলায়নরত গিরগিটির দিকে হাত বাড়িয়ে অসহায় মুখে হাহাকার করছে, "এই রে আমার উনিশ টাকা চলে যাচ্ছে রে!"

স্পেসিমেনের জ্ঞান ফেরার ঘটনা স্তুতির সঙ্গেই বেশি ঘটে। সকালে প্র্যাক্টিক্যাল ল্যাবে ট্রে সামনে নিয়ে সবাই যে যার জায়গায় বসেছিলাম। অনেকটা বিয়ে বাড়িতে আমন্ত্রিতদের খালি পাত সামনে রেখে ভোজ খেতে বসার মতো। অপেক্ষা। খাবার আসবে। ডেমন্সট্রেটর প্রবোধদা আমাদের ট্রেতে ব্যাঙ পরিবেশন করবেন। ক্লোরোফর্মে অজ্ঞান হওয়া নিস্তেজ শরীর। ওগুলোকে কেটে তাদের এলিমেন্টারি সিস্টেম বের করতে হবে। পরিবেশিত হল ব্যাঙ। কিন্তু তার পরে তিরিশ সেকেন্ডও অতিবাহিত হল না। স্তুতি ব্যাঙকে ট্রেতে চিৎ করে শুইয়ে দিতে না দিতেই ওটার জ্ঞান ফিরে এল। ট্রে থেকে এক লাফ মেরে মেঝেতে পড়ল। টেবিলের নিচে। স্তুতিও বসে গেল খপাৎ করে ওটাকে ধরে আবার ট্রেতে রাখবে বলে। সঙ্গে চিৎকার, " প্রবোধদা, ও প্রবোধদা, আমার ব্যাঙের জ্ঞান ফিরে এসেছে। ক্লোরোফর্ম নিয়ে আসুন।" ব্যাঙও চালাক। ভাবে, *আগে ধর তো আমাকে, যদি পারিস। তারপর ক্লোরোফর্ম*। সে ওখান থেকে লাফ মেরে অন্য টেবিলের নিচে গেল। আমরাও হইহই করতে করতে তার পেছনে ছুটলাম। ব্যাঙ এক জায়গায় থাকে না। একবার লাফ মারে, দু'সেকেন্ড বসে, আড় চোখে দেখে নেয় আমাদের, আবার লাফ মারে। তার শেষবারের লাফটা ছিল আলমারির সামনে। দেখলাম সেখান থেকে মাথা নিচু করে চ্যাপ্টা হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সে আলমারির নিচে চলে গেল। আমরা ব্যাগ থেকে স্কেল-পেন্সিল বের করে আলমারির নিচে গুঁতিয়ে ব্যাঙের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করি। প্রবোধদাও ক্লোরোফর্ম নিয়ে হাজির। কিন্তু ব্যাঙের কোন খবর নেই। এস কে এস একটু দেরিতে লাল গোলাপ বুকে নিয়ে ডিপার্টমেন্টে ঢুকে দেখেন ল্যাবে সব টেবিল খালি, কোন ট্রেতে উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে, কোন ট্রেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে অচৈতন্য ব্যাঙ। মেয়েরা পায়খানা করার মতো করে বসে আলমারির নিচে উঁকিঝুঁকি মারছে।

হাসি

আমার, মণিকার এবং চৈতালির হাসাহাসির এবং দৌড়োদৌড়ির অগণিত কারণ থাকে। কারণ পায়ে পায়ে ছড়ানো। মনে হয় যেন পৃথিবীর সব উদ্ভিদ ও প্রাণী আমাদের হাসানোর জন্যই জন্ম নিয়েছে এবং সৌভাগ্যবশত প্রাণী জগতের পুরোটাই আমাদের বিদ্যাসাগর কলেজের জুওলজি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বেঁচে অথবা মরে নতুবা অজ্ঞান হয় পড়ে। এসবের মধ্যে হাসির খোরাক চৈতালিই অবশ্য বেশি খুঁজে পায়।

—হুঁ, কিং ক্র্যাবটাকে দেখ, পা-টা কেমন পেছন দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এই লাথি মারল বলে। হুঁ-এর পরে একটা লম্বা টান থাকে যে টান ওর কথায় আমার এবং মণিকার মনোযোগ কাড়ে।

"আরে ওটা মরা রে চৈতালি। তুই কি মনে করছিস যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে তোকে সাদর আমন্ত্রণ জানাবে আমাকে দেখুন আমাকে দেখুন বলে?" আমি হাসি হিহি। শুনে মণিকাও হাসে হিহিহি।

—হুঁ, এই কক্রচটাকে আমি নেব না রে। ডিমটা কেমন ঝুলছে ওর গায়ের সঙ্গে। মনে হচ্ছে বেচারি ধরা পড়ে ভয় পেয়ে ডিম পেড়ে দিয়েছে।

"ভয় পেয়ে কেউ ডিম পাড়ে না রে চৈতালি। ভয় পেলে হেগে দেয়।"

"ওই হল।"

"ডিম আর পায়খানা একই জিনিস নয়," আমি হাসি হিহি। মণিকা হাসে হিহিহি।

—হুঁ, আমার ড্রসোফিলাটাকে দেখ একবার। কত ছোট! এর এক্স ক্রোমোজোম, ওয়াই ক্রোমোজোম তো মাইক্রোস্কোপেও ধরা পড়বে না।"

"ড্রসোফিলার সাইজের সঙ্গে ওর ক্রোমোজোমের সাইজের এমন কিছু পার্থক্য নেই," আমি হাসি হিহি। মণিকা শুনে হাসে হিহিহি।

—হুঁ, সাইজ ছোট হলে কি হবে। এদেরও ওই জিনিসটা ঠিক আছে।

আমরা তিনজনই হাসি। স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান না রেখে হাসি। ক্লাসের মেয়েরা আমাদের দিকে ভ্রূকুটি করে। ওরা আমাদের বেআক্কেলে কথাবার্তা, হাসি পছন্দ করে না। রীতা তো একদমই করে না। সে আমাদের দেখে মুখ বাঁকায়। রীতা ও সুমিতার খুব ভাব। দু'জনেই লম্বা, স্বাস্থ্যবতী, লেখাপড়ায় মনোযোগী। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে সুমিতা তবু নিজের গল্পও করে। রীতার ওসবও নেই।

রাস্তায় গাড়ির মাঝে লাল পিঁপড়ে এসে গেলে আমরা হাসি, গঙ্গাফড়িং মাথায় চুলে আটকা পড়ে ছটফট করলে আমরা হাসি, শুঁয়োপোকা জামার মধ্যে শুঁয়ো ফুটিয়ে বেরোনোর রাস্তা খুঁজে বেড়ালে আমরা ভয়ে চিৎকার করি, হাসিও। শুঁয়োর জ্বালায় কাতরাই, তবে হাসিকে সঙ্গে নিয়েই। হাসতেই থাকি আমরা। সূর্যমুখী ফুল কেন সূর্যের পানে চেয়ে থাকে তার ব্যাখ্যা আমরা হাসি দিয়ে করি। পদ্ম কেন সবুজ নয়—এই প্রশ্নের উত্তর আমরা হাসির মধ্যেই খুঁজে পাই। ফুলদানিতে রজনীগন্ধা শুকিয়ে গিয়ে নুইয়ে পড়েছে—এই দুঃখ আমরা হাসি দিয়েই লাঘব করি। রেস্তোরাঁয়

গিয়ে পেট ভরে কচুরি, মিষ্টি খাওয়ার পর ক্যাশিয়ার কম পয়সা নিলে আমরা রেস্তোরাঁ থেকে গম্ভীর মুখ নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে আসি বটে, কিন্তু তারপর হাসতে হাসতে রাস্তায় কুঁজোবুড়ি হয়ে বসে যাই। রেস্তোরাঁতে গিয়ে কখনো আমি খাওয়াই, কখনো মণিকা, কখনো চৈতালি। একদিন চৈতালির টাকায় আমাদের খাওয়ার কথা। কচুরি, মিষ্টি দিয়ে পেট ভরিয়ে আমি আর মণিকা বাইরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছি। অপেক্ষা করছি চৈতালির আসার। কিছুক্ষণ বাদে চৈতালি এল। ছুটতে ছুটতে। জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েছে? ছুটছিস কেন?"

"দিয়েছে দিয়েছে...ভাগ ভাগ।" বলেই সে রাস্তা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে শুরু করল।

চৈতালিকে না পেয়ে মণিকাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি দিয়েছে?" মনে হল সে বুঝেছে ব্যাপারটা। কিন্তু সেও আমাকে পাত্তা দিল না। সে অনুসরণ করল চৈতালিকে। অগত্যা আমিও ছুটলাম ছোটার কারণ না জেনেই। যেহেতু ওরা কেউ মাঝখানে থামল না, আমিও থামলাম না। যেহেতু ওরা ছুটে রাস্তা পার হল, আমিও হলাম পার। যেহেতু ওরা আবার ছুটল, আমিও আবার ছুটলাম। ওরা কলেজের সিঁড়ি বেয়ে একেবারে তিনতলায় লাইব্রেরির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আমিও একই জিনিস করলাম। লাইব্রেরির সামনের বারান্দায় রেলিং-এ হেলান দিয়ে তিনজনই হাঁপানির রোগীর মতো ভয়াবহ জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকলাম। পাঁচ মিনিট কেউ কোন কথা বললাম না। পাঁচ মিনিট পরে ফুসফুসের সংকোচন প্রসারণের গতি কম হলে চৈতালি বলল, হোটেলের ক্যাশিয়ার বেশি টাকা ফেরত দিয়েছে। ক্যাশিয়ারকে দশ টাকা দিয়েছিলাম। আমার ফেরত পাওয়ার কথা ছিল দু'টাকা কিন্তু পেয়েছি বারো টাকা। ক্যাশিয়ার ভেবেছিল আমি কুড়ি টাকা দিয়েছি।"

শুনে আমাদের অট্টহাসি শুরু হল। পয়সা বেশি পাওয়ার সৌভাগ্য চৈতালির কিন্তু হাসি আমরা তিনজনই। খুশিও আমরা তিনজনই ফেরত পাওয়া বেশি পয়সা দিয়ে আরেকদিন অন্য রেস্তোরাঁয় গিয়ে কচুরি, রসগোল্লা সাঁটিয়ে আসতে পারব ভেবে।

বেলুড়ে ঘুরতে গেছি। দেখি কয়েকটি ছেলে আমাদের পেছনে পড়ে গেছে। হাঁটছেও আমাদের পেছন পেছন। ওদের দিকে না তাকিয়েই আমরা বুঝতে পারছিলাম ওরা আমাদের অনুসরণ করছে, অনুকরণ করছে—কারণ, আমরা যা বলছি তা ওদের স্বরযন্ত্রের ভেতর থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে বাড়ি মারছে আমাদেরই কানে। অনেকক্ষণ ধরে বিরক্তি হজম করার পর চৈতালি মণিকাকে বলল, "নমুনাগুলো সব কেমন রে?"

এক সেকেন্ডের জন্য পেছনে মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে মণিকা চৈতালিকে তাদের পুরো চেহারার বিবরণ পেশ করে, "নেড়িকুত্তার মতো।"

শুনতে পেলাম একটি ছেলে জিজ্ঞেস করল, "কিছু বললেন?"

অন্য একটি আমাদের হয়ে তাকে উত্তর দিল, "আমাদের নেড়িকুত্তা বলল রে।"

আরেকজন বলল, "কুত্তা বললেন আমাদের। তাও আমরা আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। নামগুলো বলবেন প্লীজ?"

আরেকজন বলল, ‘‘কোথায় থাকেন? মানে কোথায় থেকে এসেছেন?’’
আরেকজন ঃ বাড়িতে কে কে আছেন?
আরেকজন ঃ প্রেম করবেন?

‘‘উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক টু ইউ,’’ পেছন ফিরে রাগে গজগজ করতে করতে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়েই চৈতালি আবার হাঁটতে শুরু করে। কথা না ছুঁড়লেও আমার এবং মণিকার অঙ্গভঙ্গী চৈতালির মতনই। আওয়াজ পাই, ‘‘কি বললেন ঠিকমতো শুনতে পেলাম না।’’

আরেকজন বলল, ‘‘কোন ভাষা ছিল ওটা?’’
আরেকজন ঃ ইংরেজি রে ইংরেজি।
আরেকজন ঃ বড় কঠিন ভাষা।
আরেকজন ঃ ইংরেজিতে আর কি কি বলতে পারেন শুনি।

সেদিন সেই সময়টাতে ছেলেগুলোর গায়ে পড়া আচরণে আমরা একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। আমাদের মুখ থেকে হাসি উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওরা হাল ছেড়ে অন্যদিকে হাঁটা দিলেই স্বস্তির হাসি ফুটে উঠেছিল আমাদের মুখে। স্বস্তির হাসি জোরালো হয়েছিল ট্রেনে করে বাড়ি ফেরার সময়।

কলেজে আসার পথে রাস্তাতেই আমরা দিনের হাসির অনেক উপকরণ জোগাড় করে ফেলি। প্রথম পিরিয়ডে এস কে এস ছাড়া অন্য কেউ এলে সকাল সকাল ক্লাসে তাঁর তাজা শুদ্ধ মেজাজ বিগড়ে দিয়ে ক্লাস নেওয়ার ইচ্ছেটাকে নষ্ট করে দিতে আমাদের একদমই সময় লাগে না। এস কে এস নিজেও রসিক মানুষ, তাই সহ্য করেন, আমাদের রসিকতার সঙ্গে নিজের রসিকতা মেশান। কিন্তু বাকিরা তা করেন না। তাঁরা হয় লেকচারের মাঝখানে হতাশায় মুখ বন্ধ করে কিছু সময় বসে থাকেন, নচেৎ তৎক্ষণাৎ ধমকানি দিয়ে লেকচার অব্যাহত রাখেন। বি এম, যিনি আমাদের ক্লাসিফিকেশন পড়াতেন ধমক দেওয়ার দলে।

প্রথমদিনের ‘কে ডি’র সেই ছোট রুমটাতেই ‘বি এম’ এর ক্লাস চলছিল। সেদিন যে কারণেই হোক চৈতালি ও মণিকার একসঙ্গে আসা হয়নি এবং চৈতালি ট্রেনে নয়, বাসে এসেছিল। আমি এবং মণিকা ক্লাসে শেষ বেঞ্চে বসেছিলাম চৈতালি এলে পাশে জায়গা দিতে পারব ভেবে। বি এম পড়ানোতে ডুবে ছিলেন। বোর্ডে পলিপ এবং মেডুসার ছবি আঁকা হয়েছিল। তাদের পার্থক্য বোঝানোর জন্য জোরদার চেষ্টা চলছিল। আমি না পারলেও অনেক মেয়েরা বুঝতেও পারছিল। যেমন রীতা, সুমিতা, পুতুল। ওদের প্রাইভেট টিউটর আছে। ওরা অনেক জিনিস আগেভাগেই প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে নিয়ে ক্লাসে আসে কিন্তু ক্লাসে এমন একটা ভাব করে যেন এই প্রথম জানছে ম্যাডামের কাছ থেকে, প্রথমবার জেনেই অবিলম্বে বুঝে নিচ্ছে। তাতে দু’পক্ষেরই কল্যাণ। ভালো পড়াতে পারছেন বলে ম্যাডামের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং ভালো ছাত্রী হিসেবে ম্যাডামের কাছে রীতা, সুমিতা, পুতুলের মানও বৃদ্ধি পায়। রীতা, সুমিতা তবু বোঝে কিন্তু পুতুল যে না বুঝেই মুখস্থ করে তার খবর ম্যাডামের কাছে নেই। আমি জানি। আমি ওকে ক্লাসে প্রাইভেট টিউটরের দেওয়া

নোট নিয়ে আসতে দেখেছি। শুধু আমি কেন, অনেক মেয়েরাই দেখে থাকবে। তবে তারা তাকে ঝালিয়ে নেয়নি। আমি নিয়েছি। আমি ওকে নোটের জিনিসগুলো বোঝাতে বলেছিলাম কিন্তু সে পারেনি। স্তুতি কিছু বুঝে বাকিটা বোঝার জন্য লড়াই করতে থাকে, অনবরত। সেইজন্যই ক্লাসের বাইরে কথাবার্তার মাঝখানে যখন তখন সিলেবাস ঢেলে দেয়। অজন্তা, মহুয়া, মৌসুমি এবং আরেক চৈতালির মধ্যে কারও কারও প্রাইভেট টিউটর থেকে থাকবে। ওরা বোঝা না বোঝার মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। বিভ্রান্ত। ঝিল্লীকে দেখে কখনো আমার মনে হয় সে পুরো বুঝেছে, কখনো মনে হয় কিছুই বোঝেনি। যাই হোক, এরা সব না থাকলে শুধু রীতা, সুমিতা, পুতুল, স্তুতির মাঝখানে ক্লাসে টেকা আরও মুশকিল হত। এমনিতেই কাজ ছেড়ে অকাজ এবং হাসির জন্য কলেজে আমাদের নাম ভালোই ছড়িয়ে পড়েছে।

চৈতালি আসে ক্লাস শুরু হওয়ার কুড়ি মিনিট পরে। হাসি হাসি মুখে 'বি এম'কে জিজ্ঞেস করে, ''মে আই কাম ইন মিস?''

''কাম,'' বি এম চৈতালির দিকে না তাকিয়েই অনুমতি দেন। চলছে বোঝানো। মনে হচ্ছে সে এত দেরিতে ক্লাসে আসায় উনি খুশি নন। অথচ চৈতালির মধ্যে তার জন্য কোন লজ্জা বা অনুশোচনা নেই। লেকচারের বিষয়বস্তুর মধ্যে ঢোকার ইচ্ছেও নেই তার। সে ঘুটঘুট করে হাসছে আর আমাকে কনুইয়ের গুঁতো মারছে।

''আঃ, কি করছিস! বি এম রেগে যাবেন।''

চৈতালি আমাকে গুঁতো দেওয়া বন্ধ করে কিন্তু হাসি বন্ধ করে না। ঘুটঘুট হাসির শব্দ আসতেই থাকে কানে।

''চুপ!'' ফিসফিসিয়ে সাবধান করি। গলাটা খেঁকরে নিয়ে সিরিয়াস হওয়ার চেষ্টা করে সে। এমন একটা ভাব যেন মোটেও হাসছিল না। খুসখুসানি কাশিটা কেবল ওকে বিরক্ত করছে। গলা খেঁকরানোয় গলায় খুসখুসানি ভাবটা অল্প সময়ের জন্য কম হল। তারপর আবার বাড়ল। আবার ঘুটঘুট হাসি। এবার বি এম পড়ানো থামিয়ে দিলেন, ''এই দাঁড়াও তো।''

চৈতালির হাসির ঘুটঘুট আওয়াজ বন্ধ, কিন্তু মুখে হাসি হাসি ভাব অটুট। এত তাড়াতাড়ি গম্ভীর হওয়া সম্ভব নয়। তবে তার চেষ্টা চলছে। বসেই রইল সে। বোঝাতে চাইল ক্লাসের শৃঙ্খলা সে ভঙ্গ করেনি। তাই বি এম তাকে দাঁড়াতে বলতে পারেন না।

''কি হল? আমি তোমাকেই বলছি। বুঝতে পারছ না?''

চৈতালি এবার মেরুদণ্ড সোজা করে মাথা উঠিয়ে বসে। এদিক ওদিক দেখে। এখনও যেন ক্লাসের মেয়েদের বিশ্বাস হওয়া উচিত নয় যে সে-ই সেই মেয়ে যার জন্য 'বি এম'এর এই আদেশ।

''কি দেখছ? দাঁড়াও।''

''আমি?'' কাঁপা কাঁপা আঙুল দিয়ে নিজের বুকে টোকা মারে চৈতালি। ক্লাসের মেয়েদের এটাই ভাবাতে চায় বি এম ভুল করছেন। গড়বড় করেছে আসলে তার আগের মেয়েটি। তবু অনিচ্ছাকৃতভাবে দশ সেকেন্ড সময় নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে।

''হাসছিলে কেন?''

''আমি হাসিনি তো।'' আত্মরক্ষার দুর্বল চেষ্টা।

''তুমিই হাসছিলে।''

বি এম ধরেছেন চোর। রীতার মুখে বিরক্তি। সুমিতার অভিব্যক্তি নিরপেক্ষ। স্তুতির মুখ চিন্তাগ্রস্ত—ক্লাসে এরকম বাধা এলে তার তো আজ পলিপ ও মেডুসার পার্থক্য বুঝে ওঠাই হবে না। কি যন্ত্রণা! অন্যান্যরা বলী কৌতূহলের।

এবার আমিই গুঁতো লাগাই চৈতালিকে, ''বলে দে কেন হাসছিলি। না হলে উনি আরও রেগে যাবেন।''

চৈতালি শুরু করে, ''বাসে ভিড়ের মধ্যে সামনের দিকে ড্রাইভারের পেছনের রডটা ধরে কোনওরকমে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ একটা বিকট হ্যাঁচ্চোর আওয়াজ আমার মাথাটাকে যেন কাঁপিয়ে দিল। পেছন ফিরে দেখলাম একটা ছেলে দাঁড়িয়ে...''

ছেলের কথা শুনে মুহূর্তেই 'বি এম' এর রাগ পড়ে গেল। তাছাড়া গল্পই শুরু হয়েছে নাটকীয় ভঙ্গীতে। হাসলেন উনি, ''তারপর?'' 'বি এম'এর আগ্রহ দেখে বাকি মেয়েরাও আগ্রহ নিল গল্প শোনার।

''...আমি বুঝতে পারলাম ওর নাকে আমার চুল ঢুকেছে...''

চৈতালির কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা মোটা খরখরে চুল ছেলেটির নাকে সুড়সুড়ি যে দিতেই পারে তা নিয়ে ক্লাসের কোন মেয়ের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

''ব্যস এই কথা?'' মজা নিতে চেয়েও মজা নিতে পারেন না বি এম।

''না, এখানেই শেষ নয়।''

''তবে?''

''আমার বেশ ভালোই লাগল। আমি ইচ্ছে করে মাথাটাকে ডানে-বাঁয়ে ঘোরালাম। দেখলাম সে আরও কয়েকবার হাঁচি মারল...''

''ছেলেটি গালি দিল না তোমাকে?''

এতক্ষণে রীতা একটু একটু হাসতে শুরু করেছে।

''না, কিন্তু কলেজ স্টপে আমি যখন বাস থেকে নামছিলাম তখন শুনলাম সে চিৎকার করে বলছে, এই যে ম্যাডাম এবার থেকে বাসে ওঠার সময় হয় ভালো করে চুল বেঁধে আসবেন নতুবা মাথা ন্যাড়া করে আসবেন।''

শুনে ক্লাসে হাহা হাসির রব। সবাই হাসছে—ঝিল্লী, মহুয়া, অজন্তা, মৌসুমি, আরেক চৈতালি, সুমিতা, রীতা, পুতুল। স্তুতিও বাদ যায় না। একটু সময়ের জন্য হলেও পলিপ, মেডুসার সঙ্গে ধস্তাধস্তি থেকে চৈতালি তাকে মুক্তি দিতে পেরেছে। বোর্ডে অনাদরে পড়ে আছে সেগুলো।

বি এম জিজ্ঞেস করেন, ''তুমি কিছু বললে না?''

''আমি তো শুনে হতভম্ব, কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। তাছাড়া বাসও ছেড়ে দিয়েছিল। ভাবলাম পরের বাসে উঠে ছেলেটিকে ধরব কিন্তু তাহলে আপনার ক্লাসটা মিস হয়ে যেত।''

লোকদেখানো পড়ুয়া আমরা বেশিরভাগ সময়ই ক্লাসে উপস্থিত থাকি না, আর

যখন থাকি তখন না বুঝে অধ্যাপকদের শরীরের ও মুখের ভাষা অনুকরণ করি। অন্যসময় সেসবের প্রদর্শন চলে। কেমিস্ট্রির এস বি মেন্ডেলিফের পিরিওডিক টেবিল পড়ান। নোবেল গ্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'এনি অফ দ্য গ্রুপ অফ গ্যাসেস' বলার পর চোখ বন্ধ করে মুখ ছাদের দিকে উল্টে দিয়ে এক মিনিট বিশ্রাম নেন, বাকি অংশটা তার পরে বলেন। ওনার লেকচার দেওয়ার ভঙ্গী অনেকটা অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভাষণ দেওয়ার মতো। অটল বিহারী বাজপেয়ী অবশ্য তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। উনি অনেক পরে লোকসভার ইলেকশন জিতেছেন এবং আমি তাঁর ভাষণ শুনেছি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর। আমরা গ্যালারিতে সবশেষ সারিতে বসি তবু হাসির আওয়াজ পেয়েই যান এস বি। মাথা নামিয়ে চোখ খোলেন, এত দূর থেকেও ললাট সংকুচিত করে আমাদের সনাক্ত করেই ফেলেন। আমরা যত মাথা নামাই তাঁর গলা তত লম্বা হয়ে উপরে ওঠে। সুতরাং জলে যায় লুকোনোর প্রচেষ্টা। এস বি আমাদের ক্লাসের বাইরে বেরিয়ে যেতে বলেন। এত উগ্র হয়ে যায় তাঁর চেহারা যে মনে হয় আমরা ক্লাস থেকে না বেরোলে উনি নিজেই বেরিয়ে যাবেন।

অনার্সের ক্লাসে আমরা বেশি অনুকরণ করি 'ইউ বি'কে। ঘোড়ার এভলিউশন পড়াতে পড়াতে ক্লাসে ঘোড়ার মতো লাফান ইউ বি। 'এস সি ভি'র ভাগে পড়েছিল এন্টমোলজি কিন্তু উনি বাটারফ্লাই ছাড়া আর কিছু পড়ানোর ইচ্ছে রাখেন না, অথবা অন্য কিছুর জ্ঞানই রাখেন না। তা না হলে এমন করবেন কেন! ইনসেক্ট-এ গঙ্গা ফড়িং আছে, মৌমাছি আছে, পতঙ্গ আছে, মশা আছে, আরশোলা আছে, আরও অনেক কিছু আছে। 'এস সি ভি'কে যদি বলা হয়, স্যার বাটারফ্লাই অনেক হল, এবার অন্য কিছু পড়ান এস সি ভি ঘাড় দুলিয়ে 'হুঁ হুঁ, পড়াবো পড়াবো' বলে টেবিলে পড়ে থাকা ডাস্টার উঠিয়ে বোর্ড থেকে বাটারফ্লাই-এর সব ডায়াগ্রাম মুছে ফেলেন। সেখানে ছবি আঁকেন মশার। পাঁচ মিনিট পড়ান, তারপরে আবার ফিরে সেই বাটারফ্লাই-এই। এবার উনি বোর্ডে আর ছবি আঁকেন না। ঝোলা থেকে বের করেন তাঁর বাটারফ্লাই-এর সংগ্রহ। এভাবেই পুরো একটা বছর প্রায় না পড়িয়েই কাটিয়ে দেন এস সি ভি। তবু চৈতালি, মণিকা এবং আমি তাঁকে প্রজাপতি স্যার নাম দিয়ে হাসতে হাসতেই ক্ষমা করে দিই।

পড়া, প্রেম, বন্ধুত্ব

বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা ‘ধীরা দে’র কাছে পড়তে গিয়েই চৈতালি জেনেছে তাঁর শৈশব কেটেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ গ্রামে। হিঙ্গলগঞ্জ গ্রামে চৈতালির বাবাও বড় হয়েছেন। সেখানে এখনও বাবার বাড়ি আছে। ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে ছুটি পড়লে উনি সপরিবারে হিঙ্গলগঞ্জে গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে আসেন। ‘ধীরা দে’র ব্যক্তিগত জীবনের এই খবর পেয়ে চৈতালির বাবা খুশিতে উপহারস্বরূপ একটা শাল সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়ি যান। শাল পেয়ে ‘ধীরা দে’ মহাখুশি। পড়ানো শুরু হয়ে গেছে তবু উনি চৈতালির বাবার কাছে নতুন শর্ত পেশ করেন, “আপনার মেয়েকে পড়াবো, কিন্তু তার জন্য আপনাকে আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে।”

অনুরোধ শোনার জন্য উদগ্রীব চৈতালির বাবা।

“আমি আপনার কাছ থেকে কোন মাইনে নিতে পারব না।”

“তা কি করে হয়?”

“তাই-ই হবে দাদা। আপনার মেয়ে হল আমারও মেয়ে। আপনি ওকে আমার কাছে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। মাইনে না নিলেও আমার পড়ানোতে কোন গাফিলতি হবে না।”

ধীরা দে চৈতালিকে বিনে পয়সায় পড়াবেন। তাই বলে মণিকাকে তো পড়াবেন না। আমাকেও না। মণিকার বাবাও চান সে ‘ধীরা দে’র কাছে পড়তে যাক। চিন্তা আছে তাঁর মেয়ের রেজাল্ট নিয়ে। আমাদের বাড়িতে এমন কেউ নেই যে আমাকে নিয়ে উদবিগ্ন হবে। বাবা মেয়েকে বালুরঘাট থেকে কলকাতায় পড়তে পাঠিয়েছেন, মেয়ের জেদ মেনে নিয়ে বাধ্য হয়েছেন পাঠাতে—এটাই অনেক। মাসে মাসে আড়াইশো তিনশো করে টাকা পাঠাচ্ছেন—এর চেয়ে বেশি কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ছোটদা বলেছে, একটা মানুষকে মাসের প্রথমে মাইনে পেয়েই যদি আমার জন্য এতগুলো টাকা হাতছাড়া করে দিতে হয়, তাহলে মেজাজ ঠিক না থাকারই কথা। এরপর তাঁর কাছ থেকে আমার আর কিছু আশাই করা উচিত নয়। আমি নিজেকে তাই-ই বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। তবু সবসময় ভালো হয়ে চলতে পারিনি। ওয়ালটেয়ার এক্সকারশনে যাওয়ার জন্য আমি ছোটদাকে দিয়ে বাবাকে রাজি করিয়েছিলাম। আমাদের কাছ থেকে মাথা পিছু তিনশো টাকা চেয়েছিল ডিপার্টমেন্ট। আমি ছোটদাকে পাঁচশো টাকা বলেছিলাম। বাবার কাছ থেকে ছোটদার হাত হয়ে এসেছিল টাকা। যাওয়ার দিন হাওড়া স্টেশনে আমি চৈতালির, মণিকার সঙ্গে ট্রেনের অপেক্ষা করছি। আনন্দে উল্লসিত মন। হাসাহাসি লাফালাফি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এই প্রথম কোথাও পা রাখব, তাও আবার বন্ধুদের সঙ্গে। ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রতট আমার চোখের সামনে তখন যেন মাউন্ট এভারেস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাতে চড়ার জন্য আমার পিঠে পাখা গজিয়েছে। বেশ শক্তপোক্ত পাখা। কি ভীষণ স্বাধীন আমি। এক লাফ দিলেই উড়তে শুরু করব। পাখির মতো পাখা কিন্তু উড়ে যাব পাখির চেয়েও অনেক উপরে, পাখি পড়ে থাকবে নিচে। আমি যত

উপরে উড়ব নিচে পাখির আকার তত ছোট হতে থাকবে। ছোট হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পাখি। আমি পৌঁছে যাব পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত-শিখরে। আমার আনন্দের আরেকটি কারণ হল ধীরা দে। চৈতালি, মণিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে উনি আমাকে অনবরত হাতছানি দিচ্ছেন। আত্মবিশ্বাস কম, একা পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করতে পারব না। আর যদি কারও কাছে টিউশন পড়তেই হয় তাহলে 'ধীরা দে'র কাছে কেন নয়! যাঁর কাছেই যাই না কেন মাইনে তো তাঁকে দিতেই হবে। আমি 'ধীরা দে'র এক মাসের দেড়শো টাকা মাইনে আদায় করে ফেলেছি। আমার হাতে এখন অতিরিক্ত দুশো। ওয়াল্টেয়ারে আর কতই বা খরচা হবে! বড়জোর পঞ্চাশ।

ছোটদা স্টেশনে আমাকে সী-অফ করতে এল। আমাকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "ওয়ালটেয়ারের জন্য স্টুডেন্টস-এর কাছ থেকে কত করে চার্জ করা হয়েছে?"

মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে বুঝেও স্বীকার করতে পারলাম না। ঘষে যাওয়া গলায় জবাব দিলাম, " পাঁচশো।"

"তিনশো টাকা। আমি খবর নিয়েছি। এবার কিছু বললাম না। আশা করব এর পরে আর এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না।"

মুখ চুন করে পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অর্থ হল, 'না, এর পরে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না।'

'ধীরা দে'র কাছে আমরা পড়তে যাই সেকেন্ড ইয়ারে। তাঁর প্রথম মাসের মাইনে দিতে আমার কোন অসুবিধে হয় না। হইহই করে কাটতে থাকে দিন। দেড়শো টাকার বিনিময়ে সপ্তাহে তিনদিনের প্রতিদিন দু'ঘণ্টা করে ধীরাদির সান্নিধ্য লাভের মূল্য যত না বুঝি তার চেয়ে বেশি বুঝি চৈতালি ও মণিকার সান্নিধ্য লাভের মূল্য, একসঙ্গে দিনের আরও কিছুটা সময় কাটাতে পারার আনন্দ। টিউশনে গিয়ে আমাদের একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। নাম বিশ্বদীপ। ছুটির দিনে সে খড়দায় ট্রেনে চেপে বিরাটীতে হাত দেখিয়ে মণিকাকে নিজের কম্পার্টমেন্টে উঠিয়ে নেয়, তারপর একইভাবে চৈতালিকেও ওঠায় দমদমে। তারপর বালিগঞ্জ নেমে দু'জনের মাঝখানে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে হিরো হিরো ভাব নিয়ে হাঁটে ধীরাদির বাড়ির দিকে। আমি একা যাই। ছেলেটি বেঁটে। উচ্চতা টেনেটুনে পাঁচ চার। ফর্সা, কৃশকায় চেহারা। চোখে রুপালি ফ্রেমের চশমা। শরীরের সব অতিরিক্ত মাংস তার পশ্চাদ্ভাগে গিয়ে জমা হয়ে উইপোকার ঢিবির মতো ঢিবি তৈরি করেছে আর সেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে দুটো বাঁকা পায়ের মাঝখানে অন্ততপক্ষে এক ফুটের ব্যবধান রেখে। বিশ্বদীপের মুখের সঙ্গেও আমি উইপোকার সাদৃশ্য পাই এবং এ ব্যাপারে চৈতালি, মণিকাও আমার সঙ্গে একমত। তাই আমরা ওর নাম রেখেছি টারমাইট। কৈশোর অনেকদিন আগেই ছাড়িয়ে এসে সে এখন এক সম্পূর্ণ যুবক, গলার স্বর কিছুটা হলেও মোটা, শরীরে পুরুষ হরমোনের ক্ষরণ এবং বীর্য উৎপাদনও নিশ্চয় হয়ে থাকবে। সে আমাদের মতো শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজ পরে না। তবু আমার তাকে পুরুষ বলে মানতে অসুবিধে হয়। 'ধীরা দে'র বাড়ির বাইরে বসে বসে আমরা যখন আগের ব্যাচের পড়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা করি তখনও সিগারেট ফোঁকে টারমাইট। আমরা চাইলে

দেয় না। বলে, মেয়েদের সিগারেট খেতে নেই। আমরা শুনি না। বায়না করি 'দে না, দে না, একটা টান মারব' বলে। বায়নার কাছে পরাজিত হয়ে একদিন সে আমাদের তিনজনকে তিনটে সিগারেট দিল। মহা উদ্যমে কয়েকটি টান মেরে দেখলাম কেমন যেন একটা ঝিমুনি ঝিমুনি ভাব আসছে। ঘুম পাচ্ছে, বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে চোখ। ওকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'সিগারেট খেলে বুঝি এমন নেশা হয়?" টারমাইট ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে, "আরে, আমি ওগুলোতে গাঁজা পুরে নিয়ে এসেছি।"

আমাদের তিনজনের জীবনে তখনও পর্যন্ত ছেলেবন্ধু আসেনি, মানে সেভাবে আসেনি। মণিকা ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড় হলেও বাড়িতে ওর স্বাধীনতা কম। মণিকার অন্তত তাই বক্তব্য। শুধু বক্তব্যই নয়, অভিযোগও। মণিকার বক্তব্য এবং অভিযোগ বাড়িতে স্বাধীনতা ভোগ করে ওর মেজো বোন তুতুল। তিন বোন এক ভাই ওরা। তিন বোনের পরে ভাই। বাড়িতে মা বাবা ছাড়াও এক জেঠু আছেন। জেঠু অবিবাহিত। মণিকা বলে বাড়িতে ওর মেজো বোনের প্রাধান্য পাওয়ার কারণ আছে—সে ঘরে বেশি কাজ করে, মায়ের ডানহাত। তাই মা তাকে তোয়াজ না করে পারেন না, সময়বিশেষে তার পরামর্শ না মেনে পারেন না। মণিকার গৃহকর্মে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সে লেখাপড়া করে এবং ফিটফাট হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে বেড়ালেও স্বাধীনতা কম হওয়ার কারণে তাকে প্রেমের ইচ্ছেটাকে মনে চাপা দিয়ে দিয়ে রাখতে হয়েছে। আমার মনে হয় তবু ভালো ছেলে পেলে সে নিশ্চয় ঝুঁকি নিয়েই নেবে। এগারো ক্লাসে পড়ার সময় স্কুলের এক বান্ধবীর ঘটকালিতে একটা প্রেমের প্রস্তাব পেয়েছিল মণিকা। কিন্তু সে ছেলেটির কাছে শর্ত রেখেছিল উচ্চ মাধ্যমিকে তাকে ফার্স্ট ডিভিশন পেতে হবে। শর্ত রাখার তাদের সেই প্রথম মিটিং-ই শেষ মিটিং ছিল। বছর দুই বাদে শুধু ঘটক বান্ধবীর কাছে সে সংবাদ পেয়েছিল ছেলেটি থার্ড ডিভিশনে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে, করে দূর থেকেই ফুটে গেছে। তখন চৈতালির পাশের বাড়ির একটি লোক চৈতালিকে তার প্রেম জাতীয় সাগরে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছে। সেই প্রেম জাতীয় জিনিসটা না গেলা যায় না ফেলা যায়। গেলা যায় না বলে তাকে ঠিক প্রেমও বলা যায় না আবার ফেলা যায় না বলে তাকে প্রেম নয় ভেবে অস্বীকার করার হিম্মতও হয় না। প্রেম এবং প্রেম নয়ও এমন মাঝামাঝি ধরনের জিনিসটাকে দু'তিন বছর ধরে সহ্য করে স্নাতকের প্রথম বর্ষে এসে জীবন পরিধির একেবারে বাইরে করে দিতে চাইছিল চৈতালি। তাতে মণিকা আমি আমি ওকে সাহায্য করছিলাম। সবশেষে আমার কথা যদি বলতে হয়—স্নাতকের সেই প্রথম বর্ষ থেকেই প্রতিদিন এক স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে চৈতালির সঙ্গে আমার নিয়মিত রাগারাগি-অশান্তি হয়েই চলেছে। চৈতালির দাদা নাকি আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাকে আমি দেখিনি কিন্তু সে আমায় দেখেছে। তাই চৈতালির সঙ্গে আমার এইসব কথাবার্তা হয়।

"তোর দাদা আছে জানা ছিল না তো!"

"বা রে! অপুদা আছে না!"

"আগে কখনও তার কথা শুনিনি তো!"

"অপুদা আমার নিজের দাদা নয়। দাদার বন্ধু দাদা। আমার দাদা নয় বছর বয়সে মারা গেছে।"

আমি অনেকবারই চৈতালিদের বাড়িতে গেছি কিন্তু তখন তার এই দাদার বন্ধু দাদাটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। দাদাটির মুখ চেনার আগেই তার ইংরেজি হাতের লেখা চিনে নিয়েছিলাম। আমি বুঝেছিলাম ক্ষুদ্রাকার এ সি ই আই এম এন ও আর এস এউ ভি ডবলু এস এক্স জেড-এর মাঝখানে বি ডি এফ জি এইচ জে কে এল পি টি ওয়াই-এর হাত-পাগুলোকে উপর নিচে টেনে টেনে লম্বা করা থাকে যে হাতের লেখায় সেটি হল চৈতালির দাদার লেখা। সেই হাতের লেখায় আমি একটি চিঠি পেয়েছিলাম। ফুলস্কেপ সাইজের পাতা ভরা চিঠি। চিঠি ডাক মাধ্যমে আসেনি। চৈতালিই হাতে করে বহন করে নিয়ে এসেছিল। বলেছিল, "অপুদা তোকে প্রেমপত্র লিখেছে।" ইংরেজিতে যাকে বলে লাভ-লেটার। চিঠিটি হাতে ধরে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কোথায় দেখল সে আমাকে?"

"দেখেনি," হেঁয়ালিমাখা উত্তর।

"না দেখেই ভালবেসে ফেলল? অবাক কাণ্ড!"

"দেখেছে কোথাও।"

"কোথায়?"

'বীডন স্ট্রিটে।"

"কি করে সে চিনল আমাকে?"

"চিনেছে কোনভাবে!"

"আরে কিভাবে?"

"তোর এত জানার কি দরকার?"

"বা রে! কিছু না জেনেই কি প্রেমে পড়ে যাব!"

"আমাদের পাড়াতে দেখেছে।"

"আরে সেটাই বল না তোদের পাড়াতে দেখেছে!"

"বীডন স্ট্রিটেও দেখেছে।"

"বীডন স্ট্রিটে পরে দেখে থাকবে," বলতে বলতেই শঙ্কা জাগে মনে—সে কি আমায় অনুসরণ করছে? সেদিন আর হাঁটা নয়, কলেজ থেকে বাসে সোজা বীডন স্ট্রিট, বাসস্টপে নেমেই কোনদিকে না তাকিয়ে এক দৌড়ে হোস্টেলের ভিজিটরস' রুমের দরজা। সিঁড়িতে চড়ার আগে শুধু একবার পেছনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। নাহ্, কেউ নেই।

চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা। কলেজেই পড়ার চেষ্টা করেছিলাম। বুঝতে পারিনি। চিঠিতে যে একটিমাত্র জানা শব্দ 'লাভ' পাওয়ার কথা ছিল, সেটাও খুঁজে পাইনি। তার বদলে অনেক কঠিন কঠিন শব্দের মাঝখানে দেখেছিলাম একটা অর্ধপরিচিত শব্দ—এন্টারটেনমেন্ট। লেখা ছিল, আই ওয়ান্ট টু এন্টারটেন ইউ। আমি পাতি বাংলা মিডিয়ামের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর পড়া মেয়ে। কলকাতায় আসার পর অক্সফোর্ডের একটা মিনি ডিকশনারি কিনেছিলাম তিরিশ টাকা দিয়ে।

হোস্টেলে ফিরে সেটা খুলে দেখে নিয়েছি এন্টারটেনমেন্ট-এর মানে। এন্টারটেনমেন্ট-এর মানে হল এনজয়মেন্ট যাকে মোদ্দা বাংলায় বলে বিনোদন—চিত্ত বিনোদন। ভালো লাগেনি। মনে বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল ছেলেটি খুব খারাপ। আমার সঙ্গে ঘুরে চিত্ত বিনোদন করবে, চিত্ত বিনোদনের সঙ্গে আর কি কি বিনোদনের ইচ্ছে রাখবে কে জানে। আর তাতে সহমত না হলে হৃদয় ফুটো করে ফুটিয়ে দেবে। আমার ফুটো হৃদয়ের বিশুদ্ধ রক্তের চেম্বারে তখন অশুদ্ধ রক্ত ঢুকে পড়বে, তৈরি হবে সাপের বিষের মতো নীলাভ রক্তের মিশ্রণ। হৃদপিণ্ড জ্বলবে। সেই নীলাভ রক্ত ছড়িয়ে পড়বে সারা শরীরে, সারা শরীরও জ্বলবে। জ্বলা শরীরে আর কারও পক্ষে সহজ হবে না ভালবাসার কবোষ্ণ পোশাক পরানোর।

কিন্তু চৈতালিও আমাকে ছাড়তে চায় না। সে বলে অপুদা খুব ভালো ছেলে। ঘ্যান ঘ্যান করে রোজ। যেদিন কলেজে শাড়ি পরে কিংবা একটু সেজেগুজে যাই সেদিন ওরও ঘ্যান ঘ্যান বেড়ে যায়। বলে, ‘‘তোকে আমি আমার বউদি বানিয়েই ছাড়ব।” বলতে ইচ্ছে করে ‘তোর দাদা তো আমাকে বউ বানাতে চায় বলে প্রস্তাব দেয়নি, সে বলেছে সে এন্টারটেন করতে চায়’ কিন্তু বলি না। মুচকি হেসে চেপে যাই। মনের কথা মনে রাখি। যদি জিজ্ঞেস করে, ‘কি রে রাজি?’ আমি জানাই, না। চৈতালি আমার মুখ থেকে ‘না’ শুনতে একদমই পছন্দ করে না। কীসের অভিভাবকত্ব নিয়ে আমার মাথায় চেপে বসার চেষ্টা করছে সে-ই জানে।

বাড়িতে দিদির সঙ্গে চেঁচামেচি করে, মা’র কাছে দিদি শাড়ি দিচ্ছে না বলে নালিশ করে দিদির কাছ থেকে একটা সবুজ রঙের তাঁতের শাড়ি আদায় করে কলকাতায় এসেছিলাম। শাড়ির আবার হাতকটা ব্লাউজ। ছোটদা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে হাতকাটা ব্লাউজ ওর পছন্দ নয়, তবু আমি সেই শাড়ি-ব্লাউজ পরে কলেজে যাই। সেই শাড়ি পরা দেখলে চৈতালির মাথা আরও ঘুরে যায়, আমার সঙ্গে তার মনোমালিন্য বেড়ে যায় আমি অপুদার সঙ্গে প্রেম করতে রাজি হচ্ছি না বলে। গরমের ছুটিতে চৈতালি ওর মাসির মেয়ে রুঙ্কু এবং আমি চিত্তরঞ্জনে যাব। চৈতালির মামার বাড়িতে। মণিকা বাদ। অনুমতি পায়নি। পরাধীন সে। বাড়িতে বান্ধবীদের নিয়ে এসো, তাদের রাতে রাখো, আপত্তি নেই কিন্তু নিজে বান্ধবীর বাড়িতে রাত কাটাতে পারবে না। মণিকার বাড়ির এই নীতির সুবিধে নিয়ে আমি সেখানে অনেকদিন থেকেছি, অনেক ভালবাসাও নিংড়ে নিয়েছি ওর মা-বাবা এবং জেঠুর কাছ থেকে। কলেজে মণিকার সঙ্গে আমার এবং চৈতালির যে গভীর বন্ধুত্ব হয়েছে তার খবর মণিকার মা-বাবা এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল। একইরকম জিনিস ঘটেছে চৈতালির ক্ষেত্রেও। কলকাতা শহর থেকে চারশো পঁইত্রিশ কিলোমিটার দূরে হলেও আমাদের বাড়িতেও পৌঁছে গিয়েছিল সুসংবাদ। এ যেন এক শুভবিবাহের বার্তা। মণিকা তার মাকে বলেছে, ‘‘জানো মা, বনানী হোস্টেলে থাকে। বাড়ি বালুরঘাটে।”

মা বলেছেন, ‘‘বাবুঘাট তো কাছেই। তবু হোস্টেলে থাকে কেন?”

‘‘বাবুঘাট নয়, বালুরঘাট। রায়গঞ্জ, মালদা, বালুরঘাটের নাম শুনেছ? সেই

বালুরঘাট।"

"অ, আহারে মেয়েটা হোস্টেলে বালো খাইতে পায় না নিশ্চয়। জিজ্ঞাসা করো কি খাইতে বালোবাসে। নিয়া আসো ঘরে।"

মণিকা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে। আমি বলেছি মাগুর মাছের ঝোল এবং দই-মিষ্টি। ব্যস, আমার নিমন্ত্রণ এসে গেল। গেলাম। দেখি মাগুর মাছ কাটা হচ্ছে। মণিকার মা জিজ্ঞেস করলেন, "মা বুঝি মাগুর মাছ বালো রান্না করে?"

"হ্যাঁ।"

"অনেকদিন মায়ের রান্না খাইতে পাওনি।"

আমি হাসি।

"দ্যাহো, মাগুর মাছ কাটা হইতেসে। পিস বড় হইব নাকি ছোট হইব।"

"মা তো পিস ছোট করেই কাটেন দেখেছি।"

"মা জিরা বাটা দিয়া ঝোল রান্না করে নাকি অন্য কিসু দেয়?"

"মনে তো হয় জিরা বাটা।"

"পেঁয়াজ বাইটে দেয় নাকি কুঁচি কইরা দেয়?"

"কুঁচিয়ে দেন।"

"রসুন দেয় কি দেয় না?"

"রসুনও দেন। লম্বা লম্বা করে, চিকন করে কেটে।"

"গরম মশলার মধ্যে কি কি দেয় মা?"

"মানে?"

"মানে হইল শুদু দারচিনি দেয় নাকি এলাচও দেয়?

"তা তো বলতে পারব না মাসিমা।"

"ঠিক আসে।"

মাগুর মাছের সঙ্গে অন্য মাছও থাকে। মাসিমা জিজ্ঞেস করেন, "এই মাছডা সরষা বাটা দিয়া রান্না করব নাকি জিরা বাটা দিব?"

আমি আমার পছন্দ জানাতে পারি না। "আমি খেয়াল করিনি মা কিভাবে রান্না করেন।"

"অ।"

মণিকার বাবার বড়বাজারে জামাকাপড়ের ব্যবসা। শুনেছি বাবা খুব রাগী মানুষ। কিন্তু উনি আমাকে রাগ দেখান না। আমি ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি, উনি আশীর্বাদ করেন আমাকে। বলেন, ভালো থেকো। এটা তোমার নিজের বাড়ি মনে করো, যখন ইচ্ছে করবে চলে আসবে। মাসিমা বলেন, "কয়েকদিন থাইকা যাও। লজ্জা করবা না, যা যা খাইতে ইচ্ছা করে মনের সুখে খাইয়া লও।"

মণিকাকে জেঠুর কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলে জেঠু বাইরে গেছেন। উনি ফিরলেন একটু পরেই। হাতে মিষ্টি দই ও রসগোল্লার ভাঁড়।

চৈতালির মণিকার বাড়িতে প্রথমবার রাত কাটানোর কারণ অন্য ছিল। সে আমার মতো হোস্টেলবাসি নয়। চৈতালির রাঙাকাকা ওদেরই বাড়িতে থাকেন। উনি

চৈতালিদের বাড়িতে অপুদার অবাধ যাতায়াত পছন্দ করেন না। সন্দেহ করেন মেয়ে বুঝি অপুর সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্কে ফেঁসে গেছে। চৈতালি তা বোঝে এবং আমাদের কাছে এসে রাঙাকাকাকে নিয়ে মাঝে মাঝে অভিযোগ করে। আমার তখন ইচ্ছে হয় ওঁকে গিয়ে বলি 'ওঁর এমন চিন্তা নিতান্তই অমূলক। অপুদা তো আসলে আমার পেছনে নম্বর লাগিয়ে বসে আছে'। কিন্তু ওই যে, আমার অনেক ইচ্ছে অব্যক্ত ইচ্ছে হয়েই ভেতরে রয়ে যায়, কেউ জানতে পারে না এক আমি ছাড়া। এক্ষেত্রেও তাই-ই হল। ভাষায় প্রকাশ করা হল না ইচ্ছে আর সেই অবসরে অপুদাকে নিয়ে রাঙাকাকার সন্দেহ একদিন কটূক্তি হয়ে মুখ থেকে নিক্ষিপ্ত হল। কটূক্তি সহ্য করতে না পেরে চৈতালিও বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা মণিকার বাড়িতে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে পরদিন কলেজে এল।

পরদিন শেষের দুটো ক্লাস মিস করে আমাদের কসবায় ধীরাদির বাড়িতে পড়তে যাওয়ার কথা। ডিপার্টমেন্ট থেকে তিনজনকে একসঙ্গে বেরোতে দেখে মোটা মৌসুমি জিজ্ঞেস করে, কি রে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কোথায় যাচ্ছিস? বলি, ডায়মন্ডহারবারে। আমরা বেরিয়ে যেতেই চৈতালির বাবা মেয়ে খুঁজতে ডিপার্টমেন্টে আসেন। মোটা মৌসুমিকে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, "মা তুমি কি চৈতালির ক্লাসে পড়ো?"

"হ্যাঁ।"

"আমি চৈতালির বাবা।"

ক্লাসে তিনজন চৈতালি। সুতরাং ভদ্রলোক আসলে কোন চৈতালির বাবা বুঝতে পারে না মোটা মৌসুমি। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

"চৈতালি চক্রবর্তী," বলেন মেসোমশায়।

"চৈতালি তো এখানে নেই।"

"ও কলেজে এসেছিল?"

"হ্যাঁ।"

শুনে মেসোমশায় কিছুটা নিশ্চন্ত হন। "তোমাদের ছুটি হয়ে গেছে?"

"না। কিন্তু চৈতালি তো ডায়মন্ডহারবারে যাবে বলে একটু আগেই বেরিয়ে গেল।"

"ডায়মন্ডহারবারে! কেন?" আতঙ্ক মনে।

"ঘুরতে। আপনাকে কিছু বলেনি সে?"

"না তো!" মেসোমশায় মোটা মৌসুমিকে বলতে পারেন না যে মেয়ে না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। দুশ্চিন্তায় ভরে যায় মন। তাহলে কি সে কোন ছেলের সঙ্গে পালালো?'

"একা ছিল নাকি আরও কাউকে দেখেছ সঙ্গে?"

"বনানী এবং মণিকাও গেছে।"

জয় মা, কালীঘাটের কালী। শত প্রণাম তোমার পায়ে মেয়েকে দুর্বুদ্ধি দাওনি বলে। আমরা সঙ্গে আছি জেনে কিছুটা শান্ত হন মেসোমশায়।

মণিকার বাড়ির মহান হৃদয়। সুস্বাদু পদ খাওয়ার লোভে বান্ধবীরা সেখানে আস্তানা

গাড়তে পারে, ঘর থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু কোন অজুহাতেই সে নিজে অন্য কোথাও রাত্রিযাপন করতে পারে না। আমি বালুরঘাটে থাকলে আমারও অবস্থা এমনই করুণ হত। হোস্টেলে আছি বলে রক্ষে। আমার স্থানীয় অভিভাবকের কার্যাধ্যক্ষ হয়ে ছোটদা আমাকে অনেকখানি স্বাধীনতা দিয়েছে। বলেছে নিজের সিদ্ধান্তে কোথাও যেতে আমার কোন বাধা নেই, শুধু যাওয়ার আগে ওকে জানিয়ে যেতে হবে 'আমি যাচ্ছি' বলে।

মণিকা আমাদের কাছে 'তুতুল যেতে চাইলে কিন্তু মা-বাবু না করত না' বলে অফ হয়ে গেল। সকালে দমদম থেকে আমাদের সবার চিত্তরঞ্জনের ট্রেন ধরার কথা। হোস্টেলে তনিমা ভালবেসে আমার সুটকেস গুছিয়ে দিয়েছে। ঢুকিয়ে দিয়েছে ড্রাই ক্লিন করা আমার পছন্দের নীল এবং বাদামি রঙের নিজের দুটো পিওর সিল্কের থান শাড়ি। তা দেখে তপতী বলেছে চিত্তরঞ্জনে ওগুলো পরে আমাকে ছেলে পটাতে হবে। কিন্তু চৈতালির বাড়িতে রাত কাটাতে গিয়ে বুঝলাম চিত্তরঞ্জনে ছেলে পটানোর সুযোগ আমি পাব না। কলকাতা থেকে আগেই জোর করে পটে যাওয়া ছেলে আমাদের দলে যোগদান করতে চলেছে। অপুদা। সে থাকবে আমাদের সঙ্গে, বিশেষত আমার সঙ্গে। ভ্রমণের সব জায়গাগুলোতে। সশরীরে অথবা অশরীরে। আমি কোথায় যাচ্ছি, কোথায় বসছি, কি খাচ্ছি, কি পরছি, কার সঙ্গে কথা বলছি এমনকি বাথরুমের দরজাটা কতক্ষণ বন্ধ রাখছি, কত সময় নিচ্ছি স্নান করতে সবকিছুরই হিসেব রাখবে সে। দেখে অথবা না দেখে। কোন ছেলের বিশেষত সে যদি আমাকে এমন বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে, এত কাছাকাছি থাকার অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। না হলেও হলফ করে বলতে পারি প্রথমবারের অভিজ্ঞতাটা একেবারেই সুখের হবে না। এক চূড়ান্ত অস্বস্তি আমার ঘোরার আনন্দের অর্ধেকটাকে গ্রাস করে ফেলে। এন্টারটেনমেন্ট শব্দটা মাথা থেকে সরতেই চাইছে না। বলপূর্বক সরিয়ে দিলে রক্তপ্রবাহে মিশে গিয়ে হৃৎপিণ্ডে ঢুকে পড়ছে। ভেতর থেকে চাপ দিচ্ছে তাকে। মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ড বুঝি ফেটে যাবে। চাপ কমাতে যদি বা অনেক মুশকিল করে হৃৎপিণ্ড থেকেও বের করে দিচ্ছি কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ছে তা। তার পরের প্রচেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হচ্ছে। তাকে ত্বক দিয়ে নিঃসরণ করা যাচ্ছে না। ত্বকের বাইরে চৈতালি আমার পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ট্রেনেও আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়। তার শাসিত অঞ্চলের পরিসীমার মধ্যে রাখতে চায় আমাদের দু'জনকে। নিরুপদ্রবে প্রেম করার অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে।

চিত্তরঞ্জনে চৈতালির মামা-মামির ক্লাস নাইনে পড়া ছেলে টুটুন নিয়ে তিন সদস্যের পরিবারে অঢেল আদর পেয়েও বড় একা লাগে, দম বন্ধ হয়ে আসে। যেন বারো ফুট উঁচু প্রাচীর দেওয়া কারাগারের মধ্যে আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভেতরে থেকেও শান্তি পাই না—সেখানে পরিশ্রম, একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতা। বাইরে পালিয়ে গিয়েও শান্তি পাব না—পুলিশের হাতে পড়ার ভয়। যতক্ষণ না নিজেকে প্রেম না করার পাপমুক্ত করতে পেরেছি ততক্ষণ পেতে হবে শাস্তি, ততক্ষণ আমি আমার মাথার উপর নীলাকাশ দেখব না, ততক্ষণ আমার আকাশে কোন রামধনু ফুটবে না,

ততক্ষণ আকাশে কোনই রঙিন প্রান্ত থাকবে না, কোন পাখি ডানা মেলে উড়বে না। ততক্ষণ পৃথিবীর কোনও হাস্যকৌতুক আমার ভেতরের ভারি পাথরটাকে সরাতে পারবে না, মনে ছোঁয়াতে পারবে না শরতের ফুরফুরে হাওয়া। রুঙ্কু আমার থেকে প্রায় একহাত লম্বা। পাতলা টিংটিঙে চেহারা। টুটুনের সাইকেলের সীটে বসলে পা বাঁকিয়ে মাটিতে রাখতে হয়, তবু সে সেটা চালাতে চালাতে সরলরেখা ধরে সোজা এগিয়ে সামনের গর্তে হুড়মুড় করে নেমে গিয়ে উল্টে পড়ল। দেখলাম। অপুদা, চৈতালি 'বাঃ কি দারুণ সার্কাস' বলে হাততালি দিল। হেসে অস্থির হল। আমার একটুও হাসি পেল না। গুটিয়ে রাখলাম হাত। মন হাততালিও দিতে চাইল না। আমার আর কোথাও ঘোরার ইচ্ছে করল না। যেন মামার বাড়িটাই চিত্তরঞ্জনের একমাত্র দর্শনীয় জায়গা। আমি জানি বাড়ির বাইরে বেরোলে অপুদাও সঙ্গে থাকবে, চৈতালি আমাকে এবং অপুদাকে একত্র করে দিয়ে নিজে রুঙ্কুকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে। আমি অপুদার সঙ্গে মোটেও কথা বলতে চাইব না। কেমন কেমন করবে আমার মন। ঠিক কেমন বুঝতে পারব না, শুধু বুঝতে পারব কেমন কেমন। শরীরও কেমন কেমন করবে। হয়ত বমি বমি লাগবে। সব কেমন কেমনের পাল্লায় পড়ে মুখে তালা লাগিয়ে আমি একটু ধীরে ধীরে পা ফেলব যাতে করে সে একটু আগে আগে চলতে পারে।

দু'দিন বাড়িতে কাটানোর পর মামা বললেন, "চলো কোথাও থেকে ঘুরে আসি।"

সবাই রাজি একমাত্র আমি ছাড়া।

মামা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

"এমনি।"

"এমনি কেন? এখানে এসেছ। মজা করে যাও।"

"করেছি মজা।"

"কোথায় করলে?"

"রুঙ্কু সাইকেল চালাতে গিয়ে উল্টে পড়ল। খুব হেসেছি।"

"ধুৎ!" হাসেন মামা।

"আরও মজা করেছি।"

"কি?"

"চৈতালি আমাকে জোর করে অপুদার সাইকেলের পেছনে চড়িয়েছে।"

"কি?"

"ওটা আবার মজা হল নাকি!" মামীও হাসেন।

"মজাই তো।"

মামী বলেন, "মামার সঙ্গে হিল টপে যাও।"

সেই বিকেলে আমি বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম যখন চৈতালি বলেছিল, তুই আর অপুদা তৈরি হয়ে বেরিয়ে যা, আমরা পরে আসছি এবং আমি আপত্তি জানিয়ে বলেছিলাম, আমরা সবাই একসঙ্গে যাব। চৈতালি রাগে বিস্ফারিত চোখ নিয়ে ফেটে পড়েছিল আমার ওপর, "ভীষণ জেদি মেয়ে তুই। আমি জানতাম এখানেও এমনই

করবি। ভুল করেছি তোকে নিয়ে এসে।” ওরা তিনজন তাড়াহুড়ো করে আমাকে ফেলে বেরিয়ে গিয়েছিল, আমি বসে ছিলাম ঘরে, একা, শুধু মামা দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলে। কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলাম। এটা পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। চৈতালি যাকে সাম্মানিক ভাবছে তা আমার কাছে পরীক্ষা। সে বন্ধুত্বের সাম্মানিক দিতে চাইছে আমাকে কিন্তু আমি তা নিতে চাইছি না। তার দেওয়া উপহারকে প্রত্যাখ্যান করে বন্ধুত্ব বাঁচিয়ে রাখতে চাইছি আমি। আমি চৈতালিকে হারাতে চাই না। মণিকাকেও না। চৈতালি এবং মণিকাকে নিয়ে কলকাতার দিনগুলো আমার জীবনের সবথেকে বেশি রঙিন দিন। রঙিন দিনের রঙিন ছবিতে এককফোঁটা এমন কালি আসুক যা মোছা যাবে না অথবা যা অন্য রঙ দিয়ে কোনভাবেই ঢেকে দেওয়া যাবে না আমি চাই না।

অলস হয়ে গিয়েছিল আমার নড়াচড়া। সেই নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে তনিমার যত্ন করে গুছিয়ে দেওয়া নীল রঙের পিওর সিল্ক থান আমার শরীরে একদমই শোভা পেল না। শাড়ি আমার কপালে একটা নীল টিপ দাবি করেছিল কিন্তু আমি পরিনি টিপ। শাড়ি হাতে চুড়ি দাবি করেছিল কিন্তু আমি চুড়ি পরিনি। কানে দুল কিংবা পাশা দাবি করেছিল শাড়ি কিন্তু আমি কিছুই না পরে কানকে অলঙ্কারহীন রেখে দিয়েছিলাম। শাড়ি ঠোঁটে লিপস্টিক দাবি করেছিল কিন্তু আমি তার সেই দাবিও মানতে রাজি হইনি। শাড়ির সব দাবিকেই ঠুকরে দিয়ে স্থবির হয়ে বসে ছিলাম বিছানার উপর। অজানা জায়গায় অনাত্মীয়ের বাড়িতে বন্ধ ঘরের অন্ধকারে মন সংকুচিত হতে হতে একদমই চুপসে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় মামা বাইরে থেকে কড়া নড়িয়েছিলেন, “এখনও তৈরি হলে না। ওরা যে অনেকদূর এগিয়ে গেল।”

উত্তর দিয়েছিলাম, ‘যাব না’ বলে।

—তা কি করে হয়! সবাই রাস্তায় তোমার জন্য অপেক্ষা করবে।

—তুমি না গেলে আমিও যাব না।

—তুমি কি চাইছ না যে আমি যাই?

—তোমাকে ছেড়ে একা কি করে যাই বলোতো!

—মামীও চলে গেলেন। আমি গেলে তুমি ঘরে একা থাকবেই বা কি করে?

শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত পাল্টে বেরিয়েছিলাম মামার সঙ্গে। মামা আমার এবং চৈতালির ভুল বোঝাবুঝির কি কারণ অনুমান করেছিলেন জানি না, জানতেও চাননি আমার কাছে। রাস্তায় ধীরে ধীরে হেঁটেছিলাম আমরা। আমি ছিলাম গম্ভীর, উনি দরদী। স্নেহ ঢেলে দেওয়া কথায় উনি বোঝাতে চেয়েছিলেন এখানে আমার নিজেকে একা মনে করার কোন কারণ নেই।

তবু হিলটপে কিছুটা দূরে একা দাঁড়িয়ে ছিলাম। বড্ড নিঃসঙ্গ লাগছিল নিজেকে। পাহাড়ের উচ্চতা মাপতে চেয়ে ব্যর্থ হচ্ছিলাম বারবার। শ্যামবর্ণ প্রকৃতির অপূর্ব মনোলোভা দৃশ্য উপভোগ করতে চেয়েও পারছিলাম না। দিনের আলোতে রাতের কালো ঢুকে যেমন প্রকৃতিতে ধূসর করে দিয়েছিল তেমনই আমার চোখের দৃষ্টিকে ধূসর করে দিয়েছিল আমার চোখের জল। পাহাড়ের উপর থেকে পাহাড়ের গোড়ায়

অনবরত বিন্দু বিন্দু করে ঝরে পড়ছিল তা। আমারও আফসোস হচ্ছিল এসে ভুল করেছি ভেবে।

রসায়নে আমরা দেখি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি সম্পর্ক সমীকরণ মেনে চলে। প্রত্যেক পদার্থের একক অণুর মধ্যে পরমাণুগুলোও সমীকরণ মেনেই অবস্থান করে। পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন সমীকরণ মেনেই ঘুরতে ঘুরতে বাঁধা থাকে নিউক্লিয়াসের সঙ্গে। একাধিক মৌল থেকে যৌগ তৈরি হয় সমীকরণ মেনেই। দুটো মৌল একাধিক যৌগ তৈরি করে সমীকরণ মেনেই। আলাদা আলাদা সমীকরণ। সমীকরণের বাইরে কিছু নেই। আবার দুটো মৌল কোন যৌগই তৈরি করে না যদি না তাদের মধ্যে কোন সমীকরণ খাপ খায়। মানুষ একটি জীব। মানুষের রসায়ন জৈব রসায়নেরই একটি অংশ। দুটো মানুষ পরস্পরের থেকে শুধু চেহারাতেই আলাদা নয়, মনেও আলাদা। তাই আমার মনে হয় মানুষের শরীরের যেমন রসায়ন আছে তেমন মনেরও। মনের রসায়ানেরও সমীকরণ আছে। ভালবাসার উদ্রেক হয় মনে। মনের ভালবাসার আলাদা সমীকরণ। সেই সমীকরণ যদি দু'জন মানুষের মনের ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দুর সমন্বয়সাধক না হয় তাহলে কি করে প্রেম সম্ভব!

হয়ত অনেকক্ষণ কেটে যায়। হয়ত মামাই কিছু বলে থাকবেন। হঠাৎ দেখি চৈতালি পেছন থেকে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। বলছে, 'সরি বনানী।'

কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি—পরদিন সকালে কলকাতায় ফিরব।

সরি বলার পরেও পরদিন চৈতালি আমাকে একা ছাড়ল না। অপুদাকে আমার সঙ্গে দিল সহযাত্রী রক্ষী বানিয়ে। বসিয়ে দিল তাকে পাশে, রিকশাতে। আমরা ছিলাম স্টেশনের পথে। চৈতালি ভাই টুটুনের সাইকেলের সামনের রডে বসা। গান ধরেছে, ''এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হত তুমি বলোতো...''

শিয়ালদার ট্রেনে আমরা উঠেছি। অসম্ভব ভিড়। অপুদা সামনে ভিড়ের মধ্যে আমাকে পথ দেখিয়ে চলেছে। লোকের ধাক্কা খেতে খেতে সে যেদিকে যায় আমিও যাই সেদিকে, সে যেখানে থামে আমিও সেখানে থামি। অনেকক্ষণ পর আমরা সীট পাই। বসি মুখোমুখি। ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে থেকে হাওয়া ঢুকে আমার মুখে, বুকে, হাতে, গলায় লাগে। শীতল হয় মুখ, বুক, হাত, গলা। কিন্তু শ্বাসকষ্ট কম হয় না, মনে হয় বাতাসে অক্সিজেন কম। অপুদাকে আমি ভালো করে চিনিই না। সমীকরণের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন মানুষকে চেনার পরে আসে। অপুদাকে ভালো করে চেনার ইচ্ছে আমার মনে তখনও জাগেনি। মন প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি। সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের ওপর কোন জোরাজুরি পছন্দ করে না। তার যা ইচ্ছে সে তাই-ই করে। তোমার কোন ইচ্ছে থাকলে, কিছু চাওয়ার থাকলে একবার বলে ছেড়ে দাও, খুব বেশি হলে একবার বুঝিয়ে বলো। মন বুঝতে চাইলে বুঝবে, না বুঝতে চাইলে বুঝবে না। জোর করলেই বেঁকে বসবে সে। তাতে শ্বাসকষ্ট হবে। আমি এখন সেই শ্বাসকষ্টেই ভুগছি। বাতাস এত অক্সিজেন ঢেলে দিচ্ছে আমার প্রশ্বাসে, তবু তা পর্যাপ্ত যাচ্ছে না।

সীটে নিজেকে একটু ধাতস্থ করে নিয়ে অপুদা বলে, ''একটা কথা জানার ছিল।''

ভয় হয় আবার বুঝি সে তার ‘এন্টারটেনমেন্ট’-এর প্রসঙ্গ ওঠাবে। তাহলে আমার আরও শ্বাসকষ্ট হবে।

“আমি যদি তোমাকে, তুই বলে সম্বোধন করি তাহলে কোন আপত্তি থাকবে?” আমি অপুদাকে বলতে চাই, ‘এতদিনে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের আসল সমীকরণটা বুঝলে তাহলে। অনেক ভালো লাগা দিলে তুমি আজ আমাকে’। কিন্তু তা না করে মনে মনে কবিতা রচনা করি—

রাতের সীমানা ভেঙে আলোর ঘোষণা করে যায়,
কে সে, তুমি দূত তুমি দূত?
সূর্যরাজ নিয়ে আসে উপহার সোনার থালায়—
এ নয় কোন নিশির চমক,
চির খাওয়া অন্ধকারে ঘাতক বিদ্যুৎ।
তুমি দূত তুমি দূত।
উপহার দিলে সহোদর মোরে,
দিলে তুমি স্বর্গসুখ।

শেষপর্যন্ত আমার এবং চৈতালির বন্ধুত্ব টিকে যায়। আমরা তিনজন ধীরাদির বাড়িতে পড়তে যাই এবং ভালবাসার ক্ষেত্রে অনেকটা পেছনে পা টেনে দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্বদীপের মতো ছেলেকে টিউশনের বন্ধু হিসেবে পাই, তার বাঁকা পাছা নিয়ে নিজেদের মধ্যে চর্চা করি। বিশ্বদীপের বাঁকা পাছার চর্চা শুধু আমাদের তিনজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আমাদের সঙ্গে দূরে থেকেও আরেকজন যুক্ত হয়। সেই নমুনাটির নাম হল সুমনা। ইনল্যান্ড খামে সুমনার চিঠি আসে। হাতের লেখা অত্যন্ত ছোট এবং প্যাঁচানো। লেখা দেখে মনে হয় কাগজের উপর অসংখ্য ছারপোকাকে আঠা দিয়ে আঁটকে দেওয়া হয়েছে। ছারপোকা যার জন্য পাঠানো তাকে পেলে দংশন করবে। আমাকে দংশন করে না। ছারপোকা আমার সঙ্গে সঙ্গে চৈতালি এবং মণিকার সঙ্গেও বন্ধুত্ব করে ফেলেছে। তাদেরও দংশন করে না। আমাদের তিনজনকে সুড়সুড়ি দেয় ছারপোকা।

বিরহ-ভাবের খেলা

'ধীরা দে'র প্রথম মাসের বেতন দিতে আমার কোন অসুবিধে হল না। দ্বিতীয় মাসের বেতন জোগাড় করতে আমি অন্য এক পন্থা অবলম্বন করি। সেজদাকে চিঠি লিখি আমার টাকা পয়সার অসুবিধে হচ্ছে বলে। সেজদা দু'শো টাকা পাঠায়। তার পরের মাসে দুর্গা পুজোর ছুটিতে বাড়ি যাই। গিয়ে মাকে বলি, "পুজোতে জামা নেব না।"

মা'র আবার একইরকম জিজ্ঞাসা শুরু হয়, "ক্যান?" আমরা কেউ বাড়িতে থাকি না বলে মায়ের শুদ্ধ বাংলায় কথা বলার অভ্যাসটা আবার নষ্ট হয়ে গেছে।

"ইচ্ছে নেই।"

"ইচ্ছা নাই ক্যান?"

"আমার অনেক জামা আছে মা।"

"থাকুক। সবার জন্যে নতুন জামাকাপড় কেনা হোবে। তুই বাদ য্যাবি ক্যান?"

সবার জামা কাপড় বলতে মা-বাবার, আমাদের ভাইবোনদের, জামাইবাবুর, দিদির মেয়ের, দিদির শ্বশুর-শাশুড়ির এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বাছা বাছা কয়েকজনের। মায়ের সাধ্য বুঝে। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা আর আগের মতো সঙ্গিন নেই। বাবা আবার চাকরি করছেন। মাইনেও বেড়েছে। দাদা, মেজদা, সেজদা সবাই উপার্জন করছে। এখন ভাইবোনদের মধ্যে শুধু আমার পুরো এবং ছোটদার কিছু খরচা বহন করতে হয় বাবাকে। ছোটদা টিউশন করে নিজের অনেকটা চাহিদা মিটিয়ে নেয়। দাদাদের প্রতি অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব কম হওয়ায় বাবা আরও বেশি টাকা দিদির পেছনে খরচা করতে পারেন। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। জামাইবাবু চাকরি করেন। তবুও বাবা আবেগ দিয়ে বাঁধা দিদির কাছে। দিদিও তাই চায়। সবসময় তার মুখে তার তিনজনের পরিবারের টাকার সমস্যার গল্প শোনা যায় এবং সেই গল্প শুনে বাবা নিজেকে শক্ত রাখতে পারেন না, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেন বিবাহিতা নিজের সংসারে স্বাধীন মেয়ের প্রতি তাঁর দায়িত্ব তো বিন্দুমাত্র কম হয়ইনি বরং বেড়েছে।

পুজোতে যাদের জন্য নতুন জামাকাপড় কেনা হবে তাদের তালিকা থেকে আমাকে বাদ দিতে চান না মা। কিন্তু আমি চাই বাদ যেতে। তাই বলে আমার ভাগ পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে বৈরাগ্য পালনের ইচ্ছেও আমার নেই। জামা কেনার টাকা আমি হাতে পেতে চাই। ধীরাদির তৃতীয় মাসের মাইনে দিতে হবে। মানসিক প্রতিবন্ধকতার কাছে হার মেনে যাওয়া মা-বাবা তা বোঝেন না। তাঁরা মনে করেন না যে আমার টিউশনের প্রয়োজন আছে। মাকে বলি, "টাকাটা আমার হাতে দাও। আমি কলকাতায় গিয়ে জামা কিনব।"

"ক্যান? কোলকাতায় ক্যান? বালুরঘাটে ক্যান না?" একটা ইচ্ছে বা প্রয়োজন জানালে মায়ের জিভের ডগায় বাসা বাঁধা একশো 'ক্যান'-এর প্রাচীর পেরোতে পেরোতে দেখি পর্যায়ক্রমে আমার ইচ্ছে অনুরোধে, অনুরোধ রাগারাগিতে, রাগারাগি কান্নাকাটিতে পরিণত হয়েছে। যে ক'দিনের পরিকল্পনা নিয়ে বাড়িতে আসা সে ক'দিন বাড়িতে থাকা অসম্ভব মনে হচ্ছে। ফিরে যেতে হচ্ছে কলকাতায় খালি হাত এবং মনে একাকীত্ব নিয়ে।

মায়ের এখনকার শেষ ক্যান-এর উত্তরটা আমি এভাবে দিই, ‘‘বালুরঘাটে আমি আমার পছন্দের জামা পাব না।’’

‘‘ঢপের কথা! পূজা শেষ হয়ে গেলে তুই জামা কিনবি?’’

‘‘যদি তাই হয় কি অসুবিধে আছে?’’

‘‘অসুবিধা আসে। পূজাতে সবাই নতুন জামা পরবে আর তুই পুর‍্যানা জামা পরে ঘুরবি?’’

‘‘নতুন জামা আমার আছে মা!’’

‘‘সেই নতুন জামা আর এই নতুন জামা এক হল!’’ মা বুঝতে একদমই নারাজ।

শেষে বলেই ফেলি, ‘‘তুমি আমাকে টাকা দাও। ওটা আমি কলকাতায় টিউশনের কাজে লাগাবো।’’

‘‘জামা কেনো,’’ আমার কথা শুনে মা অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্ট হলে মায়ের সম্বোধন তুই থেকে তুমিতে উঠে আসে। ‘‘টিউশনের টাকাও তোমাকে দেওয়া হোবে।’’

‘‘না পরে দেবে না তোমরা। বলবে পুজোতে অনেক খরচা হয়ে গেছে। এখন আর সম্ভব নয়।’’

আমার কথায় মায়ের অহং ঘা খায়। উনি খিঁচিয়ে ওঠেন, ‘‘হ, খালি বদনাম! টিউশনের টাকা কি প্যাস না তুই?’’ টাকা মায়ের হাতে থাকে না। মা শুধু সুপারিশ করে বাবার কাছ থেকে অন্যের জন্য টাকা আদায় করে দিতে পারেন।

‘‘কোথায় দিয়েছ টিউশনের টাকা! আমি আমার কাছ থেকে দিয়েছি, না হলে অন্যভাবে ম্যানেজ করেছি। গতমাসে সেজদা টাকা পাঠিয়েছিল।’’

‘‘ওই হল, প্যালি তো!’’

‘‘কীসের প্যালি তো! তুমি নিয়ে দিয়েছ কি? এত কথা বলছ যে!’’

তবু মা আমার কাছে হারেন না। আমি হেরে যাই তাঁর কাছে। দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে বালুরঘাট বাজারে গিয়ে জামা কিনি। পুজোর পরে যা ভেবেছিলাম তাই হয়। বাবার কাছ থেকে আমার টিউশনের জন্য টাকা আদায় করতে পারেন না মা। শেষে দাদার কাছ থেকে দেড়শো টাকা নিয়ে কলকাতায় ফিরি।

আমাদের থার্ড ইয়ারের শুরুতেই কলেজ থেকে আরেকবার এক্সকারশনে নিয়ে যাওয়া হবে ঠিক হয়েছিল। সেবারের প্ল্যান দিল দক্ষিণ ভারতে। আমি যে যেতে পারব না তা আমি আগে থেকেই জানতাম। যেতে পারব না মানে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না। টাকার অভাবে। চৈতালি, মণিকাকে আমি আমার অক্ষমতা জানিয়েও দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা মানতে চায়নি। বারবার বলেছে, ছোটদাকে বল, বাবাকে বল, ম্যানেজ হয়ে যাবে টাকা। বড় আশা নিয়ে ছিল দু’জন। আমিই বলিনি। বলতেই পারিনি।

শেষে যখন দেখল সত্যিই আমি দক্ষিণ ভারতে যাচ্ছি না ওরাও আর ডিপার্টমেন্টে টাকা জমা করল না। ওরাও গেল না। না গিয়ে আমার ওপর রাগ পুষে রাখল। কথা বন্ধ করল আমার সঙ্গে। তবু আমি টিউশন বন্ধ করলাম না। আমি ওদের

সঙ্গেই কসবাতে ধীরাদির ক্লাসে যেতে থাকলাম। আমরা একই সঙ্গে কলেজ থেকে শিয়ালদা স্টেশনে যাই, একই সঙ্গে ট্রেনে উঠি, একই সঙ্গে ট্রেন থেকে নামি, হাঁটিও একই সঙ্গে। একই রিকশাতে চড়ি, কখনও চৈতালি কোলে বসে, কখনও আমি, কখন মণিকা, পালা করে তবু দেখি দু'জন শুধু নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, পর করে দিয়েছে আমাকে।

অপুদাই বা কেমন! যেমন দাদা তেমন বোন। অপুদা আমাকে তুই বলে সম্বোধন করার অনুমতি নিয়ে ডুব মেরেছে। সেদিন শিয়ালদায় ট্রেন থেকে নেমে সেই যে আমরা আলাদা হয়ে গেছি, তারপর ভাইবোনের সূত্র ধরে আমাদের একবারও যোগাযোগ হয়নি। দ্বিতীয়বার তুই ডাক শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। অভিমান হয়েছিল। রাগও। রাগে ভাবছিলাম, প্রেমিক থেকে পরিবর্তিত দাদাকে আবার প্রেমিক বানিয়ে নিলে কেমন হয়? তাহলে অপুদার সঙ্গে রাস্তায় আমাকে পাশাপাশি হাঁটতে হবে, হাঁটতে হাঁটতে বসে যেতে হবে কোন রেস্তোরাঁয়। রেস্তোরাঁয় বসে সে চেয়ে থাকবে আমার দিকে, আমার চোখে খুঁজতে থাকবে অন্ধকারের জানা-অজানা ভালবাসা, নিংড়ে নেবে তা একটুখানি আয়তনে ঘনীভূত করে। তাতে আমার অস্বস্তি হবে, তার দিকে আমি আমার দৃষ্টি স্থির রাখতে পারব না, তাকিয়ে থাকব রেস্তোরাঁর কিচেনের দিকে, ভাবব কখন আসবে অর্ডার করা দু'কাপ কফি, খেয়ে উঠে পড়ব, পা রাখব হোস্টেলের গলিতে। পরদিন আবার দেখা হবে আমাদের। আমরা কোন পার্কে গিয়ে বসব। পাশাপাশি। সামান্য দূরত্ব রেখে। এক মিনিট অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই অপুদা সরে আসবে আমার কাছে। অতিক্রম করে নেবে সেই সামান্য দূরত্বকে। আমার কোল থেকে হাতটিকে উঠিয়ে নেবে নিজের হাতে। আমার অভিমান কোন বাধা মানবে না। চোখ থেকে জলের ধারা বইতে শুরু করবে।

অভিমান দেখে অপুদা বলবে, "আমি তোকে বোনের মতোই ভালবাসি।"

"তাহলে হাত ধরেছ যে?"

"কেন? দাদা হয়ে হাত ধরা কি পাপ?"

"পাপই তো।"

"তাহলে কি করব?"

"দূরে বসো।"

"আর?"

"আর আইসক্রিমওয়ালাকে ডাকো। আমায় আইসক্রিম খাওয়াও।"

তারপর আমার মাথাটা সামান্য ঝুঁকে যাবে অপুদার বিপরীত দিকে, অভিমান কবিতার ছন্দে সাজানো শব্দের রূপে বেরিয়ে পড়বে।

তুমি হাত ধরে গল্প করতে ভালবাস,
আমি দূরত্ব রেখে।
আমি সহোদর বিনা অন্য কারও কাছে বোনের স্নেহ চাই না।
তার কারণ আছে।
কারণ—সময়, মেলামেশা, পছন্দ-অপছন্দ, চাওয়া না চাওয়া, পাওয়া না পাওয়া

এবং মান-অভিমান-আত্মসম্মানের পরিপ্রেক্ষিতে হাত ধরার অর্থ পাল্টে যায়।

"একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

"কি?"

"প্রেমের নাটক করলি কেন?"

"দাদা হয়ে হারিয়ে গিয়েছিলে বলে।"

সময়, চাওয়া না চাওয়া, পাওয়া না পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধুত্বর রঙ পাল্টায় গভীরতা পাল্টায়, পুরো চেহারা তার পাল্টে যায়। বেশিদিন নয়, মাত্র দু'মাস আগের কথা। কলেজে দুর্গাপুজোর ছুটি পড়বে। আমি বাড়ি যাব। একমাস আমার সঙ্গে চৈতালি মণিকার দেখা হবে না। ওদের মন খুব খারাপ। আমারও। মন খারাপের বাহানাতে আমরা কয়েকদিন ধরে কলেজে এসে প্রায় সব ক্লাস ফাঁকি দিয়ে আড্ডা মারছি। তারপর সিরিয়াস, চাকরির জগতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখা মেয়েদের মতো ঘরে ফিরছি। ছুটির আগে কলেজের শেষ দিনটিতে আড্ডায় না গিয়ে আমি কমনরুমের টেবিল টেনিস বোর্ডের উপর উল্টো হয়ে শুয়ে আছি। সেই একইরকম মন খারাপ মন খারাপ ভাব। চৈতালি-মণিকা মেতে আছে কোন গোপন ষড়যন্ত্রে, হাসছে খিলখিল করে। ষড়যন্ত্রে সামিল হওয়ার অনুমতি আমার নেই। আমি জিজ্ঞেস করলেও জানাতে চায়নি। নিরুপায় আমি ঘুমিয়েই পড়ি। ওরা অনেকক্ষণ সময় নেয়। তারপর আমাকে কাতুকুতু দিয়ে জাগিয়ে একটা চিরকুট হাতে ধরিয়ে দেয়। তাতে লেখা আছে, "শ্রী চরণ কমলেষু বড়দা, বিজয়া দশমীর অগ্রিম প্রণাম নেবেন এবং বনানীর হাতে মিষ্টির টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন।"

"দাদা খুব গম্ভীর রে। টাকা চাইতে পারব না। শুধু তোদের হয়ে প্রণাম জানাতে পারব," করুণ মিনতি আমার।

"না, টাকা চেয়ে নিয়ে আসতে না পারলে কলকাতায় ঢুকতে দেব না। এসপ্ল্যানেড থেকে ফেরত পাঠাব।"

"কবে আসছি বললে তবে না।"

মণিকা বলে, "ও ঠিক জেনে নেব।"

আরেকটা চিরকুট পাই। তাতে লেখা আছে, "শ্রী চরণকমলেষু মেজদা, বিজয়া দশমীর অগ্রিম প্রণাম নেবেন এবং বনানীর হাতে মিষ্টির টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন।"

"কোন অসুবিধে নেই। পাঁচ দশ টাকা দিয়ে দেবে মেজদা।"

"পাঁচ দশ টাকা নেব না। পঞ্চাশ টাকা দিতে বলবি," ধমকায় মণিকা। চৈতালি চিঠিটা আমার হাত থেকে টেনে দেয়, "দাঁড়া তো, টাকার অ্যামাউন্টটাও লিখে দেব।"

নতুন চিরকুট লেখে সে পঞ্চাশ টাকার উল্লেখ করে।

তার পরের চিরকুট বলে, "শ্রী চরণকমলেষু সেজদা, বিজয়া দশমীর অগ্রিম প্রণাম নেবেন এবং বনানীর হাতে মিষ্টির টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন।"

"সেজদা ছুটিতে বাড়ি আসবে কিনা ঠিক নেই।"

"না এলে চিঠিটা সেজদার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবি," সুবুদ্ধি দেয় মণিকা।

পরের চিরকুট—"শ্রী চরণকমলেষু ছোটদা, বিজয়া দশমীর অগ্রিম প্রণাম নেবেন

এবং বনানীর হাতে মিষ্টির টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন।”

ছোটদা কলকাতাতেই থাকে। ওর সঙ্গে দেখা করে টাকা চাওয়ার সাহস নেই চৈতালি মণিকার।

ওরা দিদির উদ্দেশ্যেও চিঠি লিখেছে। মা-বাবার উদ্দেশ্যও। তাদের কাছে টাকা চাওয়া হয়নি। দিদি মেয়ে বলে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞেস করি, ‘‘মা-বাবার কাছে টাকা চাইবি না?”

‘‘ধেৎ, ওঁদের কাছে টাকা চাওয়া যায় নাকি!”

একগাদা চিঠিতে সুটকেস ভারি করে আমি বাড়ি যাই। চিঠি প্রথমে দাদাকে দিই। দেখি মহাকাশের কালোগর্ভে ঢুকে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চিঠি। মেজদার কাছে থেকে অনেক দরাদরি করে কুড়ি টাকা আদায় হল। সেজদার কাছে বিভ্রান্ত হয়ে আটকে রইলাম। চিঠি পড়ে সে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, ‘‘কত টাকা?”

‘‘পঞ্চাশ।”

‘‘পঞ্চাশ নিবি নাকি যা পার্সে আছে তাই নিবি?” মিনমিনে প্রশ্ন। বুকপকেট থেকে পার্স বের করে সে আমার সামনে ধরে।

‘‘কত টাকা আছে পার্সে?”

‘‘বলব না।”

এভাবে যে কেউ তার পকেটের সর্বস্ব আমার হাতে তুলে দিতে পারে তা আমার কল্পনার অতীত। লোভে দিশাহারা হয়ে জানতে চাই, ‘‘পঞ্চাশ টাকার কম আছে না বেশি আছে?”

‘‘কমও থাকতে পারে, বেশিও থাকতে পারে।” ‘কম’-এর ওপর কম এবং ‘বেশি’র ওপর বেশি জোর দেয় সেজদা। আমার মনের বিভ্রান্তি বাড়িয়ে দিয়ে আমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় মুচকি হেসে দাঁড়িয়ে থাকে, ‘‘বল। আমি তিন গোণা পর্যন্ত সময় পাবি।”

‘‘সময় দিয়ে দিয়ে গুণবি।”

‘‘এক...”

কি করি!

‘‘দুই...”

কি করি! আরে মন, কিছু তো বল কি করি।

‘‘তি...”

‘‘পার্স চাই আমি। পার্স।”

পার্স দিল সেজদা। দিয়ে বাবার ঘরে ঢুকে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। সমতলে গঙ্গার স্রোতহীন অংশের মতো অসম্ভব ধীর তার গতি, হিমালয় পর্বত চূড়ায় পদ্মাসনে সমাধিস্থ যোগীর মতো ঠাণ্ডা তার হাব-ভাব। আর এদিকে টাকার খনি হাতের মুঠোয় ভেবে আমার অবস্থা পর্বতের উৎসস্থল থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কলকল হলহল শব্দে বয়ে চলা জলতরঙ্গের মতো। জলতরঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হয়ে ঢুকে পড়েছে আমার শরীরে। বিদ্যুতের ঝটকায় কাঁপছে শরীর। হাতের আঙ্গুলও

কাঁপছে ঠকঠক করে। হাত থেকে টাকার ব্যাগ পড়ে যেতে যেতে যায় না। হাতের আঙুলের বন্ধনে তা রয়ে যেতে যেতে রয়ও না। আমি টিভির ঘরে দৌড়ে যাই। সেখানে বিছানার উপর ঢপ করে পড়ে ব্যাগ। ঠকঠক কাঁপতে থাকা আঙুল দিয়ে খুলে দেখি তাতে আছে মাত্র তিরিশ টাকা। কি ভীষণ ধোঁকা!

আমার মনে হয় চৈতালি-মণিকা আমাকে আরও বেশি ধোঁকা দিচ্ছে। এত কিছু করার পরেও, বাড়ি থেকে এত কষ্ট করে পঞ্চাশ টাকা উঠিয়ে দেওয়ার পরেও আজ সামান্য দক্ষিণ ভারতে যেতে পারছি না বলে আমার সঙ্গে কথা বলছে না। ভুলে গেছে উপকার। আগের মতো সরল নেই কেউ। জটিল হয়ে গেছে ওদের মন। কলেজে থিয়োরি ক্লাসে আমরা পাশাপাশি বসি। প্র্যাক্টিক্যালের সময় আমার ট্রে চলে আসে ঝিল্লী কিংবা স্তুতি কিংবা মহুয়ার পাশের টেবিলে। তবু সবাই জানে একইরকম আছি তিনজন, একটুও ভাঙন আসেনি আমাদের বন্ধুত্বে। বাইরে তো দূরের কথা, ক্লাসেও যে আমার সঙ্গে ওদের কথাবার্তা হচ্ছে না, প্র্যাক্টিক্যালে আমার স্পেসিমেন ছিঁড়ে গিয়ে জল ঘোলা হয়ে পড়ে থাকলেও তা নিয়ে ওদের মাথাব্যথা হচ্ছে না, ওরা দু'জন শুধু দু'জনেরটাই দেখছে তা সবাই বুঝেও যেন বুঝছে না। হয়ত এভাবেই চলত আরও কিছুদিন। চলতে চলতে রাজধানীর মেয়েগুলোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যেত আজীবনের জন্য। কিন্তু দাদা তাতে বাগড়া দেন। কলেজে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সেদিন মন খারাপ নিয়ে প্র্যাক্টিক্যাল করতে করতে কলেজের দোতলার অফিস থেকে ডাক পাই। নিচে নেমে দেখি দাদা দাঁড়িয়ে আছেন। আমি অবাক। বালুরঘাট কলকাতার দূরত্ব পাঁচ দশ কিলোমিটারের নয়, বালুরঘাট থেকে বারো-তেরো ঘণ্টা বাসে জার্নি করে কলকাতায় আসতে হয়। কলকাতায় এসে ওঠার মতো এক বড়মামা আরেক হোটেল ছাড়া আর কোন জায়গা আছে বলে আমার জানা নেই। দাদা কেন এসেছেন কোথায় উঠেছেন জিজ্ঞেস করলে উনি খোলাখুলি কিছু বলবেন না বলেই আমার বিশ্বাস তবু মন মানে না। জানতে চাই, ‘‘কলকাতায় কবে এলেন?’’

‘‘আজকেই।’’

‘‘হঠাৎ?’’

‘‘ওই স্কুলের ব্যাপারে একটা দরকার ছিল।’’

‘‘কোথায় উঠেছেন?’’

‘‘হোটেলে।’’

‘‘ফিরছেন কবে?’’

‘‘আজই।’’

এইটুকুই জিজ্ঞাস্য। অবিশ্বাস্যভাবে সবটুকুর উত্তর পাওয়া। দাদা বলেন, ‘‘চল কোথাও থেকে ঘুরে আসি।’’

আমি একপায়ে খাড়া। ক্লাসের যে সব মেয়েরা বাড়িতে থাকে অনেক গল্প করে আত্মীয়দের নিয়ে, তাদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া নিয়ে, ছুটিতে কোথাও ঘুরতে

যাওয়া নিয়ে। হোস্টেলে যারা থাকে তাদের সঙ্গেও নিয়মিত অনেক আত্মীয়স্বজন দেখা করতে আসে। তারাও বেরোয় তাদের সঙ্গে দূরে অথবা কাছে। এমন সুযোগ আমার আসে না। হোস্টেলে ছোটদাই আমার এক এবং একমাত্র নিয়মিত অতিথি। মামা শুধু খাতা কলমেই আমার স্থানীয় অভিভাবক। খাতা কলমে স্থানীয় অভিভাবক হয়ে তাঁদের কলঙ্ক হয়ে বসে আছেন উনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছোটদার মতো দায়িত্ববান কেউ যদি না থাকত তাহলে মা-বাবা দুলাল ঘোষের মতো এমন নির্বিকার লোকের ওপর তাঁদের মেয়ের দায়িত্ব সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। শুধু মাসে দু'মাসে তাঁর বাড়িতে এক দু'ঘণ্টার জন্য গিয়ে ঘুরে আসা যায়, তাও আবার বন্ধু-বান্ধব ছাড়া, একা।

দাদার প্রস্তাব পেয়ে আমি চল্লিশ সিঁড়ি দশ ধাপে পেরিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ডিপার্টমেন্টে ঢুকি। 'বি এম'কে বলি, ''ম্যাডাম আমি ক্লাস করব না। দাদা এসেছেন, অফিসের সামনে অপেক্ষা করছেন। ওঁর সঙ্গে বেরোবো।''

'বি এম' না বলতে পারেন না। কলেজে ক্লাসের মাঝখানে ক্লাস ছেড়ে যাওয়া যাবে না এমন কোন কড়াকড়ি নিয়ম নেই। আর থাকলেও আমার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হতে পারে না। আমি হোস্টেলে থাকা মেয়ে, চারশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে বাড়ি। আমি অবশ্য চারশো পঁয়ত্রিশ বলি না, পাঁচশো বলি, বেশি দূরে বলতে বেশি ভালো লাগে তাই। আমার দাদা যখন তখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারবেন না।

ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিলাম তাড়াতাড়ি। শুনি মণিকা চিৎকার করছে, ''কি রে তোর দাদা এসেছেন, আমাকে বললি না? আমিও যাব তোদের সঙ্গে।'' সেও প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

চৈতালি 'বি এম'কে বলে, ''ম্যাডাম, বনানীর দাদা এসেছে। আমিও চললাম।''

মুহূর্তে ঘটে গেল সব। বি এম ডায়াসের উপর মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখলেন ব্যাগ কাঁধে নিয়ে আমি হাঁটছি সবার আগে, অঙ্গ দুলিয়ে। আমার পেছনে মণিকা, তারও কাঁধে ব্যাগ, আমার পায়ের সঙ্গে তাল মেলানোর তালে পড়ে তার চলার গতি বেশ বেশি। মণিকার পেছনে চৈতালি, তারও কাঁধে ব্যাগ, চৈতালির দৌড়ব দৌড়ব অবস্থা। মেয়েরাও মুখ বেঁকিয়ে হজম করল আমাদের যাওয়া। প্র্যাক্টিক্যাল ট্রে পড়ে রইল অনাদরে। দাদাকে পরিচয় করিয়ে দিলাম চৈতালি ও মণিকার সঙ্গে। কলেজ থেকে বেরিয়ে ভালোই হাঁটছিলাম। কিন্তু থেমে গেলাম ওই রাস্তা পর্যন্ত গিয়েই। দাদা বোধহয় অস্বস্তি অনুভব করছিলেন ওদের সঙ্গে। তাই একটা একশো টাকার নোট আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ''কিছু কিনে খেয়ে নিস তোরা।''

''আপনি আসবেন না?''

''না আমার কাজ আছে।''

ভাবলাম একা না এসে ভুল করেছি। কিন্তু এটাও ঠিক যে দাদার জন্য ওদের সঙ্গে আমার পুনর্মিলন হল। শুরু হল আগের মতো সাবলীল মেলামেশা। চৈতালি বলল, 'চল, আমরা তন্দুরি রুটি খাব।'' উঠলাম ট্রামে। নামলাম শ্যামবাজারে। একশো টাকার পুরোটাই নাশ করে তবে হোস্টেলে ফিরলাম।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ

টাকার অভাবে ধীরাদির কাছে পড়তে যাওয়া আমার বন্ধ হল। চৈতালি, মণিকা যেতে থাকল সেখানে। আমি আলাদা হয়ে গেলাম ওদের থেকে। হোস্টেলেও দেখি মেয়েরা টিউশন পড়তে যায়। তপতী, দিব্যানি, সুমিত্রা সবাই। সুমিত্রা ঘাটালের মেয়ে। সর্বাণীও ঘাটালের। সেও বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ে সুমিত্রারই ক্লাসে। সেও যায় প্রাইভেট টিউটরের কাছে। সুতরাং ওদের সঙ্গে আমি সবসময় কথা বলতে পারি না। ওরা পড়তে গেলে আমি ওদের ফেরার অপেক্ষা করি। অপেক্ষা করতে করতে ভাবি ওরা বিষয়ের গভীরে অনেকটা বেশি ঢুকে পড়ছে। আমি পিছিয়ে থাকছি। কষ্ট হয় নিজের জন্য। ওরা ফিরে আমার সঙ্গে গল্প করলে মনে হয় না ঠিকই আছে সব, আমাদের মধ্যে ব্যবধান একটুও বাড়েনি। এই তো আগের মতোই কথা বলছে আমার সঙ্গে। আগের মতোই আমরা চপ খেতে বেরোচ্ছি হাতিবাগানে, জামাকাপড় কিনতে যাচ্ছি, সিনেমা দেখতে যাচ্ছি পুরবী, ছায়া, দর্পণা অথবা প্যারাডাইসে। আগের মতোই রুমে হইহুল্লোড় করছি, আগের মতোই হোস্টেলের মনুদার পেছনে পড়ছি, দোতলা, তিনতলার বারান্দার রেলিং-এর ওপাশটাতে মাথা ঝুলিয়ে চিৎকার করছি, ‘ও মেনুদা, মেনুদা, আজকের মেনু কি’ বলে। আমার প্রাইভেট পড়া বন্ধ হলেও বাকি সবকিছুই একই রকম চলছে। একই মেজাজে, একই তালে।

প্রতি মাসে দু’জন মেয়ের ওপর হোস্টেলের মেসের ভার পড়ে। যাদের ওপর ভার পড়ে তাদের কাছে মেয়েরা একশো টাকা করে জমা করে দেয়। মেস ম্যানেজারকে প্রত্যহ মনুদাকে সঙ্গে নিয়ে মানিকতলার সবজি-বাজারে যেতে হয়, মুদিখানায় যেতে হয়। মনুদা বাজার বহন করেন, সবজি কাটেন, চালডাল ধুয়ে দেন। এসব কারণে তাঁর কাছে রোজকার খাবারের মেনু থাকে। সেইজন্য মনুদার নাম হয়েছে মেনুদা। মেয়েরা ‘মেনুদা ও মেনুদা, মেনু দা ও মেনু দা...’ হাঁক ছাড়লে মোটামুটি পাঁচফুট আট কি নয় ইঞ্চি উচ্চতার কালো মোটা থ্যাবড়া মুখো, মাথা ভরা অগোছালো চুলের মোটাসোটা মনুদা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। উপরে মাথা ঘুরিয়ে মেয়েদের দিতে তাকিয়ে দিনের খাবারের মেনু এক নিঃশ্বাসে শুনিয়ে দেন, ‘‘ডাল ভাত লাউয়ের ঘণ্ট মাছের ঝোল চাটনি।’’ মনুদা অল্প কথার মানুষ। তাঁর সঙ্গে হেসে কথা বললে, গম্ভীর উত্তর পাওয়া যায়। রাগ দেখিয়ে কথা বললে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। রাগ দেখলেই বোবা হয়ে গজগজ করেন উনি। তাঁকে পাঁচটা কাজ করতে বলা হলে একটা করেন। চারটে ডিম কিনে নিয়ে আসতে বলা হলে দুটো নিয়ে এসে সেদ্ধ করে বসে থাকেন। কলেজ থেকে ফিরে যখন দেখি আমার ভাগের ডিম নেই, ইতিমধ্যেই দু’জন খেয়ে বেরিয়ে গেছে, যখন ক্লান্তিতে দোকানে যাওয়ার অবস্থা আর থাকে না তখন হতাশায় মনে হয় নিজেই মুরগির মতো পক করে একটা ডিম পেড়ে দিতে পারলে বেশ হত। বড় ঠাকুরের কাছে মনুদাকে নিয়ে অভিযোগ করলে আধময়লা ধুতিগেঞ্জি পরা বড় ঠাকুর কানাওয়ালা বড় টিনের থালা নিয়ে হইহই করে রান্নাঘর থেকে ডাইনিং টেবিলে ছুটে আসেন। থালার তলানিতে পড়ে থাকা ডাল থেকে

দু'হাতা উঠিয়ে পাতে ফেলে ফোকলা দাঁত নিয়ে ফকফক করে বলেন, ''দাল খাও, দাল খাও, মাথার চুল ঘন হবে।'' মুখ খিঁচিয়ে তাই-ই খাই। বড় স্নেহভরা ভাতের মাড় মেশানো বড় ঠাকুরের দেওয়া ডাল মাথায় না পৌঁছে অন্য কোথাও পৌঁছয়, সেখানকার চুল ঘন করে।

বোধ অনেক কম মনুদার। যেমন মাথা কম চলে তেমন কম চলে হাত পাও। মাঝে মাঝে আমাদের সিলিং ফ্যানের কার্বন ব্রাশ ক্ষয়ে যায়। ফ্যান বিনা কলকাতার গরমে এক মুহূর্ত চলে না। বস্তুত ফ্যান থেকেও চলে না। যতবার হোস্টেলের বাইরে যাই, ফিরে স্নান করি, রুমের স্টাডি চেয়ারটা টেনে জুড়ে দিই খাটের সঙ্গে, অতঃপর ভেজা অর্ধনগ্ন শরীরের অর্ধেকটা বিছানায় এবং অর্ধেকটা চেয়ারে ঢেলে দিয়ে ফ্যানের হাওয়ার স্পর্শ পাওয়ার চেষ্টা করি। সেই ফ্যানই যদি কার্বন অভাবে চলা বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে মনুদার তলব তো পড়বেই। আশা এই যে মনুদা ডাক শুনে ছুটে যাবেন দোকানে, ব্রাশ কিনে নিয়ে এসে ফ্যানে ফিট করে দেবেন অবিলম্বে। কিন্তু উনি তা করেন না। চিৎকার করে ডেকে ডেকে তাঁর কানে খবর ঢোকাতেই সময় লেগে যায় অনেক। তারপরে বিশ্লেষণ করতে হয় ফ্যান ঠিক করাটা কতটা জরুরি। মনুদা তবু বোঝেন না, অথবা বুঝেও তাড়াতাড়ি নড়তে চান না। জানি না বড় ঠকুরের ডালের কতটা তাঁর পাতে পড়েছে, কতটা তাঁর মাথায় জমা হয়ে চুল ঘন করেছে, কতটা ব্রেনে গেছে, কতটা গায়ে শক্তি জুটিয়েছে। কিন্তু মেয়েরা বেশ তাগড়া। শরীরে, মনে। মনুদা হেলে দুলে কার্বন ব্রাশ কিনে নিয়ে আসার অবসরে ফ্যান বেশ কয়েকবার মেয়েদের কাছে খাটের ডান্ডার বাড়ি খেয়ে ফেলে। বাঁকা হয়ে যায় তার ব্লেড। বাঁকা ব্লেড নিয়ে একটু ঘোরে, তারপর থেমে যায়। জানিয়ে দেয়, কার্বন ব্রাশ নিয়ে এসো, নতুবা আরও বেঁকে বসব, তবু নড়ব না।

পাশের রুমে, অর্থাৎ কৃষ্ণার উনিশ নম্বর রুমে দেখি ফ্যানের চারটি ব্লেডই নব্বই ডিগ্রিতে বাঁকা। বাঁকা অংশগুলো নব্বই ডিগ্রিতেই নিচের দিকে ঝোলা। ওই ফ্যানের আরও সমস্যা থেকে থাকবে। হয় কয়েল দুর্বল হয়ে পড়েছে, নতুবা ক্যাপাসিটার খারাপ, আর তা না হলে বিয়ারিং টাইট। না হলে সবই। ডান্ডার মতো চেহারা নিয়ে ডান্ডার বাড়ি লাগাতে কৃষ্ণা ওস্তাদ। একদিন দেখি ফ্যানের বিপরীত দিকের দুটো ব্লেড উধাও। কি করে এই দশা হল জানতে চাইলে কৃষ্ণা বলে, ''ভেঙে গেছে ব্লেড।'' খাটের নিচ থেকে ভাঙা ব্লেডগুলো বের করে দেখালো সে। তবু সুপারিন্টেনডেন্টের কাছে খবর পৌঁছায়নি কেন না তাতেও মেয়েদের হাওয়ার কোন সমস্যা হয়নি। ডান্ডা খেয়ে অর্ধেক শরীর হারিয়ে তিনশো ষাট ডিগ্রিতে তিনশো 'আর পি এম'-এ গুণ্ডার মতো ঘোরে ফ্যান।

উনিশ নম্বরের দেবারতির সঙ্গে আমার রুমমেট দিব্যানির খুব ভাব হয়েছে। দেবারতি মাঝে মাঝে আমাদের কুড়ি নম্বরে ঢুকে পড়ে। আড্ডা দিয়ে যায়। প্রাইভেট টিউটরের অভাবে বিষয় কঠিন লাগায় আমার এমনিতেই লেখাপড়ায় একাগ্রতা কম, তার ওপর বেঁচে থাকা একাগ্রতার সত্যনাশ করে যায় দেবারতি। দিব্যানির সঙ্গে তপতীরও বেশ মিল। আমি সবার মাঝখানে থেকেও আলাদা। হোস্টেলের বাইরে কাছে দূরে তনিমার

অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে। রুমের বান্ধবী নিয়ে তাই তার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। তাছাড়া মেলামেশার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অনেক বেশি কুশলী সে। যতটুকু সময় রুমে থাকে মনে কি আছে বুঝতে না দিয়ে মন খুলে কথা বলছে দেখায়। আমার চেয়ে অনেক পরিণত ওর মন। 'এই কথা বলব না যাঃ, এই আড়ি যাঃ' ভাব দেখিয়ে অথবা মুখ টেঁসিয়ে দিয়ে বসে থাকে না। দূরের, কাছের বন্ধুদের সঙ্গে তনিমার ডাক মারফৎ অথবা হাতে হাতে চিঠির আদানপ্রদান হয়। ফুলস্কেপ সাত আট পাতা জুড়ে লেখা চিঠি। সেসব চিঠি সে পড়ে শোনায় আমাকে। সেসব চিঠিতে ভাসা ভাসা কিছু কথা থাকে। যেসব কথার ধাপ ধরে চিঠির গভীরে নেমে গিয়ে ভালো লাগার চাদর উঠিয়ে নিয়ে আসা যেতে পারে, তার স্পর্শকে ত্বকের রোমকূপ থেকে চুইয়ে নিয়ে অন্তস্থ স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপিত করা যেতে পারে, ঘুমকে গভীর হতে না দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে সারা রাত। তনিমাও বড় বড় উত্তর লেখে সেসব চিঠির। পোস্ট করার অথবা হস্তান্তরিত করার আগে উত্তরগুলো পড়ে শোনায় আমাকে। উত্তরে একই রকম জিনিসের হাতছানি থাকে। তনিমার চিঠি আমার ভেতরের অবচেতন মেয়ে সত্তাকে জাগিয়ে দেয় একশো বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা রাজকুমারিকে সোনার কাঠি দিয়ে জাগিয়ে দেওয়ার মতো। আমার মেয়ে সত্তা চোখ মেলে, ধীরে ধীরে উঠে বসে, দাঁড়ায়, হাঁটে, তলাশ করতে চায় কোন বিপরীত লিঙ্গের যে আমাকে এমনই পত্রালিকা পাঠাবে, স্মৃতিশক্তি কম করে দেবে আমার, ভুলিয়ে দেবে স্থান কাল পরিবার।

আমার মেয়ে সত্তা বিপরীত লিঙ্গের তলাশ করতে চেয়েও বেশি এগোতে পারে না। কারণ, সে মূলত অন্তর্মুখী। তার এই অন্তর্মুখী চরিত্রের পেছনে দায়ী তার বাড়ির পরিবেশ। বাড়িতে তার স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ বছরের পর বছর ধরে বাধা পেয়ে এসেছে। বর্তমানে খাঁচাবন্দি বনের পাখির মতো হয়েছে তার অবস্থা। পাখি দীর্ঘদিন পাখা মেলার জায়গা পায়নি বলে ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। পাখিকে খাঁচার বাইরে ছেড়ে দিলে ওড়ার প্রয়াস করে, দু'চারটে ঝাপটা মারে, দু'চার ফুট উড়েও নেয়, কিন্তু তারপর আবার হেরে গিয়ে নেমে আসে সেই মাটিতেই।

মেয়ে সত্তার বেশি এগোতে না পারার আরেকটি কারণ আছে। উমাদি। উনি হোস্টেলে আমার স্বাধীনতা খর্ব করছেন, আমাকে দু'চার ফুটও উড়তে দিচ্ছেন না। তাঁর ব্যবহারে আমি পরিক্লিষ্ট। আমার জীবনে নতুন নতুন অনেক কেউ আসতে চাইছে। আমার সেই অনেক কেউ জোটে কলকাতা থেকে বালুরঘাটে এবং বালুরঘাট থেকে কলকাতায় বাসে সফরকালে। যারা একসঙ্গে সফর করে তাদের বেশিরভাগই দু'য়েকটা কথাবার্তা থেকেই আমার পরিচয় পেয়ে যায়। আমি তাদের কাছে বাবার এবং দাদাদের নাম গোপন করি না। সেই 'অনেক কেউ'-এর মধ্যে সেজদার বা ছোটদার বন্ধুরাও থাকে। তারা আমার হোস্টেলের ঠিকানা জেনে নেয়, চিঠি পাঠায়, কখনো আমার না চাওয়াকে উপেক্ষা করে হোস্টেলে দেখা করতেও আসে। একটা চিঠি পাওয়ার পরেই অথবা একটা সাক্ষাতের পরেই তাদের প্রতি আমি আমার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। তদের চিঠিগুলো বড় বেশি মধুমেশানো মনে হয়। তাতে যা

চাই তা পাই না। আমি চাই সেসব চিঠিতে ভাসা ভাসা কিছু কথা থাকুক, যেসব কথার ধাপ ধরে চিঠির গভীরে নেমে গিয়ে ভালো লাগার চাদর উঠিয়ে নিয়ে আসা যাবে, সেই চাদরে আপাদমস্তক মুড়িয়ে ফেলে ভালবাসার উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করা যাবে, সেই স্পর্শকে ত্বকের রোমকূপ থেকে চুঁইয়ে নিয়ে অন্তস্থ স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপিত করা যাবে, ঘুমকে গভীর হতে না দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাবে সারা রাত। কিন্তু তা হয় না। এরা সব সরাসরি ভালবাসা জাহির করতে চাওয়া মানুষের দলে। বিয়ে করে আমাকে তাদের গ্রামের বাড়ির রান্নাঘরে ঢোকাতে চাওয়া মানুষের দলে, রাজি না হলে কথার দংশনে মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে চাওয়া মানুষের দলে। একজন—গৌতম ঘোষ নাকি তার নাম, বটুনে নাকি তার বাড়ি, বাবার স্কুলে পড়া নাকি সেই ছেলে—বি এ পড়ে বি এড করে স্কুলে চাকরি পাওয়ার মুখে। বাসে গৌতম ঘোষ আমার সঙ্গে পরিমিত কথা বলে, চা আমার পছন্দ নয় জেনেও মালদায় জোর করে চা খাওয়ায়, মিষ্টি আমার পছন্দ জেনে কৃষ্ণনগরে রসগোল্লা খাওয়ায়, তারপর আমার ইচ্ছে নেই জেনেও জোর করে হোস্টেলের ঠিকানা নিয়ে এসপ্ল্যানেড থেকে চুপচাপ কেটে পড়ে। তখন বুঝিনি তার মনে এত কিছু ভাবনা তৈরি হয়েছে আমাকে নিয়ে। প্রথম চিঠিতেই বিয়ের প্রস্তাব। আমি কোন উত্তর দিইনি। দ্বিতীয় চিঠিতে পুনরাবৃত্তি প্রস্তাবের। তারও কোন উত্তর দিলাম না। তারপর হোস্টেলে এসে সরাসরি বিয়ের ইচ্ছে ঘোষণা। বলি, ‘‘তা কি করে সম্ভব! আমার তো পড়াশোনাই শেষ হল না।”

‘‘বিয়ের পরে পড়বে। চিন্তা নেই, আমি আছি।”

‘‘চাকরি করতে হবে।”

‘‘করবে চাকরি।”

‘‘আপনার বটুনে কি চাকরি পাব আমি?”

‘‘কেন? আমার মতো মাস্টারি করবে।”

‘‘দেখুন বিয়ের কথা আমি এখন ভাবছি না।”

ছেলেটি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বলল, ‘‘চলো বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।”

‘‘না না, আমার অন্য কাজ আছে।”

‘‘হোস্টেলে আবার কি কাজ?”

‘‘হোস্টেলে নয় বাইরে।”

‘‘বাইরে কোথায়?”

‘‘আছে কোথাও।”

‘‘তুমি কি প্রেম করো?”

‘‘আমাকে টিউশন পড়তে যেতে হবে।”

‘‘চলো, তাহলে একসঙ্গে বেরোই।”

‘‘আমি একটু পরে বেরোবো।”

নৃপেনদা ভ্রূ সংকুচিত করে কান পেতে দিয়েছেন ভিজিটরস’ রুমের দরজায়।

উনি নির্ঘাত শুনে ফেলেছেন আমাদের কথাবার্তা, বুঝেছেন যে কিছু তো গড়বড় আছে হিসেবে, এই ছেলেটি আমার আত্মীয় বা বন্ধুর পর্যায়ে পড়ে না। খবর আবার উমাদির কানে যাবে। উমাদি কোমরে আঁচল বেঁধে আমায় শাসন করতে নেমে পড়বেন। এমনিতেই আমি এখনও দাদাকে দিয়ে তার মেয়ের জন্য টপ আনিয়ে দিতে পারিনি। মেজদাকে বলেছিলাম। মেজদা শুনে আমার জন্য আম্বালা থেকে দুটো চুড়িদারের পিস কিনে বাড়ি যাওয়ার পথে হোস্টেলে এসে দিয়ে গেছে। সেজদাকে বলেছিলাম, সেজদা মিনমিন করে বলেছে, "উমাদিকে ছাড়, তোর কিছু দরকার আছে কিনা বল।" বুঝেছি উমাদিকে সে দেবে না। অযথা আমার সুযোগ কেন নষ্ট করি! তাই সেজদার কাছে টু পিস সোয়েটার চেয়েছিলাম। পেয়ে গেছি। সেটা দেখে উমাদি উন্মত্তপ্রায় হয়েছেন, "আমার জন্য একটা অর্ডার করো।" কলকাতায় তখন পর্যন্ত আমি তেমন সোয়েটার দেখিনি। দু'তিন মাস ধরে জিজ্ঞেস করে করে যখন উমাদি বুঝে গেছেন পাবেন না, আমার জন্য মুখের হাসিকে স্থায়ীভাবে তালাবন্ধ করে দিলেন।

"তুমি একটু পরেই এসো। আমি বাইরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি," নাছোড়বান্দা গৌতম ঘোষ।

নৃপেনদার হাবভাব সুবিধের নয় দেখে বলি, "আপনি বীডন স্ট্রিটের বাসস্ট্যান্ডের কাছে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। আমি আসছি।"

কতক্ষণ সে সেখানে অপেক্ষা করেছিল জানি না। কয়েকদিন পরে আমি তার একটা লম্বা চওড়া চিঠি পাই যার মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য লাইনটি ছিল—

"...তুমি আমাকে ভুলে গেলেও আমি তোমাকে ভুলব না। আজকে কথাটা বিশ্বাস করতে পারছ না। সময় এলে ঠিক বুঝতে পারবে..."

জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কিভাবে বোঝাবেন?"

"মুখে কিছু বলব না। বোঝালেই বুঝতে পারবে কিভাবে।" সঙ্গে একটি কবিতাও পাঠিয়েছিল—

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের প্রার্থনা করি
আকাশচুম্বী ওই গম্বুজটির কাছে,
যার চরম ঔদাসীন্য দিগন্ত বিস্তৃত,
ধূসর স্থবিরতাকে দিয়েছে বাড়িয়ে।
ভারি পর্দার ছিদ্র দিয়ে এক জটায়ু মেঘ
বছর ব্যাপী খরার পূর্বাভাস ঘোষণা করল।
বকেরা তাই আকাশ নিংড়ানো প্রণয়পূর্ণ উষ্ণতাকে পিঠে নিয়ে
অদৃষ্টের প্রাচীর অতিক্রম প্রয়াসী।

গৌতম ঘোষের চিঠিতে তনিমার বন্ধুদের চিঠির স্বাদ না পেলেও মনে হয়েছিল অন্ততপক্ষে একটা কবিতা তো পেলাম। বিয়ের প্রস্তাব এবং জোরাজুরির মাঝখান থেকে কবিতাটিকে উঠিয়ে নিই। মুখস্থ করি। ভাবতে চাই কবিতাটি আমাকে উদ্দেশ্য করে গৌতম ঘোষ নয়, অন্য কেউ লিখেছে। সে আমাকে ভালবাসতে চায়। কিন্তু কি করে উপস্থাপন করবে বুঝতে পারছে না। ভয় পাচ্ছে যদি প্রত্যাখ্যাত হয় তার

ভালবাসা। সে জানে না তার কাছ থেকে আমার, জটায়ু মেঘের এটাই কাম্য ছিল। তাই অবোধ সে একবার দেখা দিয়ে ভালবাসার পাপ স্বীকার করেই পশ্চাদপসরণ করতে চাইছে। কিন্তু আমি তা হতে দেব না। আমি আটকে রাখব তাকে গ্রহণের হাল্কা প্রতিশ্রুতি দিয়ে। অসম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি। দু'পক্ষ থেকে অঙ্গীকার বাড়তে থাকবে, খুব অল্প মাত্রায়। মাত্রা পূর্ণ হতে কেটে যাবে কয়েক বছর। তারপর হৃদয়ের চূড়ান্ত ভালবাসাটুকু বাঁধা পড়বে পরস্পরের কাছে।

তারপর—
আনন্দ আবেগ থেকে উঁকি মারবে অসহায় দুর্বল চোখ,
পাবক শিশুর ভীরু মিনতি মেশা পূর্ণাহুতি থাকবে সেখানে।
তারপর—
ধরা দিলে প্রেম পদতল থেকে বিচ্ছুরিত হবে শিশুর অবুঝ উচ্ছাস,
তমিস্রা শেষে পুনরায় শুরু হবে প্রভাতী লহরী।

বালুরঘাটে গেলে সেজোমামিমার কাছে কলকাতা থেকে বহন করা গল্পের ঝুলি নিয়ে বসি। আর বালুরঘাটে এমন কোন গল্প তৈরি হলে তা কলকাতায় মণিকা, চৈতালিকে শোনানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ি। গৌতম ঘোষের কথা শুনে সেজোমামিমা হা হা করে হেসে ফেলেন।

বলেন, ‘‘এই রূপু, তুমি এখন কলকাতা ছ্যাড়ে অ্যাসে বটুনের কলেজে ভর্তি হোব্যা?’’

‘‘বটুনে আবার কলেজ আছে নাকি?’’

‘‘তাই তো! তালে বালুরঘাট কলেজে অ্যাসবা?’’

‘‘কি যে বলো আবোল তাবোল!’’

মামিমা আমার বাঁ হাতটা খপাৎ করে নিজের হাতের মধ্যে নেন। নেলপেন্ট পরা আঙ্গুলগুলো মেলে ধরেন। নরম করে বলেন, ‘‘কি সুন্দর আঙ্গুল! কি সুন্দর হাত তোমার! এই হাত দিয়ে তুমি বটুনে য্যায়ে ভাত রান্না করব্যা?’’

‘‘ইশ্, তোমাকে বলেই ভুল হয়েছে।’’

এমনই একবার বাসে কলকাতায় আসার পথে বালুরঘাটের এক ক্লাসমেটের সঙ্গে দেখা। ক্লাসে তার সঙ্গে কোনদিন আমার কথা হয়নি। বাসে হল। দু'বছরের কথা এক রাতে হল। কলকাতায় কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ হল। ঠিকানার আদানপ্রদান হল। কলকাতাতেই থাকে সে তবু ডাক মারফৎ বেশ কিছু চিঠির দেওয়া নেওয়াও হল। একবার বালুরঘাটে থাকাকালীন এক বৃষ্টিভেজা সকালে আমি ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম। অনেক গল্পশেষে আমাকে আমাদের বাড়ির দিকে কিছুটা এগিয়ে দিয়েছিল ছেলেটি। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে প্রেম প্রেম ভাবের প্রকাশ করেছিল। নিজেরই লেখার উদ্ধৃতি টেনে। প্রশংসা করেছিলাম ‘ভালো কবিতা লিখিস’ বলে।

সে বলেছিল, ‘‘তবু লিখতে ইচ্ছে করে না।’’

"কেন?"

"পড়ার লোক নেই।" আবার বলেছিল, "আমার গান শুনতে খুব ভালো লাগে। রাতে মান্না দে না চালিয়ে না দিলে ঘুম আসে না।"

"তাই বুঝি?"

"তখন খুব কষ্ট হয়।"

"কেন?"

"মনে হয় পাশে কেউ থাকলে ভালো হত।"

"হোস্টেলে তো অনেক বন্ধুই আছে। কাউকে সঙ্গে নিয়ে নিলেই পারিস।"

"না, বিশেষ কাউকে চাই।"

শরীরে একটু শিহরণ খেলে গেল। মনে হল বিশেষ কাউকে বলতে সে আমাকেই বোঝাতে চাইছে।

সে বলল, "আমার খুব গান শিখতে ইচ্ছে করে।"

"শিখতেই পারিস।"

"শিখেই বা কি করব!"

"গাইবি গান।"

"শুনবে কে?"

মনে হল গানের জগতে তার যাত্রার সা রে গা মা থেকে শুরু করে রাগ ভৈরবী, পল্লবী, ইমন, বেহাগ সব আমাকেই শোনাতে চায় সে।

তার পরের কথা, "ভাবছি সানাই শিখব। রাতে আর মান্না দে চালাবো না। নিজে সানাই বাজিয়ে ঘুমোতে যাব।"

তার কথা শুনে আমার কানে ওস্তাদ বিসমিল্লা খানের সানাই-এর খাম্বাজ ধুন বেজে ওঠে। আগুন জ্বলছে। আগুনের একপ্রান্তে সে, আরেক প্রান্তে আমি। দূর থেকে ভেসে আসছে সেই ধুন, আমাদের মধ্যেকার ব্যবধান ঘোচাতে চাইছে।

তার সানাই শেখার ইচ্ছেতে উৎসাহ জোগাতে চাই আমি। কিন্তু কোন কাজ হয় না। সে বলে, "না, শিখব না। সানাই শোনারও লোক নেই রে।"

"তাহলে ঘুরে বেড়া।"

"কার সঙ্গে ঘুরব? সঙ্গী একজন ছিল, সে-ও তো আজ চলে যাচ্ছে।"

সেই রাতে আমারই কলকাতায় ফেরার কথা। তাই মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে সে আমাকেই চাইছে। ছেলেটি আমাকে বাসস্ট্যান্ডে সী অফ করতে এসেছিল। তার সঙ্গে আমার বিশেষ ভুল বোঝাবুঝি ছিল না। মাঝে মাঝে আমার চিঠি লিখতে দেরি হত, অথবা চিঠিতে একটু আধটু অভিমানের কথা থাকত এই যা। বাস ছাড়তে কিছু দেরি ছিল। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের। সে করুণ স্বরে আমায় বলেছিল, "চিঠি দিতে দেরি করবি না, রাগারাগি করবি না আমার সঙ্গে। ভীষণ কষ্ট হয় আমার। বুঝিস না কিছু?"

তার কাছে আমি ভাসা ভাসা ভালবাসার চিঠির আশা করেছিলাম। ভেবেছিলাম ক্লাসমেট হওয়ায় আমার সঙ্গে তার নিশ্চয় অনেক মিল থাকবে। কিন্তু চিঠিতে শুধু

একদিনের কয়েকটি লাইন ছাড়া আর কিছু তনিমাকে শোনানোর মতো পাইনি। সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমার সিনেমা দেখতে ভালো লাগে কিনা। আমি বলেছিলাম, লাগে। সে জিজ্ঞেস করেছিল, কি ধরনের সিনেমা ভালো লাগে। যদিও তখন সদ্য দেখা ঝুটি সিনেমায় রেখার মিথ্যে কথা বলার দক্ষতায় অভিভূত ছিলাম, অপেক্ষা করছিলাম এমন আরও কয়েকটি সিনেমা রিলিজ হওয়ার, ওকে বলেছিলাম রোম্যান্টিক মুভি দেখতে পছন্দ করি। আমার কথা শুনে আমার রুমমেট তপতী হেসেছিল, ‘‘ঝুটি দেখে এসে তুই-ই তো ঝুটি হয়ে গেলি রে!’’

যাই হোক, আমার মতো ঝুটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে পরের চিঠিতে লিখেছিল, ‘‘জানিস রোম্যান্টিক মুভির নায়কের চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে সিনেমা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে, যদিও জানি এসব শুধু সিনেমাতেই চলে। বাস্তবে এমন নায়কসুলভ আচরণ করতে যাও, জনসাধারণ ঠেঙিয়ে বদভ্যাস ছুটিয়ে দেবে।’’ ছেলেটি ভাবুক ছিল। তার ভাবনার বেশি প্রকাশ ছিল কথাবার্তায়। চিঠি কাঠখোট্টা। চিঠি মনে প্রেম জাগায় না। সেই রাতে বাসস্ট্যান্ডে সে আমার বিশ্বাসকে পাকা করে দিয়েছিল যে আমার প্রতি তার অনুভূতি বন্ধুত্বকে ছাড়িয়ে ঘনিষ্ঠতার দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, সেখান থেকে ফিরে আসা কষ্টকর। পরে অবশ্য তেমন কিছু মনে হয়নি। যদি সত্যিই তাই হত তাতে আমারও হয়ত আপত্তি থাকত না।

সে আমাকেও গান শিখতে বলেছিল। আমি বলিনি যে শোনার লোক নেই। আমার গান শেখার ইচ্ছে বাবার ইচ্ছের সঙ্গে মেলেনি, তাই শেখা হয়নি। এখন আমি হোস্টেলে, বাবার অগোচরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা আমার আছে, তবু সম্ভব নয়। টাকার অভাব। তাছাড়া হোস্টেলে হারমোনিয়ম বাজিয়ে চিৎকার করার অনুমতি নেই। এমনি জোর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাও, নজরুলগীত গাও, আধুনিক, লোকগীত, পল্লীগীত, পপ, জ্যাজ গাও, গেয়ে স্নান করো, বাথরুমের দেওয়াল ফাটিয়ে দাও, কেউ অভিযোগ করবে না। বাথরুমের বাইরেও গাও, অন্যরা বড়জোর একটু বিরক্ত হবে, নতুবা পাগল বলবে তোমাকে কিন্তু হারমোনিয়ম বাজানো চলবে না। হারমোনিয়মের সঙ্গে গাইলেই নিয়মভঙ্গকারী অপরাধী বলে গণ্য হবে। কেবল হারমোনিয়মই নয়, কোনই বাদ্যযন্ত্র হোস্টেলে ঢোকানো যাবে না। তবু আমি ঢুকিয়েছিলাম। এক ভোরে বালুরঘাট থেকে সেতারটা নিয়ে এসে আমার বিছানার একপাশে লম্বালম্বিভাবে শুইয়ে দিয়েছিলাম। অনতিবিলম্বে সুপারিন্টেনডেন্টের কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছিল। উনি ছুটে এসেছিলেন। পিলে চমকে ওঠা গলায় ফিসফিস করেছিলেন, ‘‘বনানী, কি নিয়ে এসেছ এখানে! তুমি জানো না...’’

‘‘আমি এখানে বাজাবো না।’’

‘‘তাহলে নিয়ে এসেছ কেন?’’

‘‘সৌমিত্র লাহিড়ীর বাড়ি নিয়ে গিয়ে বাজাবো।’’

‘‘উনি কে?’’

‘‘সেতার বিশারদ।’’

বালুরঘাট ছাড়ার আগে আমার সেতারের মাস্টারমশায় পুলক নিয়োগীর কাছে

বিদায় নিতে গেলে উনি আমাকে সৌমিত্র লাহিড়ীর ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন, ‘‘সেতারটা বন্ধ করো না। ভালো বাজানোর হাত তোমার।’’ হোস্টেলে অনুমতি নেই বলে এবং টাকার সমস্যার জন্য একবছর কিছু ভাবতে পারিনি। টাকার সমস্যার জন্য টিউশন পড়াও বন্ধ হয়েছে। এবার মরিয়া হয়ে উঠেছি। কিছু তো একটা করতেই হবে।

সুপারিন্টেনডেন্ট থরথর বুক নিয়ে মুখ চাপড়ান, ‘‘তা হোক, ইউনিভার্সিটি বোর্ড অফ রেসিডেন্সে খবর গেলে...ইশ্...।’’

আমি ওনাকে শান্ত করার চেষ্টা করি, ‘‘আপনি শুধু শুধু ভয় পান। কেউ এখানে খোঁজ নিতে আসছে না।’’

‘‘উমা জানতে পারলে...’’

উমাদিকে নিয়ে আমার চাইতেও বেশি চিন্তা সুপারের। ওঁর ধারণা উমাদি স্পাই-এরও কাজ করেন।

‘‘তুমি সেতারটা অন্য কোথাও রাখার ব্যবস্থা করো,’’ অর্ডার অনুরোধের রূপে পেশ করেন উনি।

অন্য কোথাও বলতে এক ছোটদা। ছোটদা আমার কাছেই থাকে। আগে মাত্র কয়েক দিনের জন্য দূরে ছিল। আমাদের কৃষ্ণার সঙ্গে সেই বন্ধুত্বপূর্ণ র‍্যাগিং জাতীয় ঘটনার পরের ঘটনা—ছোটদার র‍্যাগিং হয়েছে। সে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এস সি করে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে এম টেকে ভর্তি হয়েছিল। কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে। হোস্টেল পেয়েছিল বালিগঞ্জে। পেতেই সিনিয়রদের শিকার। আমাকে খোলাখুলি বলেনি, তবে ওর বন্ধুদের মুখে শুনেছি মুরগি করতে করতে খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল সিনিয়র ছেলেগুলো। একটা নগ্ন মেয়ের ছবি দিয়ে বলেছিল, ‘‘এর সঙ্গে সঙ্গমে যাও।’’ কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছে সে। ছেলেগুলো ধমকেছিল র‍্যাগিং-এর কথা বাইরে ফাঁস করলে আর যেন হোস্টেলে ফিরে না আসে। তাই করেছিল ছোটদা। কলেজে এসে আর হোস্টেলে ফেরত যায়নি। ফাঁস করে দিয়েছিল র‍্যাগিং-এর কথা। সংবাদপত্রে বেশ কিছুদিন মাতামাতি হল এ নিয়ে। ইউনিভার্সিটি বোর্ড অফ রেসিডেন্স সেক্রেটারি ছোটদাকে ডেকে বললেন সে তার পছন্দমতো হোস্টেল বেছে নিতে পারে। ছোটদা বেছেছে রাজাবাজারের পি জি হোস্টেল। সেখানে ওর প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্লাসমেট সুদীপ্তদাও আছে।

সেতার আমি ছোটদার হোস্টেলে রাখব কি রাখব না সে নিয়ে পরে ভাবব। আগে সৌমিত্র লাহিড়ীর মাইনে জোগাড় করতে হবে। একদিন ঠিকানা খুঁজে হাতিবাগানে টাউন স্কুলের কাছে তাঁর বাড়িতে গেলাম। দেখা করে এলাম তাঁর সঙ্গে। মাইনে জিজ্ঞেস করে জানলাম একশো টাকা।

বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছিলাম হোস্টেলের বাইরে মুদিখানার দোকানে ডিম, আলু, তেল কিনতে গেলে একটা ছেলে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য উসখুস করছে। চেহারায় আর্থিক প্রাচুর্যের ছাপ নেই। আশপাশের কোন অলিগলির মধ্যেই থাকে মনে হয়। আগে কখনও প্রশ্রয় দিইনি। এখন দিলাম। জানতে চাইলাম আমার সঙ্গে তার কথা বলতে চাওয়ার উদ্দেশ্যটা কি। সে বলল সে আমাকে দিদি বলে

ডাকতে চায়। ছেলেটি আমার থেকে বয়সে অনেকটা বড়। তবু রাজি হয়ে গেলাম। প্রেম তো সে করতে চায়নি। নাম তার চন্দনী। মেয়েদের নাম চন্দনা হয় জানি। চন্দনার পুংলিঙ্গ হল চন্দন। চন্দনা এবং চন্দনের মাঝামাঝি এসে চন্দনী কোথায় আটকে গেল বুঝতে পারলাম না। তবু নামটি মেয়েদের মতোই লাগে। কলেজ স্ট্রিটে বই কেনার নাম করে একটা দোকানে বাংলা ডিকশনারি খুলে দেখেছি চন্দনী কোন নদীর নাম হতে পারে অথবা চন্দন-গন্ধ কোন আতরের নাম হতে পারে। যে যেটা নিতে পছন্দ করবে। চন্দনী নামের আড়ালে আমি কখনোই কোন পুরুষাঙ্গ দেখি না। তবু চন্দনী নামের এই মানুষটি ছেলে। ডাকতে ইচ্ছে করে না ওই নামে। তবু ডাকি। বলি, ‘‘চন্দনী, তুমি কি আমাকে একটি টিউশন দিতে পারবে?’’

‘‘আপনি কি নিয়ে পড়েন?’’ জিজ্ঞেস করে সে।

‘‘সায়েন্স।’’

‘‘কিসে অনার্স?’’

‘‘জুওলজি।’’

‘‘আমার জানাশোনা কোন জুওলজির টিচার তো নেই দিদি।’’

‘‘না না, আমি পড়তে চাই না। পড়াতে চাই।’’

‘‘ও আচ্ছা। দেখছি দিদি।’’

চন্দনী আমাকে টিউশন দিল। ঠিকই ধরেছি। হোস্টেল থেকে বেরিয়েই ডানদিকের একটা গলিতে সে থাকে। নানা জায়গায় ফাটলধরা প্রায় ঝুরঝুরে একটি বাড়ি। বাড়ির পরিধি আমার জানা নেই। দু’পাশে অন্য বাড়ির সঙ্গে সেঁটে যাওয়া দেওয়াল, অথবা কমন দেওয়াল। বাড়িতে কতগুলো ঘর আছে তারও অনুমান লাগাতে পারি না। একটি ঘরের সামনে একটি খোলা জায়গা, ঠিক বারান্দা নয় তা, সেখানেই পড়াতে বসি। আমার স্টুডেন্টস দু’জন। একজন ছাত্র এবং একজন ছাত্রী। ছাত্র ক্লাস থ্রিতে পড়ে, ছাত্রী নাইনে। ছাত্রকে সব বিষয় পড়াতে হয়, ছাত্রীকে বিজ্ঞান এবং অঙ্ক। সপ্তাহে তিনদিন যাই, দু’শো করে পাই। চন্দনী বলে ছেলেটি তার ভাগনে, মেয়েটি বোন। আমার অবশ্য তা মনে হয় না। আমার মনে হয় এসবই আলাদা আলাদা ঘর থেকে উঠিয়ে নেওয়া পাতানো সম্পর্ক। সম্পর্ক তৈরি হয়েছে পাশাপাশি থাকার কারণে। ঘর আলাদা হলেও ছেলেমেয়েদুটির মধ্যে মিল রয়েছে। লেখাপড়ায় দুটোই খারাপ এবং ছেলেটির চাইতে মেয়েটি বেশি খারাপ, বেশি বছর নষ্ট করার কারণে।

দুটোকে পড়িয়ে আমি সেতারের টাকা জোগাড় করতে থাকি। সৌমিত্র লাহিড়ীর ক্লাসে সেতার বহন করে নিয়ে যাই। ওখানে যা বাজানোর বাজিয়ে আসি। হোস্টেলে বোবা হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে সেতার। হোস্টেলে এর মধ্যে আমার রুমও পাল্টে ফেলি। কুড়ি নম্বর রুম থেকে যাই তিন বেডের ষোলো নম্বর রুমে। সেখানে কালিয়াগঞ্জের একটি মেয়ে থাকে। নাম শবরী। কালিয়াগঞ্জ বালুরঘাটের কাছে বলে, কালিয়াগঞ্জ এবং বালুরঘাট পশ্চিম দিনাজপুরের শহর বলে ওর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। আমার চাইতে এক বছরের সিনিয়র সে। ওকে আমি শবরীদি বলে

ডাকি। শবরীদি ভালো গান গায়। সে কারণেই হোস্টেলের অনেক মেয়ে ওকে পছন্দ করে না। সে তার রুমেরই থার্ড ইয়ারের একটি মেয়ের প্রিয় ছিল। তার নাম ছিল শর্মিলা, অর্থাৎ শর্মিলাদি। শর্মিলাদি চলে যাওয়ার পর শবরীদি একা হয়ে গিয়েছিল। ষোলো নম্বর রুমের আরেকটি মেয়ে, রূপম, যে কিনা শবরীদির ব্যাচমেট, তবে বিষয় আলাদা, কলেজ আলাদা, তার সঙ্গেও বেশি ভাব ছিল না তার। আমি ছোট হয়ে শবরীদির রুমে থাকতে গিয়েছি তার একাকীত্ব দূর করতে। শবরীদি ভালো গান গাইলেও আমি দেখেছি হোস্টেলে কোন অনুষ্ঠান হলে তাকে কেউ গান গাইতে বলে না। গান গাইতে বলা হয় তাদের যারা গান না শিখে গায়িকা হয়েছে। শবরীদি চুপ করে বসে থাকে। শোনে না সাধা গলার গান। আমিই বলি, শবরীদি একটা গান গাও না, গাও না গান। আমার আবদার শুনে পরে দু'য়েকজন মিন মিন করে বলে গাও গাও। তখন গান ধরে শবরীদি। তার গলার ক্লাসিকাল মিউজিকের অদ্ভুত কারুকার্য স্তব্ধ করে দেয় সবাইকে। বুঝতে পারি তদের ভালো লাগছে, এতটাই ভালো লাগছে যে তার গান গাওয়ার প্রতিটি মুহূর্ত তারা গানের জন্যই সঁপে দিয়েছে, অন্য কোন কথা ভাবতেই পারছে না। তবু গান শেষ হলে দেখি গানের প্রশংসা করছে না কেউ। আমি শবরীদির রুমমেট হতে পারার গর্ব অনুভব করি। শবরীদির সঙ্গে একই জেলার বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে আত্মীয়তা গড়তে পারার জন্য বুক ফুলে ওঠে আমার।

আমি থার্ড ইয়ারে পৌঁছনোর আগেই পার্ট টু-এর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে শবরীদি আমাকে ছেড়ে চলে যায়। যাওয়ার আগে একটা ডায়েরি উপহার দেয়। ডায়েরির প্রথম পাতায় লেখা থাকে, ''বনানী, জানি না এই ক'দিনে তোর মনের কাছাকাছি আসতে পেরেছি কিনা। পারলে জানিস, এটাই আমার তোর কাছে একমাত্র চাওয়া ছিল।'' খুব আবেগপূর্ণ কথা। পড়ে আমার কান্না এসে যাওয়া উচিত। কিন্তু আসেনি কান্না। শবরীদি চলে যাওয়ায় মন খারাপ হয়েছে নিঃসন্দেহে, কান্নাও পেয়েছে, কিন্তু ওই লেখা পড়ে আমার চোখ জলে ভরেনি। কারণ সেই লেখাতে যে আবেগ ছিল তা সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। একই কথা শর্মিলাদিও ডায়েরিতে শবরীদির জন্যে লিখে রেখে গেছে। কি জানি, হয়ত শর্মিলাদিও আরও সিনিয়র অন্য কোন দিদির কাছ থেকে পেয়ে থাকবে। শবরীদি যাওয়ার আগে আমায় একটি গানও শুনিয়েছে,

আজা রে পরদেশী,
ম্যায় তো কব সে খাড়ি ইস পার,
বে আঁখিয়া থক গয়ী পন্থ নিহার,
আজা রে পরদেশী...

মধুমতি মুভির গান। লতা মঙ্গেশকরের গলায় বৈজয়ন্তীমালা গেয়েছে। আগেও অনেকবার শুনেছি। কিন্তু সেই রাতে গানটি আরেকবার একান্তভাবে আমার জন্য গেয়ে শবরীদি আমাকে এক অসম্ভব ভালো লাগা দিয়েছে।

ভয়ঙ্কর প্রেম

বালুরঘাটে পুলক নিয়োগীর কাছে আমি সেতারে অনেকগুলো রাগ শিখে ফেলেছিলাম। যেমন ইমন কল্যাণ, দুর্গা, বিলাবল, ভূপালি, খাম্বাজ, ভৈরবী। সৌমিত্র লাহিড়ী তা জেনেও আমাকে আবার নতুন করে শেখাতে শুরু করেন সব। উনি ইমনের নতুন স্থায়ী লিখে দিলেন, নতুন অন্তরা লিখে দিলেন, নতুন তোড়া। নতুন নতুন আলাপ তৈরি করে বাজাতে সাহায্য করলেন। নতুন নতুন তোড়া তৈরি করতে সাহায্য করলেন। সৌমিত্র লাহিড়ীর কাছে আমার থিয়োরি ক্লাসও শুরু হল। তখন মোবাইল ছিল না, ইন্টারনেটের কোন ধারণা ছিল না। যা কিছু শেখা, যা কিছু জ্ঞান অর্জন করা বই পড়ে, গুরুর মুখে শুনে। পুলক নিয়োগী বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। উনি কম কথা বলতেন, নিজে বেশি বাজাতেন না, হাত কাঁপত। কখনও বাজিয়ে দেখানোর প্রয়োজন হলে মেয়েকে ডাকতেন। মেয়েটি আমার চেয়ে অনেকটা বড়। বাবার কাছেই সেতারের তালিম নিয়েছেন। বাবার হয়ে উনিই বাজাতেন সেতার যাতে করে আমার পাঠ নিতে সুবিধে হয়। পুলক নিয়োগীর বিপরীতে সৌমিত্র লাহিড়ী অনেকটা কম বয়সি। সবেমাত্র বিয়ে করে সংসার জীবনে পা রেখেছেন। তাঁর একটি সরলচিত্ত স্থূলাঙ্গী স্ত্রী এবং একটি বছর দু'য়েকের ফর্সা কোঁকড়ানো কালো চুল ও গোলাপি ঠোঁটের মিষ্টি ছেলে আছে। উনি উচ্চতায় বেশি না হলেও দেখতে সুন্দর, দিনের আঠারো ঘণ্টা সেতার বাজিয়ে এবং বাকি ছ'ঘণ্টা সেতারের ধ্যানে কাটিয়ে দেন, মাঝে মাঝে সেতার নিয়ে, সেতার বাজিয়েই বিদেশ ভ্রমণ করেন। সৌমিত্র লাহিড়ী হলেন প্রয়াত সঙ্গীতার্য সুশান্ত লাহিড়ীর ছেলে। উনি ছেলেবেলায় গিটারও শিখেছিলেন। তারপর বড় হতে হতে পণ্ডিত গোকুল নাগ এবং গোকুল নাগের পুত্র মনিলাল নাগের কাছে সেতারের হাত পাকা করেন।

সৌমিত্র লাহিড়ীর গিটার শেখার কথা আমি জেনেছি অন্য একজনের কাছে। তার নাম কমল কর। সে ওঁর কাছে গিটার শিখতে আসত। সুদক্ষ হাতে সৌমিত্র লাহিড়ীর সেতারের সঙ্গে সঙ্গে একই স্থায়ী বাজাত, একই অন্তরা, একই তোড়া, একই ঠুমরী, একই ঝালা এবং আমার মনে হত বাজাতও একই পারদর্শিতায়। মনে হত যদি সে গিটার এতটাই ভালো বাজায় তাহলে কি শিখতে আসছে এখানে? আমি ওর হাতের আঙ্গুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মোহিত হয়ে যেতাম ওর একাগ্রতা দেখে।

সৌমিত্র লাহিড়ী আমার হাতে কি দেখেছেন জানি না, যাঁরা যাঁরা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাঁদের সবাইকে আমার হয়ে করুণ মিনতি করেন বিনে ভাড়ার একটা ঘর খুঁজে দেওয়ার জন্য যেখানে বসে আমি মনের সুখে যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ সেতার প্র্যাকটিস করতে পারব। বলতেন, "মেয়েটির দারুণ হাত জানেন? অথচ হোস্টেলে প্র্যাকটিস করার অনুমতি পায় না।" সৌমিত্র লাহিড়ীর বাড়িতে আমি যখন যাই তখন অনেক শিষ্য থাকে না। সেখানে সেইসব দিনে আর মাত্র দুটো ছেলে থাকে। দু'জনই আমার চেয়ে ছোট। দু'জনই আমার চেয়ে ভালো বাজায়। ক্ষুদ্র সেতার পারদর্শীর সামনে পণ্ডিতের মুখে নিজের এমন প্রশংসা শুনে আমি লজ্জিত হই। আমার জন্য ঘর খোঁজার কথা সৌমিত্র লাহিড়ী কমল করকেও বলেন।

সেদিন সন্ধের পর—তখন রাত আটটা না হলেও সাড়ে সাতটা তো হবেই, কারণ আমি একটু বেশিই চিন্তিত ছিলাম অনেকক্ষণ আগেই হোস্টেলে নাম ডাকা হয়ে গেছে বলে। ট্রাম থেকে নেমে আজ আবার উমাদির খপ্পরে পড়তে হবে ভাবতে ভাবতে দ্রুত পদক্ষেপে এগোচ্ছিলাম অভেদানন্দ রোড ধরে। একটু গিয়ে বাঁদিকের রাস্তাটা নেব। সেই রাস্তা ধরে খানিকটা গেলে আসবে হোস্টেলের তিন ফুট চওড়া গলি। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে হল কাঁধের উপর নিঃশ্বাস ফেলে কেউ আমায় আদেশ করছে, ‘‘দাঁড়াও।’’

বিদ্যুতের মতো ঝটকা খেয়ে পেছন ফিরতেই দেখি কমল কর।

‘‘তোমার ঘরের দরকার?’’ জিজ্ঞেস করে সে। আম কি উত্তর দেব ভেবে পাই না।

‘‘আমার একজন পরিচিত আছেন। তার বাড়িতে অনেকগুলো ঘর এমনিই পড়ে থাকে। তাকে বলে দেখব,’’ বলেই সে জানতে চায়, ‘‘কোথায় চাইছ? সোদপুরের দিকে নাকি শ্যামবাজারের দিকে?’’

বুঝতে পারলাম না। সে একবার বলছে তার একজন পরিচিত আছেন, তাকে বলে দেখবে আবার বলছে কোথায় আমি ঘর পেতে পছন্দ করব—কেন! আমি যদি সৌমিত্র লাহিড়ীর বাড়ির পাশেই চাই ঘর তাহলে কি তার সেই পরিচিত তাঁর ঘরটা তুলে নিয়ে সেখানে বসিয়ে দেবেন?

‘‘দেখুন আমাকে এখনই হোস্টেলে ফিরতে হবে। এমনিতেই রাত হয়ে গেছে।’’

‘‘কোথায় তোমার হোস্টেল?’’

‘‘এই এদিকেই আছে,’’ বলেই থমকে দাঁড়াই। মনে হয় হাঁটতে থাকলে সে আমার সঙ্গে হেঁটে হোস্টেলের ঠিকানা জেনে যাবে।

কমল কর বলল, ‘‘সতিই রাত হয়ে গেছে। চলো তোমাকে হোস্টেলে পৌঁছে দিই।’’

‘‘তার দরকার হবে না। আমি একাই চলে যেতে পারব।’’

‘‘পারবে জানি। তবু...’’

‘‘অন্যদিন স্যারের ক্লাসে কথা হবে।’’

‘‘কিন্তু, বললে না যে কোথায় ঘর চাও তুমি!’’

‘‘পরে। আজ ফিরতে দেরি হলে বিপদে পড়ব।’’ তবু কমল কর নড়ে না। আমার সেতার বাজানোর হাতের তারিফ করে, ‘‘খুব সুন্দর বাজাও।’’

‘‘প্লীজ, এখন আমি আর এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারব না।’’

চলে যায় সে। ছেড়ে দেয় আমায়, কিন্তু সেদিনের মতো। পরদিন আবার আমার পিছু নেয়। সৌমিত্র লাহিড়ীর ক্লাসে আমার প্রতি যেন কোন আগ্রহই নেই এমন অভিনয় করে, ক্লাসের বাইরে আগ্রহের বাড়াবাড়িতে গায়ের ওপর ঝেঁপে পড়ে। সৌমিত্র লাহিড়ীর আমার জন্য ঘর খুঁজে দেওয়ার আবেদনকে অবলম্বন করে প্রতিদিন কমল কর আমি ক্লাস থেকে বেরোনোর পরই বেরিয়ে আসে, আমায় রাস্তায় ধরে ফেলে। সত্যি মিথ্যে জানি না সে নাকি আমার জন্য সোদপুরের তার সেই পরিচিতের

বাড়িতে একটি ঘরের ব্যবস্থা করেও ফেলে। কিন্তু আমি সেখানে যেতে প্রস্তুত নই। অনেক দূর সোদপুর। কমল কর বলে, "ঠিক আছে শ্যামবাজার, হাতিবাগানে দেখছি কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।"

কমল কর একদিন বিকেলে আমার হোস্টেলে হঠাৎ এসেও পড়ে। বন্ধু দীপঙ্করকে নিয়ে। নৃপেনদার হাঁক শুনে নিচে গিয়ে দেখি ভিজিটরস' রুমে বসে আছে তারা। নৃপেনদার চোখের বাঁধ না মানা কৌতূহলের স্পর্শ গায়ে নিয়ে আমি ভিজিটরস' রুমে তাদের মুখোমুখি বসি। মনে চূড়ান্ত অস্বস্তি, দরজার বাইরে নৃপেনদার উঁকিঝুঁকি। উমাদিকেও দেখলাম ডিউটিতে এলেন। আমাদের দিকে একবার কুঞ্চিত ভ্রূ নিয়ে দৃষ্টিপাত করে ভেতরে গেলেন। নৃপেনদাও গেলেন ভেতরে। আমি দুই অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত অতিথির সঙ্গে সাক্ষাৎকাল লম্বা করতে চাইলাম না। বললাম, "আপনারা বাইরে যান, আমি আসছি।" বুঝতে পারলাম ছেলেটি এত সহজে আমায় ছাড়বে না। বাইরে কাছেই এক রেস্তোরাঁয় আমরা গেলাম এবং সাধারণ দু'য়েকটি কথার পরে আমি ফিরে এলাম। ছেলেটির সঙ্গে আমার আরও বেশ কয়েকবার সৌমিত্র লাহিড়ীর ক্লাসেই দেখা হল, আরও বেশ কয়েকবার সে ক্লাস থেকে বেরিয়ে ঘর দেওয়ার বাহানায় আমার পিছু নিল। কিন্তু বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা স্পষ্ট করে বলল না। সে কিছু না বলুক, আমার মন বলে উদ্দেশ্য তো আছেই। উদ্দেশ্য কি হতে পারে তাও আমি বুঝি। কোন ছেলের পাশে হাঁটতে খারাপ লাগে না যদি সে বন্ধুত্বের পরিষ্কার প্রস্তাব নিয়ে সামনে আসে। যে কারও সঙ্গে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে প্রেমিক গোছের হাবভাব দেখলেই মনে যতসব অশান্তি শুরু হয়।

আমি বরাবরই একটু উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বিয়ের কথা গভীরভাবে না ভাবলেও যদি কখনো মনে উঁকি মেরেছে কল্পনা করেছি সেই মানুষটি কেমন হবে। কল্পনা করতে কতক্ষণ? মানুষের মনের গতি আলোর গতির চেয়েও বেশি। মনের অক্ষমতা শুধু একটাই। মনের চোখ নেই যে চোখ দিয়ে সে দূরের কাছের কোন বস্তুকে দেখতে পাবে। সেই চোখ থাকলে মন দূরদূরান্তরে অন্য কোন সূর্যের চারপাশে কোন কোন গ্রহ ঘুরছে, তাদের মৃত্তিকায় অথবা অন্য কোন পদার্থের স্তরে কোন কোন জীবন হেঁটে বেড়াচ্ছে, না ভেসে বেড়াচ্ছে, না হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে, নাকি শূন্য খাঁ খাঁ পড়ে আছে সেইসব স্তর দেখতে পেত। বিজ্ঞানীদের এত অধ্যবসায় করে, এত পরিশ্রম করে এত শক্তিশালী দূরবীন বসানোর প্রয়োজন হত না। আমার কল্পনার মানুষটিও হলেন একজন বিজ্ঞানী যিনি মনের প্রতিবন্ধকতাকে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল দিয়ে অতিক্রম করার চেষ্টা করছেন, চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানের জগতে এক নজিরবিহীন অবদান রাখার। এই বিজ্ঞান হল মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান এবং সেই বিজ্ঞানী হলেন একজন মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানী। মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানী ছাড়া অন্য মানুষকে নিয়ে আমি আমার জীবন নরকে দেখব। কমল কর ভালো গিটার বাজায়, হয়ত একদিন ওকেও লোকজন পণ্ডিত কমল কর বলে জানবে, তা হোক, আমার ওকে পছন্দ নয়। যারা বোবা হয়ে প্রেম প্রেম ভাব নিয়ে চলে তাদের তো আমার একদমই সহ্য হয় না। আর 'তোমাকে

ভালো লাগে' অথবা 'তোমার সঙ্গে প্রেম করতে চাই' বলে যারা দুর্বলতা জাহির করে তাদেরকে আমি ভয় পাই, মনে হয় তারা আজ আমার কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করছে, কাল আরেকজনের কাছে করবে।

আমি কমল করের কাছ থেকেও চিঠি পেতে থাকি, নিয়মিত। চিঠিতেও ওই একই ভাব। বলি অথচ বলিও না, বোঝাই অথচ বোঝাইও না। এই ধরনের চিঠি ভয়ংকর হয়। হ্যাঁ বলে দিলে ওদিক থেকে না-ও হয়ে যেতে পারে। বলতেই পারে আমি তো সেরকম কিছু বোঝাতে চাইনি। বালুরঘাটের ছেলেটির সঙ্গে এমন হয়েছিল। তাকে আমার প্রেম করার জন্য একদম অনুপযুক্ত মনে হয়নি। কিন্তু কমল করের ব্যাপারটা প্রথম থেকেই একেবারেই অসহনীয়।

একজন দু'জন করে আমার কাছের মানুষের সংখ্যা বেশ ভালোই হয়েছে। রোজ বিকেলে অনেকগুলো করে চিঠি আসে। একই নাম বারবার ডাকতে ডাকতে নৃপেনদার মুখে যেমন ব্যথা ধরে, হোস্টেলের মেয়েদের কানেও তেমন জ্বালা ধরে। ‘‘বনানী শিকদারের কত চিঠি আসে দেখেছিস?’’ বলাবলি করে ওরা।

একদিন দেখি কমল করের বন্ধু দীপঙ্কর হোস্টেলে এল। একা। বলল, ‘‘চলো, একটু বাইরে বেরোই।’’

জানতে চাই কারণ।

‘‘কিছু জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে।’’

ভাবলাম, যে কথা কমল কর আমায় বলতে পারছে না হয়ত সেই কথা সে বন্ধুকে দিয়ে বলাতে চাইছে। *ঠিক আছে যা হবার আজই হয়ে যাক।* রাজি হলাম। দীপঙ্কর আমাকে নিয়ে কোন রেস্তোরাঁয় বা পার্কে গেল না। সে হাঁটালো আমাকে। অনেকক্ষণ। মানিকতলা, রাজাবাজার, ফুলবাগানের রাস্তায়। ঘণ্টাখানেক হাঁটিয়ে অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বলে অবশেষে আমার ভাবনা মতোই বন্ধুর কথায় এল। বলল, ‘‘কমলের তোমার প্রতি দুর্বলতা আছে।’’

‘‘কিন্তু আমি তো এমন কিছু অনুভব করিনি!’’

‘‘এতদিন অনুভব করোনি। এখন করো।’’

আশ্চর্য! অনুভব করো বললেই অনুভব করা যায়! আর তা যদি যায়ও ওর প্রতি এমন দুর্বলতা অনুভব করতে যাব কোন সুখ পেতে! ‘‘ইচ্ছে নেই।’’

‘‘ছেলেটি ভালো।’’

‘‘হতে পারে।’’

‘‘তাহলে?’’

‘‘তাহলে আর কি!’’

‘‘তুমিও তো সেতার বাজাও। তোমরা একই লাইনের লোক।’’

‘‘আমি শখে সেতার শিখি। সেতার বাজানোকে আমি পেশা হিসেবে নিতে চাই না।’’

‘‘শখে শিখলেই বা। কমল তোমার সেতার প্র্যাকটিসের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করে দেবে।’’

‘‘প্রয়োজন নেই।’’ ওকে বলি না যে ছোটদার হোস্টেলে আমি ইতিমধ্যেই সেতার

রাখার ব্যবস্থা করে নিয়েছি।

"ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে তুমি তাই করবে। কিন্তু রাজি হয়ে যাও। তুমি না বললে ওর খুব অসুবিধে হবে।"

"ভারি অদ্ভুত তো! আমি কি লোকের সুবিধে করার জন্য কলকাতায় এসেছি!"

"না, তা ঠিক বলতে চাইনি। দেখো চেষ্টা করে।"

দীপঙ্কর ধীরে ধীরে অসহনীয় হয়ে উঠতে থাকে আমার কাছে। একবার জানিয়েছে বন্ধুর ইচ্ছে, আমি বলে দিয়েছি সম্ভব নয়। হল! এত বোঝানো কেন? বন্ধুর হয়ে এত তরফদারিতে আমার ভেতরের রাগি পাথরটা গরম হয়ে যায়। সেখান থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসে। বলি, "ব্যস, এব্যাপারে আপনার আর কোনও উপদেশ শুনতে চাইছি না। আপনি আসুন। বন্ধুকে বলে দেবেন আমার সঙ্গে আর যেন যোগাযোগ না করে।"

বন্ধু ফিরে যেতেই কলম করের ফোন পাই। "তোমার নাকি দীপঙ্করকে ভালো লেগেছে?" শুনে আমি আকাশ থেকে পড়ি। সঙ্গে রাগে গাও রি রি করতে থাকে, "হ্যাঁ এতটাই ভালো লেগেছে যে একটা বিশেষ উপহার তাকে দিতে চাইছি।"

"কি উপহার?"

"একটা চড়।"

সেদিনই আরেকটা ফোন পেলাম। দীপঙ্করের। "তোমার হোস্টেলে আসব।"

"কেন?"

"চড় নিতে।"

আমার না চাওয়া স্বত্ত্বেও পরদিন দীপঙ্কর কমল করের সঙ্গে হোস্টেলে হাজির হল। ভিজিটরস' রুমে বসে গাল বাড়িয়ে দিল সে, "দাও, চড় দাও।"

দীপঙ্করের সাহস দেখে আমি হতবাক। মনে সাহস জোগাই এই ভেবে যে দুর্বল হয়ে পড়লে আমার চলবে না। অন্যায় তো কিছু আমি করিনি। আমি না 'কমল কর'কে সৌমিত্র লাহিড়ীর ঘর থেকে বেরিয়ে অনুসরণ করেছি, না ওর প্রেমে পড়েছি, না বান্ধবীকে দিয়ে ওকে পাওয়ার জন্য আমার ভেতরে কিছু হচ্ছে বলে খবর পাঠিয়েছি, না আমি ওকে ফোনে মিথ্যে বলেছি যে কমল কর নাকি আমার বান্ধবীর প্রেমে পড়েছে।

বলি, "চড় আমি ফোনেই তো দিয়ে দিয়েছি। আবার আলাদা করে এখানে খেতে আসার কি প্রয়োজন ছিল? খিদে কি মেটেনি?"

"খুব সাহস তোমার!"

"আপনার সাহস দেখে নিজের সাহস বাড়াতে হয়েছে।"

"কি করেছি আমি?"

"সেটা আপনার বন্ধু এবং আপনি ভালো জানেন। দেখুন আপনারা আমাকে বিরক্ত করা বন্ধ করুন। তা না হলে এবার সৌমিত্র লাহিড়ীর কানে সব কথা পৌঁছে যাবে।"

সুড়সুড় করে বেরিয়ে যায় কমল কর এবং কমল করের বন্ধু।

বিজ্ঞানচেতনা এবং আমি

কলেজ এবং হোস্টেলের দিনগুলো বেশ আমোদ-আহ্লাদে, সিনেমা নাটক থিয়েটার দেখে কাটছিল। এর মধ্যে ছোটদা এক সমস্যা খাড়া করল। একবার বাড়ি গিয়ে মাকে বলল, ‘‘ওকে আমি যে উদ্দেশ্যে কলকাতা নিয়ে গিয়েছিলাম তার তো কিছুই হল না।’’

মেজদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল ছোটদার কথা। সে বলল, ‘‘মানে বুঝলাম না।’’

‘‘মানে আর কি! আমি ভেবেছিলাম চিন্তাভাবনা, পছন্দ-অপছন্দ পাল্টাবে, সাজগোজ কমবে। কিন্তু কই হল!’’

ছোটদা ঠিকই বলেছে। কলকাতায় গিয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা, পছন্দ-অপছন্দ কিছুই পাল্টায়নি। কিছুই আমি পাল্টাতে দিইনি। বরং সেগুলোকে ঘষামাজা করে আরও ঝকঝকে করেছি। যেসব চিন্তাভাবনা, পছন্দ-অপছন্দ মনের কোণে ভয় পেয়ে বসে ছিল সেগুলোকে সাহস দিয়ে বলেছি সামনে এসো, আর যেসব চিন্তাভাবনা, পছন্দ-অপছন্দ জীনের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল, লুকিয়ে ছিল সেগুলোকে জাগিয়ে দিয়েছি, টেনে বের করেছি তাদের সব গোপন জায়গা থেকে, দিয়ে বলেছি খোলো চোখ—সমাজ-সংস্কৃতি, ভালো-খারাপের আয়নায় দেখো নিজের মুখ, এ জীবন দ্বিতীয়বার পাবে না, এভাবেই কি মরে যাবে নিজেকে না জেনেই?

হাতের নখ বড় করে তাতে নেলপেন্ট পরার ফ্যাশন আমি গার্লস স্কুল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিখে নিয়েছিলাম। তখন লিপস্টিক পরারও অভ্যেস তৈরি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সম্ভব হয়নি। কারণ হলেন বাবা। দিদির বিয়েতে উনি আমার ঠোঁটে লিপস্টিক দেখে যাদের জন্য লিপস্টিক পরা তাদের সামনেই বলেছিলেন, ‘‘দেখসো, রঙ লাগায়ে ঠোঁটগুলান কেমন বানরের পাছার মতো লাল কোরসে!’’ লজ্জা লজ্জা! ঠোঁটে লিপস্টিক পরাতে মায়ের কোন আপত্তি ছিল না। মা বলেছিলেন, ‘‘হঃ, শুদু উল্টাপাল্টা কথা!’’ কিন্তু তাতে কি আর লজ্জা যায়! লজ্জা বানরের পাছা হয়ে ঠোঁটের উপরে বসে গেছে। সাবান লাগিয়ে ঠোঁট সাদা না করা পর্যন্ত ওটা ওখানেই থাকবে। ঠোঁট সাদা করলেও তার উপর পাছা কতখানি ছাপ রেখে যাবে কে জানে!

কলকাতায় এসে আমি নতুন জনসাধারণের সামনে আবার লিপস্টিক পরা শুরু করলাম। ভুলে গেলাম লিপস্টিক পরার লজ্জাকর পূর্ব ইতিহাস। কাজল তো চোখকে কখনই ছাড়েনি। কাজলের সঙ্গে আমার চোখের অটুট বন্ধন। কলকাতায় হাতওয়ালা ব্লাউজ পরতে ভালো লাগে না। শাড়ি পড়লে হাতকাটা ব্লাউজ চাই-ই-চাই।

ছোটদারা কয়েকজন বন্ধু মিলে ‘বিজ্ঞান চেতনা’ নামে একটি বিজ্ঞান সংগঠন তৈরি করেছিল। পরে অবশ্য সংগঠনের সদস্য সংখ্যা অনেক বেড়েছে। তারা বস্তিতে পড়ানো, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ইত্যাদি সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করত। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মূলত যে প্রোগ্রামগুলো হত তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট নাম দেওয়া হয়েছিল—অলৌকিক নয় নিছক ম্যাজিক। তাদের মতে সাঁইবাবা যে সমস্ত

কাণ্ডগুলি দেখিয়ে মানুষের মধ্যে বিস্ময় উৎপাদন করতেন, অনুরাগীদের কাছে নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন সেসব ম্যাজিক ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন শূন্য থেকে বিভূতি আনা, জল থেকে মদ তৈরি, শূন্যে মানুষ তোলা, আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, আগুন খাওয়া ইত্যাদি। এসব খেলা 'বিজ্ঞান চেতনা'র সদস্যরা শিখে নিয়েছিল। তাদের গুরু ছিলেন বি প্রেমানন্দ, কেরালার র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাহসী সদস্য। প্রেমানন্দ তাঁর ছোটবেলা থেকেই সাহসী ছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে। আব্রাহাম কভুরের অনুগামী ছিলেন তিনি। কভুরের বক্তব্য—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অতীতে না কেউ কখনও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল না বর্তমানে কেউ আছে। ১৯৬৩ সালে উনি ঘোষণা করেছিলেন যদি কেউ তার কিংবা অন্য কারও মধ্যে অলৌকিকতা আছে বলে প্রমাণ করতে পারে তাহলে তাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ১৯৭৮-এ কভুর মারা গেলে বি প্রেমানন্দ কভুরের বিখ্যাত চ্যালেঞ্জ নিজের কাঁধে তুলে নেন। পরিবার থেকে বেরিয়ে গিয়ে জীবনের অনেকগুলো বছর বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে থেকেছেন বি প্রেমানন্দ, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের আশায় নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, অতঃপর জীবনের পরম সত্যটা বুঝেছেন। সত্যটা হল—সব ভুয়ো, অলৌকিক বলে এজগতে কিছু নেই। ব্রহ্মসৃষ্ট এই অণ্ডায় যা কিছু এযাবৎ ঘটেছে, যা ঘটছে বর্তমানে তার পেছনে বৈজ্ঞানিক কারণ অবশ্যই আছে। অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে যা ঘটবে তারও পেছনে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক কারণ থাকবে। বিজ্ঞানই হল আমাদের চরম এবং পরম শক্তি। সুতরাং বিজ্ঞানকেই ভালো করে বুঝতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানকে বোঝার সচেতনতা নেই। হয়ত কঠিন লাগে। তাদের বেশিরভাগই অজ্ঞ থাকতেই বেশি পছন্দ করে। তাতে পরিশ্রম কম। তাদের অজ্ঞ থাকার এই পছন্দকে হাতিয়ার করে অল্প কিছু মানুষ তাদের ওপর নিজেদের স্বল্প জ্ঞান ও ভুয়ো রটনা দিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে।

বি প্রেমানন্দ একবার আমাদের বালুরঘাটের বাড়িতে গিয়েছিলেন। প্রেমানন্দের বাংলা জানার কোন প্রশ্নই নেই। দক্ষিণ ভারত থেকে উঠে আসা মানুষ, হিন্দিও পারেন না। শুধু ইংরেজিতে সড়োগড়ো। আমাদের অবস্থা আরও করুণ। আমরা দক্ষিণ ভারতের না হয়েও হিন্দি থেকে সাত মাইল দূরে। বাবা বিশুদ্ধ ইংরেজিতে মোটামুটি স্বচ্ছন্দ—বিশুদ্ধের মানে হল বিশুদ্ধ, বাংলার 'ওহে কর্ণধার তব তরণী লইয়া আইস'র মতো। তাঁর ইংরেজিতে টেন্স, মুড, জেড়াণ্ড একটুও এদিক ওদিক হওয়া চলবে না। আমাদের ভাইবোনদের ইংরেজির দৌড় সিলেবাসের প্রশ্ন-উত্তর মুখস্থ করার চেষ্টা দিয়ে শুরু এবং ভুলভাল বাক্য মুখস্থ করাতে শেষ। ছোটদাকে দেখছিলাম ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি বলছিল। তবু আমার চেয়ে ভালো।

বারো বছর বয়সে প্রেমানন্দ ইংরেজদের বিরুদ্ধে গিয়েছেন। বড় পুরষ্কার পেয়েছেন তার জন্য—স্কুল ছাড়ার নোটিশ। স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়ে ঘরে এমন শিক্ষা পেলেন উনি যে সত্য সাঁইবাবার সবথেকে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। প্রেমানন্দ বলেন, "অনেকের

মতে ঈশ্বর দেখার জিনিস নন, অনুভব করার জিনিস। কোথায়! আমি অনেক চেষ্টা করেছি অনুভব করার। পাইনি তো! তাহলে কি আমার সেই মন নেই!” আমার তখন গোপালভাঁড়ের সেই গল্পের কথা মনে পড়ে—গোপালভাঁড় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বললেন, মহারাজ আমি আপনাকে এমন একটা জিনিস উপহার দেব যা আপনি পৃথিবী খুঁজে আর কোথাও পাবেন না।

রাজার মহা কৌতূহল—কি জিনিস?

গোপালভাঁড় কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দিলেন এক কৌটো ছাই।

রাজা দেখে বেজায় ক্ষিপ্ত—এত স্পর্ধা তোমার...

—মহারাজ, রুষ্ট হবেন না। কৌটোর ছাই-এর দিকে তাকিয়ে দেখুন ঈশ্বর আপনার সামনে।

কৃষ্ণচন্দ্র তাকালেন—কোথায়?

—সে কি! দেখতে পাচ্ছেন না? ওই তো, আপনি এদিকে দাঁড়িয়ে দেখুন। আহা, আচ্ছা এভাবে দেখুন তো। আশ্চর্য! স্বয়ং ভগবান আপনার দিকে তাকিয়ে হাসছেন মহারাজ।

—আমার সঙ্গে তামাশা! সান্ত্রি ওকে এখনই শূলে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দাও।

গোপালভাঁড় এবার গম্ভীর—মহারাজ আপনি আমাকে দোষী করবেন না। ঈশ্বর দর্শনের সৌভাগ্য আপনার নেই। সেই চোখ তিনি আপনাকে দেননি।

বিজ্ঞান চেতনা যেখানে প্রোগ্রাম করত সেখানে সেখানকার অনুরাগী-অনুরাগিণীদের নিয়ে ওয়ার্কশপ হত। এভাবে অনেক জায়গাতেই অনুরূপ সংগঠন গড়ে উঠেছিল। আমি কয়েকদিন ‘বিজ্ঞান চেতনা’র মিটিং-এ গিয়েছিলাম। খুব দুর্বোধ্য লেগেছে ওদের আলাপ আলোচনা। নিজেকে আরও বোকা মনে হয়েছে যখন দেখেছি আমারই সমান কয়েকটি ছেলেমেয়ে আসরে দিব্যি জমে গেছে। তারা প্রেসিডেন্সি এবং অন্যান্য কলেজের ছাত্রছাত্রী। তাদের মধ্যে সঞ্জয় ছিল, প্রভাস ছিল, আমিতাভ ছিল।

প্রেমানন্দের দীক্ষায় দীক্ষিত ‘বিজ্ঞান চেতনা’র ছেলেমেয়েরা যখন ‘সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিং’-এর মন্ত্র মুখে নিয়ে ট্যাঁকট্যাঁক করে কলেজ স্ট্রিটের প্রান্তে প্রান্তে এমনকি গ্রামেগঞ্জে যেমন বর্ধমান, টাকি, শ্যামনগরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে, বিজ্ঞানপ্রেমী হয়ে গর্বে ফুলিয়ে দিচ্ছে মা-বাপের বুক তখনও আমি হাতে নেলপেন্ট এবং ঠোঁটে লিপস্টিক একইভাবে চালিয়ে যাচ্ছি। আমার শুধু আমাতে ছাড়া আর কোনকিছুতে কোন সচেতনতা নেই। আমি ওদের সিম্পল লিভিং অথবা হাই থিঙ্কিং কোনটিরই নাগাল পাচ্ছি না। নাগাল পাই না। ওদের চেহারা এতটাই চাকচিক্যহীন যে অনেককে দেখে আমার ভিখারিই মনে হয় এবং আমার বিশ্বাস আমার হোস্টেলে ছোটদার বান্ধবী সুস্মিতাদি ছাড়া বাকি সব মেয়েদেরও তাই-ই মনে হবে। চৈতালি মণিকার তো মনে হবেই। ছোটদার অবশ্য অন্যরকম বক্তব্য—আমাকে যদিওবা কখনো সখনো পাতে ফেলা যায় আমার হোস্টেলের বান্ধবীদের ফেলা যায় না, চৈতালি মণিকাকে তো একদমই নয়। ওই দুটো পিস বাড়িতে থেকে ন্যাকার চূড়ান্ত হয়েছে, ওদের নিয়ে কোন গল্প শুনতে

ছোটদার কোনই আগ্রহ নেই। 'বিজ্ঞান চেতনা'য় পুষ্ট মেয়েগুলো আমার মতো কাজল লিপস্টিক নেলপেন্ট পরা তো দূরের কথা হাতের নখও বড় করে না। চুল পরিপাটি করে বাঁধা তো দূরের কথা ভালো করে আঁচড়ায়ই না চুল। ওরা ঢিলেঢালা পোশাক পরে স্নো, পাউডার, বোরোলিন, শোভোলিন ইত্যাদি প্রসাধনের নাম অথবা আমলা, ঘৃতকুমারী, ক্যান্থারাইডিন হেয়ারওয়েলের নাম কস্মিনকালেও শোনেনি এমন একটা ভাব দেখিয়ে উশকোখুশকো চেহারা নিয়ে কাঁধে অতি লম্বা হাতলের সাইড ব্যাগ ঝুলিয়ে আড্ডা দেয়। কিছুতেই তাদের দেখতে সুশ্রী লাগা চলবে না। উত্তাল যৌবনে যখন অন্য মেয়েরা কেউ-ই নিজেকে বিশ্বসুন্দরীর চেয়ে কম সুন্দরী বলে মনে করতে চায় না তখন 'বিজ্ঞান চেতনা'র মেয়েরা যেন এক অঘোষিত বিশ্বকুৎসিত প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। মুখে কিছু বলে না। শুধু বুঝে নিতে হয়। যে যত নিজের রূপ নিয়ে উদাসীন থাকবে তাকে তত বেশি বুদ্ধিমতী মানা হবে, তার চিন্তাধারা তত বেশি উন্নতমানের বলে বিবেচিত হবে। তাদের পোশাকে আমি কখনও কোন আধুনিকতার ছোঁয়া যে দেখি না তা নয়, কখনও যে চিরাচরিত শাড়িকে ছুটি দিয়ে তারা চুড়িদার বা সালোয়ার গায়ে চড়ায় না এমনও নয়, তবু বাইরের ভাবটা এরকম যে আমি সালোয়ার পড়েছি কিন্তু তোমরা আমার পোশাকের দিকে নজর দিও না। লং স্কার্ট বা মিনি ফ্রকের ক্ষেত্রেও একইরকম ভাব। আমার এদের হিপক্রিট মনে হয়। তবু ছোটদাও এসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভেবে বিশ্বাসও হতে চায় না যে এরা সত্যি সত্যিই হিপক্রিট। মাঝে মাঝে ভাবি নিশ্চয় কোথাও ভুল হচ্ছে আমার। আমি ঠিক-ভুলের মাঝামাঝি অবস্থায় দুলতে থাকি।

ছেলেদেরও একই হাল। দাঁড়ি কামানো নেই, চুলে চিরুনি নেই, জামা ইন করা নেই, পায়ে বুট তাদের কখনই নেই। কাঁধে ঝোলা অবশ্যই আছে। জ্ঞানে ভারি মাথা থেকে উপচে পড়া কিছু জ্ঞান ঝোলার মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা। এদের মনে যে প্রেমতরঙ্গ বয় না তা নয় তবে সেই প্রেম-প্রণয়-বিবাহের ধরন বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। উদ্ভট উদ্ভট প্রেমে এদের ভালো লাগা, উদ্ভট উদ্ভট বিয়েতে এদের পরিতুষ্টি লাভ। একদিন হঠাৎ একজনকে দেখি বস্তির একটি মেয়ে যে নিজের নাম ছাড়া আর কোনকিছুই লিখতে পারে না তাকে বিয়ে করে ফেলল। যেহেতু তারা নাস্তিক তাই বিয়ে মানে কালীঘাটে গিয়ে মালাবদল করা নয়। যেহেতু তারা মানুষের তৈরি আইনসিদ্ধ বন্ধনে থাকতে অনাগ্রহী তাই বিয়ে মানে রেজিস্ট্রি পেপারে সই করাও নয়। বিয়ে মানে হল শুধু নিজেদের স্বামী-স্ত্রী ভেবে সহবাস শুরু করা। অসম্ভব এদের মন, অসম্ভব এদের পারস্পারিক বোঝাপড়া, অসম্ভব এদের সম্পর্কের বন্ধনও। এদের বোঝাপড়ার কাছে সম্পর্ক নিয়ে আমার দর্শন ছোট পড়ে যায়। অনেক উঁচুস্তরের মনে হয় ওই নববিবাহিতা মেয়েটিকেও। আমরা বাঙালিরা প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে তুমি সম্বোধনটা পছন্দ করি। এরা পছন্দ করে তুই। কি ধরনের কথার আদানপ্রদান হয় প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে আমার জানা নেই। এদের প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার ধরনও সৃষ্টিছাড়া—হার মানছি আবার মানছিও না। যার মানে হয় ইচ্ছে আছে আবার নেইও।

সঞ্জয়ের আমাকে প্রস্তাব দেওয়ার ধরনটাও এমনই ছিল। পিয়ারিচরণ সরকার

স্ট্রিটটা যেখানে হ্যারিসন রোডে এসে মিলে গেছে তার কাছে একটা চায়ের দোকানে লেবু চায়ের অর্ডার করার পর। লেবু চা অনেকেরই পছন্দ কিন্তু আমার নয়। চাই-ই আমার চূড়ান্ত অপছন্দের জিনিস। অপছন্দের জিনিস বলেই হোস্টেলের মঞ্জু ডিকোস্টাকে দশ পয়সা দিয়ে অর্ধেক চা কেনার জন্য সাধতে এলে ওইভাবে বকুনি দিতে পেরেছিলাম। তবু সঞ্জয়, অমিতাভ, প্রভাস এদের পাল্লায় পড়ে আমি চা খাই। না বললে এরা আবার মিনমিন করবে 'এ কি রে! লেবু চা পছন্দ না!' 'কি রে' মানে 'কি বস্তু রে'। সঞ্জয় জিজ্ঞেস করেছিল, ''আমার সঙ্গে প্রেম করবি নাকি?'' অন্যদের মাঝখানে মজা ওড়াতে ওড়াতে এমন করে বলেছিল এবং বলেই এমন করে কথাকে অন্য সব আঁতেল কথার মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়েছিল যে সে আমার সঙ্গে সত্যি সত্যিই প্রেম করতে চায় কিনা বুঝতে পারিনি। তাছাড়া আমাকে প্রেমের খিদে এমনভাবে গ্রাস করেনি যে কুমীরের মতো ওঁত পেতে ছেলেদের মাঝখানে বসে থাকব এবং কেউ 'প্রেম করবি নাকি' বলতেই তার চেহারা, মন, চালচলন কিচ্ছু যাচাই না করে খপ্ করে সেই প্রস্তাবকে মুষ্টিবদ্ধ করে মুখে ঢোকাবো। আমি কোন উত্তর না দেওয়ায় দেখলাম সঞ্জয়ের আত্মসম্মান ঘা-ও খেল। ''তোর বাপ ক'টাকা ইনকাম করে রে! দেখে নিস আমি পাঁচ হাজার টাকা মাইনের চাকরি করব,'' সে বলে। আমার সামনে তার ফিজিক্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার অহংকার ছড়িয়ে দেয়।

রাগ হয়েছিল খুব। এটা একধরনের বাপের নাম তুলে গালি দেওয়া। বাপের স্বল্প উপার্জনকে উপহাস করার অর্থ হল বাপকে উপহাস করা। উপহাস হল মিষ্টি গালি। সঞ্জয়ের সেই গালি ছোটদার 'বিজ্ঞান চেতনা'র 'সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিং' মূলমন্ত্রে দীক্ষিত কারও কাছ থেকে পাওয়া আমার প্রথম আঘাত। প্রতিবাদ করা যায় না। ছোটদার বোন আমি। যদিওবা সে এখানে নেই, সে তার পি জি হোস্টেলে বসে আছে, সুকিয়া স্ট্রিটের কাছে, তবু। আমি রেগে প্রত্যুত্তর দিলে প্রথমেই মিনমিনে স্বরে এরা যা বলবে তা হল, 'এ মা! এ তো ইয়ারকিও বোঝে না!' তারপর ওখানেই আমাকে উপেক্ষা করে নিজেদের মধ্যেই আমার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া দুর্বোধ্য ভাষায় কথাবার্তা চালাতে থাকবে। আমি তখন অস্বস্তি কাটাতে কি করব জানি না। তারপর ওরা গিয়ে ছোটদাকেই বা আমার সম্পর্কে কি প্রতিবেদন দেবে তাও অনুমান করতে পারি না। পারি না আমি 'বিজ্ঞান চেতনা'র সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলতে।

তবু ছোটদার চাওয়াতে কয়েকটি ম্যাজিক আমি বেশ শিখে নিই। তার মধ্যে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করি একটিতে। ম্যাজিকটির নাম ছুরি-ঘটি ম্যাজিক। ছুরি-ঘটি ম্যাজিক দেখানোর আগে যে গূঢ় অর্থপূর্ণ কাহিনী দর্শকদের শোনোনো হয় তা হল—দক্ষিণ ভারতে অনেক জায়গায় বিশেষত অন্ধ্রপ্রদেশে যেসব মহিলারা বিয়ের পর বেশ কয়েক বছর সন্তানের মা হতে পারেন না পরিবারে তাঁদের বন্ধ্যা বলে মানা হয় এবং তাঁদের ওপর চলে পরিবারের অনান্য সদস্যের চরম অত্যাচার। অত্যাচারিত মহিলাদের অনেকে অনেক কান্নাকাটি করে, অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে অবশেষে মন্দিরের পুরোহিতের শরণাপন্ন হন। কামনা এটাই যে পুরোহিত তাদের

বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতে পারবেন। পারেনও তাঁরা। কিভাবে তার ব্যাখ্যা এইরকম—সহৃদয় পুরোহিত একটি চালভর্তি ঘটি নিয়ে মহিলার সামনে রাখেন। হাতে থাকে ধারালো ছুরি। ধারালো ছুরিটি উনি সবলে ঘটির চালের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। দিয়ে বলেন, এই ছুরিকে আমি এখন উপরে টানব। যদি এটা চালসহ ঘটিকে শূন্যে তুলতে সক্ষম হয় তাহলে জানবে গর্ভে সন্তান ধারণ করার ক্ষমতা তোমার আছে। বলা বাহুল্য ছুরি ঘটিকে চার সেকেন্ডেই অনায়াসে চার ফুট উপরে তুলে নেয়। আশার আলো জাগায় মহিলার মনে। সহৃদয় পুরোহিত অতঃপর মহিলাকে তাঁর সঙ্গে মূর্তির পেছনে যাওয়ার আদেশ দেন। সেখানে শিবলিঙ্গ আছে। মহিলাকে শিবলিঙ্গের পুজো করতে হবে। মহিলা যান, শিবলিঙ্গের নাম করে পুরোহিত সেখানে মহিলার কাছে থেকে জোর করে পুজো নেন নিজের লিঙ্গের। পূর্ণ করেন তাঁর সন্তানের চাহিদা। মানহানির ভয়ে মহিলারা চুপ থাকেন। তাছাড়া হয়ত তাঁরা ভাবেন পুজো যখন হয়েই গেছে, যত কঠিনই হোক, যত যন্ত্রণাদায়কই হোক সেই পুজো বন্ধ্যা হওয়ার কারণে শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রাপ্ত যন্ত্রণার তুলনায়, আশঙ্কিত আমৃত্যু অপমানের তুলনায় তা নগণ্য, সুতরাং মুখ বন্ধ রাখাই শ্রেয়। মন্দিরের পেছনের সেই শিবলিঙ্গ দেখার অনুমতি কেউ পায় না একমাত্র সেই মহিলা ছাড়া। কিন্তু কেরালার র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন জোর করে দেখে বা না দেখে আবিষ্কার করে ফেলে সেই শিবলিঙ্গ আর সেই গর্বে গর্বিত হয়ে গল্পশেষে আমি ম্যাজিক প্রদর্শন করি। প্রথম প্রথম কখনও পুরো গল্পটাই বলতাম আবার কখনও থতমত খেয়ে মাঝখানে থেমে যেতাম। থেমে গেলে আমার সহকর্মীরা গল্পের পরবর্তী অংশ বলার দায়িত্ব নিত। গল্প বলাতে ব্যর্থ হলেও চালের ঘটি চার ফুটের উপরে টেনে তুলতে ব্যর্থ হতাম না। তাই ঘটি তোলার কাজটা যে আমাকে দিয়ে করানো যেতেই পারে সে ব্যাপারে কোন দ্বিমত ছিল না।

আমার থতমত খাওয়ার ব্যাপারটা জেনেই হবে প্রথম কয়েকমাস আমি যেসব প্রোগ্রামে যেতাম সেসব প্রোগ্রামে ছোটদা যেত না। যা হোক করে ধীরে ধীরে বলাতেও আমি পারদর্শী হয়ে উঠলাম। আমার ওপর আস্থা বেড়ে গেল ছোটদার। একদিন তার হোস্টেলে সেতার প্র্যাকটিস করতে গেলে সে আমায় জিজ্ঞেস করে, “কি রে বর্ধমানে যাবি নাকি?”

“কেন?”

“বিজ্ঞান চেতনার একটা প্রোগ্রাম আছে। আমি যেতে পারব না বলে তোকে বলছি।”

“যেতে পারবি না নাকি যেতে চাইছিস না?” পাশে সুদীপ্তদা বসা। সুদীপ্তদা উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করা ছেলে, একটু মোটা, হেলেদুলে চলে, পরিমিত কথা বলে। সঞ্জয়ের মতো বখাটে নয়।

ছোটদা সুদীপ্তদাকে বোঝায় যে ওকে ছেড়ে আমার দূরের প্রোগ্রামগুলো অ্যাটেন্ড করতে শেখা দরকার। তাছাড়া সুদীপ্তদা তো থাকছেই সঙ্গে। আমার পছন্দ-অপছন্দের বিপরীতে গিয়ে কিভাবে কি ছাঁচে ঢেলে ছোটদা আমাকে মানুষ করতে চাইছে কে জানে! আমি এবং সে ও তার দল আলাদা পদার্থ দিয়ে তৈরি। আমাদের ত্বকের,

আমাদের চোখের, আমাদের নাকের মালমশলা আলাদা। আমাদের ব্রেন, মন এবং জিভ তৈরি হয়েছে আলাদা জীন দিয়ে। তাই যখন আমরা একসঙ্গে কারও বাড়িতে যাই মে মাসের চিটচিটে গরমে বিদ্যুৎবিভ্রাট হলেও ওদের ত্বক ঠাণ্ডা থাকে, আমার থাকে না। আমার জিভ প্রকাশ করে ফেলে শরীরের অস্বস্তি 'খুব গরম লাগছে' বলে। তখন ওরা মিনমিন করে, 'এ কি বলছে রে!' আমি লজ্জা পাই। ভাবি, না বললেই পারতাম। কোন খাবারের স্বাদ ভালো লাগছে না বলে নষ্ট করা চলবে না। তাহলেও ওই একইরকম মিনমিন করা কথা কানে আসবে। কাজেই স্বাদ যেমনই হোক মুখে বন্ধ করে পুরো পেটে ঢোকাও, হজম করো সেই খাবার। খাবার স্বাভাবিক নিয়মে পায়ু দিয়ে মল হয়ে না বেরিয়ে মুখ দিয়ে বমি হয়ে বেরোলেও ওই একই মিনমিনে স্বর বিদীর্ণ করবে কান, 'কি করছে রে!' যেন সবকিছুই আমার আই কিউ কম বলেই হচ্ছে।

ছোটদার প্রস্তাবে সম্মতিতে মাথা ঝাঁকালো সুদীপ্তদা। ইচ্ছে বা অনিচ্ছে নিয়ে বুঝলাম না। ঠিক হল বখাটে সঞ্জয়টাও থাকবে আমাদের সঙ্গে। বখাটে সে আমার মুখের ভাষায়। অন্য কেউ তাকে বখাটে মনে করুক বা না করুক আমি করি। কিন্তু মনে করলেও ওপরে কিছু বলার উপায় নেই। বললেই মিনমিন করবে, 'কি বলে রে!' আমার তখন মনে হবে আমার আই কিউ কম—যে কথাটাকে যেভাবে বোঝা দরকার সেই কথাটাকে সেভাবে বুঝতে পারি না, যে জিনিসটাকে যেভাবে গ্রহণ করা দরকার সেই জিনিসটাকে আমি সেভাবে গ্রহণ করতে পারি না। কাউকে নিয়ে কোন অসন্তোষ দেখানো তাদের সামাজিক মেলামেশার নীতির মধ্যে পড়ে না। তাই ওরা 'কি বলে রে,' 'কি করে রে,' বলে ছেড়ে দেয়। মিনমিন করা কথাকে তুমি বিরক্তি বলে মনে করতে পারো আবার নাও পারো।

আমার যে কাজগুলো সহজ বলে মনে হয় তা হল সিনেমা দেখা এবং পোশাক-প্রসাধনে নিজেকে সজ্জিত করে ঘুরে বেড়ানো। কোন এক গল্পের বইয়ে পড়েছিলাম পাশ্চাত্যের এক দার্শনিক লিখেছেন জীবনটা কেঁদে ভাসানোর চাইতে হেসে উড়িয়ে দেওয়া অনেক ভালো। কথাটা কেন জানি না আমার মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে গেছে। তাই যখনই কোন কাজ করতে গিয়ে ভেতরে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, মনে হয় এই কাজটা আপাত-আনন্দদায়ক হলেও ভবিষ্যতের পক্ষে একেবারেই নয় তখন এই কথাটাই আমার দ্বন্দ্বের সমাধান হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ আজ অনেকই উন্নত হয়েছে, অনেক কিছুই ভাবনা-চিন্তা করে মানুষ তবু যখন তাকে এমন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যেখানে তার বিবেকের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য তখন অনেকক্ষেত্রেই সে বিবেককে জয়ী হতে দিতে চায় না। কারণ বিবেক জয়ী হলে তার ভবিষ্যৎ সুস্থ থাকবে কিন্তু বর্তমানের মজাটাই মাটি হয়ে যাবে যে! উন্নত মানুষ তার উন্নত চিন্তাশক্তি বিবেকের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে আপাত-আনন্দদায়ক জিনিসগুলোর পক্ষে এমন যুক্তি দাঁড় করিয়ে দেয় যে আর পিছিয়ে থাকা সম্ভব হয় না। কাজেই বাবা, সেই দার্শনিকের জয়। তুমিই গুরু, ধন্য তুমি, জীবনকে উপলব্ধি করেছ।

বর্ধমানে প্রোগ্রামশেষে রাত কাটানোর জন্য আমাদের একজনের বাড়ির দোতলাটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। দোতলায় তিনটে ঘর ছিল, আমরা তিনজন ছিলাম থাকার জন্য কিন্তু ঘর ব্যবহৃত হয়েছিল একটাই। আমার জন্য আলাদা ঘরের কথা আমি বলতে পারিনি। বললে ঘর তো পেতামই না, উল্টে ওদের একটা চাওনিতেই কাত হয়ে যেতাম যে চাওনি বলত 'সে কি রে! ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে শুলেই ওসব হয় নাকি! একদমই মানসিক বিকাশ হয়নি তোর। এত কম আই কিউ নিয়ে চলে!' তারপরে কলকাতায় ফিরতেই ছোটদার কাছে খবর পৌঁছে যেত 'বিলু তোর বোন কি বলে রে! আলাদা ঘরে থাকবে।' কলকাতায় ছোটদার ডাকনাম বিষ্ণু থেকে পরিবর্তিত হয়ে বিলু হয়েছে।

নিজেকে এত অভিযোজিত করতে চেয়েও শেষপর্যন্ত সফল হলাম না। ছোটদার কাছে খবর গেল আমার কম আই কিউ আমার মানসিক বিকাশের পরিপন্থী, ছেলেমেয়েকে রাতের অন্ধকারে বিছানায় শুধুমাত্র বন্ধুর রূপে কল্পনা করতে অক্ষম। ছোটদা আমাকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করল, ''কি রে, তুই নাকি সঞ্জয়কে কিসব বলেছিস?''

''কখন?''

''বর্ধমানে তোরা যখন একসঙ্গে ছিলি।''

''কে বলল তোকে?''

''সঞ্জয়।''

''সুদীপ্তদাও কি একই কথা বলেছে?''

''হুঁ।''

আমি স্তম্ভিত। মুখ চুন হয়ে গেল আমার। স্বভাবদোষে মুখ খুলতে পারলাম না। ভাষা খুঁজে পেলাম না ছোটদাকে বোঝানোর। বিশ্বাস করতে পারলাম না সে আমাকে বুঝবে বলে। বুঝতে চাইবে বলে। সুদীপ্তদাই তো আমাকে বুঝল না। সে কি আমাদের কোন কথা শুনতে পায়নি! শুনতে না পাওয়ার অর্থ সে মটকা মেরে পড়ে থাকেনি, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। আর যদি সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্নই থাকে তাহলে আমাকে না জিজ্ঞেস করেই সঞ্জয়ের কথা বিশ্বাস করে নিল কি করে! যদি ঘুমে আচ্ছন্নই থাকে তাহলে সঞ্জয়ের কোমল স্বরের এক ডাকেই কি করে সাড়া দিল! মাঝখানে সরে এল ওপাশে সঞ্জয়কে জায়গা দেবে বলে!

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়। সেই রাতে আমার ঘুমনোর প্রয়োজন ছিল কেননা পরদিন আবার প্রোগ্রাম হওয়ার কথা। কিন্তু আমি ঘুমোতে পারছিলাম না। কারণ সেই রাতেও লোড-শেডিং ছিল, গরম ছিল খুব। আর গরমই আমি সহ্য করতে পারি না। অস্থিরতা আমার অন্তরে, বাহিরে তবু তা প্রকাশ করা যাবে না। সঞ্জয়ও অস্থির হয়ে পড়ছিল। অবশ্য তার অস্থিরতার কারণ আলাদা। তার অস্থিরতা হল আমার ঘুমকে নিজের কব্জায় নিয়ে রাত পার করতে চাওয়ার অস্থিরতা। আমি দেখছিলাম, আমি বুঝছিলাম, ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলাম এই সঞ্জয় চায়ের দোকানের সেই সঞ্জয় নয় যে আমার সঙ্গে প্রেম করবি বলেই অন্যদের সঙ্গে আঁতলামির কথায়

মন ঘুরিয়ে নিয়েছে। আঁতলামির গল্প করার জন্য যে সঙ্গীর দরকার সেই সঙ্গীও এখন নেই। তার ডানপাশে সুদীপ্তদা, কম কথা বলা মানুষ। বাঁপাশে আমি, আমিও কম কথা বলা মানুষ। সঞ্জয় আমাকে জিজ্ঞেস করে, ‘‘ঘুমিয়ে পড়েছিস?’’

‘‘না।’’

কিছু সময় ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ।

‘‘কি রে ঘুমিয়ে পড়লি?’’

‘‘না। কেন?’’

‘‘গান জানিস তুই?’’

‘‘না।’’ কিছু সময় ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ।

‘‘কি রে ঘুমিয়ে পড়লি?’’

‘‘না।’’ *গরমে ঘুম আসছে না।*

‘‘কবিতা জানিস?’’

‘‘না।’’

‘‘ধ্যুর, কি জানিস তাহলে?’’

কিচ্ছু জানি না। আমার আই কিউ কম। কিছু সময় ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ।

‘‘আমি একটা কবিতা আবৃত্তি করি শোন।’’

‘‘সঞ্জয় ঘুমো। রাত অনেক হয়েছে।’’ কিছু সময় ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ।

‘শোনই না একটি কবিতা।’’

আমি চুপ, যার অর্থ হয় অগত্যা রাজি। সঞ্জয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে,

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।...’’ ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ।

‘‘কিরে ঘুমিয়ে পড়লি?’’

‘‘না, ঘুমবো। তুইও ঘুমো।’’

‘‘জীবনানন্দ দাশ জানিস?’’

‘‘জানি।’’

‘‘বল।’’

‘‘কি বলব?’’

‘‘আরে কবিতা বাবা।’’

পাছে সে আবার ভাবে আমি মিথ্যাবাদী অথবা আমার আই কিউ কম, বলি, ‘‘বনলতা সেন জানি।’’

‘‘বল।’’

‘‘না, ঘুমবো এখন।’’

‘‘তুই আসলে জানিসই না। তাহলে শোন,
হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,

সিংহল সমুদ্র থেকে আরও দূর অন্ধকার মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরও দূর অন্ধকার বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।...” সঞ্জয় মুখ উঠিয়ে আমার মুখে দিকে তাকায়, “তোর মতো।”

সঞ্জয়ের মতিগতি ভালো লাগে না। সুদীপ্তদা পাশে—মানে আমার পাশে সঞ্জয়, সঞ্জয়ের পাশে সুদীপ্তদা।

সঞ্জয় বলে, “তুই জানিস কবিতা। বল না একটা।”

আই কিউ-এর প্রশ্নটা আমায় বারবার ধাক্কা দেয়। প্রশ্নের কথা মনে হতেই রবীন্দ্রনাথের ‘প্রশ্ন’ কবিতাটি মনে পড়ে। আমাদের একটা ইন্ট্রা কলেজ কালচারাল মিট-এ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ছিল। তাই প্রাণপণে মুখস্থ করেছিলাম—ভগবান তুমি দূত পাঠায়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে...” মুখস্থ করার সময় চেঁচিয়ে আমার গলা বসে গিয়েছিল, আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। হোস্টেলে বড় ঠাকুরকে তোয়াজ করে দিনে পাঁচবার জল গরম করিয়েছিলাম গার্গল করব বলে। তিনদিন মাত্র বেঁচে ছিল। তিন দিনে কিছুটা ঠিক হল গলা কিন্তু স্বর পুরোপুরি স্বাভাবিক হল না। খরখরেই রইল। তাতেই তৃতীয় হলাম। সুস্থ থাকলে নিশ্চয় প্রথম হতাম। প্রশ্ন কবিতাটি আবৃত্তিতে আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই বলে এই রাতে! অসম্ভব।

“গান গা।”

“না।”

“আচ্ছা আমি গাইছি শোন।”

আবার অগত্যা রাজি হই। সঞ্জয় গায়, “ও আলোর পথযাত্রী, তরণী তোমার এখানে বেঁধো না। আমি ক্লান্ত যে, এসো হাল ধরো। আমি রিক্ত যে, এ যে সান্ত্বনা...”

লোডশেডিং-এর পালা শেষ। মাথার উপর ঘুরতে শুরু করে ফ্যান। বলি, “অনেক হল সঞ্জয়, এবার ঘুমো।” আবার বেশ কিছু সময় আমরা চুপ। কানে বাজে ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ। সঞ্জয় আবার আমাকে জিজ্ঞেস করে, “ঘুমিয়ে পড়লি?”

আমি ক্লান্ত! আর কথা বলতে ভালো লাগছে না। সঞ্জয় আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে নেয়।

“করছিস কি তুই?”

“বনানী, আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি।”

“বিরক্ত করলে সুদীপ্তদাকে ডাকব কিন্তু,” হাত ছাড়িয়ে নিই।

সঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থেকে নিজেই সুদীপ্তদাকে ডাকে, “সুদীপ্তদা তুমি মাঝখানে শোও তো। এখানে ফ্যানের হাওয়াটা একদম গায়ে লাগছে না।”

ছোটদা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে তাতে আমি আহত হইনি। সঞ্জয়ের কাছ থেকে

ভদ্রতা আমি আশাই করতে পারি না। মিথ্যাভাষী সে। তার ব্যবহারে ব্যথা পাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু সুদীপ্তদা! সে ছিল সেই রাতের প্রত্যক্ষশ্রোতা, হয়ত প্রত্যক্ষদর্শীও, কারণ সেই রাত কোন অমাবস্যার নিঝুম অন্ধকার রাত ছিল না। চাঁদের আলো পড়েছিল বিছানায়, সেই চাঁদের আলো গায়ে মেখেই তাৎক্ষণিক প্রেমাবেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সঞ্জয়ের মন, শরীর। সুদীপ্তদা কেন ছোটদাকে বলল না সঞ্জয় মিথ্যে বলছে? সে কেন বুঝল না এমন রটনা আমার সম্মানকে ধরাতলে পৌঁছে দিতে পারে? মেধাবী সে, গম্ভীর সে, অবৈজ্ঞানিক প্রচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বেড়ানো ছেলে সে। একইসঙ্গে আলাদা মানুষ সুদীপ্তদা। আলাদা সত্তা। আমি সুদীপ্তদা নোই। আমি তাকে ঘাড় ধরে বলতে পারিনি সঞ্জয়ের মুখটাকে ঘুষি মেরে থেঁতলে দিতে, তাই বলে এটাও কল্পনা করতে পারিনি যে সে সঞ্জয়ের কুৎসিত জিভটাকে সমর্থন করবে। সুদীপ্তদা ছোটদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাকে ডিঙিয়ে ছোটদা আমাকে বিশ্বাস করতে পারে না। এত বছরে আমাদের বাড়ির একটিও লোক একবারও আমার মনের গভীরতা মেপে দেখার কোন ইচ্ছে প্রকাশ করেনি। বোঝার চেষ্টা করেনি যে আমার এই রঙিন পোশাকের অন্তরালে একটি মন আছে, খাঁটি রঙ দিয়ে রাঙানো সেই মন। সেই রঙ কখনও ফিকে হয় না। ফিকে হয়ে মনকে রঙচটা করে দেয় না। তাই সেই রঙের সঙ্গে যদি অন্য কোন রঙ কোন সম্পর্কে আসতে চায় তাহলে সেই অন্য রঙকেও স্থায়ী হতে হবে সে হলুদই হোক অথবা সবুজ অথবা গোলাপি অথবা লাল। আমার পরম শত্রু 'আমার কম আই কিউ' সেদিনও জিভের জড়তাকে কাটিয়ে উঠতেই দিল না। আমি ছোটদাকে বোঝাতে অক্ষম হলাম যে মেয়েরা, বিশেষত আমার মতো মেয়েরা এমন অপরিণত মস্তিষ্ক দ্বারা ঘোষিত এক পলকের প্রেমে বাঁধা পড়ে তার বাহুবদ্ধ হয়ে ভালবাসার অন্ধকারে ডুবে যেতে পারে না।

প্রেম বিরহ

পার্ট ওয়ান পরীক্ষার আগে ক্লাসে একটা সুখবর তৈরি হল। পুতুল একদিন হঠাৎ হাতে পলা পরে উপস্থিত। রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেছে—অনুষ্ঠান করে পরে হবে। ওকে দেখে আমাদের সবার চোখ টেরা। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না এই সিরিয়াস মেয়েটি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার আগেই বিয়ের কথা ভাবতে পারল বলে। তাছাড়া ওর মধ্যে আমি কখনই ছেলেদের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখিনি। পুতুলের হাতে পলা দেখে আমরা ওকে কবে হল কেন হল জিজ্ঞাসা দিয়ে ছেঁকে ধরি। পুতুল বলে, "বাবা অসুস্থ, তাই তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে দিতে চাইছিলেন।" আমরা যখন ওয়াল্টেয়ারে গিয়েছিলাম, পুতুলের মা-বাবা গিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে। তখনই দেখেছিলাম ওঁরা বেশ বয়স্ক, অর্থাৎ তাঁদের বেশি বয়সের সন্তান পুতুল। এখন যদি পুতুলের বয়স আঠারো অথবা উনিশ হয়, ওর বাবার বয়স ষাটের উপরে হতেই পারে। অসুস্থ উনি হতেই পারেন।

চৈতালি, মণিকা, আমি প্রেম না করলেও ছেলেদের পেছনে পড়তে ছাড়ি না। রাস্তাঘাটে কেউ কখনও বজ্জাতি করলে তার জবাব দিতে ছাড়ি না। একদিন ক্লাসশেষে কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি একটা ট্রাম আমাদের সামনে দিয়ে টুং টাং আওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে গেল। আমরা ট্রামে উঠব না। আমাদের গন্তব্যস্থল আলাদা হলেও বাস এক। সেভেন্টি এইট বাই ওয়ান। বাস প্রথমে আমাকে নামায়, তারপর চৈতালিকে, তারপর মণিকাকে। ট্রাম ক্রস করে যাওয়ার সময় ভেতরে বসে থাকা একটি লোক আমায় চোখ মারে। চৈতালি, মণিকা তো হেসেই অস্থির, "এই দেখলি লোকটা কেমন অসভ্য! বসে তো আছিস বাবা টুনটুনি পাখির মতো, তাও আবার ওই টুং টাং আওয়াজ করা ভগ্নপ্রায় ট্রামে। এর মাঝেও দুষ্টামি!"

কলকাতার ভগ্নপ্রায় ইলেকট্রিম ট্রাম হল এশিয়ার সবথেকে পুরনো ইলেকট্রিক ট্রাম সিস্টেম—কলকাতার ঐতিহ্য। শুধু কলকাতা কেন, আমাদের পুরো ভারতের পুরনো উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতির মধ্যে কলকাতার ইলেকট্রিক ট্রামের নাম থাকতেই হবে। এখানে কেউ ঘুরতে এলে তাকে ১৯০২ সালে জন্ম নেওয়া এবং এখনও পর্যন্ত জীবন্ত জীবাশ্মের মতো অপরিবর্তিত চেহারা নিয়ে নির্বিকার চিত্তে শহরের বুকে ঘুরে বেড়ানো স্থলযানটিতে দশ ফুট দূরত্বের জন্য হলেও অন্ততপক্ষে একবার সফর তো করতেই হবে, নতুবা শহর ঘোরার সার্থকতা অনুভব করা যাবে না। তবু আমরা তাকে উপহাস না করে পারি না, না হেসে পারি না, হাসির অন্য কোন উপকরণের সঙ্গে তাকে জুড়ে দিয়ে হাসিকে অট্টহাস্যে রূপান্তরিত না করে পারি না।

বলি, "দাঁড়া, আমিও ওকে চোখ মারব।"

চৈতালি বলে, "কি করে মারবি? ট্রামটা কোন মুলুকে গিয়ে থামল দেখেছিস?" ট্রাম দাঁড়িয়েছিল কম করেও পনেরো মিটার দূরে।

"তাতে কি হয়েছে? ওখানে গিয়ে মেরে আসব।"

"পারবি না।" চ্যালেঞ্জ মণিকার।

"পারব।"

"আরে মারবি তো তাড়াতাড়ি যা!" চৈতালির ধাক্কা খেয়ে আমি ভাগি ট্রামের কাছে। লোকটির সামনে গিয়ে তাকে পাল্টা চোখ মেরে আসি।

চৈতালিও একবার খুব দুষ্টুমি করেছিল। সেদিন সে কলেজে না এসে একা ধীরাদির বাড়ির পথে, কসবা স্টেশন থেকে গন্তব্যস্থলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে দেখে উল্টোদিক থেকে মোটরসাইকেলে করে আসছে একজন সুদর্শন যুবক। সে যুবকটির দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বাঁ চোখটি বন্ধ করেই খুলে দেয়। চৈতালির মনে খুশি খুশি ভাব—আগের দিনের ছেলেটির *এই যে ম্যাডাম এবার থেকে মাথা ন্যাড়া করে বাসে উঠবেন* বিদ্রুপের জবাব দিতে না পারলেও আজ একটা কাজের কাজ করতে পেরেছে। হোক না সে অন্য ছেলে। একটি ছেলে হল সমগ্র ছেলে জাতির প্রতিনিধি। কাজেই একজনের বিদ্রূপের জবাব অন্যজনকে অন্যভাবে দিতে পারলেও শান্তি আছে।

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গহনে।
পান করি রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া সদাদীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি।
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে।

খানিক আগে একপশলা ঝমাঝম বৃষ্টি হয়ে গেছে। স্বচ্ছ আলো চারিদিকে, কিন্তু তখনও রোদ ওঠেনি। রাস্তার দু'পাশে এবং রাস্তার মাঝে জায়গায় জায়গায় জমে আছে জল। তারই মাঝে দু'হাতে শাড়ি কিছুটা উপরে উঠিয়ে গুনগুন গান গাইতে গাইতে সাবধানতার সঙ্গে পায়ে ছন্দ মিলিয়ে চলেছেন আমাদের যুবতী নায়িকা। মুখ নিচে রাস্তার দিকে। একটু অসতর্ক হলেই খানায় পড়ে যেতে পারে চঞ্চল পা, ভিজে যেতে পারে শাড়ি। হঠাৎ নায়িকা সামনে মোটরসাইকেল এসে থেমে যাওয়ার শব্দ শোনেন। মাথা তুলে দেখেন কান কোন ভুল করেনি। সত্যিই এক ফুট দূরত্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মোটরসাইকেল এবং তাতে বসে আছেন চোখ দিয়ে মার খাওয়া নায়ক। বলছেন, "প্লীজ ম্যাডাম আরেকবার।"

নায়িকা রীতিমত অপ্রস্তুত। "এ কি অসভ্যতামি হচ্ছে!" সংলাপের শব্দ সংযোজনায় দম থাকলেও গলা একেবারেই দুর্বল। বরং তেজ আছে নায়কের গলায়, "অসভ্যতামি আমি করছি! তাহলে আপনারটা কি ছিল?"

"আহ্, রাস্তা ছাড়ুন।"

ছেলেটি শয়তান নয়, তাই বলেছে, "আজ প্রথমবার, তাই ছেড়ে দিলাম। দ্বিতীয়দিন এমন শুভক্ষণ এলে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে ছাঁদনাতলায় বাসিয়ে দেব।"

সেদিনের সেই ঘটনা থেকে চৈতালি এক সহবত পায়—আর কাউকে চোখ মারার ঝুঁকি নেওয়া যাবে না।

পার্ট ওয়ান পরীক্ষার আগে এবং পুতুলের রেজিস্ট্রি ম্যারেজের পর আরও কিছু ঘটনা ঘটল। খারাপ ঘটনা। মণিকার দুটো অপারেশন হল—ওভারির টিউমার এবং

অ্যাপেন্ডিসাইটিস। মণিকাকে এক বছর ড্রপ দিতে হবে। পুতুলের বাবা মারা গেলেন। এক বছর ড্রপ দিতে হবে পুতুলকেও। পুতুলের জন্য আমার কষ্ট হয়। কিন্তু মণিকার ব্যাপারটা আমাকে যেন বেশি ধাক্কা দেয়। এবছর সে পরীক্ষা দিতে পারবে না সে এক ধাক্কা, থার্ড ইয়ারে সে আমাদের ব্যাচের থাকবে না সে আরেক ধাক্কা। পার্ট ওয়ান পরীক্ষা আমি ধীরাদির কাছ থেকে পাওয়া সেই দু'মাসের নোট পড়ে দেব। তার সঙ্গে নিজের তৈরি করা এবং হোস্টেলের এক সিনিয়র মেয়ে সুতপার কাছ থেকে পাওয়া কয়েকটি নোটও থাকবে। সুতপা মেয়েটি সরল, কিছু চাইলে কখনও দেব না বলে না। সে রাজা রামমোহন কলেজের একজন অধ্যাপকের কাছে পড়তে যায়। নোটগুলো ছোট, আমার খুব পছন্দের নয় তবু কাজ চালাতে নিতে হয়েছে।

মনে কষ্ট নিয়ে, যথেষ্ট প্রস্তুতি না নিতে পারার টেনশন নিয়ে পরীক্ষার প্রাক্কালে বিছানায় বই খুলে বসেছি। গোঁ গোঁ করে মুখস্থ করছি পড়া। পাশে পনেরো নম্বর রুম। পনেরো নম্বরের মেয়েরাও অনিদ্রায় রাত কাটাচ্ছে। তারা কলেজ নিয়ে ক্লাস নিয়ে আমার মতো উদাসীন ছিল না তবু ঘুম নেই তাদেরও চোখে। সেখানে কেউ বোম ফাটানোর মতো শব্দ করে পড়ে আবার কেউ ক্ষীণস্বরে। যেদিন পনেরো নম্বর রুমের মেয়েরা পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নিঃস্তব্ধ রাতে দোতলার কমন রুম থেকে গায়ত্রীদির পড়ার আওয়াজ পাই—মাঞ্জে মাঞ্জে মাঞ্জে। বড্ড ঘ্যানঘেনে। একটা লাইন উচ্চারণ করতে গিয়ে দশবার মাঞ্জে বলে। গায়ত্রীদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মাঞ্জে মানে কি গো? সে বলেছিল, তোর মাথা। তপতীর কাছে শুনেছিলাম মাঞ্জে মানে কি। মাঞ্জে মানে হল, মানে এই যে।

পড়ার সময় বিভিন্ন আওয়াজের সঙ্গে মেয়েদের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিও থাকে। পনেরো নম্বর রুমের মেয়েদের কেউ রুমেই বিছানার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে থেকে পড়ে, কেউ ভেতরের বারান্দায় বা বাইরের ব্যাল্কনিতে পায়চারি করতে করতে পড়ে। নন্দিনীর পায়চারি করতে করতে না পড়লে হয় না। কেউ বারংবার পড়ে মুখস্থ করে লেখার উপাদান ব্রেনে সামলে রেখে দেয় একেবারে পরীক্ষার খাতায় ঢালবে ভেবে, আবার কেউ মুখস্থের পরে তৎক্ষণাৎ উগরে বের করে দিতে না পারলে শান্তি পায় না। তাদের বিশ্বাস হয় না মাথায় পদার্থগুলো সত্যিসত্যি ঢুকেছে বলে। সেই উগরে বের করাটা কখনো কাগজে হয়, কখনো দেওয়ালে, আবার কখনো হাতে, পায়ে এবং ঠ্যাঙে। নন্দিনী মলত্যাগ করতে বসে কলম দিয়ে কেমিস্ট্রির সমীকরণ লিখে লিখে হাত, পা, ঠ্যাঙের দৃশ্যমান জায়গাগুলো ভরে ফেলে। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে সেসব সাবান জলে ঘষে ঘষে তুলে দেয় রুমমেটরা। রুমমেটদের একদিকে নিজেদের পরীক্ষার চাপ, অন্যদিকে নন্দিনীর পাগলামির চাপ। নন্দিনী সেন্ট জেভিয়ার্সের মেয়ে। সুন্দর চটকদার চেহারা। মেধাবীও। কখনো বেশ আত্মসচেতন কখনো উদাসীন। ভালো পোশাক পরে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে ছোট আয়না বের করে লিপস্টিক লাগায়, কিন্তু তার অন্দরমহলের জীবনধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় জামাকাপড় নোংরা, বিছানায় লালপিঁপড়েদের অবিচ্ছিন্ন লাইন।

ধীরাদিও বলেছিলেন, একটা নোট মুখস্থ করে পাঁচবার লিখবে। আমার একবারও

লিখতে ইচ্ছে করে না। আমি মনে করি তাতে সময় নষ্ট হয়। সেই সময়ে আমি আমার গুটিকয়েক নোটের বাইরে অতিরিক্ত পড়া মুখস্থ করতে পারি। অতিরিক্ত পড়া বলতে ক্লাসিফিকেশন। আমার কাছে মোট তিনটে বই আছে। পার্কার অ্যান্ড হাসওয়েলের ক্লাসিফিকেশন—ইনভার্টিব্রেট ও ভার্টিব্রেট এবং স্ট্রিকবার্জারের জেনেটিক্স। সময় পেলেই আমি ওই তিনটে বই নিয়ে বসি। রপ্ত করি তিনটে বই-ই। জিজ্ঞেস করো ইনভার্টিব্রেটকে মোট কতগুলো ফাইলামে বিভক্ত করা হয়েছে, কোন ফাইলামে কতগুলো সাবফাইলাম আছে, কোন সাবফাইলামে কতগুলো সুপারক্লাস আছে, কোন সুপারক্লাসে কতগুলো ক্লাস আছে, তার নিচে সাবক্লাস, সুপারঅর্ডার, অর্ডার, সাবঅর্ডার, জেনাস আছে সব বলে দেব। স্পিসিস এবং তাদের বিজ্ঞানসম্মত নাম আমার ঠোঁটের ডগায়। সব ঝরঝরে। ভার্টিব্রেটের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। কিন্তু ক্লাসিফিকেশনের পণ্ডিত হলেই রেজাল্ট ভালো হয় না। সিলেবাসে আরও অন্য অনেক কিছু আছে। সেসবের উপযুক্ত তথ্য আমার কাছে নেই। আর যদি অন্য কোথাও থেকে বই জোগাড় হয়, দেড়শো পাতার বিষয় থেকে কতটুকু নিয়ে কুড়ি নম্বরের নোট তৈরি করতে হবে বুঝতে পারি না। জেনেটিক্সে সাইটোপ্লাজমিক অর্গান্যালিস-এর আল্ট্রাস্ট্রাকচার, কেমিক্যাল কম্পোজিশন এবং ফাংশন পড়ে নিয়েছি, প্রোক্যারিওটস এবং ইউক্যারিওটস-এর সেল ডিভিশন এবং ডি এন এ রেপ্লিকেশন-এর ওপরেও যথেষ্ট অধ্যয়ন হয়েছে। বই পড়ে একা একা বাকি সবের গভীর ধারণা পাওয়া বেশ কঠিন।

এমন গুরুতর সময়ে কৃষ্ণা—র‍্যাগিংয়ে হোস্টেলে আমার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা মেয়েটি, গুণ্ডাগিরি করে সিলিং ফ্যানের ব্লেড ভেঙে দেওয়া মেয়েটিকেও বেশ নার্ভাস লাগে। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে সে জানালার সামনে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, ‘‘যাচ্ছি রে বনানী।’’ কৃষ্ণাকে দেখে আমার বুকের ভেতরের বায়ুস্থলী চুপসে যায়। ভয় করে, মনে হয় কৃষ্ণা এমন কোন ঠিকানার দিকে পা বাড়িয়েছে যেখান থেকে বেশ বলশালী না হলে ফিরে আসা অসম্ভব, অথবা প্রায় অসম্ভব। সেখান থেকে ফিরে এলেও শরীরের কিছু অঙ্গচ্ছেদ ঘটবেই ঘটবে, সেখানেই পড়ে থাকবে সেইসব ছিন্ন অঙ্গ। কৃষ্ণাকে আমি আমার শুভকামনা জানাতে পারি না। নিজের অশুভ চিন্তাতে হাত পা কাঁপে, বিছানার উপর চেয়ার তুলে নিই, তার উপর রেখে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে একটি একটি করে ঝালিয়ে নিই গুটিকয়েক নোট।

কেমিস্ট্রির প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা দিতে গিয়ে চৈতালির সঙ্গে আমার বেদম ভুল বোঝাবুঝি হয়। টাইট্রেশন-এর এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সলিউশনের কনসেন্ট্রেশন বের করতে হবে। খাতা কলমে ফর্মুলায় ফেলে হিসেব করে দেখাতে হবে কনসেন্ট্রেশন। সৌভাগ্যবশত চৈতালি এবং আমি একই প্রশ্ন পেয়েছি। ওর দেখাদেখি কোনওরকমে এক্সপেরিমেন্ট করেও নিয়েছি। করার সময় পিপেটে টানতে গিয়ে একগাদা সোডিয়াম হাইড্রাক্সাইড খেয়েও ফেলেছি। তার জন্য

গলায় কেমন একটা ঘেঁষা ঘেঁষা ব্যথা। এক্সপেরিমেন্টের পদ্ধতি লেখার জন্য হাতে কলম ধরতেই বুকেও ব্যথা শুরু হয়। ধড়ফড় করে বুক। সময় কম। চৈতালিকে তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করতে হবে। আমাকেও। কিন্তু আমি একা লিখতেই পারছি না। চৈতালির পেছন পেছন ঘুরছি। এদিকে গার্ডের ভয়ে চৈতালি আমার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে চাইছে। কিন্তু আমি তা হতে দিচ্ছি না, লোহার চেন দিয়ে যেন বাঁধা আছি তার সঙ্গে। মাথা উঁকিঝুঁকি মারছে তার হাতে ধরা কাগজকলমের দিকে। তবু সে কি লিখছে বুঝতে পারছে না মাথা। কার পর কি লিখতে হবে সেটাও ভুলে গেছে। বারবার জিজ্ঞেস করছি 'এটা কি লিখলি' বলে। জিজ্ঞেস করছি, ''মিথাইল অরেঞ্জ-এর রঙটা অ্যালক্যালাইন সলিউশনে কি যেন ছিল?'' এত সরল জিনিস, এক্সপেরিমেন্ট করলাম, চোখেও দেখলাম তবু স্নায়বিক চাপ খুব বেড়ে গেছে। গুলিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। মাণিকা নেই, সেটাও চাপের একটা কারণ।

সে বলে, ''হলুদ।''

''নিউট্রিলাইজেশনে কি ওটা পিংক হয়ে গেল?''

উত্তর নেই। লিখতে ব্যস্ত সে।

''বল না।''

''ও হো, দেখলি না তুই যে ওটা অরেঞ্জ হয়েছিল?''

হাঁ দেখেছিলাম। ভুলে গেছি টেনশনে।

চৈতালি বলে, ''আমাকে আগে লিখতে দে। তারপর তুই লিখিস। আমি পেপার পাস করে দেব তোর কাছে।''

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। চৈতালিকে আমি খুব ভালবাসি। সেও আমাকে ভালবাসে, আমি জানি কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ওর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। কলকাতায় চৈতালি এবং মণিকাই আমার একমাত্র দুর্বলতা। হোস্টেলে মেলামেশার জন্য গুটিকয়েক মেয়ে আছে, দিনের বেশিরভাগ সময়টা, এমনকি রাতেরও অনেকটা সময় আমার তাদের সঙ্গেই কাটে তবু আমি তাদের এত কাছের মনে করি না যেমন ওদের করি। হোস্টেলের মেয়েদের বাড়ির সঙ্গে আমার কোন আত্মীয়তা গড়ে ওঠেনি যেমন ওই দু'জনের বাড়ির সঙ্গে গড়ে উঠেছে। মণিকার মা-বাবা আমাকে ভালো ভালো জিনিস রান্না করে খাওয়ান। চৈতালির মা-বাবা বন্ধুর মতো ব্যবহার করেন। দুপুরে খাওয়া শেষে আমরা যখন বিছানায় শুয়ে জমিয়ে আড্ডা দিই তখন মাসিমা আমাদের দলে যোগদানের জন্য করুণ মিনতি নিয়ে হাজির হন। অন্য সময় মেসোমশাই লাজুক লাজুক মুখ নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর অফিসের গল্প করেন, ঘরের গল্প করেন। চৈতালির বোনকে আমি আমার মাসির মেয়ে বলে মনে করি, চৈতালির ভাইকে মাসির ছেলে। তবু এই মুহূর্তে আমি ওর ওপর আস্থা রাখতে পারছি না। দেরিও হয়ে যাচ্ছে, ভয় করছে পরে আর সময় পাব না ভেবে। আমি ওর হাত ধরে টানাটানি করছি। আমার আচরণে শেষে ভয়ংকর স্বার্থপর হয়ে উঠেছে সেও। বলছে, ''দেব না যা।''

চৈতালি ওর পেপার দেখতে দেয় না। মুখেও কিছু বলে না। একটুও সাহায্য করে না সে আমায় লিখতে। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে শেষে নিজেই কোনরকমে যা তা

লিখে বেরিয়ে পড়ি হল থেকে। আজ আর বাসের জন্য অপেক্ষা করি না। চৈতালি নেই সঙ্গে। মণিকা তো দল থেকে আগেই আলাদা হয়ে গেছে। আজ আমি একা। আজকের 'একা আমি'কে সঙ্গ দেয় টুং টাং ট্রাম—১৯০২ সালে জন্ম নেওয়া এবং এখনও পর্যন্ত জীবন্ত জীবাশ্মের মতো অপরিবর্তিত চেহারা নিয়ে নির্বিকার চিত্তে শহরের বুকে ঘুরে বেড়ানো স্থলযান।

হোস্টেলে ফিরে খাবার টেবিলে ব্যাগ রেখেই বড় ঠাকুরের জন্য চিৎকার ছাড়ি, ভাত দাও। এটা বাড়ি নয়—রেগে গেলে, হতাশ হলে রান্নাঘরে গিয়ে নিজে হাঁড়ি খটখটানো যাবে না। ডাইনিং টেবিলে বসে খালি প্লেট সামনে রেখে 'বড় ঠাকুর'কে হুকুম করেই নিতে হবে ভাত। বড় ঠাকুর আমার রাগ দেখে রান্নাঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। কিন্তু তাঁর হাতে আমি কোন ভাতের গামলা দেখি না। আমার অজানা কারণবশত তৈরি হওয়া রাগের কবলে পড়ে দিশেহারা উনি বহন করেছেন তাঁর বিখ্যাত ভাতের মাড় মেশানো ডালের গামলা। উনি আমাকে রাগের কারণ জিজ্ঞেস করেন না। এমন সঙ্কটকালে প্রয়োজন নেই কারণ জানার, প্রয়োজন আছে রাগ প্রশমিত করার, বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে। ওঁর বিশ্বাস একমাত্র ওঁর ভাতের মাড় মেশানো ডালেই আছে সেই অদ্ভুত শক্তি। গামলা থেকে দু'হাতা ডাল ঠাকুর আমার প্লেটে ঢেলে ফোকলা মুখে বলেন, "রাগ করে না লক্ষ্মীটি, দাল খাও, মাথা থান্দা হবে।" আজ বড় ঠাকুরের ডাল শুধু আমার মাথার চুলই ঘন করবে না, মাথাকে ঠাণ্ডাও করবে।

স্নান হল না। মন সারাদিন ভীষণ ভারাক্রান্ত রইল। বিকেলে 'না, একটা বোঝাপড়া করতেই হবে' সিদ্ধান্ত নিয়ে চৈতালির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই। উঠে বসি বাসে। বাস পৌঁছতে একঘণ্টা সময় নেয়। সেই একঘণ্টা আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি, দৃষ্টিপাত করি পৃথিবীর নাট্যমঞ্চের বড় পর্দার ওপর। সেখানে লোকজনের মাঝখানে হাসি দেখি, কান্না দেখি, রাগ দেখি, অনুরাগ দেখি, মিল দেখি, অমিল দেখি, প্রেম দেখি, বিরহ দেখি। সবকিছু দেখলেও সবকিছুকে মনোহর দৃশ্যপট বলে মনে হয় না। সবকিছুর মধ্যে থেকে হাসি, অনুরাগ, মিল, প্রেম উঠিয়ে নিয়ে আমি এক নতুন দৃশ্যপট রচনা করি। এ এক অন্য পৃথিবী। আমার মাথায় অন্য ভাবনা আসে। ভাবনা বলে দোষটা আমারই, সমস্যাটা আমারই। দুটো বছরকে হেলায় চলে যেতে দিয়েছি এটা আমার দোষ, পরীক্ষার হলে নার্ভাস হয়ে পড়েছি এটা আমার সমস্যা, চৈতালির খাতা ধরে টানাটানি করেছি এটা আমার দোষ, সাহায্য না পেয়ে ওর ওপর রাগে অভিমানে ফুলে উঠেছি এটা আমার সমস্যা। আমারই সব। সুতরাং নরম আমাকেই হতে হবে। মণিকাকে আর আগের মতো করে পাব না। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু দেখা সাক্ষাৎ তো কম হয়ে যাবেই। আমি যখন পার্ট টু দেব, সে দেবে পার্ট ওয়ান। বেশিরভাগ সময়টাতে সে ঘরেই থাকবে, ক্লাসে আসবে মাঝে মাঝে। ওর ক্লাস। হয়ত ওর ক্লাসের কারও সঙ্গে আবার ওর এমনই বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে, গড়ে তুলবে সে, একা একা এতটা সময় কাটানো সম্ভব নয় তাই। কখনো দেখা হলে তার মুখে নতুন বন্ধুর গল্প শুনে খুশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি

মনে চাপা কষ্ট অনুভব করব। এসবের মাঝখানে চৈতালির সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হলে অসহনীয় হবে দিনগুলো।

চৈতালির বাড়ি গিয়ে দেখি সে চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে শুয়ে আছে। আমাকে পেয়েই মাসিমা জিজ্ঞেস করেন, ‘‘তোদের নিশ্চয় ঝগড়া হয়েছে?’’

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকি।

‘‘কি ঠিক ধরেছি বল?’’

মাথা আমার নিচুই থাকে। আমি নিরুত্তর।

মাসিমা বলেন, ‘‘আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল। কলেজ থেকে ফিরে স্নান খাওয়া কিছুই করেনি। এভাবেই শুয়ে রয়েছে।’’

চৈতালির মুখের ঢাকাটা সরিয়ে দিয়ে সরি বলি। সে উঠে বসে, হাসে, আমাকে জড়িয়ে ধরে, ‘‘ইট’স অল রাইট।’’

মাসিমা আমাদের দু’জনকে খেতে বসিয়ে দেন। পাতে পড়ে ভাত, ডাল, তরকারি, মাছের ঝোল। উপদেশ দেন, ‘‘মিলেমিশে থাক বাবা তোরা।’’

‘‘হ্যাঁ মাসিমা।’’

‘‘এখন তো শুধু তোরা দু’জনই আছিস।’’

‘‘হ্যাঁ মাসিমা।’’

‘‘আজ পরীক্ষা কেমন হল?’’

খুব খারাপ। মনে হচ্ছে না পাশ করতে পারব। ‘‘ভালো মাসিমা।’’

‘‘দাদা কেমন আছে?’’

‘‘ভালো মাসিমা।’’

‘‘বাড়ি থেকে চিঠিপত্র পেয়েছিস? মা-বাবা কেমন আছেন?’’

‘‘ভালো মাসিমা।’’

‘‘মন খারাপ করলেই এখানে চলে আসিস কেমন? দুই বোনের মতো থাকবি তোরা। একদম ঝগড়াঝাঁটি নয়।’’ মাছের আরেকটা বড় পিস আমার থালায়।

‘‘ঠিক আছে মাসিমা।’’

তবু আমার মনে একটা কিন্তু থেকে যায়। আমি খবর পেয়েছি, চৈতালি আমাকে বলেনি কিন্তু মণিকার কাছে স্বীকার করেছে যে সে নিজেই অপুদার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। যে অপুদার সঙ্গে ভালবাসাবাসির সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে বলে ওর রাঙ্গা কাকার সন্দেহ প্রকাশ এবং তাতে রেগে গিয়ে ওর নিজের বাড়ি থেকে মণিকার বাড়িতে পলায়ন সেই অপুদাকেই সে এখন জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চাইছে। ক্লাসের মেয়েরা এমনিতেই বিয়ের বাজারে লাইন লাগিয়েই ফেলেছে। মণিকাকে সে লিখেছে চিত্তরঞ্জনে যখন অপুদা আমাকে তার সাইকেলের পেছনে বসিয়ে ঘুরছিল, যখন সে আমার প্রতি বেশি আগ্রহ রাখছিল তখন তার নিজেকে উপেক্ষিত মনে হয়েছে। হিংসে হয়েছে আমার ওপর। যে মানুষটাকে সে এত বছর ধরে এত কাছে পেয়ে এসেছে সে হঠাৎ করে দু’দিনের পরিচয়ে অন্য কারও অধিকতর কাছে চলে যাবে সহ্য হয়নি। অন্তর্দর্শন করতে পেরেছে সে আমারই কারণে। তার জন্য এতটুকু ধন্যবাদ

জানানো নেই। উল্টে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে চৈতালি, অপুদাকে এতটাই কাছে টেনে নিয়েছে যে সে আমার সঙ্গে বোনের সম্পর্ক পাতিয়েই উধাও হয়ে গেছে।

পুতুলের বিয়েতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল না। পুতুলের বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়েছিল মণিকা এবং আমাদের পরের ব্যাচের মেয়েরা। শুনেছিলাম বিয়ের দিন বাবার জন্য খুব কেঁদেছিল সে। বাবার জন্য মন খারাপ করলেও ফুলশয্যা স্থগিত রাখা যায় না। তাই বিয়ের পর প্রথমদিন কলেজে এলে মেয়েরা অদমনীয় কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কি হল সেই রাতে?

পুতুল বলেছিল, ‘‘কিছুই হয়নি।’’

মেয়েরা মানতে চায়নি সে সত্যি কথা বলছে। ‘‘তাই হয় নাকি! বল না বল না কি হয়েছিল।’’

‘‘শুধু একটা কিস করেছিল আমাকে।’’

‘‘কোথায় করেছিল?’’ যদি একটাই কিস করে থাকে তবে তা কপালে না ঠোঁটে না গলায় না বুকে মেয়েরা জানতে খুব উৎসুক।

‘‘আরে বাবা কপালে।’’

‘‘ধ্যুস!’’ মেয়েদের উত্তেজনায় জল ঢালে পুতুল।

‘‘তাছাড়া আবার কোথায় হবে! ও যখন আমার কপালে চুমু খেয়েছিল আমি তো কেঁদেই ফেলেছিলাম।’’

মণিকা বলেছিল, ‘‘সে কিরে! ফুলশয্যার রাতে বর ঘরে ঢুকলেই আমি তো তাকে বলব, এই যে গুরু মাল রেডি।’’

ক্লাসের আরেকটি মেয়ে হেসেছিল, ‘‘তোর বর ভয় পেয়ে যাবে রে! দেখবি সে ‘ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি’ বলে দরজার দিকে দৌড়চ্ছে।’’

‘‘দৌড়লেই হবে নাকি! আমিও ছুটব না ওর পেছন পেছন! জামার কলার ধরে টেনে নিয়ে আসব।’’

‘‘ফুলশয্যার রাতে বর শার্ট পরে থাকে না যে তার কলার ধরে টানাটানি করবি। পাঞ্জাবি পরে থাকে।’’

‘‘তাহলে পাঞ্জাবি ধরে ঝুলে যাব।’’

ভাঙা হৃদয়

প্রেম আমার দ্বারা আর হয়ে উঠল না। হোস্টেলে তপতী বহু আগেই, ফার্স্ট ইয়ারেই প্রেমের বারি খেয়ে হৃদয় ভেঙে বসে আছে। ছেলেটি মেডিক্যাল কলেজে পড়ত। নাম কেতু। তপতী যেমন বলত তাতে মনে হত কেতু খুব ভালবাসত ওকে। সে কেতুর হোস্টেলে যেত। সেখানে কেতুর সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্কও হয়েছিল একাধিকবার। কেতুর বাড়ি ও তপতীদের বাড়ি কাছাকাছি। বীরভূমে। তপতী একবার কেতুকে কলকাতায় ফেলে মাসখানেকের জন্য বাড়ি গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে কেতু তাকে ছেড়ে সহপাঠীর সঙ্গে প্রেম করছে। তখন ঘোর বিপর্যয় তার জীবনে। সারাদিন কান্নাকাটি 'কেতু আমার সব নিয়ে আমাকে প্রতারণা করেছে' বলে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, কলেজে যাওয়া নেই, লেখাপড়ার তো নামগন্ধই নেই। পড়াশোনা ছেড়ে দেয় আর কি। দিব্যানি অনেক সামলেছে তপতীকে। এমনকি চেয়ে না চেয়ে আমাকেও অনেককিছু ত্যাগ করতে হয়েছে তার জন্য। তপতীর প্যানপেনে কান্নায় বেশ কিছু রাত অনিদ্রায় কাটাতে হয়েছে। ধীরে ধীরে প্যানপেনে কান্নার মধ্যে যখন ঘুমোতে অভ্যস্ত হলাম, এক রাতে ফুসুর-ফুসুর কথা এবং খুকর খুকর হাসির শব্দে ঘুম ভাঙল। কেঁদে জাগালে বিরক্ত হতাম না। হেসে জাগিয়েছে বলে রাগ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করি, "কি করছিস রে তোরা?"

দিব্যানির হাসি জোরালো হয়। 'এই জেগে গেছে রে' বলে সে নাইটির মধ্যে কিছু একটা লুকোয়।

"কি লুকোলি রে?" বেড়ে গেল আমার কৌতূহল।

"তোকে বলব কেন?"

"কেন বলবি না?"

"এমনি।"

দেখি ওদের মুখ নড়ছে। খাচ্ছে কিছু।

খুব চেনা-পরিচিত গন্ধ নাকে আসে। ছুটে গিয়ে দিব্যানির নাইটি নিয়ে টানাটানি শুরু করি। টানাটানি পরে ধস্তাধস্তিতে পরিণত হয়। ধস্তাধস্তির শেষে দিব্যানির প্যান্টির কাছ থেকে উদ্ধার হয় আমার নারকেলের নাড়ুর বোতল। মাত্র পাঁচটা পড়ে আছে তলানিতে। দুর্গাপুজোর পর বাড়ি থেকে একটা হরলিক্সের খালি শিশিতে ভরে নারকেলের নাড়ু নিয়ে এসেছিলাম। সেখান থেকে আগেই ভাঙ্গা হৃদয় জোড়া লাগানোর চেষ্টায় তপতীকে খাইয়ে অর্ধেকটা খালি করে দিতে হয়েছিল। আমার টেবিলের সঙ্গে লাগানো বুকশেলফে রাখা ছিল তা। তার ওপর আজ আবার এই আক্রমণ। কেতুর ভ্রষ্টাচারের চাবুকে ফাটা হৃদয় নিয়ে মাঝরাতে দিব্যানির বুকে মাথা গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ তপতীর নাকি আবার নারকেলের নাড়ু খাওয়ার শখ হয়েছে। আমি রাগে ফেটে পড়ি। বেশি রাগ হয় কেতুর ওপর। কেতুর ভ্রষ্টাচারের চাবুক আমার ওপরও এসে পড়েছে বলে।

আমার প্রেমিকের খালি জায়গাতে ভিড় করেছে যতকিছু সৃষ্টিছাড়া গণ্ডগোল। পার্ট ওয়ানে চৈতালি এবং আমি দু'জনই এক নম্বর পেলম। ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট

ফাইভ পার্সেন্ট। পার্ট টু-এর জন্য চৈতালি ধীরাদির কাছেই পড়বে। এবার আমাকেও কিছু একটা করতে হবে। সুতপাও হোস্টেল ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং ওর কাছে থেকে নোট আর পাওয়া যাবে না। ঠিক করি সেতার শেখা কিছুদিন বন্ধ রেখে সুতপার সেই স্যারের কাছেই যাব—ওঁর বেতন কম—মাত্র একশো টাকা। কিন্তু বাধা এল অন্য দিক থেকে। যে টিউশন পড়িয়ে আমার টাকা রোজগার করা সেই টিউশনটাই আর রইল না। আমিই ছেড়ে দিলাম মাস শেষ করে দু'শো টাকা হাতে নিয়ে। চন্দনী একটা সমস্যা তৈরি করেছে। একদিন যখন আমি অঙ্কের একটিও প্রশ্ন ধরতে পারছে না বলে টিউশনের মেয়েটির একটি কান বেশ কয়েকবার মলে লাল করে অন্যটিতে প্রথম টান দিই চন্দনী এসে আমাকে আড়ালে ডাকে, "দিদিভাই একটু আসেন এদিকে।" ভাবি সে বুঝি বলবে, এত মারবেন না। কাল রাতে পিঠের ঘুষির ব্যথায় সে ঘুমোতে পারেনি। বললে আমি বলব, একটাও হোমওয়ার্ক করে রাখে না, ঘরে বই খুলে বসে না, দায় আমার, তাহলে তুমিই পড়াও ভাই, আমি চললাম। কিন্তু না, চন্দনী একদমই অন্য কথা পাড়ল, "দিদিভাই, আপনার হোস্টেলে শ্রাবণী নামে একটি মেয়ে থাকে, তাই না?"

"কেন বলো তো?"

"পনেরো নম্বর রুমে থাকে?"

"কেন জানতে চাইছ?"

"বনগাঁর মেয়ে?"

"কেন?"

"বেথুনে পড়ে?"

"কেন বলো?"

"অঙ্কে অনার্স?"

আমার 'কেন'র উত্তর না দিয়ে সে শুধু আমার বিস্ময় বাড়িয়েই চলেছে দেখে এবার আমি চুপ থাকি। কিন্তু মুখে বিরক্তি ঢেলে দিই।

"আপনারা একই ইয়ারের?"

আমি চুপ। মুখে বিরক্তি প্রকট।

"ওকে আমার ভালো লাগে।"

শুনে আমি অবাক।

চন্দনী জিজ্ঞেস করে, "আপনি একটা কাজ করতে পারবেন দিদিভাই?"

আমি এবারও আমার মৌনতা ভঙ্গ করি না। ভ্রূ কুঞ্চিত করে অপেক্ষা করি কি কাজ করতে বলছে শোনার জন্য।

"এটা শ্রাবণীকে আপনি দিতে পারবেন?" পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে আমার সামনে ধরে সে।

রাগে আমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। *আমাকে দিয়ে এসব কাজ করাবে বলেই কি ছেলেটি আমার সঙ্গে দিদি-ভাইয়ের সম্পর্ক পেতেছে! টিউশন দিয়েছে! বছর দশেকের ছোট একটি মেয়ে আমি হলাম ওর দিদি এবং দিদির বান্ধবীর সঙ্গে ওর প্রেম করার ইচ্ছে।*

"না ভাই, এসব কাজ আমার দ্বারা হবে না," স্পষ্ট জানিয়ে দিই। পরের কয়েকদিন আমি গম্ভীর মুখকে আরও গোমড়া বানিয়ে পড়াতে যাই এবং মাসান্তরে মাইনে হাতে নিয়ে কেটে পড়ি। চন্দনী আমার কেটে পড়ার কারণ বুঝতে পেরে একদিন সেই দোকানেই যেখানে আমরা ভাইবোন সম্পর্কে বাঁধা পড়েছিলাম বলে, "দিদিভাই আপনি আমাকে ভুলে গেলেও আমি কিন্তু আপনাকে ভুলব না। কখনও কোন দরকার হলে বলবেন, আমি আছি আপনার সঙ্গে।" রাগে গজগজ করতে করতে ভাবি ওকে বলি, "আমার মাসে মাসে টিউশন না পড়িয়ে একশো টাকা দরকার নিজের টিউশনের জন্য। দিতে পারবে?" কিন্তু ভাবনা ভাবনাই থাকে, কিছুদিন পর আমি দু'শো টাকা নিয়েই রামমোহন কলেজের সেই স্যারের কাছে যাই দু'মাস পড়ব বলে।

চন্দনীকে আমি অন্য এক সময় অনেক মনে করেছিলাম। হোস্টেলের বাইরের দিকের বারান্দার পরে কয়েকটি ছাদ ছাড়িয়ে একটু দূরে আরেকটি ছাদে প্রত্যেক বিকেলে একটি ছেলে চড়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। তার জন্য বারান্দায় দাঁড়াতে রীতিমত অস্বস্তি হত আমাদের। আমার ঘরেও অস্বস্তি হত। কারণ আমার বিছানার পাশের জানালাটা খুললে আমি সেই ছেলেটিকে দেখতে পেতাম। ছেলেটিও দেখতে পেত আমাকে। ঘরের মধ্যে গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারতাম না। মনে সর্বদা অশান্তি অশান্তি ভাব। জানালা না খুললে দেখি ঘরে আলো বাতাস পর্যাপ্ত নয়। এতদূর থেকে চিৎকার করে বলা যায় না, এই যে ওভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। যে বাড়ির ছাদে সে দাঁড়িয়ে থাকে সেই বাড়িতে কি করে কোন গলির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাও জানি না। তাই ছেলেটিকে সংস্কৃত করতে আমিই নিজেই একটু অসংস্কৃত হয়ে পড়ি। ওকে অনুকরণ করতে শুরু করি। সে আমার দিকে তাকায় তো আমিও তাকাই ওর দিকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নেয় আমিও স্থির রাখি আমার দৃষ্টি, সে তার গালে হাত রাখে তো আমিও হাত রাখি আমার গালে, সে সামনে পেছনে হাঁটে তো আমিও হাঁটি একইভাবে। বেশ কয়েকদিন চলে এমন। তারপর একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে সবে ট্রাম থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে হোস্টেলের দিকে পা রেখেছি সামনে এসে দাঁড়ায় সে। বলে, "আপনি রোজ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আমাকে নকল করেন।" বলল বলেই বুঝলাম এই ছেলে হল সেই ছেলে।

আমি তাকে না চেনার ভান করি, "আপনি ভুল করছেন। অন্য কারও কথা আমার ওপর চাপাচ্ছেন।"

"না ভুল, করিনি। আপনাকে আমি ঠিকই চিনেছি।"

তবু স্বীকার করি না। "দেখুন আমাকে এসব উল্টোপাল্টা কথা বলবেন না," বলেই তাড়াহুড়ো করে কেটে পড়ি।

ছেলেটি পরদিনও আমার রাস্তা আটকে ধরে, "আপনিই সেই মেয়ে।"

"কি যা তা বলছেন!"

"মোটেও যা তা নয়।"

"মিথ্যে কথা বলে আমাকে বিরক্ত করলে আমি কিন্তু পুলিশ ডাকব।"

"ডাকুন। মিথ্যে কথা আমি বলছি না, আপনি বলছেন।"

আমি আর কোন জবাব না দিয়ে হাঁটার স্পীড বাড়িয়ে দিই। ছেলেটি ছেড়ে দেয় আমায়। পরের কয়েকদিন রুমের জানালা কম খুলি। বারান্দাতেও কম দাঁড়াই। কখনো ছেলেটিকে দেখি, কখনো দেখি না। যখন সে ছাদে ওঠে আগের মতোই আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়ত কিছু বোঝার চেষ্টা করে। তারপর আবার একদিন রাস্তায় আমায় ধরে ফেলে। তখন আমার মাথায় চন্দনীর কথা বিদ্যুতের মতো খেলে যায়। ভাবি আজকে সমস্যার কিছু একটা সমাধান করতেই হবে। না পারলে চন্দনীকে ডাকতে হবে। চন্দনীর কথা মনে হতেই আমি বেশ সাহসী হয়ে উঠি। ছেলেটিকে বলি, ‘‘হ্যাঁ আমিই আপনাকে নকল করতাম। তো?”

‘‘তো কি! এরকম করবেন না।”

‘গত কয়েকদিন করেছি?”

‘‘না। কিন্তু আগে অনেকবার করেছেন।”

‘‘কারণটা জানেন না?”

‘‘কি কারণ?”

‘‘বাহ্! বেশ তো! আপনি আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতেন কেন?”

‘‘কিভাবে তাকিয়ে থাকতাম? খারাপ তো কিছু ভাবিনি!”

‘‘যা হোক, মানলেন যে তাকিয়ে থাকতেন। আমি কি করে জানব কি আছে আপনার মনে? তাছাড়া মেয়েদের দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকা ঠিক নয়। বোঝেন না তাতে তাদের চলাফেরায় স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়? আবার অভিযোগ করছেন আমি আপনাকে অনুকরণ করি বলে!”

‘‘আপনাকে ভালো লাগে তাই।”

‘‘এত দূর থেকে দেখে ভালো লেগে গেল! অদ্ভুত! রাস্তা ছাড়ুন। না হলে এবার চিৎকার করব।”

ছেলেটি মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চলে এলাম।

হোস্টেলে ফিরে দেখি মেয়েদের মধ্যে ফুসুর-ফুসুর। কানাকানি হচ্ছে কথা। সে কথা সবাই জানছে। শুধু আমি জানছি না। আমাকে আড়াল করে ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে। আমার মনে হল কেউ ছেলেটির সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখে নিয়েছে। কথা তো তার সঙ্গে একদিন বলিনি। তিন চারদিন বলেছি। সে-ই পথ আটকেছে আমার। এই কথা আবার মামিসার কানে যাবে। মাসিমা মুখে কিছু বলবেন না। কিন্তু মুখ বাঁকিয়ে থাকবেন। কয়েকদিন তাঁর মেয়ের বাড়ির কুকুর বেড়ালের গল্প থেকে আমাকে মুক্তি দেবেন। কথা উমাদির কানে যাবে। উমাদি সুপারের কানে লাগাবেন, তারপর মিটিং ডাকবেন ধমক দিতে। বোর্ড অফ রেসিডেন্স থেকে হোস্টেল ছাড়ার নোটিশ নিয়ে এসে ধরিয়েও দিতে পারেন হাতে। হোস্টেলে আমাকে নিয়ে ইতিমধ্যেই আরেকবার মিটিং ডাকা হয়ে গেছে। তখন আমার ঝামেলাটা হয়েছিল রূপমের সঙ্গে। শবরীদির বেশি কাছাকাছি হওয়ার কারণে কিনা জানি না আমি রূপমের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলাম। আমি ছিলাম গ্রামের মেয়ে। ইংরেজিকে ভিনদেশের ভাষা মনে করে দূরে সরিয়ে রাখা মেয়ে। রূপমের বাবা ডিফেন্সে চাকরি করতেন। বাবার চাকরির সূত্র ধরে ভারতের বিভিন্ন শহরে ঘুরেছে রূপম। সেখানকার

সেন্ট্রাল নাকি এয়ার ফোর্স স্কুলে পড়েছে। ইংলিশ মিডিয়ামে। সে নিজেকে উচ্চ শ্রেণীর বলে মনে করে। উচ্চ শ্রেণী বলতে অভিজাত সম্প্রদায়। কথার মাঝে ইংরেজি শব্দ স্টাইলের সঙ্গে উচ্চারণ করে, বাংলা পড়তে লিখতে জানে না বলে অহংকার করে। খুব সেন্টিমেন্ট নিয়ে চলে। কোন কথায় রাগ হয়ে যায় বোঝা দুষ্কর। রূপম রেগে গেলে লোহার মতো শক্ত গলায় কথা বলে। হোস্টেলের মেয়েদের কাছেও আমার চেয়ে রূপমের মান অনেক বেশি। সেই রূপম কিছুদিন ধরে অনৈতিকভাবে আমাকে অনেক চাপে রেখেছে। ঘরে আমি স্টাডি টেবিলের লাইট জ্বালিয়ে পড়লে ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, এমন রাগারাগি শুরু করে যে অনেক সময় আমি পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে অসময়ে শুয়ে পড়তে বাধ্য হই। ঘরের আলনাতে আমার জন্য বরাদ্দ শেলফে জামাকাপড় রাখলেও তার মুখে বিরক্তি—বলে তোর জামা আমার জামাকে টাচ করছে। বাইরে জামাকাপড় মেললে তা সরিয়ে দিয়ে সেখানে নিজের জামা মেলে সে। বাথরুমে আমার লাইনে জোর করে ঢুকে পড়ে। একদিন আমি আমার লাইনে ওকে কিছুতেই ঢুকতে দিইনি। তাই সে ‘ও বেরোতে দেরি করেছে, আমার কলেজ মিস হয়েছে’ বলে গোলমাল শুরু করল। রূপমের সঙ্গে আমার ঝামেলার খবর তিনতলার সব মেয়েরা পেল। দোতলার মেয়েরা পেল। একতলার মেয়েরা পেল। হোস্টেলের মেট্রন এবং সুপারের কাছেও পৌঁছে গেল খবর। আমি রূপমকে তিনতলা, দোতলা, একতলার বিভিন্ন রুম থেকে প্রায়শই বের হতে দেখি। দেখি ধীরে ধীরে সব মেয়েরা আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করছে। নিশ্চয় সে আমাকে নিয়ে তাদের কান ভারি করেছে। এমনকি নীনাদি, যে দাদা ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন জেনে তাঁকে বিয়ে করার জন্য পাগলামি শুরু করেছিল সেও আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

নীনাদির সঙ্গে আমার এধরনের কথাবার্তা হত—

—এই বনানী, তোমার দাদাকে বলো না আমাকে বিয়ে করতে।

—তা কি করে হবে! উনি তো তোমাকে চেনেনই না।

—চিনতে কতক্ষণ লাগে? কলকাতায় ডেকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।

—আমার দাদা আমার কথা শুনবেন কেন?

—কেন শুনবেন না! তুমি তো তাঁর আদরের ছোট বোন।

—তা হোক, উনি আমার সঙ্গে বেশি কথা বলেন না।

—বিয়ের কথা শুনলে বলবেন দেখো।

—আমাদের বাড়ির ছেলেরা প্রেম করে বিয়ে করবে না। সে সাহস নেই।

—তাহলে বাড়িতে আমার কথা বলো। তোমার মা-বাবাকে আমাদের বাড়িতে মেয়ে দেখতে আসতে বলো।

—আমাদের গ্রামে বাড়ি। তুমি সেখানে থাকতে পারবে না।

—ঠিক থাকতে পারব।

—গ্রামের বাড়িতে অনেক কাজ করতে হয়।

—কি কি কাজ?

—যেমন মাটির ঘর-উঠোন ঝাঁট দেওয়া, গোবর দিয়ে সেসব মোছা, ঘুঁটে দেওয়া...

—সব করব।
—ধান সেদ্ধ করতে পারবে?
—হ্যাঁ।
—মুড়ি ভাজতে পারবে?
—শিখে নেব। কিন্তু আমার একটাই সমস্যা।
—কি?
—শীতকালে ঠাণ্ডায় আমি কাজ করতে পারি না।
—তাহলে কি হবে?
—কি আর হবে! শীতের দু'তিন মাস ছেড়ে বাকি সময়টাতে তো করব।

তপতী শুনে বলেছিল, "নীনাদিকে বল তাহলে তো দাদার একটা শীতকালীন বউ দরকার।"

সুপারিন্টেনডেন্টের ঘরে রূপমের সঙ্গে ঝামেলার মিটিং-এ গিয়ে দেখি বিছানার একপাশে উমাদি এবং সুপারিনন্টেনডেন্ট বসে, সামনে মেঝেতে একপাশের দেওয়াল ঘেঁষে দলবদ্ধ হয়ে আছে হোস্টেলের সব মেয়ে। শবরীদিও আছে ওদের সঙ্গে, একটু দূরত্ব রেখে। আমি আসামী বসি অন্য পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে। একা। সুপারিন্টেনডেন্ট হাই পাওয়ারের চশমার পেছনে অর্ধনিমীলিত চোখ নিয়ে তাঁর চিরভগ্নস্বর একদমই নিচে নামিয়ে উমাদিকে কিছু বলেন। কথা শোনা গেল না, হাবভাবে বুঝলাম উনি উমাদিকে মিটিং শুরু করার আদেশ দিলেন। শুরু করলেন উমাদি, "বলো রূপম, তোমার যা যা বলার আছে।"

হোস্টেলের পঞ্চাশটি মেয়ের মনোবল সঙ্গে নিয়ে বুকের পাটা শক্ত করে রূপম তার অভিযোগের ঝুলি খুলে দেয়। প্রথমে বলে আমার স্টাডি লাইট জ্বালানোর কথা। উমাদি মেয়েদের জিজ্ঞেস করেন, "কি মেয়েরা, সত্যি বলছে রূপম?" মেয়েরা বলে, "হ্যাঁ।"

সুপারিন্টেনডেন্ট আমার দিকে মুখ উঁচু করে তাকান। বুঝি উনি আমার কাছে ব্যাখ্যা চাইছেন। আমি বলি, "লাইটটি তো আমার। আমি তো ওর লাইট জ্বালাতে যাইনি!"

"তা হোক, রুমমেটদের সুবিধে-অসুবিধের খেয়াল রাখতে হয়।" হোস্টেলে আমার দেরি করে ফেরার কারণে এবং তাঁর মেয়ের জন্য দাদাদের দিয়ে টপ, সোয়েটার না আনাতে পারার কারণে মনের গভীরে তৈরি হওয়া যন্ত্রণা ভুলতে পারেন না উমাদি। বলেন, "তুমি সারাদিন বাইরে ঘুরে বেড়াও কেন? দিনের বেলায় তো পড়তে পারো।"

"হোস্টেলের নিয়মাবলীতে এমন কোন কথা নেই। আমি আমার লাইট সারারাত জ্বালিয়ে পড়তে পারি এবং তা করতে না দিলে নিজেই অভিযোগ করতে পারি পড়তে দেওয়া হচ্ছে না বলে। কিন্তু আমি তা করিনি। হোস্টেলের অনেক মেয়েরাই রাতে লাইট জ্বালিয়ে পড়ে। আমাকে পড়তে দেওয়া না হলে তাদেরও পড়া বন্ধ করতে হবে।"

"তাদের রুমমেটরা মেনে নিয়েছে। তোমার রুমমেট মানছে না। কি করবে তুমি?"

"আমি কিছুই করব না। আপনি করুন। ওকে এমন একটি রুমে দিন যেখানে

মেয়েরা রাত ন'টায় ঘুমিয়ে পড়ে।" শুনে কয়েকটি মেয়ে মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বোধ হয় তারা চায় না রূপম তাদের রুমে গিয়ে পড়ুক।

আলনার কথায় বলি, "ওর যদি এতই সমস্যা হয় আমাকে নিচের রডটি দিন। ওর জামাকাপড় আমার ওপর এসে না পড়ে তার খেয়াল যেন সে রাখে।"

সুপারিন্টেনডেন্ট ভাঙ্গাস্বরে আমাকে সমর্থন করেন, "সেটাও হতে পারে।"

"রূপম বলে আমি নিচের তাক নেব না।"

আরও কয়েকটি মেয়ে মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

রূপম বলে, "ও রুমে অনবরত খুটখাট আওয়াজ করে। আমার অসুবিধে হয়।"

"এত আওয়াজ করো কেন?" মেট্রনের প্রশ্ন।

"আমার তো মনে হয় না আমি বেশি আওয়াজ করি। রূপম অনেক জোরে জোরে পড়ে। তাতে পড়ার সময় আমার মনোযোগ ব্যহত হওয়ার কথা। সারা বছর ওর সাইনাসের সমস্যা থাকে। নাক ফচফচ করে। তাতেও আমার অসুবিধে হওয়ার কথা। পাশের রুমের থেকে নন্দিনী ও অন্যান্য মেয়েরা ব্যালকনিতে বেরিয়ে আমার জানালার বাইরে পায়চারি করতে করতে জোরে জোরে পড়ে। তাতেও আমার অসুবিধে হওয়ার কথা। তাদেরকে তাহলে বলে দেবেন এসব না করতে।"

আরও কিছু মেয়ে উঠে গিয়ে খালি করে দিল সুপারিন্টেনডেন্টের রুম।

রূপম বাথরুম থেকে আমার দেরি করে বেরোনোর কথাটা ওঠায়। আমি বলি, "আমিও ওকে আমার পার্ট ওয়ানে রেজাল্ট খারাপ হওয়ার জন্য দায়ী করতে পারি।"

সুপারিন্টেনডেন্ট মিনমিন করেন, "ঠিকই তো বলেছে বনানী।" রূপমকে বলেন, "একটু মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়। তুমি বড়।"

কথাটা মেয়েদের মধ্যে শুধু রূপম শুনল এবং আমি শুনলাম। কেননা বাকি সব মেয়েরা চলে গিয়েছিল নিজেদের রুমে।

দু'তিনদিন সংকুচিত হৃৎপিণ্ড নিয়ে, মেয়েদের সঙ্গে কথা প্রায় বন্ধ করে দিয়ে কাটানোর পর জানলাম মেয়েদের ফুসুর-ফুসুরের কারণ হল চন্দনী। চন্দনী নাকি শ্রাবণীকে প্রেমপত্র পাঠিয়েছে। মানে যে প্রেমপত্রটি সে আমাকে দিয়ে পাঠাতে চেয়েছিল সেটা সে অন্য কারও মারফৎ শ্রাবণীর হাতে পৌঁছে দিয়েছে। শ্রাবণী ভয় পাচ্ছে ছেলেটি আবার বাইরে তাকে কোনোভাবে জ্বালাতন না করে। মেয়েরা ভাবছে চন্দনী যেহেতু আমার পাতানো ভাই, এই প্রেমপত্র লেখাতে আমার সমর্থন আছে। কিন্তু আমি খুব প্রতিবাদী জেনে এবং তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই ভেবে আমাকে ঠিক অভিযুক্তও করতে পারছে না। এছাড়া এমন হওয়াটাই খুব প্রত্যাশিত যে আমাকে নিয়ে মিটিং ডাকা হলে আবার দেখা যাবে সুপারিন্টেনডেন্টের ঘরে শেষপর্যন্ত বসে আছে শ্রাবণী অর্থাৎ মূল অভিযোগকারী এবং আমি—আর কেউ নেই। সুপারিন্টেনডেন্ট শ্রাবণীকে ভাঙ্গা গলায় উপদেশ দিচ্ছেন, এমন করো না। হোস্টেলের বদনাম হয়ে যাবে। খবর পেয়ে বোর্ড অফ রেসিডেন্স কি সিদ্ধান্ত নেবে কে জানে! ইশ্!

ব্রা চুরি

অনেকে চুপচুপ করে অনেক অকাজ করে যেগুলো আমি পারি না। বালুরঘাট থেকে একটি নেটের উপর লেস বসানো সুন্দর ব্রা কিনেছিলাম। রেজিনা কম্পানির। সাতাশ টাকা তার দাম। তখন 'ব্রা'কে আমরা ব্রা বলতাম না, ব্রেসিয়ার বলতাম। ব্রেসিয়ার অনেকে ব্লাউজের নিচে ঢেকে শুকোতে দিত, ব্লাউজ না থাকলে টেপজামার নিচেও মেলা হত। হোস্টেলে নৃপেনদা আছেন। বড় ঠাকুর, ছোট ঠাকুর আছেন। আমাদের মা-মাসিমা জাতীয় মেয়েরা প্যান্টি পড়েন না। যখন থেকে ফ্রক ছেড়ে শাড়িতে পদার্পণ, সে বারো বছর বয়সেই হোক অথবা দশ অথবা আট, প্যান্টি বাদ। এমনকি আমার দিদির কিংবা আমার বয়সি মেয়েরা যারা গ্রামে থাকে তাদের ক্ষেত্রেও একই অনুশাসন বর্তমান। তারা একটু দেরিতে শাড়ি ধরে, সুতরাং দেরিতে প্যান্টি ছাড়ে এই যা। আমি শাড়িও ধরিনি, প্যান্টিও ছাড়িনি। ধরলেও ছাড়তাম না। হোস্টেলের মেয়েরা কেউ কেউ আমারই মতন। হয় আগে থেকেই ছিল নতুবা হোস্টেলে এসে হয়েছে। আমি ব্রেসিয়ার প্যান্টি দড়িতে খোলা মেলে দিই। অবশ্যই ক্লিপ লাগিয়ে। মাঝে মাঝে নেটের ব্রেসিয়ারটিও স্থান পায় সেখানে। নেটের ব্রেসিয়ার মেলে দিয়ে দেখি আর ভাবি, বাহ্, ভালোই লাগছে তো! আমার ব্রেসিয়ারই আমার আভিজাত্যের পরিচয়। কিন্তু সেই আভিজত্যের স্বাদ খুব অল্পদিনই নিতে পারি। তখন আমি কুড়ি নম্বর রুমেই ছিলাম। একদিন ব্রেসিয়ার দড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল। স্মৃতিকে উত্তম রূপে ঝালিয়ে দেখলাম, *সত্যিই আজ মেলেছিলাম তো? হ্যাঁ, মেলেছিলাম।* তবু রুমে বিছানার উপরে খুঁজি, সুটকেসে খুঁজি, ট্রাঙ্কে খুঁজি, স্টাডি টেবিলের উপর খুঁজি এমনকি কলেজের ব্যাগের মধ্যেও তল্লাশি চালাতে ছাড়ি না। নাহ্, ওটা কেচে যে মেলেছিলাম তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং এবার মনে প্রশ্ন জাগে, ক্লিপ লাগিয়েছিলাম তো? মন বলে লাগিয়ে তো ছিলাম। তবু রেলিং-এর উপর দিয়ে মাথা নিচে ঝোঁকাই, ভাবি বড় ঠাকুর কিংবা ছোট ঠাকুরের মাথায় পড়েনি তো আবার! কিংবা মনুদা! উনি তো নিচে বারান্দার কিনারায় অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে বাসনপত্র মাজেন। হতেও পারে মাথায় পড়েছে, মেয়েরা কেউ দেখে ফেলেছে, বিশেষত সেই লজ্জায় কিছু বলতে পারেননি, সোজা বাঁ হাতে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছেন ডাস্টবিনে। কয়েকজন মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম ব্রেসিয়ারটা দেখেছে কিনা। কেউ কিছু বলতে পারল না। বেশ কিছুদিন পরে যখন ব্রেসিয়ারের দুঃখ ভুলতে বসেছি তখন শুনি সুমিত্রাকে নিয়ে সতেরো নম্বর রুমে মিটিং ডেকেছে সিনিয়র মেয়েরা। হোস্টেলে মেয়েদের ব্রেসিয়ার চুরি হচ্ছে এবং সুমিত্রাকে চোর সন্দেহ করা হয়েছে। মিটিং-এ উপস্থিত থাকার নিমন্ত্রণ আমি পাইনি। কিন্তু তাতে যেসব কথোপকথন হয়েছে সেসব পরে আমার কানে এসেছে। কথোপকথন মেয়েদের মুখে মুখে সারা হোস্টেলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুমিত্রাকে 'তুমিই চুরি করছ বলে' জোর দিয়ে অভিযুক্ত করা হলে সে নাকি নিজেকে বাঁচাতে বলেছিল, "আমার বাবার অনেক টাকা আছে। আমার কারও কোন জিনিস চুরি করার প্রয়োজন নেই।" তার

জবাব সিনিয়র মেয়েরা এভাবে দিয়েছিল—‘‘জানো তো সুমিত্রা, কারও কারও স্বভাবই এমন থাকে যে যতই পাক না কেন চুরি সে করবেই।’’

সুমিত্রার জন্য আমার খারাপই লাগে। হোস্টেলের সবাই হয়ত বিশ্বাস করে সুমিত্রাই ব্রেসিয়ারগুলো চুরি করেছে। ওর রুমমেটরাও বলে কয়েকটি নতুন ব্রেসিয়ার ঢুকেছে রুমে। কেউ কেউ নাকি আবার তদের ব্রেসিয়ার সুমিত্রার রুমে মেলা আছে দেখেছে। ব্রেসিয়ার যে চুরি করবে পরার জন্যই তো করবে। পরলে নোংরা হবে, নোংরা হলে তা কাচতে হবে এবং কাচতে হলে তা মেলতে হবে। সর্বসমক্ষে না হলেও গোপনে। গোপনে বলতে নিশ্চয় সুটকেসের মধ্যে নয়—রুমের কোন কোণায়, বিছানার স্ট্যান্ডে, না হলে টেবিলের নিচে দড়ি বেঁধে। মেললে কারোর না কারোর চোখে পড়বেই। তবু কেন জানি না নিজের সাতাশ টাকার রেজিনা নেট-লেসের ব্রেসিয়ার হারিয়েও আমার মন সুমিত্রাকে চোর ভাবতে চায় না। সুমিত্রার সঙ্গে আমি কলেজে যাই—একই কলেজে, হস্টেলেও অনেক গল্প করি। সুমিত্রাই তো ওর কবিমামার চিঠি বহন করে নিয়ে এসে আমায় দিয়েছে এবং কবিমামাকে আমি পছন্দ না করলে কোন জোরাজুরি করেনি যেমন চৈতালি অপুদার জন্য করেছিল। এক রাতে আমি খাবার না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তপতী, দিব্যানিকে বলেছিলাম ডিনারের সময় ডেকে দিতে। ঘুমের মধ্যে থাকলেও মনে হচ্ছিল অনেকক্ষণ হয়ে গেল কিন্তু খাওয়ার ডাক পেলাম না। আধঘুমে কেটে গেল বেশ কিছু সময়। তারপর তপতী, দিব্যানির হাসির আওয়াজ পেলাম। সেই নাড়ু নাশ করা রাতের মতো হাসি। শুনি ওরা বলাবলি করছে, ‘‘বনানীকে ডাক, তনিমাকে ডাক।’’ ওদের রকমসকম চোখ থেকে ঘুমকে সরিয়ে দিয়ে একেবারে তাজা করে দিল আমায়। মাথার কাছে রাখা হাতঘড়িটায় সময় দেখলাম—আড়াইটা। জাগার সঙ্গে সঙ্গে পেটে খিদের ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠেছে। ওদের বলি, ‘‘কিরে আমায় খেতে ডাকিসনি কেন? খুব খারাপ তো তোরা!’’

ওরা হাসে, ‘‘হ্যাঁ রে, আমরাই বা কোথায় খেলাম?’’

‘‘কি?’’

‘‘আমরাও খাইনি।’’

‘‘কেন?’’

‘‘আমরাও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।’’

ওরা বলে, ‘‘তনিমা খালি পেটে কি সুন্দর ঘুমোচ্ছে দেখ। ডাক ওকে।’’

তনিমা ওঠে। কি অদ্ভুত! পাশের রুমের মেয়েরা, বড় ঠাকুর, অষ্টমীদি কেউ ডাকল না আমাদের! ঠিক হল মাঝরাতেই ‘বড় ঠাকুর’কে ডেকে তুলে খাওয়ার নিয়ে আসব। রেলিং-এ দাঁড়িয়ে শুরু হল আমাদের চিৎকার, ‘‘বড় ঠাকুর, ও বড় ঠাকুর।’’

নিচ থেকে কোন উত্তর পাই না।

দিব্যানি বলে, ‘‘ওইভাবে ডাকলে হবে না। সুরেলা গলায় ডাকতে হবে—ব-ড় ঠা-কু-র ও ব-ড় ঠা-কু-র।’’

তপতী ‘ধ্যুর চুপ কর!’ বলে দিব্যানীকে থামিয়ে দেয়। ‘‘ও বড় ঠাকুর, আমাদের

খেতে ডাকোনি কেন?”

নিচের কোন একটা খুপরিঘর থেকে বড় ঠাকুর চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসেন। ফোকলা মুখে ফক্‌ফক্‌ করে জিজ্ঞেস করেন, “কি হল?”

তুমি আমাদের খেতে ডাকোনি যে!”

“তোমরা কারা?”

“আরে আমরা কুড়ি নম্বরের মেয়েরা বলছি গো।”

“অনেকবার দেকেচি। তপতীদি বলে দাকলাম, বনানীদি বলে দাকলাম। তোমরা এলে না,” কাঁচা ঘুম থেকে উঠে আরও অস্পষ্ট হয়ে গেছে বড় ঠাকুরের ফোকলা মুখের কথা।

“ঠিক আছে, এখন খেতে দাও। খুব খিদে পেয়েছে।”

“কিচু বেঁচে নেই।”

সে কি গো! আমাদের চারজন মেয়ের এতগুলো খাবার কে খেল?”

নিরাশ হয়ে আমরা উনিশ নম্বর রুমের দরজা খটখটাই ক্রমাগত। ভেতর থেকে সুমিত্রার আওয়াজ আসে, “দাঁড়া, দাঁড়া, দরজাটা খোলার সময় দিবি তো!”

আমরা বলি, “কি অসভ্য মেয়ে! খেতে ডাকিসনি আমাদের।”

“কে বলেছে ডাকিনি? দরজা বন্ধ করে মরা ঘুম দে আরও!”

“কি খাওয়ার আছে তোর কাছে?”

“চিড়ে আর দই।”

“তাই দে।”

যে সুমিত্রা আমাদের এত বন্ধু, আমাদের প্রতি এত দরদি সেই সুমিত্রা কি করে আমার ব্রা চুরি করতে পারে!

পরীক্ষার প্রস্তুতি

হোস্টেলের নানা ভালমন্দ ঘটনার মাঝখানে পার্ট টু-এর মাস দু'য়েক আগে আমি রাজা রামমোহন কলেজের সেই স্যারের সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে আমার ইচ্ছে এবং প্রয়োজনের কথা বলি। স্যার রাজি হন। আমি যেতে শুরু করি তাঁর কাছে। উনি আমাকে বাইরের ঘরটিতে একা বসিয়ে রেখে ভেতরের ঘরে একটা বড় ব্যাচকে পড়ানো শেষ করেন। আমার কাছে আসেন এক ঘণ্টা পর। সেই এক ঘণ্টা অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোন কাজ থাকে না। মনে অসন্তোষ নিয়ে ভাবি উনি নোট দিয়ে গেলে লিখতে পারতাম, এই সময়টাতে আমাকে যদি পড়াতেই না পারবেন তাহলে ডাকেন কেন! ব্যাচের পড়া শেষ হলে উনি আমাকে একটা নোট দিয়ে কপি করতে বলেন। বোঝানোর কোন ঝামেলা রাখেন না। পার্ট ওয়ানের আগে এক মাসের স্টাডি লিভে দেখেছিলাম পরীক্ষার প্রস্তুতি করবে বলে হোস্টেলের বেশ কিছু মেয়ে বাড়ি চলে গেছে। আমাদের বাড়িতে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য অনুকূল পরিবেশ নেই। বাড়ি গেলে বিগড়ানো মেজাজ নিয়ে, কান্নাকাটি অশান্তির মধ্যে পড়াশোনার আরও ক্ষতি হবে ভেবে আমি যাইনি। তবু মনে হয় হয়ত ভুল করেছি। অন্য মেয়েদের মতো আমারও বাড়ির ওপর আস্থা রাখা প্রয়োজন। কলকাতায় মা-বাবা, দিদি-জামাইবাবু, প্রদীপদা নেই। মিনিটে মিনিটে কাজের জন্য মায়ের ডাকাডাকি নেই, কারণে অকারণে বাবার অসম্ভব একপাক্ষিক শাসনের বলি হওয়ার ভয় নেই, দিদির উড়নচণ্ডী মূর্তির সামনে কোণঠাসা হয়ে গিয়ে শামুকের খোলের মধ্যে একাকীত্ব নিয়ে জীবন যাপনের প্রয়োজন নেই। জামাইবাবুর অশোভন আচরণ সহ্য বা উপেক্ষা করার প্রশ্নই নেই এখানে। তবুও এখানে মাথায় একদমই যে চাপ থাকে না তা নয়। কলকাতায় ছোটদার অল্পস্বল্প অভিভাবকত্বের চাপ আছে। কলকাতায় মাথায় বয়সের চাপ আছে। উল্টো চাপ। কোনকিছুকেই গম্ভীরভাবে নিতে ইচ্ছে করে না। চারিদিকে সবকিছু হাল্কা দেখি। মনে হয় চারপাশে বাতাসের ঘনত্ব অনেক কমে গেছে। শরীরের বাইরের ঘনত্ব এবং ভেতরের ঘনত্বের তারতম্যকে প্রশমিত করতে শরীরের ভেতরে তৈরি হয়েছে অসংখ্য হাওয়ার বুদবুদ। বাতাসের চাপ কম হয়ে যাওয়ায় রক্তের স্ফুটনাংক নেমে গেছে। ফুটতে শুরু করেছে রক্ত। একেই বুঝি আমরা যৌবনে রক্ত গরম বলে ব্যাখ্যা করি। রক্ত ফুটতেই থাকে অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক, স্রোত যতই বিপরীত দিকে বইতে শুরু করুক।

ঠিক করি এবার এক মাসের স্টাডি লিভে বাড়ি যাব। স্যারকে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলি, "রোজ একটা করে নোট পেলে চলবে না। বেশি বেশি নোট চাই।" উনি বলেন, "ঠিক আছে কোন কোন নোট পেতে বাকি আছে তার লিস্ট দাও।"

"আমি জানি না কোন কোন নোট পেতে বাকি আছে।"

"সিলেবাস জানো না?"

"না।"

"সে কি! এক মাস বাদে পরীক্ষার হলে ঢুকবে। এখনও সিলেবাস বই কেননি?" উনি ভেতরের ঘর থেকে সিলেবাস বই নিয়ে আসেন। আমি দুঘণ্টা সময় খরচা করে লিস্ট বানিয়ে দিয়ে আসি তাঁকে।

বারো তেরোটি নোট নিয়ে বাড়ি গিয়ে বসে আছি। সেইসব নোট আমার ঠোঁটস্থ। অন্য কোন নোট নেই বলে বারবার সেগুলোই পড়ছি। বাকি নোট স্যারের পার্সেল করার কথা। রোজ দিন গুনি। নোটের আশায় বসে থাকি, কিন্তু নোট আসে না। উল্টে অন্যের চিঠি আসে। প্রেমের চিঠি। কমল কর এখনও আমাকে ছাড়েনি। হোস্টেলে এসে ক্ষমা চেয়ে গেছে। অনুরোধ করেছে তার সঙ্গে যেন কথা বন্ধ না করি। সে চিঠি লেখে। প্রায় প্রতিদিন। বুঝতে চায় না যে আমি বিরক্ত হই। সে লেখে তোমার মতো বন্ধু পেয়ে আমি ধন্য, খুব মিস করছি, কবে কলকাতায় আসছ এসব। মন দিয়ে পড়তেও উপদেশ দেয় সে। কমল কর আমার কাছ থেকে চিঠির উত্তর আশা করে। স্যারের নোট না পেয়ে হতাশায় আমি কমল করের একটি চিঠির উত্তর লিখতে বসি। ভাবি তাকেই বলব স্যারের কাছ থেকে নোট সংগ্রহ করে পাঠাতে। কিন্তু কি করে শুরু করি চিঠি! *'আপনার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু মন ভালো না থাকায় উত্তর দিতে পারিনি।'* তারপর সরাসরি লিখে ফেলব আমার মন খারাপের কারণ? আমার প্রয়োজনের কথা? না, তা হয় না। তাহলে আমার স্বার্থটা প্রকট হয়ে ধরা পড়বে। স্বার্থ তো আছেই কিন্তু তার এমন নির্লজ্জ প্রকাশ হলে চলবে না। সে আমার কাছ থেকে খারাপ ব্যবহারের নীরব প্রতিশোধ নিতেই পারে। আমাকে সাহায্য না-ই করতে পারে। কি লিখি তাহলে? *"আপনি লিখেছেন ভালো করে পড়তে। কিন্তু পড়ব কি! নোটই নেই আমার কাছে। আপনি যদি পারেন...।"* হ্যাঁ, এমনই কিছু একটা লিখতে হবে। কিন্তু প্রথমেই এমন লিখলে চলবে না। চিঠি টু দ্য পয়েন্ট হলেও তার কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। নানারকম ভাবনা যখন ঘোট পাকিয়ে মাথা খারাপ করে তখন মান্ধাতা আমলের একটা ট্রাক নাকি ভ্যানগাড়ির বিকট আওয়াজ শুনতে পাই। সেটাই লিখি চিঠিতে, "বালুরঘাট থেকে আপনাকে লেখা এটা আমার প্রথম চিঠি। তাই ভাবছিলাম অনেক যত্ন করে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা লিখব। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত সাদা কাগজে যেই কলম রেখেছি অমনি একটা মান্ধাতা আমলের ট্রাক ধ্যাড়ধ্যাড় করতে করতে করে রাস্তা দিয়ে চলে গেল। চিঠি লেখায় আমার মনোনিবেশ নষ্ট করল...।" বাড়াবাড়ি করলাম। ধ্যাড়ধ্যাড় আওয়াজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলাম পরের কয়েকটি লাইনে। দিতে গিয়ে নোটের কথাই বলতে ভুলে গেলাম।

পরীক্ষার যখন আর মাত্র তেরোদিন বাকি পার্সেল পাই স্যারের। প্রতিদিন তিনটে করে নোট মুখস্থ করার লক্ষ্য নিয়ে জোরদার এগোই। রাত জাগি। কমল কর আমার চিঠির উত্তর দেয়। সেন্টিমেন্টে ভরা উত্তর—"আমি জানি ধ্যাড়ধেড়ে গাড়ি বলতে তুমি আসলে আমাকেই বুঝিয়েছ। সত্যি আমি ওইরকমই। সাধারণ গ্র্যাজুয়েট, দেখতেও ভালো না, চাকরি করি না। জানি না এই গিটার নিয়ে আমার ভবিষ্যতে কি লেখা আছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে আমি কখনও অন্যের চাকর হয়ে কাজ করব না, গিটারও ছাড়ব না। গিটারই আমার সব---আমার মা-বাবা, বন্ধু-পরিবার, বর্তমান-ভবিষ্যৎ...।" কমল করের দুঃখভরা আরও কয়েকটা চিঠি আসে। ওকে আমি বোঝাতে অক্ষম হই যে আমি তেমন কিছুই ভাবিনি। যাই হোক, কমল করকে নিজের অজান্তে কষ্ট দিয়ে আমি পার্ট টু পরীক্ষায় বসি। তারপর আবার ফিরে যাই বালুরঘাটে। অপেক্ষা রেজাল্টের।

শহরের টান

কলকাতায় তিন বছর কাটিয়েও কলকাতার প্রতি মোহ আমার গেল না। শুনেছিলাম গ্রামের মেয়েদের শহরের প্রতি এক স্বাভাবিক টান থেকেই যায়। যদি তাই-ই হয় আমিই বা ব্যতিক্রম কেন হব! আমি তো গ্রামেরই মেয়ে। তাছাড়া বাড়ির প্রতি আমার চিরন্তন বিরাগ তৈরি হওয়ার কারণে আগে থেকেই আমার মন বহির্মুখী হয়েই ছিল। অনার্সে 'পার্ট টু'তে সিক্সটি পার্সেন্ট এবং এবং গড়ে ৫৬ পার্সেন্ট পেয়েও 'এম এস সি'তে নিজের জন্য একটি জায়গা হাসিল করতে পারলাম না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জুওলজিতে নাকি মাত্র ৪৪টি সীট। তার মধ্যে কিছু তফশিলি জাতি এবং উপজাতির জন্য সংরক্ষিত। আমার চেয়ে অনেক কম নম্বর পেলেও সীট তাদের জন্য খালি থাকে। তাই আমাকে সাংবাদিকতা নিয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মনে হয় একটা 'এম এ' ডিগ্রির খুব দরকার। না হলে আর মান থাকে না। 'পার্ট টু'-এর পরে বাড়ির দিনগুলোও আবার অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

সাংবাদিকতার ক্লাসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য ক্লাসগুলির মতো নয়। এখানে আমাদের বয়সি ছেলেমেয়ের সংখ্যা কম, কাকু-কাকিমা, মেসো-মাসিমার বয়সি পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা বেশি। যারা বয়োজেষ্ঠ তাদের অনেকেই পার্টটাইম অথবা ফুলটাইম কাজ করে। বস্তুতপক্ষে তারা যেখানে কাজ করে সেখান থেকেই তাদের জন্য এই কোর্সটা স্পনসর করা হয়েছে। কারও কারও কাজ আবার সংবাদপত্রেই অথবা ম্যাগাজিনে। তাদের অনেকেরই উপস্থিতি অনিয়মিত। এমন ক্লাস এর আগে আমি কখনও করিনি। ক্লাসে আমার বয়সি দুটো মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। টিঙ্কু কর্মকার এবং ইলোরা সাহা। দু'জন আমার দু'পাশে বসে। পরে সমবয়সি দু'জন ছেলেও এসে যোগদান করেছে আমাদের দলে। আনিসুর রহমান এবং অরুণ হালদার। অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক উইমেন'স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি শ্যামলী গুপ্তার ছেলে সোমশুভ্র গুপ্তাও আমার ক্লাসেরই ছেলে। আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হলেন সুনীত মুখার্জি। অধ্যাপকদের মধ্যে আছেন সৌরিন ভট্টাচার্য—স্টেটসম্যান-এর সাব এডিটর, স্বপন মল্লিক—উনিও স্টেটসম্যানেই আছেন—শুনেছি ফিল্ম এডিটর, সমর বোস এবং অন্যান্যরা। সমর বোস বর্তমানের বৃহস্পতিবারের হমলোগ পাতায় লেখেন, রাজনৈতিক সমালোচনা করেন।

ইউনিভার্সিটিতে আমার মন বসতে চায় না। ক্লাস শুরু হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের নবীন বরণ হয়েছে। নবীন-বরণে ড্রপ বক্স থেকে চিট তুলতে হয়েছে আমাদের। চিটে কোনকিছু অভিনয় করে দেখানোর নির্দেশ থাকলে তা করে দেখাতে হয়েছে, কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিতে হয়েছে। আমাকে ছাগলের ডাক ডাকতে বলা হয়েছিল। আমি ডেকেছি। ক্লাসের একটি ছেলে কৌশিক সেনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ''কি খাও?'' সে বলেছিল, ''ঘাস ছাড়া সব খাই।'' অরুণ একটি শান্তশিষ্ট গোবেচারা ছেলে। চিট উঠিয়ে থ। তাতে লেখা আছে, ''যাকে পাও তাকে ধরে ঝগড়া করো।'' অরুণ উত্তর দিয়েছে, ''খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। চিট পড়ে মাথায়

ছিট ওঠাই আর কি!" প্রোগ্রাম শেষে অরুণ বলে, "হ্যাঁ রে, এটা আবার কি ধরনের নবীন বরণ রে? এটা তো র‍্যাগিং ছাড়া আর কিছুই নয়।" আমি মানতে রাজি নই। আমি হোস্টেলে কৃষ্ণার সঙ্গেও একই ধরনের কার্যকলাপ করেছিলাম এবং তারপর উমাদির শাসানি খেয়েও মানিনি যে ওটা র‍্যাগিং। আমার মনে হয়েছে ইউনিভার্সিটিতে ওই দিনটির দৌলতে সিনিয়র ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমরা বেশি পরিচিত হয়েছি, একটু হলেও সহজ হয়েছি অধ্যাপকদের সঙ্গেও, আমরা ক্লাসের বন্ধুবান্ধবরা নিজেদের মধ্যে হাল্কা মেজাজে কিছু সময় অতিবাহিত করেছি। তা স্বত্ত্বেও জার্নালিজম-এর ক্লাস আমার ভালো লাগে না। জার্নালিজম-এর সিলেবাস কঠিন নয়, হয়ত 'এম এস সি' জুওলজির চেয়ে অনেক সহজ তবু আমার কাছে তা দুর্বোধ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুওলজির সেই ক্লাসরুমে আমি কখনও বসিনি। বসার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে দেয়নি। এমনকি কখনও দেখিওনি। তবু সেই না বসা না দেখা ক্লাসরুমকে আমার আপন লাগে। দুঃখ হয় কত কিছু না পাওয়া মেনে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে হয় বলে।

আমার মনে হয় কেউ যদি মনে শান্তি এবং সন্তোষ নিয়ে আমাদের দেশে বাঁচতে পারে তাহলে সে পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশেও সহনশীলতার পরীক্ষা দিয়ে পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে জীবন কাটাতে সক্ষম হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণের বৈচিত্রে পরিপূর্ণ এই দেশ। বৈচিত্রের যে কোন বিন্দুতে দাঁড়িয়ে 'আমরা অনেকে'ই আমাদের মধ্যে অনৈক্য ভুলে ঐক্য খুঁজি। অহংকার বোধ করি। লোক দেখানো অহংকার। মনে বঞ্চনার জ্বালা নিয়ে মুখে সুখের হাসি ফোটানো অহংকার। আমরা হলাম দেশের বাধ্য নাগরিক। রাজনীতিবিদরা আমাদের বুঝিয়েছেন চরম সহনশীলতা প্রদর্শন, বোঝাপড়া নিয়ে চলা এবং ত্যাগের মধ্যে আমাদের নিজের এবং আমাদের দেশের উন্নতির মূলমন্ত্র নিহিত আছে। কিন্তু এই সহনশীলতা, বোঝাপড়া এবং ত্যাগ নিয়ে চলবে কারা? শুধুই কি সেই 'আমরা অনেকে'? বাকিরা যেভাবেই চলুক না কেন, যতই দাঙ্গাহাঙ্গা করুক না কেন, উন্মাদ হয়ে গিয়ে বাস জ্বালিয়ে দিক না কেন, মানুষ মারুক না কেন, যতই তাদের কুৎসিত রূপ দেখাক না কেন সুন্দর আমাদের থাকতেই হবে। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে সুন্দর থাকার প্রয়াস এখন আমাদের জীনের বৈশিষ্ট্যগত ধর্মে পরিণত হয়েছে। অতীতের ইতিহাস ঘাঁটলেও আমরা দেখতে পাব যে দেশের শাসকরা সবসময়ই জনসাধারণের 'সচেতনতার অভাব'-এর সুযোগ নিয়ে তাদের জাতিগত, ধর্মগত এমনকি অর্থনৈতিক পার্থক্যকে শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশরা ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসিতে ভারত শাসন করেছে। স্বাধীনতার পরের ভারতেরও ওই একই দশা। সংবিধানের ড্রাফটিং কমিটির সদস্যরা, তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, পিছিয়ে থাকা জনজাতির উন্নতির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছেন। সংবিধান ঘোষণা করল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে এবং চাকরির ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পর্যন্ত তফশিলি জাতির জন্য ১৫ শতাংশ, তফশিলি উপজাতির জন্য ৭.৫ শতাংশ এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনজাতির জন্য ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। দীর্ঘদিনের বর্ণ ব্যবস্থার চাপে দলিত পিষিত শূদ্রের কিছু

সম্প্রদায় এরা। সংবিধানের ড্রাফটিং কমিটির সদস্যদের বক্তব্য ছিল তাদেরকে সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষাগত অবস্থার মান বাড়ানোর সুযোগ দিতে হবে। মেটাতে হবে উঁচু জাতির সঙ্গে তাদের সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষাগত অবস্থার বৈষম্য। সেই পাঁচ বছর এখনও চলছে। আর সেই পাঁচ বছরের ধাক্কায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্সের ছাত্রী হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এম এস সি'র দরজার বাইরে রয়ে যাই। জুওলজিতে প্রবেশাধিকার না পেয়ে সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাতে বসে থাকি সাংবাদিকতা বিভাগে।

আমি কানপুর থেকে এম এস সি করতে চেয়েছিলাম। ছোটদা বলেছে, ‘‘কলকাতা ছেড়ে আর কোথাও যেতে হবে না।” সেই পাঁচ বছরের ধাক্কায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্সের ছাত্রী হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এম এস সি'র দরজার বাইরে থেকে গেল চৈতালিও, লেখাপড়ায় ইতি টেনে পেশা হিসেবে বেছে নিল টিউশনকে। সেই পাঁচ বছরের ধাক্কায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্সের ছাত্রী হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এম এস সি'র দরজার বাইরে থেকে গেল সোমা, ক্ষমা, মনীষা, মিতা এবং আরও অনেকে। তারা কেউ বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ির রান্নাঘরে ঢুকেছে, কেউ কোন প্রাইভেট কম্পানিতে হাজার টাকা মাইনের চাকরি করছে, কেউ বা অন্য কোন ছোটখাটো কোর্সে ভর্তি হয়ছে ছোটখাটো লক্ষ্যের দিকে এগোবে বলে, কেউ হাত গুটিয়ে অপেক্ষা করছে মা-বাবা বিয়ে দেবেন এই আশায়, বরের মাইনেকে নিজের মাইনে বলে মনে করে জীবনের ভরণ-পোষণ চালিয়ে নিতে পারবে তাহলে। সংরক্ষণের সংরক্ষণকে হাতের লাঠি বানিয়ে আমার মতো বহু নিরীহ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করে রেখে দিল আমাদের রাজনৈতিক নেতারা। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে যাও দেখবে তোমার চেয়ে দশ-পনেরো শতাংশ কম নম্বর পাওয়া এসসি, এসটি এবং ওবিসি ছাত্রছাত্রীরা লাইনে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অতিরিক্ত সুযোগ দিয়ে লেখাপড়া করাতে হবে তাদের। তারপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ছাড়তে হবে তাদের সীট, চাকরির ক্ষেত্রেও ছাড়তে হবে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এসসি, এসটি এবং ওবিসি থেকে আলাদা সাধারণ-এর রাস্তায় হতাশা নিয়ে চলবে সেই 'আমরা অনেকে'। একদিকে সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের উন্নতির গান শুনছি, অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের তাদের এগিয়ে চলার পথ বন্ধ হওয়ায় করুণ কান্না বিদীর্ণ করছে আমাদের হৃদয়। এই দলে আমিও আছি। আমি শুনি আমার কান্না, আমি শুনি তাদের কান্না যারা আমার মতো। আমরা শুনি আমাদের পরস্পরের কান্না।

সাংবাদিকতায় পড়ানো হয় এলিমেন্টস অফ নিউজ, নিউজ সোর্সেস, স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট। লিখতে বলা হয় পলিটিক্যাল রিপোর্টিং, ক্রাইম অ্যান্ড লিগাল অ্যাফেয়ারস রিপোর্টিং। অন্যান্যদের দেখি পটাপট সাদা কাগজের পাতা ভরিয়ে ফেলে। আমার কলম কিছুতেই চলতে চায় না। কেনকি হাত চালাতে চায় না কলম। কাগজের উপর যেখানেই কলম রাখি সেখানেই হাত বসে থাকে স্থবির হয়ে। হাত বলে এধরনের সৃষ্টিমূলক কাজে মাথার সহযোগিতা প্রয়োজন। মালপত্রের উৎপাদন হবে মাথায়। মাথা সেগুলো সরবরাহ করবে আমার আড়তে। আমি তো শুধু তোমার সাদা কাগজে সেসবের সাপ্লাই দেব। 'বি এস সি'র পুরনো কিছু মাল এখনও সংরক্ষিত

করে রেখেছি—‘ডি এন এ’র ডাবল হেলিক্যাল স্ট্রাকচার, ক্লিভেজ, ফার্টিলাইজেশন। যদি বলো সেগুলো ঢেলে দেব পাতায়।

আমি হাতকে শাসন করি—এটা সাংবাদিকতার ক্লাস। ফার্টিলাইজেশন হল স্পার্ম এবং এগের মিলন। এখানে যারা বসে আছে বহু বছর আগেই তাদের জীবনে সৃষ্টির সেই সন্ধিক্ষণ এসেছে। তারপরেই তারা ভুলে গেছে তা। ভুলে গিয়েই আজ আমার মতো বড় হয়েছে, আমার মাসি-মেসো, কাকি-কাকার মতো হয়েছে। আমরা একদিন একবারই সেই মুহূর্তের কাছে মাথা নত করি, জন্ম নিই, তারপর চিরতরে ভুলে যেতে চাই তাকে, ভুলে গিয়ে বড় হতে চাই, খ্যাতি-প্রতিপত্তি পেতে চাই। ওই মুহূর্তের কথা ভুলে গিয়েই জন্মদিন পালন করতে চাই। খুব বেশি হলে জন্মদিনে জন্মের সময়টি মুখে উচ্চারণ করি, ব্যস আর কিছু নয়। তাই ওসব কথা এখানে চলবে না।

বলি এক, করি আরেক। যেটা চলবে না বলি, সেটাকেই চালাই। তারই গুদামঘরে চলে যাই। সেখানে দেখি দুটো স্পার্ম ও দুটো এগের মিলন হল। সেখানে থেকে তৈরি হল একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। তারা প্রত্যেকদিন প্রকৃতি থেকে জল, আলো, বাতাস নিয়ে এবং গাছের ফলমূল খেয়ে একটু একটু করে বড় হল। নির্জন একটা দ্বীপে। সেখানে স্পার্ম ও এগ কোথায় থেকে এসেছিল কেউ জানে না। যাই হোক, বড় হয়ে তারা একে অন্যকে ভালবাসলো, তাদের ভালবাসার রঙে রঙিন হল দ্বীপ—ফুল ফুটল, আকাশ থেকে হঠাৎ করে হাজার হাজার প্রজাপতি নেমে এসে বসে পড়ল ফুলের উপর, জঙ্গল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে এল মৌমাছি, পাখিরা আনন্দে গাছের ডালে ডালে নৃত্য শুরু করল। ছেলেটি প্রজাপতির ডানা থেকে লাল রঙ নিয়ে মেয়েটির মাথায় পরিয়ে দিল, মৌমাছির গুঞ্জনে আর পাখির কলতানে বিয়ে হল তাদের। বাসর হবে। তারা ফুলশয্যায় গেলে আমার মনও চঞ্চল হয়ে উঠল। আমিও চাই প্রজাপতি, প্রজাপতির ডানার সেই লাল রঙ—সিঁদুর। আমি প্রজাপতিকে ধরতে চাই, কিন্তু প্রজাপতি ধরা দিতে চায় না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। আমার আগে আগে। আমি দু'হাতে দুটো কচু পাতা নিয়ে তার পেছন পেছন ছুটি। প্রজাপতি ওড়ে, আমি উড়ি। উড়ে চলি। অনেকক্ষণ কেটে যায়। তারপর দেখি পৃথিবীর মাটি হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে সেই ছেলে এবং সেই মেয়েটিও। সামনে শুধু পড়ে আছে সাদা কাগজ এবং কাগজে একটিও আঁচড় না টানা কলম।

কলকাতায় হোস্টেল পাওয়ার সমস্যা অনেক। আমার ‘এম এ’-র ক্লাস শুরু হওয়ার পরে দু'তিন মাস আমাকে দুর্গানগরের সর্বধর্ম মিশনে থাকতে হয়েছিল। আশ্রয় হিসেবে সর্বধর্ম মিশনকে আমি নিজেই বেছে নিয়েছিলাম। সিদ্ধান্ত নিতে মা-বাবার সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজনই বোধ করিনি। আমি জানতাম তাঁদের তাতে কোন আপত্তি থাকবে না। সর্বধর্ম মিশন থেকে আমি যাই বিধান এডুকেশনাল সোসাইটির ভি ই এস উইমেন'স হোস্টেলে। ৮৩/১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার

রোড, কলকাতা-৯। রাজাবাজার প্রতাপ মঞ্চের পেছনে। ভি এল মিত্র হোস্টেলের মতো এই হোস্টেলটিও ছোটদাই আমাকে পাইয়ে দিয়েছে। চারতলায় পাল্লাহীন দরজা দিয়ে আলাদা করা দুটো রুমের একটিতে আরও তিনটি মেয়ের সঙ্গে আমি থাকছি। পাশের রুমে আছে পাঁচটি মেয়ে। এরা সবাই আমার চেয়ে এক বা দু'বছরের ছোট। আমার ব্যাচের এবং আমার চেয়ে সিনিয়র ব্যাচের অন্য বিষয়ের কয়েকটি মেয়ে আছে দোতলায় এবং পাশের বাড়িতে। আমাদের চারতলা হোস্টেলের নিচতলায় রান্নাঘর এবং খাবার টেবিল। ডাইনিং এরিয়ার বাইরের দিকটাতে ভারি পর্দা দিয়ে আলাদা করা ভিজিটরস' রুম। দোতলায় নার্সারি স্কুল। সেখানে সকাল সাতটা থেকে বাচ্চাদের চেঁচামেচি শুরু হয় এবং তা দুপুর এগারোটা পর্যন্ত চলে। স্কুলের পাশে কমন রুম। তার পাশে অফিস। রান্নাঘর থেকে পেছনের দরজা দিয়ে যেতে হয় পাশের বাড়িতে। সেখানে দোতলার দুটো ঘরের একটিতে তিনটি এবং আরেকটিতে দুটি মেয়ের থাকার ব্যবস্থা আছে। সেই দুটো রুমের যেটি ডাবল বেডের সেটিতে আমি কয়েকদিন ছিলাম। সেই বাড়ির দরজায় তালা দেওয়া থাকে। বাইরে বেরোনোর প্রয়োজন হলে 'বন্দনাদি' নইলে 'জবেদা মাসি' বলে চিৎকার করতে হয় মেয়েদের। অপেক্ষা করতে হয় কখন তাঁরা শুনবেন এবং এসে তালা খুলে দেবেন। বন্দনাদি হলেন রাঁধুনি এবং জাবেদা মাসি হেল্পার। দুপুরের এবং রাতের খাবারের সময় বন্দনাদি বা জবেদা মাসি নিজে থেকে এসে তালা খুলে দেন। তখন রুমে উপস্থিত সবকটি মেয়েকে একইসঙ্গে খেতে আসতে হয় এবং খাওয়া শেষে একইসঙ্গে আবার বাড়িতে ঢুকে যেতে হয়। হোস্টেলের এই নীতি আমাকে বারবার 'তুমি মেয়ে তুমি মেয়ে' বলে খোঁচা দেয়। খোঁচার ব্যথায় খুব কষ্ট হয় আমার। আমি এবং আমরা এমনই অবলা এমনই দুর্বল নারী যে আমার অথবা আমাদের ওপর যে কোন পুরুষ অথবা পুরুষের দল যে কোন সময় হামলা করতে পারে, নিশ্চয় এই ভেবেই ডাবল বেডের রুমটির সঙ্গে লাগানো ছাদটিকেও লোহার নেট দিয়ে ঘিরে একেবারে খাঁচা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই খাঁচায় আমি অক্সিজেনের অভাব অনুভব করতাম। তাই মেন বিল্ডিং-এর চারতলায় জুনিয়রদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছি। আমার রুমমেট উজ্জ্বলা এবং ছবি। হোস্টেলের মেয়েদের নাইটি বা হাউজকোট পরে নিচে খেতে নামা এবং ভিজিটরস-দের সঙ্গে দেখা করা মানা। নাইটি বা হাউজকোটের ওপর শাড়ি জড়ানোর নির্দেশ। আমি একদিন নির্দেশ পালন করে বাধ্য মেয়ে হতে গিয়ে নিজেকে অনেক কষ্ট দিয়ে ফেলেছিলাম। আনিসুর এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। ওর সামনে হাউজকোটের ওপর শাড়ি জড়িয়ে বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি ওকে নিঃশব্দে বলছি 'ইউনিভার্সিটিতে যখন স্কার্ট-টপ, চুড়িদার এবং শাড়ি পরে ক্লাস করতে গেছি তখন যদি ভালমত না বুঝে থাকিস তাহলে এখন বোঝ যে আমি হলাম মেয়ে। শুধু হাউজকোটে আমাকে দেখার অধিকার তোর নেই। তাতে করে হাউজকোটের ভেতরের সবকিছু তোর মনের আয়নায় দৃশ্যমান হয়ে যেতে পারে। দৃশ্যমান হলে তোর মনে আমাকে নিয়ে সেসব ভাবনা জাগতে পারে এবং জাগ্রত ভাবনার কাছে তুই হেরে যেতে পারিস।' শরীর গুলিয়ে উঠেছিল আমার। বমি বমি লাগছিল। চারিদিক

অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখছিলাম। সেদিন অতি উজ্জ্বল ঝলমলে আলোতেও আনিসুরের অতি পরিচিত মুখটি কেমন যেন অস্পষ্ট এবং অচেনা হয়ে উঠেছিল। অবস্থার চাপে বেহাল হয়ে সেদিনই আমি ভি এল মিত্র ইউ জি হোস্টেলে থাকাকালীন কেনা সব হাউজকোট এবং নাইটিগুলোকে বাক্সবন্দী করে ফেলি। নাইটির বদলে বাক্স থেকে বের করি চুড়িদার।

পরদিন থেকে যেখানে বাকি সব মেয়ে নাইটির ওপর শাড়ি জড়িয়ে নামে, আমি নামি চুড়িদার পড়ে। অনায়াসে চোখে পড়ে যাই সুপারিন্টেনডেন্টের। কুচোখে। ভি এল মিত্র ইউ জি হোস্টেলের উমাদির মতো ভি ই এস উইমেন'স হোস্টেলের সুপার হয়ে ওঠেন আমার পরম শত্রু।

ক্লাসে ইলোরা এবং টিঙ্কুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব চৈতালি মণিকার মতো নয়। ইলোরার মুখে ওর মা-বাবার কথা শুনেছি, বাড়িতে আর যাওয়া হয়নি। হবেও না। তেমন কোন ইঙ্গিত ইলোরা আমাকে কখনো দেয়নি। ওর মা-বাবা আমার কথা হয়ত জানেনই না। টিঙ্কুর বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম। দু'তিন ঘণ্টার জন্য। বিকেলে। থাকা হয়নি। নিমন্ত্রণ পাইনি থাকার। কখনো পাব বলে আশাও রাখি না। এই হোস্টেলটাও মনের মতো হল না। আগের হোস্টেল আর যেমনই হোক সেখানে অনেক বেশি আলো হাওয়া খেলত। এখানে প্রথমত জায়গা কম। রুমের সামনে একটা ছোট্ট বারান্দা। বারান্দায় গ্রিল। গ্রিল দিয়ে গলির শেষে দূরে রাস্তা ও লোক-চলাচল দেখা যায়। বারান্দায় বা দিকে বাথরুম। তিনতলার মেয়েরাও এখানে পায়খানা, পেচ্ছাব, স্নান করতে আসে। কাপড় কাচতে আসে। দোতলার একটিমাত্র বাথরুমে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। ওটা সুপারিন্টেনডেন্ট মেয়েদের টেক্কা দিতে একা ব্যবহার করেন। তিনতলার মেয়েরা আসায় চারতলার বাথরুমের ওপর চাপ থাকে। সময় নিয়ে মনভরে স্নান করব তাও হয় না। এত অসুবিধের মধ্যেও কলকাতা আমার প্রিয় শহর হয়ে ওঠে।

প্রথম ভালবাসা

রাতে হোস্টেলে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে গৌতমকে চিঠি লিখি। গৌতম অমিতাভর বন্ধু।

অমিতাভর সঙ্গে আমার আলাপ পত্রমৈত্রীর মাধ্যমে। বড় সুন্দর হাতের লেখা তার। সে আমাকে বেশ কয়েকটি চিঠি লিখেছে। তাতে আমি তাকে কিছুটা জেনেছি—ইতিহাসে এবং বাংলাতে এম এ, চাকরি করে, মা-বাবার একমাত্র সন্তান। অমিতাভ তার ঠিকানাও আমায় দিয়েছে। দেখা করতে বলেছে। কাছেই থাকে।

সেদিনটি কত তারিখ ছিল ঠিক মনে পড়ে না। ৮১এ, বিধান সরণির দরজায় টোকা মেরে দীর্ঘ একটি চেহারাকে বারান্দায় বের করে নিয়ে এসেছি। তার ঘরে ফোন ছিল না, তাই অগ্রিম খবর দিতে পারিনি। হঠাৎ মনস্থির করে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম কলকাতায় মা-বাবার একমাত্র আদরে-আহ্লাদে বড় হওয়া সে হবে চেহারায় আধা-আলু, কথাবার্তায় শান্ত ও দৃঢ়। চলাফেরায় থাকবে আভিজাত্যের ছাপ। কিন্তু বস্তুত মানুষটি হল ঠিক তার উল্টো। বাস্তব যে বরাবরই কল্পনার সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলতে চায় সেদিন আরেকবার তার প্রমাণ পেলাম। অতিথিকে ভেতরে না ডেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে চেয়েছে সে তার সঙ্গে। একটু আহত হলেও নিজেকে সামলে নিয়েছি এই ভেবে যে আমাকে ভালমত না জেনে সে তার মায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করাতে চায় না। আমরা নিচে নেমে গিয়েছি, হেঁটেছি রাস্তায়, তারপর একটি পার্কে বসেছি। পাশাপাশি। পার্কে অমিতাভর চোখ আবছা আলোয় ঘাস-মাটি দেখছে। রাস্তায় যখন সে নড়বড়ে পা নিয়ে টেনে টেনে হাঁটছিল, সিগারেটে টান মেরে চলেছিল অনবরত, মৃদুস্বরে দ্রুত অস্পষ্ট কথা বলছিল, আমার মনে হচ্ছিল, কেমন যেন!

অমিতাভর এম এ ডিগ্রি ছাড়া আকর্ষণীয় উল্লেখযোগ্য আর কিছু ধরা পড়ল না আমার চোখে। নিজের জীবিকা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার কোন বিশেষ ধারণা সে আমায় দেয়নি। তবু তার বাসস্থানের বাইরের চেহারা বুঝিয়ে দিয়েছিল উন্নতমানের জীবনধারা তার নয়। অমিতাভকে দেখে কোনমতেই সুদর্শন পুরুষ বলে ভুল হয় না। পুরুষ! হ্যাঁ, পুরুষই বটে। সে যুবক নয়—লোক। একজন মধ্যবয়সী লোক। আমার চেয়ে অন্ততপক্ষে দশ বছরের বড়। উচ্চতায় ছ'ফুটের চেয়ে এক ইঞ্চিও কম নয়। গায়ের রঙ শ্যামলা, রোগা চোহারা, চাপ্টা পাছা, ব্যাকব্রাশ করা মাথাভর্তি চুল। দাঁড়ায় এবং হাঁটে সামান্য কুঁজো হয়ে। কথাবার্তার মধ্যে কোন আবেদন নেই, অস্ফুট স্বরে সরু গলায় আধা বলা আধা না বলা শব্দে তার চিন্তার গভীরতার নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আমার মনে হয়েছিল যে কেউ-ই তার মতো একটা মানুষকে খড়কুটো মনে করে অতি সহজে উপেক্ষা করতে পারে। অমিতাভ অনেকের মধ্যে থেকে বিশেষ হয়ে কারও চোখে পড়ে যাবে এমন কোন ব্যক্তিত্বই রাখে না।

আমি বেশি কথা বলি, সে কম। প্রশ্ন শুধু আমারই থাকে, তার থাকে না। আমার পঞ্চাশ শতাংশ প্রশ্নের জবাব দেয় সে, বাকি পঞ্চাশ শতাংশ প্রশ্ন উত্তরাভাবে

মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। কৌতূহল পরিবেষ্টিত করে রাখে আমায়। অমিতাভ চিঠিতে একাধিকবার জানিয়েছে যে সে আমাকে ভালবাসে।

ওকে জিজ্ঞেস করি, ''তুমি খুব আদুরে না?''

''কেন?''

''মা-বাবার একমাত্র সন্তান তাই।''

সে একটুক্ষণ চুপ থেকে কি যেন ভাবে। বলে, ''তুমি যা ভাবছ বাস্তবটা আসলে কিন্তু তেমন নয়।''

আবার কিছুক্ষণ চুপ থাকা। অমিতাভই আমাকে জিজ্ঞেস করে, মাথা নিচু রেখেই, ''তুমি ছেলেদের কোন মাপকাঠিতে বিচার করো?''

মনে মনে বলি, অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের প্রতি যদি আমার অন্ধ মোহ না থাকে তাহলে যে মাপকাঠিতেই বিচার করি না কেন ন্যূনতম নির্দিষ্ট মানও তুমি পেরোতে পারবে না। উপরে কিছু বলি না।

মাঝখানে আমাদের আরও কয়েকটি চিঠির বিনিময় হয়। চিঠির সঙ্গে ছবি পাঠিয়ে সে তার মায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করায়। প্রায় চল্লিশ বছর আগের আমেরিকান-ইটালিয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক 'ফ্র্যাঙ্ক কেপ্রা'র সঙ্গে একটি গ্রুপ ফটোতে দেখলাম তাঁকে। ছবিটি তোলা হয়েছিল ১৯৫২ সালে ইডেনে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সময়। অতীতের অ্যালবাম থেকে কিছু স্মৃতি তুলে ধরা হয়েছে ১৯৯০-এর এক আনন্দলোক সংখ্যায়। মা ছিলেন দিল্লির প্রবাসী বাঙালি। দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে পদার্থবিদ্যায় মাস্টার্স করেছিলেন। দিল্লিতেই এয়ার ইন্ডিয়াতে চাকরি করতেন। বিয়ে করে কলকাতায় আসেন। ভদ্রমহিলা আমার মন কাড়েন। জানতে ইচ্ছে করে তখনকার সেই প্রগতিশীলা নারী আজ এমন এক নড়বড়ে ছেলেকে নিয়ে কিভাবে দিন যাপন করছেন। যৌবনের যে উত্তপ্ত রক্ত তাঁকে চার দেওয়ালের গণ্ডীর বাইরে সেই বৃহৎ জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল আজ তা কি অবস্থায় রয়েছে। সত্যিই উনি সুখী নাকি গলায় এক তীব্র জ্বালা নিয়ে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অতীতের সেই ভুল পদক্ষেপগুলি পর্যালোচনা করছেন। সামনাসামনি তাঁকে দেখার জন্য মন ব্যাকুল হয়।

দ্বিতীয়দিন অমিতাভ আমাকে তার ঘরে প্রবেশাধিকার দিল। দিনের বেলা নয়, সন্ধের পরে। কিন্তু তার ঘরে যে মহিলাকে আমি আশা করেছিলাম তাঁকে দেখলাম না। পরিবর্তে দেখলাম অন্য এক মহিলা। লো ভোল্টের আলোতে বিছানায় আধ শোওয়া। অমিতাভ আমাকে সেই বিছানারই একপাশে বসতে বলল। সে বসল অন্যপাশে। জিজ্ঞেস করলাম, ''তোমার মা কোথায়?''

''মা নেই।''

''বাইরে গেছেন বুঝি?''

''মা বেঁচে নেই।''

''বাবা?''

''বাবাও নেই। উনি মারা গেছেন মায়েরও আগে।''

''ওহ্।'' আহত হলাম। যখন পার্কে সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা

বলো তো একটি ছেলে যার বাবা মা কেউ নেই তার কি অবস্থা?' আমি ভেবেছিলাম এমন ভবিষ্যতের আশঙ্কায় আশঙ্কিত সে। বুঝিনি আমার চিন্তার ভবিষ্যত তার কাছে অতীত হয়ে গেছে অনেক আগেই এবং তার প্রভাব ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে তার বর্তমানকে এবং আগামী সমস্ত দিনগুলোকে।

অমিতাভ ঘরের বড় আলোটি জ্বালিয়ে দেয়। উজ্জ্বল আলোতে দেখি ঘরের সব দেওয়াল। সবগুলোই বাঁধানো ছবিতে ভরা। সব ছবিতেই একই মহিলার মুখ। সাদা কালোতে। কখনো একটি ফ্রেমে একটিই ছবি, কখনো একটি ফ্রেমে অনেকগুলো ছবি—একই মুখের—কোলাজ করা। অমিতাভ বলে, "আমার মা।" আনন্দলোকের গ্রুপ ফটোতে বোঝা যায়নি, এখন বোঝা গেল মহিলা ছিলেন পরমা সুন্দরী।

"কবে মারা গেছেন মা?"

"অনেক বছর আগে।"

"আর কে থাকেন তোমার সঙ্গে?"

"কেউ না। আমি একা থাকি।"

"আগের দিন বলোনি তো!"

"উঁ... বলিনি..." গলা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। চেয়ারে বসে ছিল সে, উঠে গিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। রুমে ঢোকার দরজার বিপরীতে অন্য একটি দরজা। সেদিকটায় দাঁড়িয়ে লম্বা টান দেয় সিগারেটে। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, "তোমার নাম কি?"

"কাকলি।"

"কে হও তুমি অমিতাভর?"

"বান্ধবী।"

"কতদিন আগে পরিচয় হয়েছে?"

"ছ'মাস।"

কাকলি আর দেরি না করে অন্যদিন আসব বলে বেরিয়ে যায়।

রুমে কার্ডবোর্ডের পার্টিশন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে রান্নাঘর। দেখে বোঝা যায় স্বল্পব্যবহৃত। সেখানে শুধু চা তৈরি অথবা দুধ, জল গরম করার কাজ হয়ে থাকবে। অন্য দরজাটার বাইরে ছাদ এবং সেখানে অমিতাভর ঘরের দরজার পরে আরও কয়েকটি দরজা। সেসব ঘরে অন্য লোকের বসবাস।

দেখি বেডরুমের ছাদের দিকের দেওয়ালে হাতের তালুসমান একটি দরজা। ওটা কি জিজ্ঞেস করতে অমিতাভ বলে, "ওটা? ওটা একটা ঘুলঘুলি। ওখান দিয়ে বাবা মাকে চাল, ডাল, নুন-হলুদ, তরিতরকারি দিতেন।"

"মানে?"

"বাবা আমাদের সঙ্গে থাকতেন না।"

"কেন?"

"বাবার আরেকটা বউ ছিল।"

"তোমার মা তাঁর সারা জীবন এই ঘরেই কাটিয়েছেন?"

"হ্যাঁ!" এমন ভাবে বলল সে যেন এতে আমার অবাক হওয়ার কিছুই নেই। "এই বাড়ি নিয়েও কেস চলছে।"

"কেন?"

"অনেক জটিল ব্যাপার আছে। তুমি বুঝবে না। আমাকে মাঝে মাঝেই কোর্টে যেতে হয়।"

খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সত্যিমিথ্যে জানি না কিন্তু জানলাম অনেক কিছুই। অমিতাভর বাবা কালিপদ মুখার্জী অমৃতবাজার পত্রিকার ফটোগ্রাফার ছিলেন। একবার দিল্লিতে কোন সেমিনারে যোগ দিতে গিয়ে তার মায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মা তাঁকে ভালবেসে বিয়ে করে কলকাতায় চলে আসেন। মাকে উনি এখানেই উঠিয়েছিলেন। এসে যখন মা জানতে পারেন বাবা আগে থেকেই বিবাহিত তখন উনি প্রেগন্যান্ট।

"কি করে জানলেন?"

"উনি মাঝে মাঝে রাতে বাড়ি ফিরতেন না।"

"তারপর কি হল?"

"আর কি হবে! অশান্তি শুরু হল। বাবা মাকে ছেড়ে চলে গেলেন।"

"কি বিপদ! মা তো চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিলেন তাই না?'

"হ্যাঁ, সেই জন্যই তো বাবা এই ঘুলঘুলি দিয়ে চাল, ডাল, মাসের খরচা দিয়ে যেতেন।"

"উনি এখানে এসে আর চাকরি করেননি?"

"না।"

"দিল্লিতে ফিরে যেতে পারতেন তো!"

"মামার বাড়ির কেউ মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাননি।"

মা কবে কিভাবে মারা গেছেন তার সঠিক খবর সে আমাকে দেয় না। আমি দেখেছিলাম ওর মা ঠিক সুচিত্রা সেনের মতো দেখতে। ঘরে তাঁর ফটোর বাহার দেখে আমার মনে হয়েছিল অমিতাভর মনের সব মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার সারা জায়গাটা শুধু ওর মা-ই দখল করে রয়েছেন।

পরে একদিন অমিতাভর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি সে নেই। একটি মেয়ে সোমা এসেছে চন্দননগর থেকে, অপেক্ষা করছে ওর জন্য। তার পরদিন দেখি সীমা এসেছে লেক গার্ডেনস থেকে, অপেক্ষা করছে ওর জন্য। তার পরদিন মৌমিতা এসেছে আগড়পাড়া থেকে। তার পরদিন রীতা এসেছে মানিকতলা থেকে। যত বেশিদিন যাই, তত বেশি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হই—শুভ্রা, সুমিতা, দেবযানী, অমৃতা, মিনু, শিলা, চিত্রা, আরতি, মোনালিসা, সুমনা, সুপ্রিয়া, লিসা, কবিতা, মালবিকা। নতুন নুতন মুখের প্রবাহ অব্যাহত থাকে ৮১এর বিধান সরণির ঘরটিতে। অমিতাভর পাশের ঘরের জটাদা এবং আরও কয়েকটি লোক যারা দিনমজুরের কাজ করে তারাও দেখে এদের। তারা আমাকেও দেখে। আমি জটাদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এরা কে। সে বলেছে জানি না। জটাদা না জানুক আমি জানি। আমি মেয়েগুলিকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি তারা সবাই অমিতাভর পত্রবান্ধবী। আমার মতো। অমিতাভ আমার

প্রথম ভালবাসা। অমিতাভই সেই পুরুষ যে চিঠিতে আমার কাছে খোলাখুলি ভালো লাগা জাহির করেছে। আমি ওর হাতের লেখা, ওর ডিগ্রি, আমাকে নিয়ে ওর ভাবনা এবং আমার প্রতি ওর ভালবাসার সাবলীল প্রকাশ দেখে ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছি। ওর মায়ের কোয়ালিফিকেশন এবং আধুনিকতা পাগল করেছে আমাকে। মনে হয়েছে এমন মায়ের ছেলে হতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রথমদিনের দেখা হওয়ার কথা ভুলে গিয়ে দ্বিতীয় দিনের দেখা হওয়া থেকে যদি শুরু করি, ওর ঘরে কাকলির অমন উপস্থিতি আমাকে যত না খারাপ লাগা দিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ লাগা দিয়েছিল ওর মা-বাবা হারা একার জীবন। কাকলি চলে গেলে অমিতাভ আমাকে বলেছে, কাকলি ওর শুধুই বান্ধবী। সে ভালবাসে আমাকে। তাই কাকলিকে বিছানায় দেখেও মনকে বুঝিয়েছি সে আধশোওয়া ছিল, অমিতাভও ছিল না তার পাশে, তাদের মধ্যে কোন শারীরিক সম্পর্ক হয়নি। কিন্তু ওর প্রতি দুর্বলতা নিয়ে আরও কিছু ভালবাসার কথা শুনব বলে গিয়ে এক একদিন এক একটি মেয়ের দেখা পেতে থাকায় আমার ভালবাসা বড় ধাক্কা খায়। দূরে সরে আসতে চাই আমি ওর থেকে। কিন্তু অমিতাভ তা হতে দেয় না। দিন এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন আরও অনেক মেয়ের সঙ্গে আমি একইভাবে পরিচিত হতে থাকি তখন আমার প্রত্যেকদিনের সংশয়কে অমূলক ভাবাতে প্রত্যেকদিনই সে বলে তারা সবাই তার বন্ধবী। শুধুমাত্র বান্ধবী। সে আমার কপালে চুমু খেয়ে বলে সে শুধু আমাকেই ভালবাসে। বলে বিশ্বাস করতে। আমার বিশ্বাস হয়, আবার হয়ও না। যখন তার চুমুর স্পর্শ পাই তখন বিশ্বাস হয় একটিও মেয়ে শোয়নি তার বিছানায়, একটিও মেয়ের সঙ্গে সঙ্গমে যায়নি সে। যখন হোস্টেলে ফিরে আসি তখন বিশ্বাসকে সরিয়ে তার জায়গা দখল করে নেয় অবিশ্বাস। অবিশ্বাস বলে, সব মেয়েরাই এসে কিছু সময়ের জন্য আশ্রয় নেয় তার বিছানায়, সব মেয়েদেরই সঙ্গে সে সঙ্গমে যায়। অবিশ্বাসের জ্বালা নেভাতে আমি আমার রুমমেট উজ্জ্বলার সঙ্গে তার গল্প করি, তাকে তার সব চিঠি পড়ে শোনাই, বলি কি বলে সে আমায়, কি করে ভালবাসে। উজ্জ্বলা মন দিয়ে শোনে আমার কথা। এইভাবে আমার চেয়ে দুই ক্লাস নিচে পড়লেও, আমাকে দিদি বলে ডাকলেও উজ্জ্বলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে।

রাতে হোস্টেলে ফিরে উজ্জ্বলার সাহচর্যে অমিতাভর চুমু খেয়ে দেওয়া বিশ্বাসকে যতই পাকা করার চেষ্টা করি না কেন ওকে আমার কিছুতেই ভালো ছেলে বলে মনে হয় না। আবার নিশ্চিতভাবে খারাপ বলে ভাবতেও মন চায় না। আমি ওকে আমার মতো করে দেখতে চাই। ওর অনেক মিল খুঁজে পেতে চাই আমার সঙ্গে। চঞ্চল হয়ে ওঠে মন। সকালে আবার ছুটি ওর ঘরে। একেবারে সকাল সকাল। ওর অফিসে যাওয়ার আগেই ওকে ধরতে হবে ভেবে। অমিতাভ অফিসের জন্য তৈরি হয়, আমি অপেক্ষা করি। আমার ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে বেরোতে। ওকে অফিসে ছেড়ে দিতে। ইচ্ছে করে জানি কোথায় ওর অফিস। অমিতাভ বলতে চায় না। শুধু বলে ডালহৌসিতে।

"ডালহৌসিতে কোথায়?"

"ডালহৌসিতেই।"
"আরে ঠিকানাটা বলো।"
"আছে কোথাও। তুমি চিনতে পারবে না।"
"পারব।"
"না, পারবে না।"
"আচ্ছা পারব না। তবু বলো। জেনে রাখব।"
"কেন জানতে চাইছ?"
"এমনি।"
তবু সে বলে না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।
"কি চাকরি করো তুমি।"
"করি একটা চাকরি।"
অমিতাভ বলে না কি চাকরি করে। মাইনেও বলতে চায় না। অনেক জোরাজুরির পরে মুখ থেকে বেরোয়, পাঁচশো টাকা।
"কি বলছ? এত কম আবার কারও মাইনে হয় নাকি!"
"হয়।"
"কি করে চালাও এত কম টাকা দিয়ে?"
"চালিয়ে নিতে হয়।"
"অসুবিধে হয় না?"
'হয় তো।"
"মিথ্যে বলছ। তোমার মাইনে হাজার টাকা।"
'না না, হাজার টাকা না।"
"তাহলে ন'শো টাকা।"
"না না, ন'শো না।"
"তাহলে আটশো।"
"আটশো না।""
"সাতশো।"
"না।"
"ছ'শো।"
"উঁহু।"
শেষ পর্যন্ত মেনে নিতেই হয় যে অমিতাভর মাইনে পাঁচশো টাকা। যেহেতু পাঁচশোর উপরে সে কিছুতেই যায় না। অমিতাভ আমাকে বাস থেকে নেমে যেতে বলে। আমি নামব না বলে জেদ ধরি। শেষে সে-ই নেমে যাওয়ার জন্য সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আমিও নামতে চাই। তখন সে আবার বসে। ওকে জানতে চাওয়ার খেলায় আমি মেতে থাকি। হয়ত ওর কোন অফিসই নেই, হয়ত বা আছে। থাকলে হয়ত সে তার অফিসের বাসস্টপ পেরিয়ে চলেও এসেছে, হয়ত বা আসেনি। আমি ওকে প্রশ্ন করতে থাকি। সে ওঠা বসার মাঝখানে দিতে থাকে উত্তর।

জিজ্ঞেস করি, ‘‘তোমার ঘরে এত মেয়ের যাতায়াত কেন?’’

‘‘এদের কিছু না কিছু সমস্যা আছে।’’

‘‘যেমন?’’

‘‘যেমন শুভ্রা ওর ভায়ের জন্য মনীন্দ্রনাথ কলেজে অ্যাডমিশন চায়। মনীন্দ্রনাথ কলেজের আগের প্রিন্সিপ্যাল বাবার বন্ধু ছিলেন। তাই সে আমার কাছে আসে যদি আমি প্রিন্সিপ্যালকে অনুরোধ করে ভাইয়ের জন্য কিছু করতে পারি।’’ আমি অমিতাভর মুখের দিকে তাকাই। শ্যামলা লম্বাটে তার মুখ। মোটামুটি উন্নত নাক, নাকের নিচে সরু গোঁফ এবং উপরে নানা ভাষায় কথা বলা অতল গভীরতাময় চোখ।

সে একটা সিগারেট বুকপকেট থেকে বের করে লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে নেয়। লম্বা টান দেয় সিগারেটে। চেন স্মোকার অমিতাভ। আমি ওর চোখের উপরে ঘন ভুরুগুলো দেখি। ওর পুরো মুখটা ভালো করে দেখি। খুব সুন্দর লাগে ওকে দেখতে। যেমন অনেক কাছ থেকে ওর মুখের সৌন্দর্য খুঁটিয়ে না দেখলে ওকে সুন্দর বলে মানা যায় না যে তেমনই অনেক কাছ থেকে ওকে পর্যবেক্ষণ না করতে পারলে মানা যায় না যে ওর চরিত্র সত্যিই এত মেয়েমুখী।

সঙ্গমের কথাকে প্রশ্রয় না দিতে চাইলেও মন বলে আমাকে যেমন চুমু খেয়েছে তেমন সব মেয়েগুলোকেই চুমু তো অন্ততপক্ষে সে খেয়েছে। কিন্তু অমিতাভ মানে না। আমি একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম সে নেই। কাকলি এসেছে। কাকলিকে নিয়ে ছাদে গেলাম. কথাপ্রসঙ্গে সে আমায় জিজ্ঞেস করল, ‘‘তুমি, রীতা সবাই বাবুলদার বান্ধবী বলো?’’

‘‘বাবুলদা?’’

‘‘হ্যাঁ, বাবুলদা! অমিতাভর ডাক নাম বাবুল তো!’’

‘‘ওহ্।’’

‘‘তোমরা সবাই বান্ধবী বলো?’’ যে কাকলিকে অমিতাভর বিছানায় আধশোওয়া দেখে আমার মন তাকে বেশ্যা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে চাইছিল না সেই কাকলি অমিতাভকে বাবুলদা বলছে, আবার সঙ্গে এও জেনে নিতে চাইছে তার বাবুলদার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক! আমারও তাকে এই মোক্ষম মুহূর্তে বাজিয়ে নিতে ইচ্ছে হল। বললাম, ‘‘শুধু বান্ধবী হতে যাবে কেন! আমরা বিয়ে করছি তো!’’

‘‘কবে?’’

‘‘এই তো আমি শুধু আমার একটা চাকরি পাওয়ার অপেক্ষা করছি।’’

কাকলি আমার কাছ থেকে আর কিছু জানতে চাওয়ার আগেই জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘কেন? তুমিও ওকে নিয়ে এমন কিছু ভাবছ নাকি?’’

‘‘ও বলে। কিন্তু আমি এখনও হ্যাঁ না কিছু জানাইনি। জানো তো আমি ওকে ঠিক বুঝতে পারছি না। ওর ঘরে অনেক মেয়ের আনাগোনা।’’

‘‘তোমাকেও বিয়ের কথা বলেছে! তাহলে বলতে হবে সত্যিই ছেলেটি একদমই নির্ভরযোগ্য নয়। হতেই পারে সে অন্য মেয়েদেরও একই কথা বলেছে। কিন্তু সবার সঙ্গে তো তার বিয়ে হতে পারে না। তোমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কতদূর গড়িয়েছে?

আমি অন্য মেয়েদেরও জিজ্ঞেস করব। তোমার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকলে তোমাকেই তার বিয়ে করা উচিত তাই না?"

কাকলি বিশেষ কিছু স্বীকার করল না। বললাম, "এবার শোনো, আমি আমাকে নিয়ে আগে যা বললাম তা মিথ্যে। ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কোন কথা হয়নি। তবে আমার মনে হয় তোমার এবার সাবধান হওয়া উচিত।"

"তার আগে একদিন এসে ওকে ঝেড়ে যেতে হবে এবং যা কিছু হবে তোমার সামনেই হবে।"

আমি অমিতাভকে কাকলির কথা জানাই। কয়েকদিন পরের কথা—৮১এ, বিধান সরণিতে গিয়ে দেখি কাকলি অমিতাভর ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে। সে বলল, মাঝখানে একদিন রাস্তায় পেয়ে বন্ধু টাব্লুর সামনে অমিতাভ তাকে অপমান করেছে, "তুমি বনানীকে কি সব আজেবাজে কথা বলেছ। মাথা কি খারাপ হয়েছে তোমার? আমি তোমাকে বিয়ের কথা বলেছি নাকি তুমি পড়ে আছ আমার পেছনে! এবার আমার ঘরে এলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।" অপমান করেই অমিতাভ তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে গেছে। কাকলি তাকে পাল্টা জবাব দেওয়ার সুযোগ পায়নি। এখন এসেছে জবাব দিতে। এক ঘণ্টা অপেক্ষার পরও সে ফিরল না দেখে আমরা দু'জনই নিচে নেমে গেলাম। হাতিবাগান বাজারের মধ্যে দেখলাম অমিতাভ হেঁটে হেঁটে আসছে ঘরের দিকে। কাকলিকে দেখেই সে উল্টো পথ নিল। কাকলিও দৌড়ল অমিতাভর পেছনে, "এই যে কোথায় যাচ্ছ?"

"আমাকে শেভ করতে যেতে হবে।"

"দাঁড়াও, শেভ করতে যেও পরে। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

"যা বলার কালকে এসে বলো। এখন তাড়া আছে," লম্বা লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল সে।

কাকলি বলল, "দেখেছ কেমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে! আমি নিজেই আর আসব না এখানে। বুঝে গেছি কেমন চরিত্র ওর।"

অমিতাভর ঘরে আমি ওর ছেলে বন্ধুও দেখেছি। যেমন জয়ন্ত, গৌতম, সুমিত। তাদের মধ্যে জয়ন্ত এবং সুমিতের সঙ্গে আমি আগেই পরিচিত হয়েছিলাম। গৌতমকে দেখলাম কাকলির সঙ্গে তার এই ঘটনার পরে। সেদিন অমিতাভর ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল। বাইরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি সে আসবে বলে। জটাদার ঘরে বসে ওর সঙ্গে অমিতাভর মা-বাবার গল্প করেছি। আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে ছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল। এরই মাঝখানে বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে রীতা এল। সঙ্গে একটি নতুন মেয়ে। রীতাকে আমি আগে আরও চারবার দেখেছি। ওরা বেশিক্ষণ বসল না। ওরা চলে যেতেই আমি ছাদে গিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে অমিতাভর ঘরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরের বৃষ্টির তালে তালে ঘরের ভেতরে কোথাও পুটপাট শব্দ পেলাম। সন্দেহ হল কায়দা করে সে ওখানে বসে নেই তো! খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরটা ভালো করে দেখলাম। জলে মেঝে ভিজে গেছে, হয়ত বা বিছানাও। পুটপুট শব্দটা যে ছাদ থেকে মাটিতে টপাটপ বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার কারণেই

তা বুঝতে বাকি রইল না। ঘর থেকে জল গড়িয়ে দরজার বাইরে চলে এসেছে। অমিতাভর বেড়ালটা বাচ্চা নিয়ে টেবিলের উপর শুয়ে ছিল। আমাকে দেখেই উঠে লাফ দিয়ে জানালায় এল। ডাকল ম্যাউ। বেড়ালের ডাকটা এত বিকট যে আমি ভয় পেয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলাম, ধাক্কা খেলাম একজনের বুকে। পরিচিত হয়ে জানলাম সে অমিতাভর বন্ধু গৌতম।

গৌতমের বয়স অমিতাভরই মতো। ত্রিপুরার জোলাইবাড়িতে তার বাড়ি। সে একটি মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করে। ত্রিপুরা থেকে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে। কলকাতায় এলে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে।

গৌতম আমাকে জিজ্ঞেস করে, "তোমার সঙ্গে অমিতাভর আলাপ হল কি করে?" বিস্ময় ওর চোখে। আমি অনুমান করি বিস্ময়ের কারণ। খুব ছোট মনে হয় নিজেকে। উত্তর দিতে পারি না আর সেই অবসরে গৌতম নিজেই কারণটি তুলে ধরে, "তোমাকে দেখে একজন ভদ্র মেয়ে বলে মনে হয়েছে। অমিতাভ আমার বন্ধু। তাই বলে নিশ্চয় আমার বলা উচিত হবে না যে ও একটা ভালো ছেলে।"

অমিতাভকে গৌতম কেন 'ভালো ছেলে'র আখ্যা দিতে রাজি নয় জেনেও না জানার ভান করি, "কেন?"

'ও একদিনে দশটি মেয়ের সঙ্গে ডেট করার ক্ষমতা রাখে।"

"ওহ্।"

"তুমি ওকে কতদিন ধরে চেনো?"

"খুব বেশিদিন নয়।"

"তবু শুনি কতদিন।"

"মাস দুই তিন হবে।"

"তোমার সঙ্গে সে তেমন কিছু করেনি তো?"

আমার মুখ চুন। *শুধু চুমু খেয়েছে।* "না। না।"

"কিছু না হয়ে থাকলে আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিতে চাই—সরে এসো ওর কাছ থেকে।"

গৌতমের কাছে আমি আমার মনের কথা ব্যক্ত করি না। বলি না যে আমি সরেই এসেছি। তবু আমি এখানে আসি। অন্য কারণে। সে যদি কোন অস্বাভাবিক পথে পা রেখে থাকে—আপনি বলছেন তবু সঠিকভাবে জানি না রেখেছে কিনা—যদি রেখে থাকে তাহলে ওকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে নির্দিষ্ট করে দিতে চাই সেই পথ যে পথে অন্যান্যরা হাঁটছে, অনেকখানি সুস্থ জীবন যাপন করছে।

গৌতমকে আমি বোঝাতে যাই না যে সবরকমের পার্থক্যকে উপেক্ষা করে মানুষের মধ্যে মিল খুঁজে বেড়ানো আমার ধর্ম। মিল আমি পাইও। আমাদের চলাফেরা এবং চিন্তাধারার মধে যতটুকু পার্থক্য আছে তা বংশগত এবং পরিবেশগত কারণে। আমরা সবাই এই পার্থক্যকে অনুভব করি এবং এখানেই আমাদের ভিত্তিগত সাদৃশ্য। এই ভিত্তিগত সাদৃশ্য আমাকে আনন্দ দেয়। আশা জাগায় মনে।

গৌতমকে এও জানাই না যে আমি অমিতাভর ঘা খেয়ে ব্যথা পাওয়া অথবা

সমাদৃত না হওয়া আবেগকে বের করে নিয়ে আসতে চাই। আবেগ এখন সুপ্ত অবস্থায় অথবা হিমশীতল হয়ে মনের কোথাও পড়ে আছে এবং এর জ্ঞান অমিতাভর নিজেরও নেই। তাকে বের করে ভালবাসার উষ্ণতা দিয়ে গরম করতে চাই, চাই তা জেগে উঠে ব্যথাহীন হয়ে ঘুরে বেড়াক, আনন্দরস নিক প্রকৃতি থেকে—যে আনন্দরস একবার ভেতরে ঢুকলে কখনও বেরিয়ে আসে না, পুনরায় ব্যথা পায় না, কাউকে দেয় না ব্যথা, শুষ্ক করে দেয় না জীবনস্রোতকে। নাই-বা হল সে আমার জীবনসাথী, নাই-বা হলাম আমি তার কেউ, তবু সে আমার প্রথম ভালবাসা। আমি আমার প্রথম ভালবাসার জন্য প্রথম ভালবাসাকে ত্যাগ করতে পারি, তাকে অন্যের হাতে তুলে দিতে পারি। কারণ আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। সে-ই আমাকে ভলবাসার পবিত্র অনুভূতি দিয়েছে।

আমি উজ্জ্বলাকে গৌতমের কথা বললে সে বলে, ‘‘মনে হচ্ছে তোমাকে গৌতমদার পছন্দ হয়েছে।”

‘‘ধ্যৎ।”

‘‘না গো বনানীদি, ঠিকই বলেছি। দেখে নিও, এই ছেলেটি তোমাকে প্রপোজ করবে।”

গৌতম ফিরে যায় ত্রিপুরায়। সেখানে গিয়ে আমাকে চিঠি লেখে। বারবার সাবধান করে আমি যেন অমিতাভর ঘরে আর না যাই। বলে আমি যেন তাকে নিয়মিত চিঠি লিখি, মন খারাপ হলে যেন তার কথা ভাবি, সে কলকাতায় এলে তার সঙ্গে যেন দেখা করি। প্রশ্ন জাগে—সে কি সত্যিই আমাকে ভালবাসতে চায়?

গৌতমকে লেখা আমার চিঠির ভাষা এরকম হয়,

‘‘আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনার সঙ্গে পত্রালাপ বজায় রাখতে আমার এতটুকুও আপত্তি নেই। আপনি মানেন কিনা জানি না, আমি মানি যে সাধারণত প্রত্যেকটা অ্যাসোসিয়েশনের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য বা নীতি থাকে। নিছক আড্ডাকেও আমি এমন উদ্দেশ্য বা নীতির বাইরে ফেলছি না। আমি একটি সংস্থাকে জানি যার উদ্দেশ্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা। অমিতাভ ও তার বন্ধু-বান্ধবী (এদের মধ্যে পত্রবন্ধু ও পত্রবান্ধবীও রয়েছে) নিয়ে গঠিত অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও নীতি আমার কাছে স্পষ্ট নয়, কারণ সংগঠনের সদস্যরা (এপর্যন্ত যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে) তাদের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে তেমন কোন সুস্পষ্ট ধারণা আমাকে দেয়নি। আমার মনে হয়—শুধু মনে হয় কেন—আমি একপ্রকার নিশ্চিতই এখানে আড্ডা মারার বাইরে লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্য কিছুও হয়ে থাকে। অস্পষ্ট সম্পর্কের আলগা বাঁধনে ধরা দিয়ে সাময়িকভাবে পারস্পরিক উত্তেজনা প্রশমনের মধ্যে অসুস্থ মস্তিষ্কের কি আত্মতৃপ্তি জানি না। আপনি বলেছেন অমিতাভর সঙ্গে আপনার কম করেও দশ বছরের বন্ধুত্ব। জানি না এই দশ বছরে আপনি এই অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কতটা

জড়িয়ে পড়েছেন অথবা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হয়েও নীতিগত দিক থেকে কতটা দূরে সরে থাকতে পেরেছেন। তবে আশা করব এ ব্যাপারে আপনি আপনার বন্ধুকে বিন্দুমাত্র সমর্থন করবেন না এবং আমার একজন ভালো বন্ধু হয়ে থাকবেন।"

পরদিন সকালে উজ্জ্বলাকে পড়ে শোনাই চিঠি।

"শুধু বন্ধু হয়ে থাকবে? আর কিছু হবে না?"

"সেটা সময় বলবে।"

ষড়যন্ত্র

কলকাতায় কয়েক বছর থাকার কারণে আমার বেশ কয়েকজনের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রকমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই বেশ কয়েকজনের মধ্যে একজন হল সুদীপ্ত শিকদার। সুদীপ্তর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় অমিতাভর সঙ্গে পরিচয়ের পরপরই। পরিচয়ও হয়েছে ওই একইভাবে। পত্রমৈত্রীর মাধ্যমে। পত্রমৈত্রী একদিকে যেমন মনের শান্তি বিনাশকারী অমিতাভকে আমার সঙ্গে জুড়েছে, অন্যদিকে জুড়েছে শান্তি প্রদানকারী সুদীপ্তকে। ছেলেটি আমার চেয়ে বছর দু'য়েকের বড়। গায়ের রঙ শ্যামলা হলেও দীপ্ত চেহারা। বি কম করে কম্পানি সেক্রেটারিশিপের কোর্স করছে। বাবা ডাক্তার। আসানসোলে থাকেন। হাওড়াতে বাবার আরেকটি বাড়ি আছে। সেখানে সুদীপ্ত জেঠুর পরিবারের সঙ্গে থাকে। সে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। মাঝে মাঝে আমিও যাই ওর হাওড়ার বাড়িতে।

সেই বেশ কয়েকজনের মধ্যে আরেকজন হল তাপস মহাপাত্র। যোগাযোগ পত্রমৈত্রীর মাধ্যমে। থাকে বেরিলিতে। 'এয়ার ফোর্স'-এ ফ্লাইট লেফটান্যান্ট। তাপসের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। যোগাযোগ চিঠিপত্রেই। অনেক বড় বড় চিঠি লেখে সে। অনেক ভালবাসার অভিব্যক্তি তাতে। সে আসতে চায় কলকাতায়। দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে। তার ভালবাসার জালে ফাঁসি বা না ফাঁসি তাকে দেখার ইচ্ছে আমারও। আমি তার আগমনের অপেক্ষা করি।

সেই বেশ কয়েকজনের মধ্যে আরেকজন হলেন প্রদীপদা। প্রদীপদার এবং আমার যোগসূত্র হল ছোটদা। উনি আমার চেয়ে চৌদ্দ পনেরো বছরের বড়। উচ্চতায় পাঁচ ছয় কি সাত। রোগা পেটা চেহারা। গায়ের রঙ তামাটে। উনি বেশির ভাগ সময় পাজামা-পাঞ্জাবি এবং কম সময় প্যান্ট-শার্ট পড়েন। তাঁর মাথার ক্রমবর্ধমান টাক এবং চোয়ালের ঘন চাপদাড়ি আমাকে বারবার, অসংখ্যবার রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা মনে করিয়ে দেয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের এবং প্রদীপদার চেহারার মধ্যে ব্যবধান তৈরি করেছে তাঁর চোখের বেশি পাওয়ারের চশমা। স্টেট ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে, শোভাবাজারে বাপের ভিটা ছেড়ে গুটিকয়েক টিউশনের দ্বারা জীবন যাপনের সঙ্কল্প নিয়ে সুকিয়া স্ট্রিটের একটি মেসে আস্তানা গেড়ে বসে আছেন। মেসের পুরো একটি ঘর তাঁর দখলে এবং সেই ঘরে আমার অবাধ যাতায়াত। প্রদীপদাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলেমেয়েরা অনেকেই অপছন্দ করে। তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। শুধু আকাঙ্ক্ষা আছে। আকাঙ্ক্ষা অবাধ স্বাধীনতার। এবং অভিযোগ আছে। অভিযোগ স্বাধীনতা ভোগ করতে না পারার। অভিযোগ বাঁধনমুক্ত না হতে পারার। স্বাধীনতা আমার অভিলাষ অথচ সেই স্বাধীনতাই আমি কোথাও পাই না। স্বাধীনতা পেতে বাড়ি ছেড়ে হোস্টেলে এসেছি। এসে দেখেছি এখানেও তা অনায়াসে লাভ করা যাচ্ছে না। আগের হোস্টেলে আমার স্বাধীনতা খর্ব করেছেন বিশেষত উমাদি। এই হোস্টেলে সেই দায়িত্বটি নিয়েছেন সুপারিন্টেনডেন্ট। এখানে কোন মেট্রন নেই, সুপারিন্টেনডেন্টই মেট্রনের ডিউটি পালন করেন। ভি এল মিত্র

ইউ জি হোস্টেল মেট্রনের ডিউটি সম্পর্কে আমাকে যে ধারণা দিয়েছে তা হল সন্ধ্যায় মেয়েদের নাম ডাকা এবং কারণে অকারণে তাদের পেছনে পড়া। কারণে পেছনে পড়ার অর্থ হল হোস্টেলের নিয়ম ভঙ্গ করলে হেস্তনেস্ত করা এবং অকারণে পেছনে পড়ার অর্থ হল হোস্টেলের নিয়ম ভঙ্গ না করলেও হেস্তনেস্ত করা। ভি এল মিত্র ইউ জি হোস্টেলে মাসিমা কারণে পেছনে পড়তেন, উমাদি পড়তেন অকারণে। ভি ই এস উইমেন'স হোস্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট মাসিমার এবং উমাদির কাজ একইসঙ্গে একাই পালন করছেন। যখন যে মেয়ের ওপর উনি কৃপাদৃষ্টি রাখেন তখন তার প্রতি তাঁর কর্তব্য খুব বেড়ে যায়। অতিরিক্ত খেয়াল রাখার কর্তব্য। বর্তমানে সুপারের কৃপাদৃষ্টি আমার ওপর। আমার ওপরই উনি তাঁর দিনের বেশিরভাগ সময় নষ্ট করেন। অবশ্য আমি যাকে সময় নষ্ট বলে মনে করি উনি তাকে তা ভাবেন না। এটাতে তাঁর বেশ চিত্তবিনোদন হয়।

আমি চুড়িদার পরে একতলায় খেতে নামলে সুপারিন্টেনডেন্টের গায়ে জ্বালা ধরে। প্রতিদিন দু'বার করে চুড়িদার পরে খেতে নামায় তাঁর সেই জ্বালার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পেতে পেতে একসময় অসহনীয় হয়ে ওঠে। পলতায় জন্ম নেওয়া এবং পলতাতেই বেড়ে ওঠা ভোগ না হওয়া কালো সিটকে শরীর কিছুটা পলতায় বুড়িয়েছে, কিছুটা বুড়িয়েছে কলকাতায়। সিটকে শরীরের উপর বসানো লম্বা সিটকে মুখখানি আরও সিটকে দিয়ে নাকি স্বরে আমাকে উনি বেশ কয়েকবার ধমকও দিয়ে ফেলেছেন হোস্টেল থেকে বের করে দেবেন বলে।

ধমকের কারণ জেনেও ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করেছি, ''কেন?''

''চুড়িদার পরে খেতে নেমেছ কেন?'' পাল্টা প্রশ্ন তাঁর।

''আমি নাইটি পরি না তাই।''

''আগে তো পরতে।''

''আগে পড়তাম। এখন পরি না।''

''ঘরে থাকলে নাইটিই পরবে।''

''কেন?''

''এটাই হোস্টেলের নিয়ম।''

''কোথায় লেখা আছে?''

''লিখে রাখার দরকার পড়ে না। আমি মুখে বলছি এটাই যথেষ্ট।''

''আমি মানি না।''

''মানো না তো হোস্টেল ছেড়ে দাও।''

আমি প্রদীপদার কাছে যাই। আমার অপমান প্রদীপদার ঝলসানো তাম্রবর্ণ চামড়ায় সুড়সুড়ি দেয়। উনি হাসেন।

''ব্যস! এতটুকুই? আর কিছু বলেনি?''

''আর কি বলবে?''

''না, বলছিলাম যে সত্যি সত্যি শাস্তি দিতে চাইলে অন্য অনেকভাবেই দেওয়া যায়।''

‘‘যেমন?’’

‘‘যেমন খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া, ভিজিটরসদের হোস্টেলে ঢোকার অনুমতি না দেওয়া কিংবা মিথে মিথ্যে ‘নেই’ বলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া, অন্য মেয়েদের পটিয়ে নিজের দলে টেনে তোমাকে কোণঠাসা করে দেওয়া ইত্যাদি। হোস্টেল থেকে তাড়ানো আবার কোন শাস্তি হল নাকি! শাস্তি তো হল হোস্টেলে রেখে অত্যাচার করা।’’

‘‘খাওয়া বন্ধ করবে! আমি কি টাকা দিই ওর বাপকে খাওয়ানোর জন্য!’’

‘‘নিশ্চয় নয়। সে টাকা নেবে না, খেতেও দেবে না। বলবে বেয়াদবি করলে অন্য কোথাও থেকে খাওয়ার ব্যবস্থা করো। তখন তোমাকে রোজ হোটেল ছুটতে হবে। এটা কি কোন ছোট শাস্তি হল?’’

সুপার আমার খাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করেন না। কিন্তু তার বদলে যা করেন সেটাও কম পীড়াদায়ক নয়। উনি বন্দনাদিকে নির্দেশ দেন মাছের সবথেকে ছোট পিসটা যেন আমার পাতে পড়ে। হোস্টেলে মেয়েরা দেখেছি বড় মাছের পিস পাওয়ার জন্য সুপারিন্টেনডেন্টকে তো বটেই, বন্দনাদিকেও খোশামোদ করতে ছাড়ে না। সুপারিন্টেনডেন্টের গালি হজম হয়ে যায় যদি তার সঙ্গে মাছের একটা বড় পিস পেটে ঢোকে। আমার পেটের হজম প্রক্রিয়া আলাদা। গালি এবং অতিরিক্ত শাসন আমার শরীরের এনজাইমের কার্যক্ষমতাকে নষ্ট করে—মাছের পিস ছোট হোক আর বড় আস্ত বেরিয়ে যায় মলদ্বার দিয়ে। আমি সবসময় একই ভাবনা নিয়ে চলি—আমার যা প্রাপ্য তা আমার পাওয়া দরকার। আমাকে আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার স্বাধীনতা কারও নেই। কেউ এমন করলে অথবা করার প্রয়াস করলে আমি ভেতরে ভেতরে অশান্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু প্রতিবাদী পদক্ষেপ নিই শান্তভাবে। তার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দিই, তার দেওয়া কোন নির্দেশ, আদেশ, উপদেশ, পরামর্শ কিছুই মানি না। তার দিকে চোখের পলক ফেলার ইচ্ছে পর্যন্ত রাখি না। এক কথায় তাকে আমি সর্বতোভাবে বয়কট করি। সর্বতোভাবে বয়কট করার অর্থ এও নয় যে তার প্রতি আমার মনোযোগকে আমি পুরোপুরিভাবে সরিয়ে নিয়েছি। বরং কার্যাবলী দিয়ে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিই যে তাকে আমি প্রতি মুহূর্তে টোকা মেরে মেরে উপেক্ষা করছি।

বাটিতে ছোট মাছের পিস দেখে আকুল-ক্রন্দন কাঁদে আমার মন। খিদের জ্বালা নয়, অপমানের জ্বালায়। কিন্তু সেই ক্রন্দনের করুণ আওয়াজ আমার শক্ত খোলসের বাইরে ফেটে, নিংড়ে, চুইয়ে কোনওভাবেই আসতে পারে না। আওয়াজকে কোনওমতেই বাইরে আসার অনুমতি আমি দিই না। ওপরে দেখাই আমি কোন মাছ-পিয়াসী নই। তাই ছোট পিসটাও আমার জন্য বড়ই হয়, অর্ধেকটা না নষ্ট করে পারা যায় না। আমাদের খাওয়ার সময় সুপারিন্টেনডেন্ট ডাইনিং চেয়ারে পা দুটো ভাঁজ করে উঠিয়ে বসে থাকেন। মুখের কাছে ভাঁজ হয়ে থাকা হাঁটুর উপর হাতদুটোকেও ভাঁজ করে রাখা থাকে। আর সেই ভাঁজ করে রাখা হাতের এবং বুকের ফাঁকে গোঁজা থাকে মাথা। চোখের অবস্থান পরিবর্তন না করে কখনও উনি টেবিলের নিচে মেঝে দেখেন, কখনও মণি ঘুরিয়ে রান্নাঘরে বন্দনাদিকে দেখেন, কখনও ডাইনিং টেবিলের চারপাশে বসা মেয়েদের দেখেন। সুপার মনে করেন উনি যেহেতু মাথা

ওঠাচ্ছেন না মেয়েদের এই ভেবে নির্বিকার থাকা করা উচিত যে উনি চোখ বন্ধ করে আছেন। কিন্তু মেয়েরা সব বোঝে। ওরা নিঃশব্দে হাসে, ইশারায় কথা বলে। সুপার সব মেয়েদের দেখলেও ওঁর লক্ষ্যবস্তু মূলত আমি। উনি আমার দিকেই বেশি দৃষ্টিপাত করতে চান, অপেক্ষা করেন আমার খাওয়া শেষ হওয়ার। খাওয়া শেষে আমি সিঁড়িতে পা রাখতেই উনি মাথা তুলে পা নিচে ঝুলিয়ে বসেন, বাকি মেয়েদের কাছে আমার সমালোচনা শুরু করেন। ওঁর কথা যতক্ষণ পর্যন্ত না স্পষ্ট হয়ে কানে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হয় না কিন্তু সমালোচনার কথা শুনেই প্রদীপদার ভেতরের প্রতিবাদী সত্তাটা ছটফট করে ওঠে। ‘‘এতদিন হোস্টেলে থেকেও তুমি গালি দেওয়া শিখলে না!’’ বলে উনি আমাাকে প্রত্যুত্তর দিতে উত্তেজিত করতে চান।

‘‘গালি দেব কেন?’’

‘‘গালি না দিলে তো তার মুখ বন্ধ হবে না।’’

পরপর কয়েকদিন আমার দ্বারা মাছ নষ্ট হওয়ার যন্ত্রণা সয়ে এখন সুপার আর আমার খাওয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা করেন না। খাওয়ার শুরুতেই আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে রাঁধুনিকে বলেন, ‘‘বন্দনা, বলে দাও এভাবে মাছ নষ্ট করলে চলবে না।’’ বলার পর মাথা আবার নিচু রোজকার মতো। বন্দনাদি আমার থালা নিয়ে আসেন। কানের কাছে ফিসফিস করে বলেন, ‘‘মাছ নষ্ট করো না লক্ষ্মীটি। আমাকে কথা শুনতে হয়।’’

তবু নষ্ট করি মাছ। পরদিন সুপার বন্দনাদিকে মাঝখানে না টেনে সরাসরি আমার ওপর আক্রমণ চালান, ‘‘অনেকবার বলেছি এমন আচরণ করলে হোস্টেল থেকে বের করে দেওয়া হবে।’’

‘‘কেমন আচরণ!’’ আমি যেন বুঝিই না কোন আচরণের ইঙ্গিত আছে তাঁর কথায়।

‘‘থালায় এভাবে মাছ ফেলে যাওয়া যাবে না।’’

‘‘আমার ভাগের মাছ আমি নষ্ট করতেই পারি।’’

‘‘না পারো না।’’

‘‘পারি।’’

‘‘পারো না।’’

‘‘পারি।’’

‘‘পারো না।’’

‘‘পারি।’’

মনের জোর লাগিয়ে যতই পারি বলি না কেন পরদিন সত্যিই আর মাছ নষ্ট করতে পারলাম না। সুযোগই পেলাম না নষ্ট করার। পরদিন আমার বাটিতে মাছের কোন পিসই পড়ল না। প্রদীপদার কাছে প্রতিবেদন নিয়ে হাজির হলাম। উনি সেই একই কথা বললেন, ‘‘এতদিন হোস্টেলে থেকেও তুমি গালি দেওয়া শিখলে না!’’

মাছ নষ্ট না করতে পেরে আমি সবজি নষ্ট করা শুরু করলাম। কয়েকদিন

আমাকে শুধরোনোর সুযোগ দেওয়ার পর সবজিও আমার পাত থেকে অবসর নিল। আবার প্রদীপদার প্রতিবাদী সত্তা উস্কানি দিল আমায়—"এতদিন হোস্টেলে থেকেও তুমি গালি দেওয়া শিখলে না!"

গালি দেওয়া আমি শিখিনি কিন্তু যারা স্বভাবদোষে যখন তখন উত্যক্ত হয়ে পড়ে তাদের কি করে আরও বেশি উত্যক্ত করতে হয় তার কলাকৌশল আমার নখদর্পণে। সুপারিন্টেনডেন্ট না আমাকে তাঁর বশে আনতে পারেন না আমাকে হোস্টেল থেকে তাড়াতে পারেন। মনে ওঁর অশান্তির শেষ নেই। ইদানিং অমিতাভর কারণে আমি প্রতিদিন সকালেই হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পড়ছি, অথচ উনি জানেন ইউনিভার্সিটিতে আমার ক্লাস শুরু হয় এগারোটায়—এই ব্যাপারটা বেশ খোঁচা দিচ্ছে তাঁকে। হোস্টেলে ভিজিটরসদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে—কয়েকদিন পরে পরেই আমার নতুন নতুন বন্ধুর মুখদর্শন করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছেন সুপার। এছাড়াও আছে চিঠির ধাক্কা। চিঠি আমাকে অনেকেই লেখে—সুদীপ্ত, তাপস, বাদল, চৈতালি, অমিতাভ, অমিতাভর বন্ধু গৌতম। মণিকা এক বছর পিছিয়ে যাওয়ায় অনেক আগেই ওর সঙ্গে আমার প্রতিদিনের মেলামেশা বন্ধ হয়ে গেছে। 'বি এস সি'র পরে চৈতালিরও পড়াশোনা আর এগোয়নি। তাই বলে আমি মণিকা-চৈতালিকে ছেড়ে দেব তা তো হতে পারে না। তাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমার ক্রোশ থেকে দূরে থাকতে চাইলে মাঝে মাঝে চিঠি লিখে আমাকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। ছেলে বা মেয়ে কারোর সঙ্গেই এত সহজে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বন্ধুত্ব আমি করি না। চৈতালি লেখে, *তোকে চিঠি লিখতে আমার খুবই ইচ্ছে করে। কিন্তু ভয়ও করে। তোর তো আবার যেমন তেমন ভাষা পছন্দ নয়, চিঠিতে ভুলভ্রান্তি পছন্দ নয়। মনে হয়, কি জানি বানান ভুল থাকলে অথবা ভাষা সাহিত্যিক না হলে রাগে ছিঁড়ে ফেলবি চিঠি অথবা দু'লাইন পড়েই ছেড়ে দিবি। তাই বাংলা থেকে বাংলা অভিধান সঙ্গে নিয়ে বসতে হয়...।*

মণিকা চিঠির ভাষা এবং বানান ভুল কি ঠিক তা নিয়ে ভাবে না। আমাকে খোশামোদ করে চলার মতো অবস্থা এখন তার নেই। হতাশায় ভরা মন। লেখে, *ভাবি তোরা কত লাকি। আমার ভাগ্যবিধাতা আমার জন্য এমন ভাগ্য কেন লিখে রাখলেন জানি না। জানি না কোন পাপের শাস্তি আমি পাচ্ছি। আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না রে বনানী...।*

তাপস লেখে, *জানো রানি তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। কবে যে কলকাতায় আসতে পারব। এলে কিন্তু খুব ঘুরব তোমার সঙ্গে। ঘুরে একবারে বিয়ে করে নিয়ে আসব তোমায়...।*

গৌতম লেখে, *অমিতাভকে একদম বিশ্বাস করবে না। তুমি আমার সঙ্গে মেলামেশা করো। আমার সঙ্গে মিশলে তুমি ঠকবে না নিশ্চিত বলতে পারি...।*

অমিতাভ তার একশো বান্ধবী নিয়ে তৈরি করা গোলকধাঁধার চত্বরে আমাকে দিশেহারা করে দিয়ে আবার সেখান থেকেই বেরোনোর পথ দেখানোর চেষ্টায় মেতে আছে। লেখে, *ভুল বুঝো না লক্ষ্মীটি। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার ভালবাসার*

প্রাঙ্গণে।

অমিতাভর এমনই একটা সোহাগ ভরা চিঠি একদিন সুপারের হাতে পড়ল। যেদিন পড়েছে সেদিন চিঠি আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। বস্তুত চিঠির ব্যাপারে কিছু বলাই হয়নি আমাকে। পরদিন ছিল বুধবার। বুধবার বিকেলে সেক্রেটারি, চিত্রলেখা নিয়োগী আসেন। উনি দোতলার অফিসে সুপারের সঙ্গে বসে টাকাপয়সার হিসেব দেখেন এবং মেয়েদের হালচাল জানেন। চিত্রলেখা নিয়োগী মাঝারি উচ্চতার শ্যামলা বর্ণের পঞ্চাশোর্ধ ভারি শরীরের মহিলা। বেশ কিছুদিন ধরে দেখছিলাম চশমার কাঁচের ভেতর থেকে ধারালো তির্যক দৃষ্টি আমার মুখের ওপর নিক্ষেপ করছেন। একদিন অফিস ঘরে আমার তলব পড়েই গেল। তখন সুপার চেয়ারে পা তুলে কুঁজো হয়ে বসে নেই। পা মাটিতেই রাখা আছে। দু'হাত সামনের টেবিলে কনুয়ের উপর দাঁড় করানো। একপাশে হেলিয়ে দেওয়া জোড়া হাতের পৃষ্ঠতলের উপর বিশ্রাম করছে তাঁর থুতনি। চোখ সম্মুখের দেওয়ালের দিকে কিন্তু দৃষ্টি পাশে কোথাও। বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে আমাকে নিয়ে নানা অভিযোগের পালা উনি ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছেন।

চিত্রলেখা নিয়োগী আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেমন আছ? লেখাপড়া কেমন চলছে? পরীক্ষা কবে? হোস্টেল কেমন লাগছে? সুপারকে কেমন লাগে?'

আমি বলেছিলাম, ভালো আছি।

—লেখাপড়া ভালো চলছে।

—পরীক্ষার দেরি আছে।

—হোস্টেল বেশ ভালো লাগছে।

—সুপার খুব ভালো মানুষ।"

মনের ভেতরে যা আছে তা ঝেড়ে ফেলার এত সুযোগ দেওয়ার পরেও আমি কিছুই ঝাড়িনি। উল্টে মুখে পরম তৃপ্তি নিয়ে সংক্ষেপে কুশল উত্তর দিয়েছি। সেক্রেটারি ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, ''এসো।" উনি আমাকে ওনার ফোন নম্বর দিয়েছিলেন, ঘরের ঠিকানাও দিয়েছিলেন—২৫৯, দারগা রোড, কলকাতা-১৭ এবং বলেছিলেন কোন অসুবিধে হলে আমি যেন ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করি। কিন্তু আমি যোগাযোগ করিনি। আমার মনে হয়েছিল, হোস্টেলের নিয়মশৃঙ্খলা না ভাঙলে একদিন না একদিন সুপার আমাকে বুঝবেন, আমাকে নিয়ে তাঁর সব অভিযোগ শূন্য হয়ে যাবে। এই হোস্টেলে আগের হোস্টেলের মতো সন্ধ্যাবেলায় সাততাড়াতাড়ি ঢুকতে হয় না। রাত আটটার মধ্যে ঢুকলেই হয়। সুতরাং ঢোকা নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই। সারাদিন বাইরে কোথায় চড়িয়ে বেড়াচ্ছি তা সুপারের দেখার বিষয় নয়। পুলিশ আমাকে সঙ্গে নিয়ে হোস্টেলে হাজিরা না দিলেই হল।

তারপর এমন হল যে হোস্টেলে থাকলে প্রত্যেক বুধবারেই চিত্রলেখা নিয়োগী আমায় ডাকছেন, জিজ্ঞেস করছেন একই প্রশ্ন এবং আমি একই উত্তর পরিবেশন করছি এবং সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে কুঞ্চিত ভ্রূ নিয়ে একইভাবে উনি বলছেন,

“ঠিক আছে, এসো।” উনি কখনও বলেন না ‘যাও’। নিশ্চয় এই জন্যই যে উনি জানতেন আমাকে তাঁর অফিসঘরে বারবার ফিরে আসতেই হবে।

সেদিন আমি অফিসে যেতেই চিত্রলেখা নিয়োগী আমার হাতে একটি খোলা খাম দেন। খামটি এসেছে ৮১এ, বিধান সরণি থেকে। উনি বলেন, “পড়ো।”

অমিতাভ লিখেছে, লক্ষ্মীটি, বারবার বলছি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি। তুমি ছাড়া বাকি যারা এখানে আসে তারা সবাই আমার বান্ধবী। কারও সঙ্গে আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক নেই। আমি কাউকেই একটা চুমু পর্যন্ত খাইনি। তুমি পারলে একবার এসো। এলেই বুঝতে পারবে।

অনাবিল ভালবাসা ও শুভকামনায়,
তোমারই অমিতাভ।

“এটা কি?” জিজ্ঞেস করেন সেক্রেটারি।

আমি প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হই বটে কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, “চিঠি।”

সুপার তাঁর নাকি স্বর তুঙ্গে চড়ান, “এসব প্রেম ভালবাসার চিঠি এখানে আর কোনোদিন যেন না আসে।”

ভয় পাওয়া তো দূরের কথা। উল্টে আমি সুপারকেই সাহসের সঙ্গে জেরা করি, “আপনি আমার চিঠি কেন খুলেছেন?”

“আমি খুলিনি, এটা খোলাই ছিল।” খামটি ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখি। সুপার ঠিকই বলেছেন। আঠা কম। অর্ধনগ্ন অবস্থায় যাত্রা শুরু করে পূর্ণনগ্ন হয়ে প্রাপকের ঠিকানায় পৌঁছেছে।

“ঠিক আছে খামটি খোলা ছিল। চিঠি তো লাফ দিয়ে খামের বাইরে এসে আপনার হাতে পড়েনি। ওটা বের করা হয়েছে।”

“তুমি হোস্টেল ছেড়ে দাও। অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করো,” কাতর মিনতি করেন সেক্রেটারি। শুনে নরম হওয়া তো দূরের কথা পাথরকঠিন গলায় আমি আমার দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিই, “হোস্টেল আমি ছাড়ব না।”

চিত্রলেখা নিয়োগীর চোয়াল শক্ত হয়ে যায়, “হোস্টেল ছাড়বে না! দেখছি কি করে তুমি থাকো এখানে।”

“দেখুন।” আমি চারতলায় উঠে যাই।

আমাকে নিয়ে ওঁদের ষড়যন্ত্র চলতে থাকে।

অমিতাভর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি সে নেই। রীতা অপেক্ষা করছে ছাদে। রীতা মাথায় সিঁদুর পরে এসেছে। অমিতাভর সঙ্গে রীতাকে নিয়ে আমি আগে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম এবং রীতা তা জেনেছে। তাই সে আজ আমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে রাখছে না। হতেও পারে সে অমিতাভকেই বিয়ে করেছে। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস

করা যাবে না। কিছুক্ষণ বাদে দেখি জয়ন্ত এল। দাঁড়ালো রীতার পাশে। আমি ওদের কাউকেই জিজ্ঞেস করে জানতে পারছি না ব্যাপারটা কি। বোবা হয়ে আরও কিছুক্ষণ ছাদের অন্য পাশটাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। জানি অমিতাভ আসবে। অমিতাভ আসবে বলেই ওরা সবাই এসেছে। অমিতাভ এলে জানলাম রীতা ও জয়ন্ত আগের দিন বিয়ে করেছে। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। সে সাক্ষী দিয়েছে।

আমি আর ওদের মাঝখানে থাকতে চাইলাম না। চলে এলাম। পরে অমিতাভ আমাকে বলেছে, ‘‘দেখলে তো, তুমি শুধু শুধু আমাকে সন্দেহ করো। বলেছিলাম না রীতা আমার বান্ধবী। খুব গরীব ঘরের মেয়ে। আমিই জয়ন্তকে বুঝিয়ে ওকে বিয়ে করতে রাজি করেছি। ওর মা-বাবা পণ দিতে পারবে না বলে একটা বুড়ো বরের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করেছিল।’’

অমিতাভর কথা শুনে সেদিন একটু লজ্জাই পেয়েছিলাম। তবু মানতে চাইনি যে আমার সন্দেহ একেবারে অমূলক। জিজ্ঞেস করেছি, ‘‘সুমিতার কি সমস্যা?’’

‘‘সুমিতা তো জটাদার গ্রামের মেয়ে।’’

‘‘তোমার কাছে ওর কি প্রয়োজন?’’

‘‘ও জটাদার কাছেই আসে। এলে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।’’

‘‘দেবযানী?’’

‘‘দেবযানীর সুমিতকে ভালো লাগে।’’

‘‘তো সুমিতের কাছে না গিয়ে সে এখানে কেন আসে?’’

‘‘আমি সুমিতকে রাজি করানোর চেষ্টা করছি তাই।’’

‘‘আরতি?’’

আরতির হাজব্যান্ড ওকে খুব মারধর করে।’’

‘‘তাতে তোমার কি?’’

‘‘এখানে এসে কাঁদে। আমার খারাপ লাগে। আমি তো ওকে চলে যাও বলতে পারি না।’’

‘‘কি করে আলাপ হল আরতির সঙ্গে? সেও কি তোমার জটাদার গ্রামের মেয়ে নাকি?’’

‘‘না।’’

‘‘তাহলে কি করে জানলে তাকে?’’

‘‘চিঠিতে পরিচয়।’’ খোলাখুলি সহজ উত্তর দেয় না সে।

‘‘পত্রমৈত্রীর মাধ্যমে?’’

‘‘হুঁ।’’

‘‘ওর হাজব্যান্ড মারধর করলে তুমি কি ওর চোখের নিচে বাটি নিয়ে গিয়ে ধরো?’’

‘‘না তা নয়...’’

‘‘ওকে আসতে না করে দাও।’’

অমিতাভ চুপ থাকে। আমি বলি, ‘‘তুমি যদি না বলতে না পারো আমিই বলে

দেব।”

“অমন করে বললে খারাপ দেখায়।”

“তুমি কি ওকে ভালবাস?”

“না।”

“ভালবাসলে বলো। বিয়ে করতে চাইলে বলো। তোমার হয়ে আমি ওকে প্রস্তাব দেব।”

“না না, কি বলছ তুমি!”

“কাকে ভালবাস তাহলে?”

“তোমাকে।”

সে আমাকে ভালবাসে, অথচ তার মধ্যে বান্ধবীর সংখ্যা সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছে আমি দেখি না। অমিতাভ আমার জীবনের সেই প্রথম পুরুষ যে আমাকে স্পর্শ করেছে। স্পর্শ করে শারীরিক চাহিদা যে কত অদমনীয় হতে পারে তার ধারণা আমায় দিয়েছে। অদমনীয় শারীরিক চাহিদা সবল মনকে কিভাবে দুর্বল করে দেয় তার উপলব্ধি তারই কাছ থেকে আমি পেয়েছি। মন এভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে কি ভীষণ ভুল ঠিকানায় তার এবং তার শরীরের স্থায়ী বাসস্থান বানিয়ে ফেলতে পারে তা আমি অমিতাভর মতো মেয়েমুখো পুরুষের সঙ্গে পরিচিত না হলে জানতেই পারতাম না। অনেক কষ্ট হয়েছে এমন বিনাশকারী ভালবাসার মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। মনে হয় আমি এক অসাধ্য সাধন করেছি। দ্বিতীয়বার এমন অসাধ্য সাধনের কোন অভিলাষ নেই। এখন আমার মন অনেক শক্ত। এক ধাতব কঠিনতা এসেছে মনে। ধাতু যেমন শক্ত তেমন নরমও। ধাতুকে আমরা শক্ত বলি কারণ একটা কাঠের টুকরোকে ভেঙে ফেলা সহজ কিন্তু লোহার টুকরোকে নয়। লোহার টুকরোকে দ্বিখণ্ডিত করতে হলে তাকে কাটতে হয়। ধাতুকে নরম বলা হয় কারণ তা উষ্ণতায় গলে যায়। উষ্ণতা দিয়ে নমনীয় করে পিটিয়ে ধাতুকে অন্য আকার দেওয়া হয়। আমার ভেতরের হৃৎপিণ্ডকে ভালবাসার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর ভাঙ্গা যাবে না। তাই বলে আমি অমিতাভর সংস্পর্শ থেকে পুরোপুরি বিচ্যুতও হয়ে যেতে পারব না। কুলাঙ্গার হয়ে হলেও অমিতাভ এই পার্থিব জগতে চলাফেরা করা অবস্থায় আমার কাছাকাছিই থাকবে। কখনও দূরে চলে গেলে আমি তার স্মৃতিকে প্রদীপের বুক পুড়িয়ে দেওয়া আলোর শিখার মতো মনের ভেতরে রেখে দেব। ওই লোকটি আমার জীবনে কেন এল ভেবে আমার যেমন রাগ হয় তেমন ভালোও লাগে সে আমাকে আমার মৃত্যুর পূর্বেই নরক দেখিয়েছে বলে। প্রেম থেকে সরে এসে তার প্রতি ভালবাসাকে আমি অন্য রূপ দিয়েছি, পিটিয়ে ধাতুকে অন্য আকার দেওয়ার মতো। আমার মনে হয়েছে এই দুনিয়াতে এই লোকটি বড় একা। কেউ তার একাকীত্ব বুঝতে পারে না এবং সে নিজেও কাউকে তার একাকীত্বের কথা বোঝাতে পারে না। বোধহয় সে নিজেই জানে না একাকীত্বটা কি জিনিস। শুধু বোঝে কিছু একটা অসহনীয় অসুবিধে হচ্ছে ভেতরে। সেই অসুবিধেকে দূরে রাখতেই সে এসব করছে। মনে হয়েছে স্নেহ, মমতা পেলে তার অতল অন্তর থেকে বিশুদ্ধ

প্রেমের অনুভূতিটি জেগে উঠে নদীর কলকল জলধারার মতো আঁকাবাঁকা পথে বেরিয়ে আসবে, এসে ছড়িয়ে পড়বে কাগজে, চিঠিতে, উজ্জ্বল করে দেবে সেই শব্দ দুটোকে—'অনাবিল ভালবাসা'কে। কোন চিঠিতেই সে এই শব্দ দুটো লিখতে ভোলে না।

আমি জানি অমিতাভ ভালো চকরি করে না। করলে কোর্ট কাছারি করে এই ঘরটিতে জেঁকে বসে থাকার চেষ্টা সে করত না। অমিতাভ বলে ব্যারাকপুরে তার আরেকটা বাড়ি আছে। হয়ত মিথ্যে বলে, হয়ত সত্যি। হয়ত তার বাবার বাড়ি আছে, হয়ত সেখানে তার বাবার আগের পক্ষের ছানাপোনারা থাকে। আমি অমিতাভকে যথাসাধ্য টাকা দিয়ে সাহায্য করি। হয়ত তার প্রকৃত প্রয়োজন নেই, তবু।

বাবা আমাকে প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা পাঠান। ভি এল মিত্র হোস্টেলে থাকাকালীন পেতাম তিনশো টাকা। এখন দু'শো টাকা বেড়েছে। তবু কলকাতায় আমার আর্থিক অবস্থার অবনতি বই উন্নতি হয়নি। হোস্টেলে দিতে হয় সাড়ে তিনশো টাকা। ছোটদা বলে দিয়েছে বাকি দেড়শো টাকায় আমি যদি নিজের অন্যান্য খরচা চালাতে না পারি তাহলে নিজেকে টাকা উপার্জনের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। টিউশন করতে হবে। সে নিজেও টিউশন করে, আমাকেও করতে হবে। শুনে বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। সংবাদপত্র দেখে বন্ধু পাওয়া সহজ, ছাত্রছাত্রী নয়। আমি যদি বন্ধুর জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিই বন্ধুত্বের একশো প্রস্তাব আসতে পারে এবং আমি একশোজনকেই বন্ধুর জায়গা দিতে পারি। প্রাইভেট টিউটরের জন্য এমন নীতি খাটে না। বিজ্ঞাপনের জবাবে একশো প্রার্থী এলেও কাটছাট করে একজনকেই ছাত্র বা ছাত্রী পড়িয়ে টাকা উপার্জনের সুযোগ দেওয়া হয়। এখানে, রাজাবাজারে ভাই চন্দনীও নেই যে তার আরেক জোড়া বোন ও ভাগনে পাব। আমার চিন্তার বিস্তৃতি ছোটদা পর্যন্ত ঘটলে ছোটদা বিরক্ত হয়, "আমি কি করে সাহায্য করব? নিজে নিজে খুঁজে নে।"

মুখে শক্ত কথা বললেও ছোটদাই শেষপর্যন্ত আমাকে সাহায্য করে। বন্ধু পকাইদাকে পাঠায় সল্ট লেক এক নম্বর সেক্টরে 'পি এন বি'র সামনে আমার সঙ্গে দেখা করতে। দেখা হতেই পকাইদা বলেন, "তিনটে মেয়েই দেখতে সুন্দর।"

"কোন মেয়ে?"

"তুমি যে বাড়িতে পড়াতে যাবে।"

"কটা মেয়ে পড়বে?"

"একটিই। ছোটটি।"

"পড়াতে যে যাবই সে কথা তোমাকে কে বলল?"

"আমি বলছি। মেয়েটার বাবা আমার কাকু হন। আমার পছন্দ নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন ওঠাবে না। কিন্তু একটা কথা আছে।"

প্রশ্নবোধক চিহ্ন মুখের ওপর টেনে দিয়ে আমি পকাইদার দিকে তাকাই। উনি বলেন "ওদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না। শুধু অঙ্ক আর বিজ্ঞান পড়াতে হবে। দু'শো টাকার বেশি দিতে পারবে না। তাই তোমাকে ব্যাপারটা অন্যভাবে ম্যানেজ

করতে হবে। তুমি বলবে আমি সপ্তাহে দু'দিন পড়াতে পারব।"

দু'শো টাকা আমার জন্য অনেক। আমি তো ভেবেছিলাম একশো সওয়াশো হবে। "আমার তিনদিন পড়াতেও কোন আপত্তি নেই।"

"না না, তার প্রয়োজন হবে না। দু'দিনই ঠিক আছে।"

যাই হোক, পরদিন থেকেই পড়ানো শুরু করি। মাস দু'য়েকের মধ্যে আরও দুটো টিউশন হাতে আসে। আমার মাসিক উপার্জন হয় পাঁচশো টাকা। পাঁচশো টাকার কিছুটা আমি অমিতাভর জন্য ব্যয় করি। তার দাড়ি কাটার টাকা, চুল কাটার টাকা, জুতো পালিশের টাকা এবং অনেকদিনের ব্রেকফাস্টের টাকা আমার তহবিল থেকেই সরবরাহ হয়। অমিতাভর প্রয়োজন মিটিয়ে যা বাঁচে তার প্রায় সবটাই ব্যয় হয় বাকি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সময় কাটানোর বিলাসিতায়।

অমিতাভর সঙ্গে আমি শর্ত রেখেছি আমায় স্পর্শ না করার। সে আমার শরীরে যৌবনের উত্তাল হাওয়ার বীজ বপন করে ভালবাসার যে চারার জন্ম দিয়েছিল, ভীষণ ভয়ংকর ছিল সে চারা। ভীষণ স্বার্থপর। সেই চারা নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য আমার ফুসফুস থেকে সমস্ত অক্সিজেন টেনে নিত। একটুও বাঁচিয়ে রাখত না আমার জন্য। আমার সেই সময়টা ছিল এক কঠিন সংগ্রামের সময়। ফুসফুসের অক্সিজেন তথা ফুসফুস নিয়ে কঠিন টানা-হেঁচড়ার পর আমি অবশেষে জিতেছি। আমার এই জিতের পেছনে অবশ্য গৌতমের হাত আছে। গৌতম এই সংগ্রামের খবর না পেয়েও বারবার আমাকে সাবধান করেছে, বলেছে অমিতাভ হল কলসপত্রী। কলসের ঢাকনায় আমি যেন ভুল করেও না বসি। বসলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমার এই জিতের পেছনে বাদলেরও অবদান আছে। নিজের অজান্তেই আমার সঙ্গে কিছুদিনের মনমাতানো রসায়ন তৈরি করে ফেলেছিল সে। সেই রসায়নের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় অমিতাভর কাছ থেকে পাওয়া যন্ত্রণা অনেকখানি ফিকে হয়ে গিয়েছিল। বাদলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল দুর্গানগরের সর্বধর্ম মিশনে। সেও ত্রিপুরার ছেলে অথবা লোক। লম্বায় অমিতাভর চাইতে কিছুটা কম, স্বাস্থ্যে অমিতাভর চাইতে কিছুটা বেশি। ঢলঢলে চেহারা। পরিচিতির স্থলে আমাদের বেশি কথা হয়নি। পরিচিতির স্থল থেকে উঠিয়ে নিয়ে পরিচিতিকে আমরা শহরের অন্যত্র ফেলেছি। সেখানে তাকে বন্ধুত্বের রূপ দিয়েছি। বন্ধুত্বকে ছাড়িয়ে আরও কিছু অস্পষ্ট মনোভিলাষ অবশ্যই তৈরি হয়েছিল আমাদের মধ্যে। তা না হলে ছুটির দিনগুলোতে সিঁথি মোড় থেকে এক কিলোমিটার হেঁটে ওর ঘরে যাওয়ার ইচ্ছে আমার ভেতরে এত দুর্বার কেন হয়ে উঠবে! নইলে বাদলই বা কেন এত দূর থেকে দিনের পর দিন রাজাবাজারের প্রতাপ মঞ্চের কাছে পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে হোস্টেলে আমার রুমের আমার বিছানা ঘেঁষা জানালার দিকে চাতক পাখির মতো হা করে চেয়ে থাকবে! নইলে সল্ট লেকে টিউশনের দিনগুলোতে অফিস শেষে বাদল কেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে আমার জন্য অপেক্ষা করবে! নইলে আমিই বা কেন টিউশন শেষে দেখা করার এবং একসঙ্গে কিছু সময় কাটানোর অসীম আগ্রহ নিয়ে একপা দু'পা ফেলে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো! নইলে বাদল কেন বলবে, চলো ব্যাংকে একটা জয়েন্ট

অ্যাকাউন্ট খুলি। নইলে সে বাগবাজারে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আর কিছু না পেয়ে হঠাৎ বাটাতে ঢুকে গিয়ে একজোড়া জুতো হাতে উঠিয়ে নিয়ে ‘প্লীজ, অন্ততপক্ষে একটা জিনিস গিফট করতে দাও’ বলে অনুরোধ করবে এবং আমি তা নিতে অস্বীকার করলে হতাশা প্রকাশ করবে এই বলে যে, ‘ভালো লাগে না। তুমি কিচ্ছু নিতে চাও না!’

স্টেট ব্যাংকে চাকরি করত সে। স্টেট ব্যাংকের চাকরি কেমন সে বিষয়ে কোন ধারণা আমার তখন নেই। কিন্তু বাদলকে আমার ভালো লাগে। অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি বলতে মাত্র গ্র্যাজুয়েশন, তবু বাদলকে আমার ভালো লাগে। পুরুষ হিসেবে নিশ্চয় সুদর্শন নয়, তবু বাদলকে আমার ভালোই লাগে। বাদলের মনের উদারতা আমাকে দুর্বল করে। বাদল একবার মাসখানেকের জন্য কালিয়াগঞ্জে গেল। সেখান থেকে চিঠি লিখল। চিঠিতে মনোহরণকারী কিছুই ছিল না, তবু আমি উল্লসিত হলাম। সেই চিঠির সংক্ষিপ্ত উত্তর পাঠালাম। উত্তর পেলামও। একটু রোম্যান্টিক, একটু অন্যরকম, *“তোমার কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার এই দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিশ্চয় ভাবছ কেন? কি এমন আছে আমার চিঠিতে? আমি বলব অনেক কিছু। আসলে কি জানো? তুমি যে আমার চিঠির উত্তর দেবে এটা আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। সাদা কাগজের উপর তোমার হাতের লেখা কয়েকটি লাইন ভালবাসার উষ্ণ ধারায় স্নান করিয়ে দিয়েছে আমাকে...। ভালো আছ তো? আশা করি পেট্রোল পাম্পের সামনে আমার ওই জায়গাটা আমারই জন্য খালি আছে, আর কেউ দখল করেনি। করলে কিন্তু...।”* আমার পরের চিঠিটা লম্বা ছিল। তার উত্তর না দিয়ে বাদল লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করে চলে এল কলকাতায়। অভিমান করলাম, “উত্তর দিলেন না যে!”

সে হেসে বলল, “উত্তরের কি দরকার? তোমার সামনেই তো হাজির হয়ে গেছি।”

তবু আমি রেগেই রইলাম। পরদিন পেট্রোল পাম্পের সামনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করালাম ওকে। তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম তবু।

আমি সাধারণত অনেক আগেই তৈরি হয়ে যাই। জানালায় বসে অপেক্ষা করি তার আসার। অপেক্ষা করতে করতে পেচ্ছাব পায়খানা পেলে ছবিকে অথবা উজ্জ্বলাকে জানালায় বসিয়ে দিই উপরে তাকিয়ে কোন ইশারা বা সংকেত না পেয়ে সে ফিরে চলে যেতে পারে এই ভয়ে। সে এলে ওরা হাত দেখিয়ে ধরে রাখে। সেদিন ওরা ছিল না। ঠিক ছিল না নয়, ছিল কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার কথা বন্ধ ছিল। আমাদের চারতলার কেবলমাত্র একটি মেয়ে ছাড়া সবাই অর্থাৎ সাতজন হোস্টেল সুপার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আমাকে বয়কট করেছিল। প্রদীপদাকে না চিনেই প্রদীপদার ছকে চলছিলেন সুপার। আমাকে বাকি সব মেয়েদের থেকে আলাদা করে কোণঠাসা করে দিতে চাইছিলেন যাতে করে হোস্টেলে আমার জায়গা ছোট হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়, আমি হোস্টেল ছেড়ে দিই।

ভি ই এস উইমেন’স হোস্টেলের সেই ‘হোস্টেল বাড়ি’ থেকে মেন বিল্ডিং-এর চারতলায় আসার পর প্রথমদিকের দিনগুলো ভালোই কেটেছিল। সিনিয়র হওয়ার

সুবাদে বাকি মেয়েদের ওপর বেশ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পেরেছিলাম। মেয়েরা আমাকে মানত, সমীহ করত, যত্ন করত। রাতে আমার ঘুমনোর অসুবিধে হলে রুমে লাইট জ্বলত না, বাথরুমে আমার যাওয়ার প্রয়োজন জানলে আর কেউ যেত না বাথরুমে, সারারাত আমার বাইরের হাওয়া খাওয়ার ইচ্ছে হলে কেউ জানালা বন্ধ করত না, রাতে হাওয়া খেয়ে ঠাণ্ডা লাগিয়ে সারাদিন জানালা বন্ধ করে রাখলেও কেউ কখনও অনুরোধ করত না 'জানালা খোলো' বলে। দীর্ঘ সময় ধরে বাথরুম দখল করে রাখায় তিনতলার কোন সিনিয়র মেয়েও যদি বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছে চারতলার মেয়েরা হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করেছে আমার বেরোনোর। ভেবেছে এবার তুলকালাম কিছু একটা ঘটবে যদিও তারা জানত তুমুল ঝগড়াকে আমি ঘৃণা করি, আমার প্রতিবাদের নীতি হল এক কথায় সংক্ষিপ্ত জবাব এবং পূর্ণ বয়কট, তবু। মেয়েরা জানত আমাকে খাবার উপহার দিতে হলে তা প্লেটে রেখে প্লেট ঢেকে যত্ন নিয়ে দিতে হবে, কাগজে করে 'এই নাওরে খাওরে' বললে চলবে না। খাবার তাহলে কাগজেই পড়ে থাকবে এবং তা পচে গলে কিংবা শুকিয়ে গেলে তাদেরকেই ডাস্ট বিন-এ ফেলার দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু মেয়েদের মাঝখানে আমার এই আধিপত্য বেশিদিন টিকল না। রুমে অদ্রিজা নামের একটি এম এ ফার্স্ট ইয়ারের মেয়ে থাকবে বলে উপস্থিত হল। তার বিষয় বাংলা। অদ্রিজা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে অনেকখানি, চোখে পড়ার মতো। এসেই সে তার বপু চেহারাকে হাতিয়ার করে নেমে পড়ল আমার সঙ্গে ক্ষমতার লড়াই-এ। হাত করে নিল ছবিকে, উজ্জ্বলাকে। হাত করে নিল পাশের রুমের মেয়েগুলোকেও। ঘরে লাইট জ্বলতে থাকল অনেক রাত পর্যন্ত। আমার বিছানার একপাশ জুড়ে থাকা জানালাটা আমার ঠাণ্ডা লাগা বা গরম লাগার খেয়াল না রেখে যখন তখন খুলতে বা বন্ধ হতে থাকল। ছবি কোন কথা শোনে না, অকারণে আমার সঙ্গে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। উজ্জ্বলা আগের মতো অমিতাভর কথায় আগ্রহ নেয় না, ভালো ধারণা রাখে না আমাকে নিয়ে। আমি আগে হোস্টেলে ওর সবথেকে প্রিয় দিদি ছিলাম, এখন পরিবর্তিত হলাম সবথেকে অপ্রিয় একটি মেয়েতে। আমি আগে ওর চোখে খুব সুন্দর ছিলাম, এখন হলাম খুব কুৎসিত। একমাস আগেই আমার সঙ্গে ফটো তোলার আনন্দে উজ্জ্বলা নেচে উঠেছিল। চোখে কাজল টানা, ঠোঁটে লিপস্টিক পরা আমাকে সাউথ সিল্ক শাড়িতে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিল, ''বাব্বা বনানীদি, তুমি তো সাজলে আগুন!'' এখন আমি সেই সাজের সঙ্গে মুখে পাউডার মাখলেও সে কিছু বলে না, চুলে গজরা বাঁধলেও ফিরে দেখে না, আমার গায়ে ছড়িয়ে দেওয়া আতর তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে না—বলে না সে, ''বাহ্, বনানীদি গন্ধটা তো দারুণ!''

হোস্টেলে কিছুক্ষণের জন্য এসে চলে যায় জল। সুপার নিজের জন্য বালতিতে জল ভরে রাখেন কিন্তু আমাদের ভরতে অনুমতি দেন না। মেয়েরা তাঁকে অমান্য করে গোপনে জল ভরে রেখেছে জানলে এসে চিৎকার করেন। ছবি আগে মাঝে মাঝে দোতলায় নেমে সুপারের বালতির জল ফেলে দিয়ে আসত প্রতিশোধ নিতে। এখন যায় না। ভালো হয়ে মেয়ে গেছে সে। হোস্টেলে দুটো মেরুর সৃষ্টি হয়েছে।

এক মেরুতে সুপার, অন্য মেরুতে আমি। আগে তিনতলার মেয়েরা ছিল সুপারের মেরুতে, চারতলার মেয়েরা আমার। এখন সবাই সুপারের মেরুতে। ওরা ভাবে আমি বুঝি প্রতিদিন অমিতাভর বিছনায় বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করে আসছি। কখনো আমাকে বিদ্রূপ করে কথা চালাচালি করে নিজেদের মধ্যে।

অসহনীয় হয়ে ওঠে হোস্টেলের পরিবেশ। তাই প্রদীপদার মেসে আমার যাতায়াত বেড়ে যায়, প্রদীপদার সামনে আঁচড়-পাঁচড় বেড়ে যায়। ছোটদাকে বলতে পারি না, প্রদীপদাকেই বলি, "হোস্টেলে আর থাকা যাবে না।" জানি প্রদীপদা আমার মনের ইচ্ছে জানলে ছোটদাও জানবে। প্রদীপদা আমাকে ছটফট করতে দেখে হাসেন। ওই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন, "এতদিন হোস্টেলে থেকেও তুমি গালি দেওয়া শিখলে না!"

অদ্রিজা আমার রুম ছেড়ে পাশের রুমে যায়। তার জায়গায় গৌতম এবং বাদলের দেশ থেকে আসে নূপুর। মেয়েটি আমাদের সবার থেকে জুনিয়র। মণীন্দ্রনাথ কলেজে বি এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী। সোশিয়লজিতে অনার্স। নূপুরের ছেলেমানুষি হাসি, ছেলেমানুষি রাগ, ছেলেমানুষি ঠাট্টা এবং শুদ্ধ বাংলা বলতে পারার অক্ষমতা নূপুরকে নিয়ে বাকি মেয়েদের কৌতুকের কারণ হয়। আমি নূপুরকে স্নেহ করি। নূপুর হয় হোস্টেলে আমার একমাত্র সমর্থক।

এর মধ্যে সুপার আরেকটি অসহনীয় আচরণের দিকে পা বাড়ান। সেদিন সন্ধের পর আমি দোতলার স্টাডি রুমে পড়তে বসেছিলাম। হঠাৎ উনি এসে কুঞ্চিত মুখে সামনে পেছনে ঘুরপাক খেয়ে ফ্যানের সুইচটা অফ করে বেরিয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম হয়ত ভুল করে সুইচে হাত পড়ে গেছে। পরের দিনও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হল। তার পরদিনও। তৃতীয়দিন আমি উঠে গিয়ে সুপারের সামনেই আবার ফ্যানটা চালিয়ে দিই। উনি আবার বন্ধ করেন, আমি আবার চালাই। আবার বন্ধ করেন সুপার, আবার আমি চালাই। সুপার বলেন, "তোমার জন্য সোসাইটি এত ইলেক্ট্রিসিটির বিল ভরতে পারবে না।" এসব কথার উত্তর দেওয়া আমার ধাতে নেই। আমি চুপ থাকি। মুখ বন্ধ রেখে নিজের কাজ করে যাই। বাড়িতেও তাই করতাম। করে দিদির হাড় জ্বালিয়েছি। আগের হোস্টেলেও তাই করতাম। করে উমাদির এবং রূপমের হাড় জ্বালিয়েছি। এখন ভি ই এস উইমেন'স হোস্টেলে করছি। হাড় জ্বালাচ্ছি সুপারের। আমি গরমের মধ্যে ফ্যান না চালিয়ে স্টাডি রুমে বই নিয়ে বসে থাকি ক'দিন। এম এ ফাইনাল পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। মিতাদির কাছ থেকে তার জার্নালিজমের নোট পেয়েছি। আমার চেয়ে বছর দু'য়েকের সিনিয়র মিতাদি শান্তনুদার স্ত্রী এবং শান্তনুদা ছোটদার বন্ধু। তারও হাল আমার মতো। বোটানি নিয়ে গ্রাজুয়েশন। এম এস সি পড়ার সুযোগ দেয়নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তাই জার্নালিজম নিয়ে পড়েছে। মিতাদি আমার মনের ব্যথা বোঝে, আমাকে ভালবাসে এবং যথাসাধ্য সাহায্য করে। কিন্তু আমার হোস্টেলের অত্যাচারী শাসক আমার ভালো চান না। আমি স্টাডিরুমে বসে ঘামে ভিজে পড়াশোনা করলেও বিন্দুমাত্র করুণার উদ্রেক হয় না তাঁর মনে। 'এই মেয়েরা সন্ধের পর নিজেদের ঘরে গিয়ে লেখাপড়া করবে।

লাইটের অনেক বিল আসছে। সেক্রেটারি আমাকে বারবার বলে দিয়েছেন স্টাডি রুমে যেন লাইট না জ্বলে,' বলে চেঁচামেচি করেন।

রাগ পেটে পিঠে বহন করে প্রদীপদার কাছে যাই। প্রদীপদা রাগ প্রশমিত করেন। হোস্টেলের সুপার এবং প্রদীপদা হলেন একে অন্যের পরিপূরক। সুপার আমাকে ব্যথা দেন, প্রদীপদা কথার মলম লাগিয়ে প্রশমিত করেন সেই ব্যথা। হোস্টেলে আমি রোজ ব্যথা পাই তাই ব্যথা প্রশমিত করতে রোজ প্রদীপদার মেসে যাওয়া আমার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। প্রতিদিনই ওঁর মেসে গিয়ে হানা দিই, প্রয়োজন বুঝে পরিমিত বা অপরিমিত সময়ের জন্য বসে থাকি সেখানে, সারা দুনিয়া নিয়ে মনের ভেতরে যত রাগ, ক্ষোভ, অভিমান, বিরক্তি নাশ করি, অতঃপর ফিরে আসি হোস্টেলে। যত দিন যায় প্রদীপদাকে তত আপন মনে হয়। উনি আমাকে কখনও সমর্থন করেন না। সমর্থন করেন আমার প্রতিপক্ষকে। কিন্তু উনি আমাকে মনোবল দেন প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়ার।

প্রদীপদা বলেন, ‘‘স্টাডি রুমে সকালে গিয়ে বসো। তাহলে ওর আর কিছু বলার থাকবে না।’’

তাই করি। সন্ধের পর স্টাডি রুমে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় সকালে যাই। আগে যেতাম না, এখন যাই। একদিনও বাদ দিই না। বাদ দিলে সুপারকে অশান্তি দেওয়া হবে না। আমিও চাই না উনি অশান্তিমুক্ত থাকুন। সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেলেন সুপার। একদিন এসে চেঁচাতে শুরু করলেন, ‘‘নিজের রুমে গিয়ে পড়ো।’’

‘‘যাব না।’’

‘‘কেন যাবে না শুনি! কেন যাবে না?’’

‘‘ওখানে মেয়েরা গল্প হাসাহাসি করে। আমি মনোনিবেশ করতে পারি না।’’

‘‘তার মধ্যেই সবাই পড়ছে। তুমিও পড়বে।’’

আমি বলি না যে ওরা সবাই একদিকে। আপনারই কূটনীতি দ্বিমেরুকরণ ঘটিয়েছে হোস্টেলে। আপনি কূটনীতি চালিয়েছেন আমার বিরুদ্ধে। আমার বিরুদ্ধে আপনার কূটনীতি শুরু হয়েছিল আমার হাউজকোটের উপরে শাড়ি জড়িয়ে খেতে নামতে অস্বীকার করার ঘটনা থেকে। এই সামান্য ব্যাপারটি এত বড় হয়ে গেল যে আমার হাঁটা, বসা, শোওয়া, কথা বলা বা না বলা সবকিছু নিয়ে আমি মেয়েটিই অসহনীয় হয়ে উঠলাম আপনার কাছে। আমি মাঝে মাঝে হিন্দু হোস্টেলে যাই—ওখানে রোগা অমিতাভ, মোটা প্রভাস এবং ছোটদার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলি। না তাদের প্রতি গেঞ্জির ওপর পাঞ্জাবি চড়িয়ে ডাইনিং হলে যাওয়ার আদেশ আছে, না তাদের সন্ধে আটটার মধ্যে হোস্টেলের গেটের ভেতরে ঢুকে পড়ার আদেশ আছে। তাদের সুপার তাদের গায়ের সঙ্গে আঁটুলির মতো লেগে থাকে না। আমি মেয়ে হয়ে জন্মানোর যন্ত্রণা ভোগ করছি। অন্য মেয়েরা এটাকে যন্ত্রণা বলে মনে করে না। আমি করি।

আমি সুপারকে বলি না যে আমার রুমের মেয়েরা একে অন্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলে। একে অন্যের জন্য একই সময় গুল্পগুজব করে, একই সময় ঘুমোয়, একই সময় পরীক্ষার প্রস্তুতি করে। ওরা আমাকে নিয়ে টিটকিরি দেয়, আমি রুমে

থাকলে শিকারকে সামনে পেয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। কিছুদিন হল নূপুরও আমার সঙ্গে কথা বন্ধ রেখেছে। মেয়েদের উপহাসে একদিন রক্তচাপ খুব বেড়ে গিয়েছিল ওর। খুব কঠিন হয়ে গিয়ে শাসিয়েছিল ওদের, ‘‘বেশি রংবাজি করবে না বুঝলে?’’ আমি ওকে আমার বয়কট নীতি গ্রহণ করার সদুপদেশ দিয়েছিলাম। চূড়ান্ত রাগের মুহূর্তে তা ওর গায়ে কাঁটার মতো ফুটেছে। উল্টে আমাকেই বয়কট করে দিয়েছে। দিয়ে তাদের সঙ্গেই হাত মিলিয়েছে। এসব আমি সুপারকে বলি না, কারণ বলা মানে হার মেনে যাওয়া। আঘাত আমিও পাই, কষ্ট আমারও হয় কিন্তু বাইরে সবাইকে বোঝাই আমার বহিরাবণটি ধাতু দিয়ে তৈরি। তাতে আন্তরাণবিক ব্যবধান খুব কম। সেখান দিয়ে ধমক, তিরস্কার, চেতাবনি, বিদ্রূপের মতো মোটা পদার্থের বড় অণুগুলো ছাঁকা হয়ে গিয়ে বাইরেই পড়ে থাকে। সেসব ভেতরে অ্যাড্রিন্যাল ক্ষরণ বাড়িয়ে দিয়ে আমার কষ্ট, আবেগ, উদ্বেগ নিয়ে ছেলেখেলা করবে তার কোন প্রশ্নই আসে না।

আমি সুপারকে বলি, ‘‘আমি এখানেই পড়ব। আপনার অসুবিধেটা কোথায় হচ্ছে বলুন তো?’’

‘‘হচ্ছে অসুবিধে।’’

‘‘কোথায় শুনি,’’ অদমনীয় কৌতূহল আমার মুখে। হয়ত এবার তাঁর মনের উল্টো প্যাঁচের স্ক্রুটার নাগাল পাব।

সুপার বলেন, ‘‘স্টাডিরুম পড়ার জন্য নয়।’’

আবার প্রদীপদার মেসে ছুটি। আবার তাঁর মুখে সেই মুচকি হাসির ঝলক দেখি। বড় শীতল সেই হাসি। আবার উনি সেই একই কথা বলেন, ‘‘এতদিন হোস্টেলে থেকেও তুমি গালি দেওয়া শিখলে না!’’

‘‘কি গালি দিই বলো তো?’’

উনি হাসেন, ‘‘ভাবো কি গালি দিতে পারো।’’

‘‘ননসেন্স, স্টুপিড এসব?’’

‘‘খবরদার না। তাহলে তখনই হোস্টেল থেকে ঠেঙিয়ে বের করে দেবে তোমায়।’’

‘‘অন্য কোন গালি তো আমার মুখে আসে না।’’

‘‘অন্য গালি বলতে?’’

‘‘যাও, তুমি জানো।’’

‘‘বাল-মাগী-ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ? গালি বলতে আমি সেই গালি বোঝাতে চাইনি। খোঁচা, খোঁচা। বোঝো খোঁচা কি জিনিস?’’

‘‘অল্প অল্প জানি।’’

‘‘তুমি তো বলেছ মহিলাটি অবিবাহিতা।’’

‘‘নিশ্চয়। উনি কখনও হাজব্যান্ডের ভালবাসা পাননি।’’

হোস্টেলে তিন বয়স্কা মহিলা। জবেদা মাসি, বন্দনাদি এবং সুপার। জবেদা মাসি হলেন বিধবা। বন্দনাদির বিয়ে হয়েছে তাঁর শৈশবেই। আর সুপারিন্টেনডেন্ট হলেন আইবুড়ো। একদিন নিচে খেতে গিয়ে দেখি বন্দনাদি উপস্থিত সবার কাছে তাঁর

বাল্যবিবাহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, বলছেন চৌদ্দ বছর বয়সেই উনি কিভাবে মা হয়ে গিয়েছিলেন। শুনে সুপার খিলখিল করে হেসে উঠেছিলেন. বলেছিলেন, ‘‘বন্দনা, চৌদ্দ বছরেই টুস!’’ টুস শব্দটা উনি হাতের এক বিশেষ মুদ্রার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন। ঘরের ছাদ চুইয়ে অতি ধীর গতিতে তৈরি হওয়া জলবিন্দুর নিচে পড়ার মতো। রুমে এসে মেয়েরা অনুকরণ করেছিল সেই মুদ্রা, সেই শব্দ, সেই হাসি। তার প্রদর্শন চলেছিল বেশ কিছুদিন। সুপারের সেই বলাতে নিজের মনে নিজেকে নিয়ে ব্যথা ছিল নাকি বন্দনাদি নিয়ে হিংসে জানি না, শুধু জানি কিছু তো একটা ছিল। লোকে বলে বিয়ে হল জয়নগরের মোয়া, খেলেও পশ্চাত্তাপ না খেলেও পশ্চাত্তাপ। খেয়ে সত্যি সত্যি পশ্চাত্তাপ হয় কিনা সে ধারণা নেই, কিন্তু না খেলে তো হয়।

কয়েকমাস আগেই আমি বিয়ের পরিপন্থী ছিলাম। এখন আর নেই। প্রদীপদা আমায় জিজ্ঞেস করেন, ‘‘তুমি বিয়ে করতে চাও না?’’

‘‘চাই।’’

‘‘কবে?’’ ভয়ে কেঁপে ওঠেন প্রদীপদা। এত কঠিন মেয়ের মুখ এবং চেহারার সঙ্গে স্বামী সংসারের চিত্র খাপ খায় না। ‘‘দেখো, বিয়ে করো আপত্তি নেই। কিন্তু সেই দুঃসময়টি এখনই যেন না আসে।’’

‘‘উফ্, চুপ করো তো! ছাড়ো এসব কথা। এখন বিয়ের আলোচনা ভালো লাগছে না। গা গুলোচ্ছে।’’

‘‘না ছাড়া যাবে না।’’

‘‘মানে?’’

‘‘মানের সুপারকে এসব কথা বলেই গালি দিতে হবে।’’

প্রদীপদা কি বলতে চান তার অনুমান লাগাতে না পেরে ভ্যাবাচাকা আমার মুখ।

‘‘রাতে যখন নিচে খেতে নামবে তখন সুপার হাঁটুতে মাথা গুঁজে তোমাকে টেরা চোখে দেখবে তাই তো?’’

‘‘হয়ত।’’

‘‘হয়ত নয়। দেখবে। খাওয়া শেষ করে মুখ ধুয়ে উপরে যাওয়ার জন্য সিঁড়িতে পা রাখলেই সে মেয়েদের কাছে ফিসফিস করে তোমার বদনাম করবে তাই তো?’’

‘‘হয়ত।’’

‘‘হয়ত নয়। করবে।’’

‘‘তো? আমার কি করার আছে তাতে? ঝগড়া? সরি, ওই দুষ্কর্মটা আমার দ্বারা হবে না।’’

‘‘ঝগড়ার কথা বলছি না। শুধু কিছু কথা ছুঁড়ে দিতে হবে।’’

‘‘কি কথা?’’

‘‘কথাটা হচ্ছে—আরে, আমার তো তবু বিয়ে-থা হবে রে। বিয়ে হবে, বাচ্চাকাচ্চা হবে। তোর তো এসব কিছুই হবে না।’’

‘‘পারব না।’’

‘‘পারতেই হবে তোমাকে।’’

রাতে পারলাম না। পরদিন পারলাম। দুপুরের খাবার সেরে আমি সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে নেমে এসে সাহসের সঙ্গে প্রসন্ন হাসি হেসে কথাগুলো ছুঁড়ে এক পা দু'পা করে আবার চড়ে যাই সিঁড়ি বেয়ে। চড়তে চড়তে শুনি সুপার বলছেন, "করো না, করো। একটা কেন? দশটা বিয়ে করো। কে না করেছে?" থতমত খেয়ে গেছেন মহিলা।

কিছুক্ষণ পরে রুমে এসে মেয়েদের আমাকে নিয়ে মাতামাতি। উজ্জ্বলা বলল, "বাহ্, বনানীদি, কি দিলে!"

ছবি বলল, "একমাত্র তুমিই পারবে ওকে জব্দ করতে।"

পাশের রুমের মেয়েরাও আনন্দে অনেক হইহুল্লোড় করল। সেই দল থেকে অদ্রিজাও বাদ গেল না। সেই দল থেকে মিতালি, যে মাথাভর্তি পাছা পর্যন্ত দশ কিলো ওজোনের বিশাল ঘন চুল এবং প্রায় সমতল বক্ষ নিয়ে নিজেকে খুব সুন্দরী মনে করে এবং অন্যের চেহারার খুঁত বের করে, যাকে তার এই স্বভাবদোষের জন্য মেয়েরা একদিন *তোর বুকের দিকে তাকিয়ে দেখেছিস, শুধু দুটো নকুলনদানা বসে আছে সেখানে?* বলে ঝেড়েছিল, যে গণ-আক্রমণের অহেতুক আশঙ্কাহেতু তার মুড়ির থলি ট্রাঙ্কে তালা দিয়ে রাখে, ঠাট্টা ইয়ারকি বোঝে কম, সে পর্যন্ত বাদ গেল না। মুখ চুন করে বসে রইল শুধু নূপুর। নিশ্চয় ভাবছে এক হিতাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে অশোভন আচরণ করা হয়েছে এবং সেই অশোভন আচরণের জন্য সে আজ সহজ হতে পারছে না।

দুনিয়ার অত্যাচারী শাসক এবং তাদের মৃত্যু নিয়ে আমি কিছু কিছু খবর রেখেছি। দেখেছি যারা অকারণে অথবা শখে অন্যের ওপর একসময় ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল, পরে অনুভব করেছে যে কঠিন হয়ে পড়েছে তাদের নিজেদের বেঁচে থাকাটাই। জীবন হয়ে উঠেছে ভয়াবহ, কুকর্মের অভিশাপ হয়ে সামনে এসেছে মৃত্যু। সেই মৃত্যুর মুখে তারা নিজেরাই নিজেদের ঠেলে দিয়েছে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে—হয় আত্মঘাত করেছেন, নয় নিহত হয়েছেন। নতুবা এমনও হয়েছে যে অসময়ে প্রাণঘাতী রোগ ছড়িয়ে পড়েছে শরীরে, তিল তিল করে মেরেছে তাদের। রবার্ট ক্লাইভ ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি স্থাপন করেছেন, ১৭৫৫ থেকে ১৭৬০ এবং ১৭৬৪ থেকে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ার গভর্নর হিসেবে ইংরেজ রাজ চালিয়ে গেছেন, ১৭৬১ সালে তৃতীয় পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ্-দৌলাকে পরাজিত করে দখল করেছেন কলকাতা, ভারতীয় জনজীবনে উপহার দিয়েছেন দুর্বিষহ যন্ত্রণা, তারপর ১৭৭৪ সালে পেটে ছুরি ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। হতাশার রোগী হয়ে পড়েছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। জার্মানের নাজি পার্টির নেতা অ্যাড্‌লফ হিটলার নিজেকে বন্দুকের গুলি দিয়ে মেরেছিলেন। মরতেই হত তাঁকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ৬ মিলিয়ন ইহুদীসহ মোট ১১ মিলিয়ন নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে হিটলারের হাতে। আমাদের হোস্টেলের সুপার হলেন অ্যাড্‌লফ হিটলারের অশিক্ষিতা মহিলা সংস্করণ। তথাপি আত্মহত্যা করার সাহস ওঁর নেই। বড় কোন অসুখও হয় না তাঁর।

চিত্রলেখা নিয়োগীর চোয়াল শক্ত হয়ে যাওয়ার পরের বুধবারের ঘটনা। উনি অফিসে ডেকে আমার হাতে একটি খাম দিলেন। বললেন, ‘‘পড়ে নিও।’’ রুমে এসে বাধ্য মেয়ের মতো খাম খুলে ইংরেজিতে টাইপ করা পাতাটি চোখের সামনে মেলে ধরলাম। মূলত বাবাকে সম্বোধন করে লেখা হয়েছে। তার কপি আমার কাছে।

Sir,

We have to inform you that it will not be possible to accomodate your daughter Sm. Banani Sikdar in this hostel from 16 September, 1990 onward. The hostel is being closed due to Puja holidays at 6 p.m. on 17th September, 1990. You are therefore requested to remove your daughter Sm. Banani Sikdar by that specified time and note that she will not be admitted after the Puja vacation or ever in this hostel. Her name is being deleted from our register.

This notice is accordance with the rule 21 of the Admission Form which reads as follows :

The Managing Committee could ask any inmate to leave the hostel within a specified time without giving any reason.

The admission form was signed by Sm. Banani Sikdar and also by Sri Biplab Sikdar as guardian under the words, “We have read the rules and agreed to abide by them.”

Sm. Banani Sikdar’s name is recommended by Sri S.K. Mukherjee, Head of the Department of Journalism, University of Calcutta. He is therefore, being informed likewise.

Yours faithfully

(Sm. C. Neyogi)

নিচে এটাও লেখা আছে, “You are requested to treat this letter as notice...”

একটি সম্পর্কের মৃত্যু

মাত্র কয়েকদিন আগে অভিনেতা উৎপল দত্তের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত লেকচারার হিসেবে আমাদের ডিপার্টমেন্টে জয়েন করেছেন। উনি আমাদেরই ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট ছিলেন। তাঁর কিছুদিন আগে জয়েন করেছেন তপতী বসু—ফর্সা, চেহারা একটু ভারি হলেও দেখতে সুন্দর, খুব হাসিখুশি। বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত মাত্র কয়েকটি 'ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন'-এর ক্লাস নিয়েছেন যার মধ্যে প্রায় সবকটিই আমি মিস করেছি—উনি ক্লাসে ঢোকার আগেই ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেছি। আজও বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাগ নিতে ভুলে যাওয়ায় আবার ঢুকতে হয়েছিল। ততক্ষণে ক্লাসে ওনার প্রবেশ ঘটে গেছে। উনি পলায়নরতা আমাকে থামিয়ে দিয়েছেন, "এই এই এই, কোথায় যাচ্ছ?"

"কোথাও না।" হতবুদ্ধি আমি।

"না, তুমি পালাচ্ছ।"

"না তো!" মৃদু অস্বীকার।

"তুমি পালাচ্ছ। আমি রোজ ক্লাসে ঢোকার মুখে দেখি তুমি ক্লাস ছেড়ে চলে যাচ্ছ। এটা ঠিক নয়। আমি তোমাকে নিয়ে রিপোর্ট করব।"

চোরের মতো ধরা পড়ে আজ প্রথম দিন আমি বিষ্ণুপ্রিয়া দত্তের ক্লাসে বসা। উনি নাটো (এন এ টি ও)র চুক্তি পড়াচ্ছেন। আমার মন বসছে না। স্বেচ্ছায় উপস্থিত থাকলে তবু মন বসার সম্ভাবনা ছিল। বাধ্য হয়ে বসতে হয়েছে বলে এখন সেই সম্ভাবনা একদমই নেই। *কতক্ষণে ওঁর পড়ানো শেষ হবে তো ভাগব, আজ আর একটিও ক্লাস করব না, করবই না যাঃ* ভাবতে ভাবতে শুনি অফিস থেকে আমার ডাক পড়েছে, "বনানী শিকদার নামে কে আছে?"

উঠে দাঁড়াই।

তোমাকে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ডাকছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া দত্তের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। উনি নিশ্চয় এখন আমাকে আরও খারাপ চোখে দেখছেন—মোটেও মনে করছেন না যে অফিসে আমার জন্য ভালো কোন উপহার অপেক্ষা করছে। অফিসে গেলে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, সুনীত মুখার্জি একটা টাইপ করা কাগজ হাতে উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি?"

দূর থেকে দেখেও আমি চিনতে পারলাম অনায়াসে। হুবহু এমনই একটা কাগজ আমি কয়েকদিন আগেই সমাদরে পেয়েছি হোস্টেলের সেক্রেটারির কাছ থেকে। তাতে লেখা ছিল যে উনি আমার জার্নালিজমের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টকেও নোটিশ প্রাপকের তালিকায় নথিভুক্ত করবেন। "আমার সুপারিন্টেনডেন্ট আমাকে আর হোস্টেলে রাখতে চাইছেন না।"

"কেন? কাকে খুন করেছ?"

ভাবি একমাত্র সুপারিন্টেনডেন্টটাই নিহত হতে পারতেন আমার হাতে কিন্তু আমি তো তা করব না।

‘‘কি সমস্যা হচ্ছে তাঁর তোমাকে নিয়ে?’’

‘‘আমি স্টাডিরুমে গিয়ে পড়ি এটা তাঁর পছন্দ নয়।’’

‘‘সে কি কথা! স্টাডিরুমে পড়বে না তো কি ওনার বেডরুমে গিয়ে পড়বে?’’

‘‘জানি না ওঁর কি বক্তব্য।’’ এই সুযোগে আমি সুনীতবাবুকে আরও কিছু বলে ফেলি যাতে করে বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত আমাকে নিয়ে অভিযোগ করলে উনি কানে না নেন। ‘‘খুব ডিস্টার্বড আছি। ইউনিভার্সিটিতে এসেও ক্লাসে মন লাগছে না।’’

‘‘ঠিক আছে যাও। সাবধানে থেকো।’’

হোস্টেল ছাড়ার নোটিশের কথা প্রদীপদাকে জানালাম। প্রদীপদা বললেন, ‘‘এবার তো কিছু একটা করতেই হবে।’’

এবার আমি সত্যি সত্যিই মুষড়ে পড়েছি। একমাসের মধ্যে থাকার জন্য বিকল্প জায়গা খুঁজে পেতে হবে। কয়েকটি মেসে যাই। সেগুলোতে জায়গা যে নেই তা নয়, কিন্তু যেমন টাকা চাইছে তা আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। হোস্টেলে উজ্জ্বলাকে দেখে আমার সুখী মনে হয়, ছবিকে দেখে সুখী মনে হয়। বাদলের সঙ্গে ট্যাক্সিতে এলোমেলো ঘুরি, রেস্তোরাঁতে খেতে যাই, সিনেমা দেখতে যাই। ওকেও দেখে সুখীই মনে হয়। ওপরে দেখাই আমিও ভালোই আছি কিন্তু আসলে ভালো নেই। আমিও সুখ পেতে চাই, কিন্তু কোথায় সুখ! হোস্টেলের সুপার এবং সেক্রেটারি আমার মাথার উপর দা রেখে খাড়া আছেন। সেক্রেটারি আগের মতোই বুধবার করে হোস্টেলে আসেন। উনি আমাকে আর অফিসে ডাকেন না। ডেকে জিজ্ঞেস করেন না হোস্টেল কেমন লাগছে, সুপারকে কেমন লাগছে, এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা। জিজ্ঞাসাবাদের পর্ব অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন অপেক্ষাপর্ব। অপেক্ষা আমি তাঁর নোটিশ মেনে কবে হোস্টেল ছাড়ছি তার।

অনেকদিন বাদলের ঘরে যাওয়া হয়নি। সে আমায় ডেকেছে। বলেছে ওর দাদা-বউদির আসার কথা, তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে। বেরিয়ে পড়লাম। ওর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দাদা-বউদিই আমাকে ভেতরে ডাকলেন, ‘‘এসো এসো।’’ এমনভাবে যেন এটা বাদলের নয় বরং তাঁদেরই ঘর। দু’জনেই একসঙ্গে বললেন, ‘‘বসো বসো।’’ বলেই দু’জনেই মেঝেতে ওঁদের পাশে একটি আসন পেতে দিলেন, ‘‘একটু কষ্ট করে নিচে বসতে হবে। ঠাকুরপোর এটা ভাড়া বাড়ি তো। তাছাড়া একা থাকে। তাই জিনিসপত্র করে উঠতে পারেনি।’’ বাদলের ঘরে আগে অনেকবারই যে আমি গেছি, গিয়ে ঘণ্টা ধরে গল্প করেছি, একসঙ্গে সকালের কিংবা দুপুরের খাবার খেয়েছি সেই খবর এঁদের কাছে নেই।

দাদা-বউদি আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, ‘‘ঠাকুরপোর কাছে তোমার অনেক গল্প শুনেছি...’’

আমি দেখছি এঁরা যা কিছু করছেন দু’জনেই একসঙ্গে করছেন, যা কিছু বলছেন একই সঙ্গে বলছেন। বাদল ওপাশটাতে মেঝেতে পাতা বিছানার এক প্রান্তে বসা। সে শুধু আমাদের কথা শুনছে, কিছু বলছে না।

দাদা-বউদিকে জিজ্ঞেস করি, ‘‘কি বলে সে আমাকে নিয়ে?’’

‘‘বাব্বা, অনেক কথা। তুমি এম এ পড়ছ, হোস্টেলে থাকো, দেখতে সুন্দর, খুব ভালো মেয়ে...।’’

‘‘থাক থাক, অনেক হল। আপনারাও কি ত্রিপুরার উদয়পুরে থাকেন নাকি আগরতলাতে?’’

‘‘আমরা ত্রিপুরাতে থাকি না তো!’’

‘‘তবে?’’

‘‘আমাদের বাড়ি কালিয়াগঞ্জে।’’

বাদলের দাদা হঠাৎ কি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে ত্রিপুরাকে টাটা করে কালিয়াগঞ্জে বসতি স্থাপন করলেন তা আমার মাথায় ঢুকল না। বাদল তো কলকাতায় এসেছে তার স্টেট ব্যাংকের চাকরির সূত্রে। তাকেও কালিয়াগঞ্জে যেতে হয়েছে কিন্তু সেই চাকরিরই সূত্রে। তাও আবার মাত্র কয়েকদিনের জন্য। স্টেট ব্যাংকের চাকরি ওকে কালিয়াগঞ্জে ঘর বানানোর সুযোগ দেয়নি। বোন হলে তবু সমীকরণটা মেলাতে পারতাম। বোনের বিয়ে কালিয়াগঞ্জে হতেই পারে। আমার মুখে একগাদা জিজ্ঞাসা দেখে এবার বাদলই মুখ খুলল, ‘‘দাদ-বউদির বাড়িরই একটা অংশ ব্যাংক ভাড়াতে নিয়েছে। আমি আসলে কালিয়াগঞ্জে গিয়ে এঁদের কাছেই ছিলাম। এঁরা আমার খুব যত্ন করেছেন।’’

দাদা-বউদি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘তোমার বাড়ি কোথায়?’’

‘‘বালুরঘাটে।’’

‘‘ওহ্, তুমি তো তাহলে আমাদের প্রতিবেশী। কালিয়াগঞ্জে কোন আত্মীয় নেই?’’

‘‘এক মাসি আছেন।’’

‘‘কোথায়?’’

‘‘উনি কোয়ার্টারে থাকেন। নার্সের চাকরি করেন।’’

‘‘নাম কি মাসির?’’

‘‘কণিকা ঘোষ।’’

নাম শুনে হা হা করে হসেন দাদা-বউদি। হাসি থামলে দাদা চুপ থাকেন। প্রথমবার কিছু বলার জন্য শুধু বউদিই মুখ খোলেন, ‘‘কণিকা ঘোষ তোমার মাসি হয়?’’

‘‘হ্যাঁ। আপনি চেনেন?’’

‘‘কণিকা ঘোষকে আমি চিনব না! ওকে আমাদের ওখানকার সবাই চেনে...’’

কালিয়াগঞ্জে মাসির এত পরিচিত জেনে অহংকারে আমার বুকে ফুলে ওঠে। বউদি তাঁর কথা চালিয়ে যান, ‘‘...যা কাণ্ড করেছে কণিকা ঘোষ...’’

‘‘কি করেছে?’’ মুহূর্ত আগের অহংকারে ফোলা বুক ধাক্কা খেয়ে মুহূর্তে আবার চুপসে যায়।’’

‘‘...সে যে হসপিটালে চাকরি করে সেই হসপিটালেরই একজন ডাক্তারের সঙ্গে প্রেম-ভালবাসা। একদিন ডাক্তারকে কোয়ার্টারে ডেকে এক ঘরের মধ্যে সে কি যা তা কাণ্ড...।’’

'যা তা কাণ্ড...' বলে এক লম্বা হাসি টেনে দেন বউদি। তারপর আবার শুরু করেন, ''...রইরই পড়ে গিয়েছিল...''

''...ডাক্তার বদনাম ঢাকতে শেষে শিলিগুড়িতে পোস্টিং-এর জন্য আবেদন... করেছে...''

''...কণিকা ঘোষই বা কি আর কালিয়াগঞ্জে থাকতে পারবে!...''

''সেও পোস্টিং নেবে। সেও শিলিগুড়িতে যাবে কিনা কে জানে...''

''...শিলিগুড়িতে গেলে সেখানেও আবার...''

বউদি আর যা যা বলেছিলেন তার কিছুই আমার কানে ঢোকেনি। কানের পর্দায় ঢাকের বারির মতো দমাদম ঘা মারছিল সেই একটি কথাই—যা তা কাণ্ড। ঘা খেয়ে পর্দার ব্যথা অধিক থেকে অধিকতর হচ্ছিল। 'যা তা কাণ্ড'-এর পড়ে বউদির সেই টেনে দেওয়া লম্বা হাসিতে কাণ্ডের অধ্যায়গুলো নিহিত ছিল। আমি পড়তে চাইনি সেসব অধ্যায়। অধ্যায়ের পাতায় প্রেমিক-প্রেমিকার সমাজের মানুষের ভাষায় অন্তরঙ্গ অশ্লীল ছবিগুলি দেওয়া ছিল। আমি দেখতেও চাইনি সেসব ছবি। অথচ দেখব না বলে চোখও বন্ধ করতে পারিনি। নতনয়ন ছিলাম। ঘরের মেঝে দেখছিল চোখ। কান আমার বশে ছিল না। কান শুনেছিল আওয়াজ। বাদলের মুখ থেকে বেরোনো একটা ছোট্ট হাসির আওয়াজ, ''হুঁ।'' আমি জানি না কালিয়াগঞ্জ থেকে আসা বাদলের পাতানো বউদি যে খবরটা আমায় দিলেন তা কতখানি সত্যি বা কতখানি মিথ্যে এবং সত্যি হলেও তা সমালোচনার যোগ্য কিনা। সত্যিমিথ্যা যাচাই করার সময় এটা নয়, সমালোচনার প্রতিবাদ করার ভাষাও নেই আমার মুখে। এটা শুধু লজ্জা পেয়ে, অপমানে কুঁকড়ে গিয়ে মৌনতা পালনের সময়। দাদা-বউদি সেদিনই একটু পরেই বাড়ি ফিরবেন বলে বেরিয়ে গেলেন। বাদল এবং আমি গেলাম থিয়েটারে। অপর্ণা সেনের নাটক দেখব বলে। হলে পাশাপাশি চুপচাপ বসে রইলাম। ওর সঙ্গে আগের মতো সহজ হতে পারলাম না। থিয়েটারের বিষয়বস্তুও আমার মাথায় ঢুকল না। কণিকা ঘোষ এবং আমার না দেখা সেই ডাক্তার সর্বদা বসে রইল আমাদের মাঝখানে আমার মাথার উপর হাত রেখে।

কণিকা ঘোষ এবং ডাক্তার পরের আরও বেশ কয়েকদিন আমার এবং বাদলের মাঝখানের জায়গাটা ছাড়তে চায়নি। বেশ কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় আমি যখন তাদের তাড়াতে সক্ষম হলাম, সহজ হলাম বাদলের কাছে টিউশন শেষে দেখা করব বলে আবার ওকে ডাকলাম সল্ট লেক এক নম্বর সেক্টরের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে। অক্টোবর মাস, শীতের প্রারম্ভ। শাড়ি পড়েছি। সোয়েটারের প্রয়োজন তখনও তেমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। তাই গায়ের উপর চড়ানো আছে স্টোল। পরি বা না পরি তাতে শরীরকে পরিবেষ্টিত করা বায়ুস্তরের তাপমাত্রার বিশেষ কিছু হেরফের হয় না। তবু পড়েছি মন পড়তে চেয়েছে বলে। অন্যদিন বাদলের কাছে পৌঁছতেই সে ট্যাক্সি খুঁজতে থাকে, পেলে উঠে পড়ে। সেদিন বাদল ট্যাক্সিতে বসার ইচ্ছে রাখল না। হাঁটতে থাকল। আমি সঙ্গে। সে গম্ভীর ছিল। হাঁটতে হাঁটতেই আমরা উল্টোডাঙ্গা থেকে কাঁকুড়গাছি, কাঁকুড়গাছি থেকে ফুলবাগান, ফুলবাগান থেকে

রাজাবাজার পৌঁছলাম। হোস্টেলের কাছাকাছি এসে বাদল বলল, ''আজ তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে।''

আমি নিশ্চয় চাই আমাকে দেখতে সুন্দর লাগুক। তাই বলে কোন প্রশংসা নয়। প্রশংসা শুনলে অস্বস্তি হয়। আমি নিশ্চয় চাই লোকজন আমাকে দেখুক। কিন্তু সেই দেখা যেন পলকহীন দৃষ্টি না হয়। দৃষ্টি পলকহীন হলে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। মেয়েদের সত্যিই অনেক সমস্যা আছে। না প্রশংসা সহ্য হয় না বদনাম, না ভালবাসা সহ্য হয় না ঘৃণা। কি যে আসলে সহ্য হয় মেয়েদের তা তারা নিজেরাও বোঝে না। আমিও বুঝি না কত মাত্রার প্রশংসার সঙ্গে কত মাত্রা বদনাম মেশাতে হবে কিংবা কত মাত্রার ভালবাসার সঙ্গে কত মাত্রার ঘৃণা।

বিরক্ত হলাম। অনেকক্ষণ থেকে ওকে বলছিলাম হাঁটব না। কিন্তু সে ট্যাক্সির ব্যবস্থা না করে আমায় হাঁটিয়েই চলেছে। তাই রাগ ছিলই মনে। প্রকাশও করে ফেললাম রাগের। আমার রাগ দেখে সে আরও খুশি হল। খুশিতে ঝলমল করে উঠল তার মুখ। বলল, ''আমার তোমাকে খুব আদর করতে ইচ্ছে করছে।''

যাকে আমি মন থেকে এত চাইতে শুরু করেছিলাম তার এই সামান্য কথা আমার নারীত্বকে সাপের বিষের মতো দংশন করল। নিজের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করা তো সম্ভব ছিল না। তবু বুঝতে পেরেছিলাম নীলাভ হয়ে গিয়েছিল আমার মুখ। জানিয়েছিলাম যে আমি এসব কথা পছন্দ করি না।

সেদিন আবার আমাদের মাঝখানে কণিকা ঘোষের অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করলাম। বাদলও মনে করল তাকে। মুখে উচ্চারণ করেই ফেলল তার নাম, ''কণিকা ঘোষ তো...আর তুমি...।'' কণিকা ঘোষের নামোল্লেখ করে সে আমাকে উপহাস করতে চাইল নাকি উৎসাহিত বুঝতে পারলাম না। বোধ হয় সে নিজেও বোঝেনি।

''আমি আপনার দাদা-বউদির কথা বিশ্বাস করি না। তাছাড়া আমি কণিকা ঘোষ নই।'' হঠাৎ মনে পাগলামি খেলে গেল—ওকে বললাম, ''কাল থেকে আমাদের আর দেখা হবে না।''

একটা কথাও না বলে সে চলে গেল। আর কোনদিনও আমার সামনে এল না।

পরে আমি বাদলকে নিয়ে অনেক ভেবেছি। সে সম্ভবত আমাকে ভালোই বেসেছিল, শুধু তার মনের নিষ্পাপ ইচ্ছেই ব্যক্ত করে ফেলেছিল আমার কাছে, কণিকা ঘোষের উপমাটা স্থান-কাল-পাত্র না ভেবে বোকামি করে দিয়ে ফেলেছে। ভেবেছি, আমার কাছ থেকে এমন প্রতিক্রিয়া তার প্রাপ্য ছিল না, তবু মাথা নত করে আগ বাড়িয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ পুনস্থাপন করতে পারিনি। সময় যেমন ভালবাসাকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপহার দেয় তেমনই তাকে সঙ্গে নিয়ে ফেরতও চলে যায়, রেখে দেয় বিরহ দশা। নিষ্ঠুর সময় সেই বিরহ দশা ভরিয়ে দেয় আরও নানা রকমের প্রতিবন্ধকতায়। আমার সামনে সময় ছেড়ে দিয়েছে দুটো বিকল্প—লড়াই করো নতুবা হোস্টেল ছাড়ো। এখানে বাদলের কোন স্থান নেই। তার কথা ধীরে ধীরে ভুলে যেতে থাকি।

লেখার হাতে খড়ি

১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে রাজীব গান্ধির সুইডেনের কম্পানি এ বি বফর্সের সঙ্গে ৪০০ ১৫৫ এম এম হাউতজার গান-এর চুক্তির ফলে ভারতের রাজনীতিতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হল। ১৪৩৭ কোটি টাকার চুক্তিটা হয়েছিল ১৯৮৬-এর ১৮ই মার্চ। এক বছর বাদে, ১৯৮৭ সালের ১৬ই এপ্রিল সুইডেনের একটি রেডিও চ্যানেল প্রচার করে যে বফর্স কম্পানি ১৪৩৭ কোটি টাকার এই চুক্তি পাওয়ার জন্য ভারতীয় পলিটিসিয়ান এবং প্রতিরক্ষা বিভাগকে ৬৪ কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছে। মধ্যব্যক্তি হিসেবে নেওয়া হয় চাড্ডা, হিন্দুজা ব্রাদার্স এবং ইটালিয়ান চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অক্টাভিও কাত্রসির নাম। রাজীব গান্ধির নতুন শুরু হওয়া রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে এটা একটা বড় কোপ। ১৯৮৪-এর ৩১শে অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধি হত্যাকাণ্ডের পর এক ঘণ্টার মধ্যে উনি তাঁর পাইলটের চাকরি ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ হয়েও দু'মাস বাদে লোকসভার ভোটে জিতে দেশবাসীর বৃহৎ সমর্থন এবং শুভকামনা নিয়ে নিজেকে পুনপ্রতিষ্ঠা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর পদে। কিন্তু পদের পাঁচ বছরের কালের অর্ধেক সময় কাটল না। পড়ে গেল তাঁর ওপর কাদার ছিটা।

১৯৮৯-এর লোকসভার ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না কংগ্রেস। কংগ্রেসের জেতা আসনের সংখ্যা ১৯৩টি, জনতা দলের ১৪০টি, ভারতীয় জনতা দলের ৮৮টি, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী)র ৩২টি, কমিউনিস্ট পার্টির ১২টি এবং অন্যান্যদের ৫৯টি। আমার তখন এম এ জার্নালিজম-এর প্রথম বর্ষ। টিঙ্কু, সুজিত এবং আমি ডিপার্টমেন্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জ্ঞানবান রাজনীতিবিদ দের মতো আলোচনা করি কোয়ালিশন সরকার কিভাবে তৈরি হতে পারে। বিষ্ণুপ্রিয়া দত্তের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপের ক্লাসেও ইলেকশন এবং তার রেজাল্ট নিয়ে আলোচনা হয়। আনিসুর, অরুণ, টিঙ্কু এবং আমাকে জার্নালিজমের ডিগ্রি কোর্সের পরীক্ষা দিতে হবে। সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট হওয়াই 'এম এ'তে এই শর্তেই আমাদের ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি না। নেবই বা কি করে! বই নেই কাছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজমের ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয় না বলে 'কলেজ স্ট্রিট'এ বই সহজলভ্য নয়। তাই পরীক্ষার চিন্তা ছেড়ে এমন সরকার পাঁচ বছর টিকবে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি। সবার মুখে মুখে ঘুরছে প্রশ্ন।

১৯৯০ সালের নভেম্বরে এগারো মাসের ন্যাশনাল ফ্রন্ট কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট পার্লামেন্টে ভোট অফ কনিফিডেন্স-এ হেরে গেল এবং আরেকটি মাইনরিটি গভর্নমেন্ট এল দেশ শাসন করতে। প্রধানমন্ত্রী করা হল সোশ্যালিস্ট জনতা দলের সি চন্দ্রশেখরকে। চন্দ্রশেখর ১৯৯১-এর ৬ই মার্চ রাজীব গান্ধির সঙ্গে মতবিরোধের কারণে পদত্যাগ করলেন। এক সপ্তাহ পরে লোকসভা স্থগিত রাখা হল। অবশ্যাম্ভাবি হয়ে পড়ল লোকসভার সাধারণ নির্বাচন।

ইউনিভার্সিটিতে চারিদিকে শুনি নির্বাচনের কথা। সমর বোস বলছেন, সুনীত মুখার্জি বলছেন, এমনকি স্বপন মল্লিক যিনি স্টেটসম্যানে ফিল্ম এডিটর তাঁর মুখেও

ফিল্ম ছেড়ে নির্বাচনের কথা। ক্লাসের যারা সংবাদপত্রে কাজ করে তারা তো একেবারে চর্চার গভীরে ঢুকে পড়েছে। এবার যদি নির্বাচন হয় তাহলে রাজীব গান্ধি আবার গদিতে আসবেন সে নিয়ে সবাই মোটামুটি একমত।

টিঙ্কু একটি সান্ধ্য দৈনিকে বিনা বেতনে কাজ করছে। ১৬৪, লেনিন সরণি, কলকাতা সংবাদপত্র অফিস থেকে বের হয় সেই পত্রিকা। প্রায়ই সে তার লেখা নিয়ে এসে আমাকে দেখায়। ওকে দেখে আমারও ইচ্ছে হয় কাজ করার। টিঙ্কু আমাকে বলে না যে চল তোকে এডিটরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। আমি নিজে কলকাতা অফিসে যাই। এডিটর সুহাস তালুকদারের সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে জানাই আমার ইচ্ছে। উনি আমায় জিজ্ঞেস করেন, ‘‘বাংলায় লিখতে চাও না ইংরেজিতে?’’

ছাত্রী জীবনের কেবলমাত্র স্নাতকের তিনটে বছর ছাড়া বাকি সময়টাতে বাংলা মাধ্যমেই পড়েছি। বাংলাতেই দক্ষতা আমার। টিঙ্কুকে ইংরেজিতে লেখার মনোবল কে দিয়েছে আমি জানি না, আমাকে কেউ দেয়নি। তবু আমি বলি, ‘‘ইংরেজিতে।’’ ইংরেজিতে বলতেও ভয় করে *যদি না পারি* আবার বাংলাতে বলতেও ভয় করে *যদি কাজ না পাই*।

উনি আমায় বললেন, ‘‘বাংলাতেই লেখো।’’

‘‘ঠিক আছে।’’

‘‘কি লিখবে?’’

‘‘আপনি যা বলবেন।’’ বুক ধুকপুক করে। রাজনীতি নিয়ে লিখতে বললে মুশকিল আছে। রাজনীতিতে আমার অনীহা। যদি বলেন, ইয়াল্টা কনফারেন্স নিয়ে লেখো, কিংবা জার্মানি ও পোল্যান্ডের বর্ডার চুক্তি নিয়ে লেখো তাহলে কি বলব! পারব না? নাকি ঠিক আছে বলে হাওয়া হয়ে যাব? নাহ্, হাওয়া হলে চলবে না। অন্য কোন বিষয় দিন বলতে হবে।

‘‘সি বি আই তো এফ আই আর রেজিস্টার করল। বফর্স নিয়ে লিখতে পারবে?’’

‘‘কিভাবে লিখব? মানে কি লিখব?’’

উনি আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড হা করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন,

‘‘বফর্স নিয়ে তোমার কি মতামত?’’

‘‘আমার মনে হয় রাজনৈতিক দলগুলোর কোড অফ কনডাক্ট শেখা উচিত। নির্বাচনে জেতার জন্য রুলিং পার্টির নেতাদের ওপর এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ লাগিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করা একটা ভীষণ অনৈতিক, অস্বাস্থ্যকর এবং ঘৃণ্য চর্চা। এমন কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ না হলে ধীরে ধীরে আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে।’’

হাসলেন সুহাস তুলাকদার, ‘‘আর?’’

‘‘আমার মন বলে রাজীব গান্ধির বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না। তাহলে প্রশ্ন উঠবে যে তাঁর নাম অপরাধী হিসেবে ট্রায়ালে কেন পাঠানো হল? সরকার বিভিন্ন দেশে অনুসন্ধানের জন্য সি বি আই অফিসার পাঠাবে, যত টাকা ঘুষ নেওয়া

হয়েছে বলে প্রচার করা হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি টাকা অপ্রয়োজনে নষ্ট হবে। অনুসন্ধানের নামে গিয়ে শুধু ঘুরে মজা করে আসবে সবাই। এই সব তো জনসাধারণের টাকা তাই না?''

''এত কিছু কি করে অনুমান করলে? খুব দূরদর্শী তো তুমি!''

''আমার আরও কিছু মনে হয়।''

''কি?''

''ভি পি সিং-এর মতো লোক যারা 'বি জে পি'র নেতৃত্বকালে চিৎকার করছে রাজীব গান্ধি ঘুষ খেয়েছে বলে, তারা রাজীব গান্ধির পুরো পরিবারের কাছে ক্ষমা চাইতে যাবে।'' স্বাধীনতার পর ৪২ বছরের মধ্যে মাত্র ৫ বছর ছেড়ে দিয়ে ৩৭ বছর রাজ করেছে নেহেরু পরিবার। নেহেরু পরিবারকে হঠিয়ে দিয়ে প্রথম তৈরি হয়েছে কোয়ালিশন সরকার। ন্যাশনাল ফ্রন্ট কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট গদিতে এসেছে। জনতা দলের নেতা ভি পি সিং হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ভি পি সিং-কে প্রধানমন্ত্রী মানতে আমার মন চায় না।

সুহাস তালুকদার এতটুকু মেয়ের মুখে এত বড় কথা শুনে হজম করতে পারলেন না। যে জিনিস হজম হয় না তা না খাওয়াই শ্রেয়। উনি আমাকে সেই-ই শিক্ষাই দিতে চাইলেন, আমি যেন এমন খাবার পাতে পরিবেশন না করি।

''রাজনীতিতে কেউ কারও কাছে ক্ষমা চায় না। মূল জিনিসটা না জেনেই আগে অনেকটা বুঝে ফেলেছ। গোড়া দুর্বল। এই গাছ বেশিদিন বাঁচবে না।''

''লিখব না তাহলে?''

''না। এইভাবে লিখলে হবে না। আমার সংবাদপত্র চলবে না।''

এখন সুহাস তালুকদার বেঁচে নেই। থাকলে গিয়ে বলতাম শুধু বফর্স কেন রাজীব গান্ধির ওপর এয়ার বাস এ-৩২০ ডিল-এও অভিযোগ আনা হয়েছিল। তাতেও সি বি আই ক্লোজার রিপোর্ট জমা করেছে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য না পেয়ে।

সম্পাদক আমায় বললেন, ''পরিবেশ দূষণ নিয়ে লেখো।''

তখন পরিবেশ দূষণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, কেন বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছ, কেন হিমবাহ গলে যাচ্ছে, কেন সমুদ্রের উপরিতলের উচ্চতা বাড়ছে ইত্যাদি নিয়েও আমাদের মন খুব উত্তাল। 'বি এস সি'তে সবুজ বিপ্লব নিয়ে মাতামাতি করেছি। পড়েছি অতিরিক্ত চাষবাস, পশুচারণ এবং বনভূমির সঙ্কীর্ণকরণের ফলে কিভাবে মরুভূমির বিস্তার ঘটে চলেছে। 'ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' নিয়েও পড়েছি। লেখার তো অনেক কিছুই আছে। অনেক কিছু লেখার জন্য জায়গা পাওয়া দরকার। জানতে চাই, ''কত শব্দের মধ্যে লিখতে হবে?''

''তুমি লেখো। শব্দ নিয়ে ভাবতে হবে না।''

লিখলাম। আমার লেখা সংবাদপত্রের ব্রডশীটের অর্ধেকটা নিয়ে নিল। সম্পাদক বললেন, ''সুন্দর লিখেছ।'' হোক না সংবাদপত্রের নাম কলকাতা। আনন্দবাজার নয়, আজকাল বা বর্তমান নয়, তবু আমি মহাখুশি। আমার লেখা কোথাও ছাপা অক্ষরে বেরিয়েছে বিশ্বাসই হতে চায় না। বারবার পাতাটি খুলে দেখি, পড়ি আর ভাবি এটা

সত্যিই কি আমি লিখেছি?

সুহাস তালুকদার তারপর আমাকে থ্যালাসিমিয়া নিয়ে লিখতে বললেন, কিন্তু তারপর যা করলেন তা আমার একেবারেই পছন্দ হল না। উনি কোনও একটা নাম না জানা ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া 'অজয় দেবগণ'-এর একটা সাক্ষাৎকার আমার হাতে দিলেন, "এটার অনুবাদ করতে হবে।" দিলাম অনুবাদ করে। তার পরদিন দেখলাম সেই সাক্ষাৎকারটি বাংলাতে আমার নাম দিয়ে ছাপানো হয়েছে। আমি রীতিমত বিস্মিত। ছোটবেলা থেকে অন্যের জিনিস চুরি করে মেজে ঘষে তার চেহারা পাল্টে দিয়ে নিজের বলে ব্যবহার করা আমার কাছে এক অসম্ভব কল্পনা। অন্যের জিনিস চুরিই করতে শিখিনি কখনও। জিজ্ঞেস করলাম, "কি করেছেন এটা?"

"অর্ধেক পরিশ্রমেই নাম পেয়ে যাচ্ছ, কেমন খুশির কথা বলো তো!"

"একটুও খুশির কথা নয়।"

"কেন?" আশ্চর্যান্বিত মুখ ওঁর।

"আমি তো 'অজয় দেবগণ'-এর সাক্ষাৎকার নিইনি—লেখার গোঁড়াতেই তো এই চরম মিথ্যেটা লুকিয়ে আছে।"

"ঠিক বলেছ—লুকিয়ে আছে। ইন্টারভিউ-এ কোথাও লেখা নেই 'আমি জিজ্ঞেস করি' অথবা 'আমার প্রশ্ন' বলে। লেখা আছে 'তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল', 'তাঁর কাছে আর একটা প্রশ্ন'। নিজে অনুবাদ করে নিজেই মনে রাখনি! অজয় দেবগণের প্রথম মুভি ফুল অউর কাঁটে মুক্তি পেয়েছে। এরকম একটা সাক্ষাৎকার খুব জরুরি ছিল।"

তাই বলে অন্যের নেওয়া সাক্ষাৎকার নিজের নাম দিয়ে চালানো! তাঁর কথাতে আমার মন একটুও সায় দেয় না। অনুরোধ করি, "অন্য কিছু নিয়ে লিখতে বলুন প্লীজ।"

"অন্য আর কি নিয়ে লিখতে চাও?"

তখন জার্নালিজমে আমাদের অ্যাঙ্কর স্টোরি কি শোখানো হয়েছে। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় আতঙ্কবাদী হামলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক পরিবর্তন, দুর্ঘটনা নিয়ে হার্ড নিউজ থাকে। সেই প্রথম পাতাতেই থাকে সফট লাইট অ্যাঙ্কর স্টোরি। এসব স্টোরি খেলাধুলা, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, সিনেমা কিছুই নিয়ে হতে পারে। এসব স্টোরি আমার তোমার ভালবাসা নিয়েও হতে পারে, তবে তা কায়দা করে লিখতে হয়। অধ্যাপক সমর বোস বলেছেন রাস্তায় মুড়ি-মুড়কির মতো ছড়িয়ে আছে গল্প। আমাদের শুধু সেগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে শব্দালঙ্কারে সাজাতে হবে।

"কোন অ্যাঙ্কর স্টোরি লিখি?"

"কি বিষয় নিয়ে?"

"আবাসিক মেয়েদেরকে হোস্টেলে যে ধরনের সমস্যর সম্মুখীন হতে হয়?"

"হঠাৎ আবাসিক মেয়েদের সমস্যা নিয়ে পড়লে যে?"

"হঠাৎ পড়িনি। আবাসিক মেয়েদের সমস্যাগুলো আমাকে অনেকদিন ধরেই ভাবাচ্ছে।"

‘‘অনেকদিন ধরে কেন ভাবাচ্ছে?’’

অদ্ভুত লোক রে বাবা! হঠাৎ ভাবলে জিজ্ঞেস করেন হঠাৎ কেন ভাবলে? আবার যদি বলি অনেকদিন ধরে ভাবছি তাহলে জিজ্ঞেস করেন অনেকদিন ধরে কেন ভাবছ? সবকিছুতেই বিপদ। ‘‘অনেকদিন ধরে ভুগছি তাই।’’

‘‘ভুগছ কেন?’’

‘‘স্যার, আমি হোস্টেলে থাকি,’’ সুহাস তালুকদারের ‘কেন’র জবাব দিতে দিতে নিস্তেজ হয়ে আসে আমার গলা।

‘‘কোন হোস্টেলে থাকো?’’

নাম বলি হোস্টেলের।

‘‘তাই এত মুখোরা।’’

‘‘আমি আদপে মিতভাষী। সংবাদপত্র লোকের মুখ খোলায় বলে মুখোরা হয়েছি।’’

হাসেন সুহাস তালুকদার, ‘‘কি সমস্যা তোমার ওখানে?’’

সমস্যা বলি।

‘‘বাকি মেয়েদেরও কি একই সমস্যা?’’

‘‘নিশ্চয়। কিন্তু ওরা সমস্যাকে মেনে নিয়ে থাকে। পেছনে সমালোচনা করে, গালাগালি দেয় আর সামনে বাধ্য মেয়ের মতো মুখ বুজে মাথা নিচু করে চলে।’’

‘‘ওদের সমর্থন না পেলে এটা তো শুধু তোমার একার কথা হয়ে গেল। সার্বজনীন খবরের আকারে লেখা যাবে না।’’

‘‘কিন্তু আমাকে হোস্টেল ছাড়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। যদি ধরাও হয় যে এটা আমার একার সমস্যা, তাই বলে এত বড় শাস্তি! আমি তো হোস্টেলের কোন নিয়ম অমান্য করিনি!’’

‘‘কিন্তু তুমি এখানে কাজ করছ। আবার তোমারই ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে খবর বেরোবে, বুঝলে আমি কি বলতে চাইছি? তুমি সাংবাদিক আবার তুমিই খবর—এটা কি করে সম্ভব!’’

‘‘তা ঠিক।’’

এসবের মাঝখানে একদিন সুনীত মুখার্জি আমাকে আবার অফিসে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘কোথায় থাকছ?’’

‘‘হোস্টেলেই।’’

‘‘ভালো করে পড়াশোনা করো। ফার্স্ট ক্লাস পেতে হবে। না হলে পিএইচ ডি করতে পারবে না।’’

সুনীত মুখার্জি ‘পিএইচ ডি’র সময় অনেকের গাইড হয়েছেন। তাই তাঁর মুখে সারাক্ষণ ‘পিএইচ ডি’র কথা শোনা যায়। অথচ ক্লাসে এসে উনি তাঁর পিরিয়ডের সিংহভাগ সময়টা না পড়িয়ে অকাজের কথায় কাটিয়ে দেন।

শুধু মৌনতা

কলকাতায় আমি অনেক বন্ধু পেয়েছি। হোক না সেসব ক্ষণিকের বন্ধুত্ব, তবুও। সেসব বন্ধুত্ব গড়তে যেমন সময় লেগেছে, পালন করতে তেমন সময় লেগেছে, ভেঙে গেলে তা ভুলতেও তেমনই সময় লেগেছে। হোস্টেল আমাকে প্রদীপদার মতো একজনকেও দিয়েছে। দাদার রূপে নাকি বন্ধুর রূপে জানি না, কিন্তু দিয়েছে। তখনও পর্যন্ত আমি আমার জীবনে এমন কাউকে পাইনি যার কাছে যে কোনও রাগ ক্ষোভ ঝেড়ে, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলে আপাত সুখকর কোন সমাধান না পেয়ে অসম্ভব ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেও, হতাশ হয়ে পড়লেও সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধানই পেয়েছি। প্রদীপদা আমার পাশে থাকার দিনগুলোতে আমার কাছে ছোটদার গুরুত্ব অনেক কম হয়ে গিয়েছিল। তবু বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলোতে এগিয়ে আসতেই হয় ছোটদাকে। একদিন প্রদীপদার মেসে গিয়ে দেখি ছোটদা এসেছে। ছোটদার প্রস্তাব, ‘‘হোস্টেল যদি একান্তই না ছাড়তে চাস তাহলে সেখানে থাকার ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।’’

আমার মুখে বিস্ময়, প্রদীপদার মুখে অর্থপূর্ণ হাসি। বুঝি ইতিমধ্যেই ওদের মধ্যে কিছু আলোচনা হয়ে গেছে।

আলোচনার বিষয়বস্তু জানিয়ে দেয় ছোটদা, ‘‘হোস্টেল সেক্রেটারি এবং সুপারিন্টেনডেন্টের বিরুদ্ধে কেস করতে হবে তোকে। রাজি?’’

‘‘অবশ্যই!’’ ছোটদা যখন দায়িত্ব নিতে চেয়েছে কেস করার এবং প্রদীপদা আছেন সঙ্গে আমার আর কীসের আপত্তি থাকতে পারে! আমি তো বরাবরই প্রতিবাদী।

‘‘চল, তাহলে তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাক। দেখছি কবে সময় করতে পারি।’’

ছোটদার যেদিন সময় হল সেদিন কলকাতায় বাস, ট্রাম, ট্যাক্সির ধর্মঘট। ছোটদা, প্রদীপদা এবং আমি হেঁটে হেঁটে এসপ্ল্যানেডে যাই। অ্যাডভোকেট গীতানাথ গাঙ্গুলীকে দিয়ে সিটি সিভিল কোর্টে পিটিশন ফাইল করিয়ে স্টে অর্ডার নিয়ে সন্ধের সময় হেঁটে হেঁটেই হোস্টেলে ফিরি। কাউকে কিছু বলি না। পরদিন আবার সেই বুধবার। চিত্রলেখা নিয়োগী আসেন। আমি যেচে যাই তাঁর অফিসে। তাঁর সামনে টেবিলের উপর কোর্ট থেকে পাওয়া স্টে অর্ডারটা মেলে ধরি। চিত্রলেখা নিয়োগী মাথা নিচে নামিয়ে উত্তেজিত মুখে ধড়ফড় করে পড়েন, বোঝেন জিনিসটি কি। বলেন, ‘‘তোমার কাছ থেকে এরকমই কিছু আশা করা যায় বলো? আর কি ভালো তুমি করতে পারো!’’ হ্যাঁচকা টান মেরে অর্ডারটা নিজের হাতে নিতে চান সেক্রেটারি। সুপার পাশের চেয়ারে বসা। আমি ডান হাতে শক্ত করে ধরে থাকি অর্ডার। বাঁ হাতে তার ফটোকপি। সেটাও খুলে ধরি টেবিলের উপর।

‘‘উঁ হুঁ, আগে এটাতে সই করুন। তারপর।’’ অ্যাকনলেজমেন্ট যে এভাবে নিতে হবে তা প্রদীপদাই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

কোর্ট থেকে স্টে অর্ডার নিয়ে এসেও হোস্টেলে বেশিদিন থাকা গেল না। ছোটদা উৎসাহিত করল না থাকতে। ওর বক্তব্য—সুপার, সেক্রেটারিকে বোঝানো হয়েছে

যে ওঁরা নিজেদের ইচ্ছেমত আমাকে হোস্টেল থেকে তাড়াতে পারেন না—এটাই অনেক। এর অর্থ হল সংঘর্ষে আমি জিতে গেছি। কিন্তু যেহেতু ফাইনাল পরীক্ষার আর দেরি নেই নিজের মঙ্গলার্থে আমার অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত। ঠিক হল এবার আর হোস্টেল নয়—বাড়ি ভাড়া করে থাকব। ছোটদাও হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে থাকবে আমার সঙ্গে। শুরু হল বাড়ি খোঁজা। পাঁচশো টাকায় কেষ্টপুরের রবীন্দ্রপল্লীতে পাওয়া গেল বাড়ি।

ভাড়াবাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কোন বিশাল ব্যাপার নয়। বহন করার জন্য আছে শুধু একটি ট্রাঙ্ক, একটি সুটকেস এবং একটি তোষক, বালিশ ও বিছানার চাদরের সেট। কতই বা ওজোন হবে! আমার মানসিক প্রস্তুতি দরকার এবং সেটাই নিচ্ছি আমি। মনকে রাজাবাজার থেকে কেষ্টপুরে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। এই কাজটাকেই অনেক বড় বলে মনে হচ্ছে। মনের ওজোনটাই অনেক বেশি। রাজাবাজারের ভি এ এস উইমেন'স হোস্টেল আমাকে চূড়ান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত হোস্টেল জীবনের স্বাদ দিয়েছে। তবু তাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে আমার করছে না। হোস্টেলে নদীর তীরের মতো এক জায়গায় টিকে থাকা সুপার এবং জলের মতো প্রবহমান মেয়েগুলো আমাকে দূরে করে দিলেও ঘরের দেওয়াল, পড়ার টেবিল, বারান্দা, সিঁড়ি সব যেন অটুট বন্ধন তৈরি করে ফেলেছে আমার সঙ্গে। অটুট বন্ধনে বাঁধা পড়েও যদি কারও কাছ থেকে শারীরিকভাবে সবসময়ের জন্য দূরে চলে যেতে হয় তাহলে না তাকে আর পাওয়া যায় না তাকে আর ছাড়া যায় এমন এক মাঝামাঝি অবস্থায় থেকে আজীবন কাতরানো বিনা আর কোন বিকল্প থাকে না। বীডন স্ট্রিটের ভি এল মিত্র হোস্টেল ছাড়ার আগেও আমার এই একই সমস্যা হয়েছিল। সতেরো নম্বর থেকে অপূর্বাকে ডেকে আমার বিছানায় পাশে শুইয়ে শেষরাত গল্প করে কাটিয়েছিলাম। তাতে মন কিছুটা হাল্কা হয়েছিল। এবার সেই সুযোগও পাব না। এখন উজ্জ্বলা, ছবির সঙ্গে অল্পস্বল্প কথা হলেও সম্পর্ক আর আগের মতো নেই। ওদেরকে জানানো হয়নি আমার হোস্টেল ছাড়ার সিদ্ধান্ত।

তাপস পৌঁছে গেছে কলকাতায়। দুপুরে স্নান সেরে তৈরি হব। ভাবছি কি পরি, শাড়ি নাকি সালোয়ার। এমন সময় হঠাৎই নূপুর একটা কাণ্ড করল। দৌড়ে এসে থুবড়ে পড়ল আমার পায়ের উপর, ‘‘বানানীদি, তুমি কি এখনও আমার ওপর রেগে আছ? প্লীজ ক্ষমা করে দাও আমাকে। কথা বলো।’’

নূপুরের কাছ থেকে এতখানি সম্মান আমাকে যুগপৎ বিস্মিত ও লজ্জিত করে। কিন্তু রুমে আমার সঙ্গে প্রাঞ্জল হৃদয়ে কথা না বলা সব মেয়েরা আছে। ওদের সামনে বিস্ময়, লজ্জা প্রকাশ করলে চলবে না, ব্যক্তিত্বকে ধরে রাখতে হবে। দু'ফুট পিছিয়ে যাই। বাকি মেয়েদের দিকে তাকাই। তাদের মনে প্রশ্ন তাদের এত অপছন্দের মেয়েটি নূপুরের কাছে এমন ভগবানতুল্য হয়ে উঠল কিভাবে? প্রশ্নের জবাব তারা নূপুরের বিলাপেই পেল, ‘‘তুমি অনেক ভালো বনানীদি, আমি তোমাকে বুঝতে

পারিনি। অনেক অন্যায় করেছি তোমার সঙ্গে। অনেক খারাপ খারাপ কথা বলেছি। তুমি আমাকে সরবত খাওয়ার জন্য ভালবেসে কাঁচের যে সুন্দর গ্লাসটি দিয়েছিলে সেটাও আমি তোমাকে ফেরত দিয়েছি। ওটা আমাকে দাও। আমি রোজ ওটাতেই সরবত খাব।" দু'ফুট এগিয়ে আবার আমার পা ধরে ফেলেছে সে। ''বলো আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। না হলে আমি তোমাকে ছাড়ব না।" মুখে ছাড়ব না বলেই সে পা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমার টেবিল থেকে কাঁচের গ্লাসটি উঠিয়ে নিজের টেবিলে নিয়ে রাখল। আবার নিচে বসল, আবার ধরল পা। পা টেনে নিয়ে বললাম, ''আমাকে এখন বেরোতে হবে। ফিরে এসে কথা বলব কেমন?"

''কোথায় যাচ্ছ? আমিও যাব।"

''বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।"

''আমিও যাব।"

''তা কি করে হয়! ছেলে বন্ধু।"

''ঠিক আছে। কালকে তুমি আর আমি সিনেমা দেখতে যাব।"

''কাল আমি হোস্টেল ছেড়ে দেব।"

হোস্টেল ছাড়ার কথায় সে অবাক। ''কোথায় যাবে? আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। এই পাগল সুপারের সঙ্গে আমি থাকতে পারব না।"

তাপস এল। সঙ্গে বান্ধবী। তাপস চিঠিতে যতই লিখুক এম এ পরীক্ষা সেরেই তাপসের সঙ্গে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে চলে যাব, বিয়ের ফর্মে সই করব, তারপরে আমাদের গোঁড়া পরিবারকে বিদায় জানিয়ে তার হাত ধরে সোজা বেরিলিতে পৌঁছে যাব এমন ভাবনা আমি কোনদিনও ভাবিনি। সে আমার পত্রবন্ধু। তার চিঠি পড়ে আমার অবসর সময়ের অনেকটা প্রসন্ন মেজাজে কেটে গেছে তাই তাকে একবারের জন্য হলেও দেখার ইচ্ছে রেখেছিলাম এই যা। তবু তার সঙ্গে মেয়েটিকে দেখে খুশী হলাম না। ভাবলাম তার অনেক মেয়ে বন্ধু থাকতেই পারে, তাদের আমার সামনে নিয়ে আসার কি আছে! রাজাবাজার থেকে আমরা তিনজনই বাসে উঠলাম। কলেজ স্ট্রিটে যাব। মেয়েটিকে দেখি ভিড়ের মধ্যে তাপসের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। আবার ইংরেজিতে পটর পটর কথা বলছে। বাসের ভাড়া তাপস দিতে চায়, মেয়েটি বলে আমি দেব। তাপস বলে না না আমি দিচ্ছি, মেয়েটি বলে উফ্ তুমি রাখো তো! তাপস তৃতীয়বার জেদ করলে মেয়েটি ওকে 'দ্য বয় ইজ রিয়ালি ভেরি ক্রেজি' বলে তিরস্কার করে। ক্রেজি মানে আমি জানি না, যেমন অপুদার লেখা এন্টারটেনমেন্টের মানে জানতাম না। এন্টারটেনমেন্টের মতো ক্রেজির মানেটাও আমাকে হোস্টেলে ফিরে ডিকশনারি খুলে দেখে নিতে হয়েছিল। তিরস্কারটা যে গুরুতর নয় তা আমি বাসেই বুঝে নিয়েছিলাম, কারণ তারপরেই তাপস ওই ভিড়ের মধ্যেই আহ্লাদে গুনগুন গান ধরে। মেয়েটি আমাদের কফি হাউসে ছেড়েই চলে যায়। বসে থাকি শুধু আমরা দু'জন। তাপস বলে, ''কারণ অবশ্যই আছে। আমি তোমার কাছে স্পষ্ট থাকতে চেয়েছিলাম। মালিনী শুধুই আমার বান্ধবী। আমার ক্লাসমেট। আমাকে পছন্দ করে। ওই পর্যন্তই। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।"

"বিয়ে!"

"কেন? প্রথমবার তো নয়! আমি তোমার সঙ্গে এতদিন ধরে মজা করিনি রানি।"

"কিন্তু আমি তো মজাই ভেবেছিলাম...।"

"আগে কেন বলোনি?"

"কি?"

"এই যে...মজা ভেবেছিলে। আচ্ছা বলো কবে করছ।"

"আমি সিরিয়াসলি ভাবতে পারছি না।"

"এখন ভাবো। কতক্ষণ লাগে?"

"সম্ভব নয়।"

"কি সম্ভব নয়?"

"আরে বাবা বিয়ে সম্ভব নয়।"

"আমি কিন্তু তোমাকে বিয়ে করার জন্যই এসেছি।"

"আপনার বাড়ির লোককে না জানিয়েই।"

"আমার শুধু মা আছেন। তাকে নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। আমি দু'মাসের ছুটি নিয়ে এসেছি এবং তোমাকে ছেড়ে ফেরত যেতে চাইছি না।"

"কি জবরদস্তি! বিয়েটা কি ছেলেখেলা নাকি!"

তাপস চুপ।

"আমাকে এমন ভালো লাগার কারণ জানতে পারি কি?"

"তোমার মুক্তোর মতো হাতের লেখা।"

"হা হা। হাতের লেখা দেখে কেউ কারও প্রেমে পড়ে নাকি!" তাপসকে বললাম বটে কিন্তু আমি হাতের লেখা দেখেই অমিতাভর প্রেমে পড়েছিলাম।

"তোমার চিঠির ভাষা।"

"হা হা, চিঠির ভাষা দেখে কেউ প্রেমে পড়ে নাকি!"

"কি বলছ তুমি রানি! চিঠির ভাষা দেখেই তো প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমে পড়ে।"

"প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমে পড়ে কথাটা ভুল। ছেলে মেয়ের প্রেমে পড়ে। প্রেম হলে তারা প্রেমিক প্রেমিকা হয়।"

তাপস হা করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, "বড় সুন্দর কথা বলো তুমি। তোমাকে আমি ছাড়ব না।" হাত দু'টোকে সামনে প্রসারিত করে নিজের মুঠোর মধ্যে সে আমার হাত টেনে নেয়।

"কি করছেন?"

"বলো তুমি আমার।"

আমি নিরুত্তর।

"বলো।"

নিরুত্তর আমি।

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"কি?"

‘‘তুমি কি সত্যিই আমাকে ভালবাস না?’’

‘‘জানি না।’’

‘‘পারবে এখন আমাকে ছেড়ে চলে যেতে?’’

‘‘হ্যাঁ।’’

‘‘যাও তো দেখি।’’ কি জেদ চেপে বসল মাথায়—চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। বেরিয়ে গেলাম কফি হাউজ থেকে। একবারও পেছনে ফিরে দেখলাম না। পরদিন হোস্টেল ছেড়ে দেওয়ায় আমার সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করার সুযোগও সে আর পেল না।

কেষ্টপুরে বাড়িওয়ালার পরিবারে মোট চারজন। স্বামী-স্ত্রী এবং তাঁদের দুই ছেলে। বাড়িওয়ালা দোতলায় থাকেন, আমরা থাকি একতলায়। দোতলা এবং একতলায় একই সংখ্যক ঘর আছে। ঘরগুলোও অনুরূপ। ঘর বলতে দুটো শোবার ঘর—একটা বড় এবং একটা ছোট, একটা রান্নাঘর এবং একটা বাথরুম। এছাড়া একটা বারান্দাও আছে। বড় ঘরটি রাস্তার দিকে। ওটা ছোটদা নিয়েছে এবং ছোটটি কলপাড়ের দিকে। বলা বাহুল্য সেটি আমার। আমাদের দু’জনেরই হোস্টেলের লোহার খাটে পাতা তোষক বালিশ মেঝেতে স্থান পেয়েছে। ছোটদার ঘরে ছোটদার বিছানা, আমার ঘরে আমার। আমার ঘরের বাড়ির ভেতরের দেওয়াল ঘেঁষে উঠে গেছে দোতলার সিঁড়ি। সিঁড়ির পরেই বাইরের দরজা। দরজা খুললেই সামনে চোখে পড়বে কলপাড়। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমার ঘরের পাশ দিয়ে ইট বাঁধানো রাস্তা বাড়ির সদরে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাড়ির নিচতলার বারান্দার পরেই রান্নাঘরের ওইপাশটাতে আছে সিমেন্ট বাঁধানো নালী। নালীর পরে প্রাচীর। বেশি নোংরা হয় না তবু মাসিমা অর্থাৎ বাড়িওয়ালি মাঝে মাঝে নালী ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করেন এবং হাত ধোওয়ার জন্য আমার কাছে ডেটল, সাবান চাইতে আসেন। মেসোমশাই একটা বেসরকারি কম্পানিতে চাকরি করেন। স্বামী-স্ত্রী দু’জনই ভালো মানুষ। তাঁদের ছেলে দুটিও মন্দ নয়। বড় ছেলেটি বয়সে ছোটদার সমান। আমরা ভাড়া যেতেই সে একটি স্কুলে চাকরি পায়। ছোট ছেলেটি, খোকন যে মাসিমার হিসেবে আমার চেয়ে বছর দু’য়েকের ছোট একটু চঞ্চল, একটু অগোছালো এবং মাসিমার মতে একেবারে অবাধ্য। মাসিমা মনে করেন দুনিয়াদারির ব্যাপারে একদমই ওয়াকিবহাল নয় সে, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন ভাবনা নেই তার, শুধু রাগ মেজাজ নিয়ে চলে এবং গজগজ করে কথা বলে। খোকন বি কম পড়ে। ফাইনাল ইয়ার। প্রচুর টিউশনও পড়ায়, মাঝে মাঝে মা-বাবা-দাদার সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করে আমার ঘরে চলে আসে। আমার সামনে এলেই তার সব রাগ পড়ে যায়, দুনিয়ার কারও বিরুদ্ধেই আর কোন অভিযোগ থাকে না, আমাকে দিদি বলে ডাকতে গিয়েই ওর মুখ নির্মল হাসিতে ভরে যায়। ছোটদার সঙ্গেও কথা বলে খোকন। কিন্তু আমার পর্যবেক্ষণ বলে সে ছোটদার কাছে এত সহজ নয় যেমন আমার কাছে।

কেষ্টপুরটা আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে অনেকটা দূরে। ভি আই পি রোডের স্টপ থেকে বাস নিয়ে এক ঘণ্টা জার্নি করে ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছতে হয়। বন্ধুবান্ধবদের বেশিরভাগই ওইদিকটাতেই থাকে—যেমন অমিতাভ, প্রদীপদা, টিঙ্কু। অরুণ থাকে আরও দূরে—বেহালাতে, সুদীপ্ত হাওড়াতে—সেকেন্ড বাই লেনে। জামাকাপড়, জুতোর বাজারহাটও ওইদিকটাতেই। তাই হোস্টেলের মেয়ের মতো বারবার ঘর থেকে বেরোনো ও বারবার ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়। একবার বেরোলে বাইরে দিনের যাবতীয় কাজ অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি, বন্ধুবান্ধব, বাজার-হাট করে ফিরতে হয়। বিকেলে যাতে করে একা কাটাতে না হয় তাই দুপুরে ক্লাসের পর চারটেতে প্রদীপদার সঙ্গে দেখা করার জন্য তিন ঘণ্টা অথবা ছ'টায় সুদীপ্তর সঙ্গে দেখা করার জন্য পাঁচ ঘণ্টা অকারণে কোথাও বসে কাটাবো তবু ঘরে ফিরব না। ঘরে ফেরার সময় রাত দশটা কিংবা এগারোটা। ছোটদারও একই হাল। সকালে ছোটদাই সাধারণত সবজি-মাছ বাজার করে। সবজি আমি কাটি, মাছ কাটে ছোটদা। সকালে আমি রান্না করি। রাতে যে আগে ফেরে সে। প্রতিদিন সকালে বেরোনোর আগে ছোটদা আমায় জিজ্ঞেস করে, "কখন ফিরবি?" আমি যদি বলি 'ন'টায়' সে মুচকি হেসে বলে, আমি দশটায়। আমি যদি বলি 'দশটায়' সে বলে, এগারোটায়। আমিও কম যাই না। মাঝে মাঝে ন'টায় বলে দশটায় ঘরে ফিরি।

অমিতাভর সঙ্গে আমার যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। আমি ওর ঘরে যাই। সেও কখনো কখনো কেষ্টপুরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়। সুদীপ্ত, আনিসুর, অরুণও এসে বন্ধুত্বের অবদান রাখে। বাড়ি ভাড়া নেওয়ায় আমার একটি সুবিধে হয়েছে। আমি আমার হাতের রান্না টিফিন বক্সে করে অমিতাভর ঘরে পৌঁছে দিতে পারি। একটি জনতা স্টোভ এবং কয়েকটি বাসনপত্র নিয়ে সাজানো আমাদের রান্নাঘর। সেই জনতা স্টোভেই মায়ের হাতের রান্নার স্বাদ মনে করে করে সুস্বাদু পদ বানানোর চেষ্টা করি এবং সেই পদ তুলে ধরি মা-হারা দীর্ঘ, শীর্ণ, শ্যামলাবর্ণ লোকটির মুখের কাছে। অফিস থেকে ফিরে যখন অমিতাভ খাবার মুখে ওঠায় আমি হা করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ভাবি, খেয়ে সে বলবে, "বাহ্, কি সুন্দর রান্না করেছ!" কিন্তু সে বলে না। গোগ্রাসে গিলতে থাকে খাবার। না পেরে আমিই জিজ্ঞেস করি, "কেমন হয়েছে রান্না?"

"ভালো। হাল্কার মধ্যে ভালোই রান্না করো তুমি।"

যথেষ্ট তেল, ঝাল, জিরে-বাটা, পেঁয়াজ-রসুন ঢালা হয়েছে। তবু অমিতাভ তাকে হাল্কা রান্না বলে। বলে, "মায়ের রান্না খুব ভলো ছিল। মা খুব রিচ রান্না করতেন।" পরের দিন আমি রান্নায় আরও তেল ঢালি, আরও ঝাল, আরও মশলা, আরও পেঁয়াজ-রসুন। পরদিন আবার জিজ্ঞেস করি কেমন লাগছে। পরদিনও সে একই কথা বলে, "হাল্কার মধ্যে ভালোই রান্না করো।" তারপর দিন আরও বেশি পরিমাণে ঢালি সব। সেদিনও অমিতাভর মনে হয় না যে আমার রান্না ওর মায়ের মতো গুরুপাক হয়েছে। আমি মেতে থাকি চোখে না দেখা ওর মায়ের সঙ্গে রান্নার প্রতিযোগিতায়।

বিকেলে আমার অনুপস্থিতিতে অনেকে দেখা করতে এসে ফিরে যায়। সে খবর আমি পাই ফেরার পর। বাড়ির মেন গেটের দরজা খুলে দিয়েই মাসিমা অথবা মেসোমশায় আমায় জানিয়ে দেন ফিরে যাওয়া অতিথিদের নাম, কোথায় থেকে এসেছিল, আবার কবে আসবে বলে গেছে ইত্যাদি। একদিন শুনি নূপুর এসেছিল। মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘নূপুর কে গো? বলছিল তুমি নাকি ওর হোস্টেলে ছিলে।’’

‘‘হ্যাঁ, সে ভি ই এস উইমেন’স হোস্টেলে থাকে, যে হোস্টেল ছেড়ে আমি এখানে এসেছি।’’

‘‘ও আচ্ছা,’’ হাসেন মাসিমা। ‘‘মনে হল মেয়েটি তোমাকে খুব ভালবাসে। জিজ্ঞেস করছিল তুমি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছ কিনা, রান্না করতে পারছ কিনা, তুমি খুব শৌখিন মেয়ে তো তাই। বলছিল তোমার জন্য ওর খুব চিন্তা হয়। তুমি কিন্তু কালকে কোথাও বাইরে বেরিও না রূপু। মেয়েটি কাল বিকেলে আবার আসবে বলে গেছে।’’

‘‘ক্লাসে তো যেতেই হবে।’’

‘‘তাহলে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।’’

হোস্টেলে শুধুমাত্র নূপুরকেই নয়, সবাইকেই আমি আমার ঘরের ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু বাকিরা কেউ আমার কোন সংবাদ নেয়নি। কেউ আমাকে মনে রাখতে চায় না। একমাত্র নূপুরই আমায় মনে রেখেছে, এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে না পেয়ে ভাবেনি, একবার ভদ্রতা করেছি, অনেক হয়েছে, আবার কেন আসা? নূপুরকে তাই আমার শুধু হোস্টেলের জুনিয়র মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সে আমার বোন। রক্তের সম্পর্কে বাঁধা বোন, মাসির কিংবা পিসির মেয়ে, অথবা কাকার অথবা জেঠার। তাই পরদিন আমি ইউনিভার্সিটিতে যাব না ঠিক করেছি। নূপুর নিশ্চয় কলেজে যাবে। সকালে ওর কলেজ। কলেজ থেকে ফিরে সে হোস্টেলে যাবে, সেখানে খেয়ে দেয়ে আসবে আমার কাছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার জন্য তার দিনের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই বাতিল হবে না, কিন্তু আমার হবে। পরীক্ষা মাথায় বন্দুক লাগিয়ে দাঁড়িয়ে। ভয় আছে—পড়াশোনো না করলে গুলি বেরিয়ে পড়বে বন্দুক থেকে, এপাড় ওপাড় করে ফুঁড়ে দেবে মাথা, তবু ফাঁকিবাজি যায় না। করছি করছি, আজ না করলেও কাল করছি বলে সামলে রাখি বন্দুককে।

সকালবেলা আমি নূপুরের জন্য সবজি, মাছের বাজারে যাই। দুপুরে রান্না করি। নূপুর আসে বিকেলে। বিকেলেই আমি ওর মুখের সামনে ভাত, মছের ঝোল, তরকারি তুলে ধরি। আমার এমন লীলা নতুন নয়। এ লীলা আমি আনিসুর, সুদীপ্ত, অমিতাভ এবং অরুণের সঙ্গেও করে থাকি। আমার ঘরে যারা আসে তাদের সবাইকেই অসময়ে আমার রান্না খাওয়ার ধকল সইতে হয়। সবাইকে খাইয়ে খাইয়ে এবং প্রশংসা আদায় করে করে আমার রান্নার হাত পেকে গেছে। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। একদিন চৈতালি ও মণিকা এসেছিল। ওদেরকে ওদের বাড়িতে এক দু’বারের জন্য হলেও রান্নাঘরে দেখেছি, রান্নাঘরে ওদের উপস্থিতি আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু

ওদের কাছে আমার জনতা স্টোভের উপর কড়াই-খুন্তি ধরা চেহারা, সবজি কাটা, পেঁয়াজের ঝাঁঝে চোখ লাল হওয়া এবং শিল-পাটাতে মশলা বাটা চেহারা একেবারেই নতুন। খেতে বসে চৈতালি আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আনন্দে গদগদ হয়ে বি এস পি পাশ করা মেয়ে ক্লাস টু-এর ছাত্রীর পারদর্শিতায় কবিতা রচনা করে ফেলে।

এই দাঁড়ানো, এই বসা।
মাছের ঝোল, মাংস কষা।
এত রান্না—
ব্যস আর না।
আমি অবাক,
থাক ভালো থাক। ‘‘সামনে দাঁড়িয়ে না দেখলে তো বিশ্বাস হত না যে তুই এত সংসারী হয়েছিস,’’ বলে সে।

চৈতালির আশীর্বাদ লেগেছে নূপুরের জন্য করা রান্নায়। আরও সুস্বাদু হয়েছে পদ। তা খেয়ে নূপুর দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। আমি ওকে বলেছিলাম বাড়িওয়ালি মাসিমা মাঝে মাঝে তাঁর রান্না আমাকে এবং আমার অতিথিদের খেতে দেন, তাই তার মনে সন্দেহ উঁকি মারছে আজও হয়ত উনি সাজিয়ে গিয়ে গেছেন ওর প্লেট। মনে ওই এক অশান্তি, সঠিক উত্তর পাচ্ছে না কিছুতেই—রান্নাগুলো আসলে কার হাতের।

নূপুর মাঝে মাঝে আমার ঘরে আসে। সে এলে অনেক হাল্কা কথাবার্তায় আমারও মানসিক অবসাদ দূর হয়ে যায়। নূপুর বলে হোস্টেলের সুপার আমাকে না পেয়ে তার পেছনে পড়েছেন। সে আমার এখানে আসছে জেনে সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। ছোট মাছের পিস পড়ছে ওরও পাতে, বুধবার করে সেক্রেটারির সামনে ওরও তলব পড়ছে। রুমমেটরাও ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে না। নূপুর বলে, ‘‘মনে হচ্ছে আমিও এবার হোস্টেলে ছাড়ার নোটিশ পাব। না পেলেই বা, সুপারের এত অত্যাচার আর সহ্য হয় না। মনে হচ্ছে আমাকে তোমার এখানেই আশ্রয় নিতে হবে।’’ আমার কোন অসুবিধে নেই তাতে। এখন ছোটদাও নেই। এম টেক ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর আগেই সে নেরিস্ট-এ পড়ানোর কাজ পেয়ে চলে গেছে। নেরিস্ট হল আসলে এন ই আর আই এস টি—নর্থ ইস্টার্ন রিজিওন্যাল ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। নিচের তলার পুরোটা নিয়ে আমি একা আছি। ছোটদা না থাকাতেও শোবার ঘর আমার একই রইল। জামাকাপড় এবং বইপত্র নিয়ে গিয়ে জমা করলাম বড় ঘরটিতে। আমার ঘর ছোট হলেও সেখান থেকে জিনিসপত্র কম হওয়াতে এবং পুরো নিচতলা জুড়ে একমাত্র আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ না থাকাতে খুব খালি খালি লাগে। ভাবি নূপুর কি সত্যিই আমার কাছে চলে আসবে? নিশ্চয় নয়। আসার কথা নূপুর শুধু বলার জন্যই বলেছে। সে কলেজে পার্টি করছে। পার্টির একটা বড়সড় লিডারও হয়ে গেছে। পার্টি পলিটিক্স আমার কাছে এক দুর্বোধ্য বিষয়। নূপুরের কথা শুনে আজকাল আমার ওকে উপরতলার

মেয়ে বলে মনে হয়।

কয়েক মাস কেটে যায়। শেষ হয় আমার এম এ ফাইনাল পরীক্ষা। একদিন নূপুর সত্যি সত্যিই এসে আমায় বলে, ‘‘সুপার আমাকে খুব বিরক্ত করছেন। একদম পড়াশোনা করতে পারছি না। কিছুদিন তোমার ঘরে এসে থাকতে চাই।’’ আমি এক কথায় রাজি।

পরদিন সকালে আমার বাজারে যাওয়ার আগেই নূপুর একটা বড় ব্যাগে কিছু জামাকাপড় এবং বইপত্র নিয়ে হাজির। বলে, ‘‘আমিও তোমার সঙ্গে সবজি কিনতে যাব।’’ বাধা দিয়ে বলি, তুই ঘরে থাক, পড়াশোনা কর। কিন্তু সে শোনে না, সবজির ব্যাগ হাতে নিয়ে আমার আগে আগে বেরিয়ে যায়। বাজার করে এসে সে বলে, ‘‘আমি সবজি কেটে দেব।’’ আমার মানা সে কানে নেয় না। জোর করে বঁটি নিয়ে সবজি কাটায় হাত পাকাতে বসে। মাছও নাকি সে কাটবে। সে এখানে এসেছে কয়েকদিন থাকবে বলে। থেকে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবে বলে। পরীক্ষার জন্য স্টাডি লিভে আমরা মা-বাবার কাছে যাই অথবা এমন কোন অভিভাবকের কাছে যাই যিনি মা-বাবার বিকল্প হয়ে আমাদের সঙ্গে থাকেন, স্নেহ করেন, আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখান। যেমন মাসি মেসো, কাকু-কাকিমা, মামা-মামি অথবা অনেক বড় দাদা অথবা দিদি। আমার মনে নূপুরের সেই বড় দিদির স্থান পূরণ করার বাসনা জাগে। অনেকটাই ছোট সে। ওর আমার বয়সে চার বছরের ব্যবধান। ওকে আমি অসম্ভব স্নেহ করতে চাই, প্রাণভরে যত্ন করতে চাই, কথা না শুনলে শাসন করতে চাই। চাই না যে তার পড়ার সময় থেকে এক সেকেন্ডও বেরিয়ে গিয়ে অন্য কাজে ঢুকে পড়ুক। কিন্তু নূপুর তা বোঝে না। সে আমার হাত থেকে খুন্তি কেড়ে নিয়ে রান্না করবে বলে জোরাজুরি করে। আমি দেখি যে কারণে নূপুরের আমার কাছে আসা, পরীক্ষার প্রস্তুতি—তাতেই তার মনযোগের একান্ত অভাব।

দুপুরে আমরা খেতে বসি। পাত সামনে রেখে একগাদা গল্পের ঝুড়ি খুলে বসে নূপুর। কলেজের গল্প—

‘‘চারটে ছেলে একসঙ্গে আমার প্রেমে পড়েছিল জানো? কি জ্বালা!’’

‘‘হুঁ,’’ আমার নির্বিকার উত্তর।

‘‘একটাও পদের না। ‘সি পি’র একটা ছেলে, ফিফথ নম্বর, কলেজের সামনে তো আমার রাস্তাই আটকে ফেলল। অনেকদিন থেকেই পেছনে ঘুরঘুর করছিল, সেদিন পেছন ছেড়ে একেবারে সামনে। দেখতে মন্দ না। গতকাল একসঙ্গে ভিক্টোরিয়াতে বসেছিলাম। কথা বলতে বলতে ওর মুখ থেকে একগাদা থুতু ছিটকে এসে আমার মুখে পড়েছে। ঘেন্না ঘেন্না। যে সমস্ত ছেলের কথা বলার সময় থুতুর ওপর কন্ট্রোল থাকে না তাদের তো আমার একদমই পছন্দ না। ও ম্যা গো...!’’

‘‘হুঁ,’’ আমার নির্বিকার উত্তর।

হোস্টেলের গল্প—‘‘তুমি জানো, পম্পার ভুরুর উপরে একটা শ্বেতির দাগ দেখা গেছে? সেটা ঢাকতে সবসময় কাজল পেনসিল দিয়ে ভুরুটা চওড়া করে টেনে দেয় ও। পম্পা মনে করে কেউ বুঝতে পারেনি। কিন্তু আমরা সবাই জেনে গেছি।’’

"হুঁ," আমার নির্বিকার উত্তর।

"শিল্পী নামে আরেকটা নতুন মেয়ে এসেছে আমার রুমে। তার সব দাঁতে পোকা ধরা। এসব তো আর দুধের দাঁত নয় যে পড়ে গেলে তার জায়গায় নতুন দাঁত গজাবে। মেয়েটার যে কি হবে! আমারও ওর জন্যে চিন্তা হয়," চিন্তার নাম করে মজার হাসি হাসে সে।

"হুঁ," আমার নির্বিকার উত্তর।

"সুপার তো সুদীপ্তার ভীষণ ফ্যান হয়ে গেছে। খুব তোয়াজ করে সে সুদীপ্তাকে। মনে হয় হারামজাদির টুঁটিটা ধরে একেবারে টেনে দিই।"

"হারামজাদি কে? সুপার না সুদীপ্তা।"

"আরে সুপার বনানীদি। এটাও বোঝো না!"

"ওহ্," আমার নির্বকার উত্তর।

"সুজাতার মাথার টাকটা আরও বড় হয়েছে। সেদিন বারান্দার বেসিনে যখন মাথা নিচু করে ও মুখ ধুচ্ছিল আমি ভালো করে লক্ষ্য করেছি। সকালের রোদে চকচক করছিল টাক।"

টাকের কথায় আমার উত্তর বিকারহীন 'হুঁ' বা 'ওহ্' হয় না। বলি, "তাই?"

টাকের কথা বলেই নূপুরও ওর বিনুনিটা বাঁ হাত দিয়ে সামনে টেনে নিয়ে আসে, "আমারও খুব চুল পড়ছে। দেখেছ কত সরু হয়ে গেছে বিনুনি। যেদিন মাথায় শ্যাম্পু করি সেদিন তো অন্ততপক্ষে দু'শো গ্রাম চুল বেরিয়ে যায়।"

উজ্জ্বলা তার চুল পড়ার হিসেব গ্রামে করত না। ওকে দেখতাম গুণত পড়ে যাওয়া চুল। গুণে ওর চুলের ডায়েরিতে লিখে রাখত—আজ সাতষট্টিটা পড়েছে।

—আজ একাশি।

—আজ বাহাত্তর।

—আজ নিরানব্বই। নিরানব্বই-এর দিনে চূড়ান্ত হতাশা। আর একটা হলেই একশোকে ছুঁয়ে ফেলবে। কি জানি ছুঁয়েও হয়ত ফেলেছে, শেষতম চুল মেঝেতেই পড়ে আছে, ওকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। দিনে মাথা থেকে একশোটা চুলের বিদায় নেওয়া অবিতর্কিতভাবে অস্বাভাবিক। অর্থহীন লাগে জীবন। নোংরা মেয়ে হিসেবে হোস্টেলে উজ্জ্বলার এমনিতেই বেশ খ্যাতি। বিছানার চাদর, নাইটি বেশ চিটচিটে, ভি এল মিত্রের নন্দিনীর মতো। ছবির তো বদ্ধ ধারণা মাসে একবারের বেশি গায়ে সাবান চড়ায় না সে। কাজেই চুল পড়া কম না হলে যে উজ্জ্বলা, তার নাইটি এবং বিছানার চাদরের অবস্থা আরও করুণ হবে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

—আজ উনপঞ্চাশ। উনপঞ্চাশটা হলে উজ্জ্বলার মুখ উজ্জ্বল। হাসি হাসি ভাব, গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধুর সুর, "ঠিকই আছে বলো? এতটা চলে। সেদিন উজ্জ্বলা গায়ে সাবান লাগিয়ে স্নান করে, সার্ফজলে নাইটি কাচে, বিছানার চাদর কাচে। সাজে। কাজল পরে, লিপস্টিক পরে, ছোট কালো টিপ পরে, ভালো চুড়িদার পরে, কোন না কোন বাহানাতে কারও না কারও সঙ্গে বিকেলে ঘুরতে বেরোয়। সেদিন উনপঞ্চাশটা চুল পড়ার দৌলতে উজ্জ্বলার খরচ বেড়ে যায়, শরীরের জৌলুস বেড়ে যায়। দেখতে

খুব ভালো লাগে। সেদিন উজ্জ্বলাকে দেখে আমার হিংসে হয়, মনে হয় অলৌকিক ক্ষমতাবলে যদি ওর মাথা কেটে আমার কাটা গলায় বসিয়ে নিতে পারতাম। তখনও পর্যন্ত যেহেতু একটিও প্রেমিক জোটেনি, প্রেমিকের সিঁড়ি টপকে সরাসরি ফুলশয্যায় পৌঁছে যায় উজ্জ্বলা, কল্পনা করে বর ওকে কিভাবে আদর করবে। বলেও আমায়।

চুল পড়ত ছবিরও। ছবি বিছানার নিচে জমা করত পড়ে যাওয়া চুল। মাঝে মাঝে সেগুলো বের করে বলত, ‘‘আমি আমার কষ্ট মুখে বলি না। গুমরে গুমরে থাকি। এই দেখো এক সপ্তাহে এতগুলো পড়েছে।’’ রুবি কাঁধ পর্যন্ত ঢেউ খেলানো চুলের দুটো বিনুনি করত। বিনুনি মোটামুটি দ্রুতগতিতেই শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে যাচ্ছিল দেখছিলাম। একদিন বাদে বাদে মাথা আঁচড়ে হাতে এক থাবা পড়ে যাওয়া চুল নিয়ে আসলে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ারই চালে সে আমাকে বলত, ‘‘দু’দিনের...এমন কিছু বেশি নয়।’’

ভি এল মিত্রে সুমিত্রারও একবার চুল পড়া নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। নূপুরের মতো সেও আমাকে বিনুনি সামনে টেনে দেখিয়েছিল। ‘‘ইশ্...’’ ঘোষণার শুরু ছিল ঈশ্ দিয়ে। ‘‘ইশ্, এবার টাকলিদের খাতায় আমাকে নাম লেখাতেই হবে।’’ সময় ছিল সকাল, স্থান ভি এল মিত্রের গলি। সবে কলেজের উদ্দেশ্যে পা বাড়ানো হয়েছিল। সঙ্গে ছিল সর্বানী। সর্বানী নেকিয়ে বলেছিল, ‘‘আমারও ভীষণ চুল পড়ছে জানিস?’’ মেয়েটি না শেখা ঘষা গলায় ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, কিন্তু ওই এক বদস্বভাব—কারও সমস্যাকে গুরুত্ব দিতে চায় না। গুরুত্ব না দেওয়ার ইচ্ছেতে সবার সব সমস্যার সামনে নিজের অনুরূপ সমস্যা আরও বড় করে তুলে ধরে। বিরক্ত হয়েছিল সুমিত্রা, ‘‘ছাড় তো। তোর চুল পড়া আর আমার চুল পড়া এক হল? দেখেছিস এক মাসের মধ্যে আমার বিনুনিটা কেমন পাতলা হয়ে গেছে?’’ তনিমা বুদ্ধিমতী। সে বলেছিল, ‘‘যখন চুল পড়ে তখন অসহায় হয়ে চুল পড়া বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।’’

আমি চাই এরা সবাই আমার সঙ্গে চুল পড়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ুক। আমার চাওয়া না জেনেই নামুক, আমার ইচ্ছে না জেনেই নামুক। হারিয়ে দিক আমাকে তাদের কাছে অদৃশ্য এই প্রতিযোগিতায়। নামেও এরা কিন্তু জিততে পারে না। আশাপ্রদর্শনকারী রুবিও না। জিতি শেষপর্যন্ত আমিই। জেতার কষ্ট আমি এদের কারও কাছে প্রকাশ করি না। উৎকণ্ঠা নিয়ে, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া তনিমার পাঠকে উপেক্ষা করে অসহায় চিত্তে বাড়ি ছুটি, মা’র সামনে অসহায় কান্না কাঁদি, এবার কিছু একটা সুরাহা হবেই এই আশায় চিরুনি দিয়ে অযত্নে চুল ছিঁড়ি। বাড়িতে থেকে শোক প্রকাশ এবং কলকাতা থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা বাস ভাড়া দিয়ে বারো ঘণ্টা জার্নি করে বাড়ি ছুটে গিয়ে শোক প্রকাশের মধ্যে অন্তর খুঁজে পান মা। বলেন, ‘‘সত্যিই তো গোছা গোছা চুল ব্যারায় যাচ্ছে রে! দাঁড়া তোর ব্যাটাকে ডাকি।’’

বাবা আসেন। উনিও বোঝেন কলকাতা থেকে ছুটে আসা শোকাতুর মেয়ের মানসিক ক্লেশ। নিয়ে যান ডাক্তারের কাছে।

খাওয়া শেষে নূপুর বাসনও মাজে। আমার আপত্তি স্বত্ত্বেও। সহোদর সহোদরার দিদি হয়ে জন্মানোর সৌভাগ্য আমার হয়নি। মাসি পিসির কয়েকটি ছেলেমেয়ে কালেভদ্রে যখন আমাদের বাড়ি এসেছে কুটুম্ব হয়েই এসেছে। বড় হয়েও তাদের ওপর খবরদারি করার সাহস আমার হয়নি। সেসব কাজ দাদারাই করেছে, আমি কেবলমাত্র দর্শক হয়ে মজা নিয়েছি। বাড়িতে যখন দাদাদের ফাজলামিতে অতিষ্ঠ হয়ে চিৎকার করতাম, আর তা সহ্য করতে না পেরে দাদারা বলত 'ও ভালবাসা বোঝে না' তখন মনে হত আমার ছোট ভাই কিংবা বোন থাকলে বুঝিয়ে দিতাম ভালবাসার চরিত্র কেমন হওয়া উচিত। আমি নুপূরকে ডেকেছি ওর ওপর দিদিগিরি খাটাবো বলে, যে দিদিগিরিতে একশো শতাংশ ভালবাসা থাকে, কিন্তু নূপুর তা হতে দিচ্ছে না। আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, ''তুই আমার কাছে কেন এসেছিস?''

সে বলে, ''পড়তে।''

''তাহলে পড়ছিস না কেন?''

''পড়ব তো।''

''কখন পড়বি?''

''রাতে।''

''মনে থাকবে তো?''

''হ্যাঁ।''

কিন্তু রাতেও ঘরে নূপুরের অনুরূপ চিত্র দেখি, তার একই ব্যবহার লক্ষ্য করি। বইপত্র ব্যাগের মধ্যেই পড়ে আছে। পরদিনও নূপুর পড়শোনার নাম করে না। পরদিন সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে রাত। নূপুর শুধু খায়-দায়, আড্ডা দেয় ও কাজ করে। যেন আমার একটা গল্পের সঙ্গী দরকার, যেন কাজের একটা লোক দরকার ঘরে। নূপুরের বিরামহীন ফাঁকিবাজি দেখে দু'দিন ধরে ভেতরে সামলে রাখা রাগ আমার উপচে পড়ে। ওকে ধমকে দিই, ''পড়াশোনা না করলে এখানে থেকে কি লাভ!''

যেই না বলা অমনি নূপুর রেগেবেগে ব্যাগ নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। তখন রাত এগারোটা। আমি তাকে বোঝাতে পারি না যে ওটা ওকে ভালবেসেই বলেছি, এমনি এমনি বলেছি যাতে কারে সে পড়াশোনা করে। তাকে হাত ধরে বাধা দিই তো সে আমার হাত নিয়ে টানাটানি করে। কলপাড়ের দরজাটা বন্ধ করে দিই তো সেখানে গিয়ে দরজা খোলার জন্য ধস্তাধস্তি করে। খোকনকে ডাকি। খোকন বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু বোঝার চেষ্টা করে না নূপুর। খোকন বলে, ''তুমি এত রাতে বাস পাবে না।'' হ্যা হ্যা করে হাসে সে।

''বাস না পেলে অটো পাব।''

''অটোও পাবে না।''

''অটো না পেলে হেঁটে যাব।''

''কি বলছ! হেঁটে এতদূর যাওয়া যায় নাকি?''

''আমি ঠিক চলে যাব।''

আমাদের আওয়াজে মাসিমা নিচে নেমে আসেন। দুপুরেই উনি মাছের ঝোল তরকারি দিয়ে আমার ঘরে এসে অতিথি আপ্যায়ন করে গেছেন। অতিথির সঙ্গে অনেক গল্পও করেছেন। অতিথির বাড়ি, আত্মীয়-পরিবার নিয়ে জেনেছেন। হোস্টেলে আমি অনেকদিন শুনেছি সেইসব গল্প। আরেকবার শুনলাম। ত্রিপুরার আগরতলাতে ওদের বড় বইয়ের দোকান আছে, তিন ভাইবোন ওরা, নূপুর সবার ছোট, নূপুরের এক দাদা এবং এক দিদি আছে। দিদি কলকাতা থেকেই নিউট্রিশন নিয়ে বিয়ে পাশ করে গেছে। ভালো গান গায় সে। নূপুরও গান গায়। খারাপ নয়, তবে ভালোও নয়। তার খারাপ ভালোর মাঝামাঝি গলার গান আগেও অনেকবার চেয়ে না চেয়ে শুনেছি। আজও শুনলাম। নূপুরের দুপুরের সেই আধা সুরেলা কণ্ঠ হঠাৎ এত বেসুরো কেন হয়ে উঠল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কি এমন ঘটল যে সহসা সে প্রস্থানের কড়া সিদ্ধান্ত নিল জানতে চান মাসিমা। খোকন হাসে, ‘‘ওই দিদি একটু বকেছে তাই।’’

‘‘বকেছে কেন?’’

আমি বকার কারণ বলি, বলার সময় আমার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে নূপুর আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে পারে ভেবে দরজায় প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে খোকন। বেরোনোর কোন উপায় নেই দেখে নূপুর ভ্যা করে কান্না শুরু করে। নূপুরের কান্না দেখে মাসিমাও হাসেন, ‘‘ও দিদি একটু বকতেই পারে...’’

‘‘কীসের দিদি! আমি এত ছোট নাকি!’’ কাঁদতে কাঁদতে নূপুর একরকম ধমকেই দেয় মাসিমাকে। কয়েকমাস আগেই সে ভাড়াবাড়িতে প্রথমদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। দেখা না পেয়ে নিজেই দিদিসুলভ আচরণ নিয়ে আমি ঠিক আছি কিনা, খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো করছি কিনা তার খোঁজ-খবর নিয়ে গেছে। কয়েকমাস পরেই সম্পর্কের সিঁড়িতে এমন অধঃপতন কি করে সহ্য হয়!

মাসিমা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, ‘‘ছোটই তো। তোমার বি এ পাশ করতে এখনো অনেক দেরি। রূপু এম এ ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছে।

‘‘দিক গ্যা। এসব দিদিফিদি আমি মানি না।’’

সে আমাকে ডাকে বনানীদি বলে। ওটা শুধু ডাকার জন্য ডাকা। হয়ত কখনও বড় মানেও, যখন মানার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে অথবা যখন ইচ্ছে করে মানতে তখন। তাই বলে বাইরের একটি মেয়েকে সবসময় দিদি মেনে তার সব আদেশ, শাসন শিরোধার্য করে চলা যায় না।

নূপুর বলে, ‘‘আমার দিদি আছে আগরতলাতে। এ আমার দিদির ধারেপাশে ঘেঁষতে পারবে না। আমার দিদি আমাকে কখনও বকে না। ভ্যা...’’

‘‘তোমার ভালো চেয়েই তো বকেছে...’’

‘‘আমার ভালো চাইতে হবে না। যথেষ্ট বড় আমি। ভালো-খারাপ বোঝার বয়স আমার হয়েছে। হয়েছে বলেই মা-বাবা আমাকে এতদূরে পড়তে পাঠিয়েছে।’’ খোকনকে বসে, ‘‘সরো, আমাকে যেতে দাও। ভ্যা...’’

মেসোমশায়-ও হাজির হন। সিঁড়িতে কয়েকধাপ উঁচুতে হতভম্ব দাঁড়িয়ে উদ্ধত

মেয়েটির দুর্মতির কারণ বোঝার চেষ্টা করেন মেসোমশায়, ''যাবে যাবে। বোঝার চেষ্টা করো। এত রাতে একা বেরিয়ে রাস্তায় কোন অঘটন ঘটালে পুলিশ এসে আমাদেরই জেরা করবে।'' উনি খোকনকে কড়া অনুমতি দেন দরজা যেন না খোলা হয়। ''কাল সকালে চলে যেও তোমাকে কেউ বাধা দেবে না,'' নূপুরের প্রতি তাঁর আদেশ।

কাঁদতে কাঁদতে নূপুর আবার ঘরে ঢোকে। তবু এমন উগ্রমূর্তি মেয়েকে বিশ্বাস করা যায় না ভেবে দরজাতে তালা লাগিয়ে ঘুমোতে যান বাড়ির মালিক-মালকিন। নূপুর না ঘুমনোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে থাকে, কাঁদে জোরে জোরে। আমার কোন কথা শুনতে সে রাজি নয়। কিছু বলতে গেলেই দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। সরি বললেও আমার পাপের কোন ক্ষমা হয় না। পেতেই হয় শাস্তি। বিনিদ্রায় কাটাতে হয় রাত।

ভোরবেলা খোকন এসে আমার ঘরের দরজার কড়া নাড়ায়। নূপুরের পাথর দিয়ে কড়াই মাজার মতো ঝান ঝান ফ্যান ফ্যান কান্নার আওয়াজকে ছাপিয়ে ওঠে সেই শব্দ। সঙ্গে ডাক, ''দিদি, দিদি দরজা খোলো। রাজীব গান্ধি মারা গেছে। দরজা খোলো।''

তাড়াহুড়ো করে উঠে দরজা খুলে দিই। নূপুরের বিকারহীন কান্না দেখে মনে হল না খোকনের কোন আওয়াজ ওর কানে পৌঁছেছে।

''কি বলছিস! রাজীব গান্ধি মারা যাবে কেন?''

''সত্যি বলছি গো। মারা গেছে।''

'কি হয়েছিল?''

''অসুখ টসুখ কিছু হয়নি, হ্যা হ্যা।''

''তাহলে?''

''খুন হয়েছে,'' দাঁতের বত্রিশ পাটি জুড়ে চওড়া হাসি খোকনের মুখে। নূপুর কান্নার মাঝখানে একপলক খোকনকে দেখে নিয়ে আবার কান্নায় মনোনিবেশ করে।

''কখন খুন হয়েছে?''

''রাতে।''

''কে খুন করল?''

''আমি, হ্যা হ্যা''

''বাজে কথা ছাড় এখন।''

''এল টি টি ই মেরেছে।''

খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। ১৯৮৪-এর ৩১শে অক্টোবরের ঝলমলে সকালে বিয়ন্ত সিং, সতবন্ত সিং ইন্দিরা গান্ধিকে খুন করেছিল। ছ'বছর না ঘুরতেই রাজীব গান্ধি খুন হল। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার অকস্মাৎ দেশের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর গদি থেকে চিরকালের জন্য সরিয়ে দেওয়া হল। প্রধানমন্ত্রীহীন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দোলনায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল দেশকে। দেশের সঙ্গে আমি ঝুলছি, আমি মাটিতে পা রাখতে চাইছি, দাঁড়াতে চাইছি সোজা হয়ে কিন্তু পারছি না। আমার মাথা ঘুরছে। শরীর টলমল

করছে। দোলনাটা খুব জোরে জোরে দুলছে মনে হচ্ছে। থামার কোন লক্ষণ নেই। গতি কম হচ্ছে না মোটেও। নূপুরের কান্নার মতো। খোকনকে দেখে নূপুর উঠে দাঁড়ালো, ‘‘দরজার তালা খুলে দাও। আমি যাব।’’

খোকন বলে, ‘‘সে কি গো! শুনলে না কি হয়েছে?’’

‘‘কি হয়েছে?’’

‘‘আরে রাজীব গান্ধি মারা গেছে?’’

‘‘শুনেছি। তাতে আমার কি?’’

‘‘খবর প্রচার হয়ে গেছে। এই অবস্থায় রাস্তায় বেরোনো রীতিমত বিপজ্জনক।’’

‘‘আমার এত ভয় নেই। ভ্যা...’’

‘‘তাছাড়া এখনও সকালের আলোই ফোটেনি।’’

‘‘কোথায় ফোটেনি?’’ জানালা দিয়ে রাস্তায় উঁকি মেরে সে বলে, ‘‘আমি দেখতে পাচ্ছি সবকিছু।’’

‘‘ঠিক বলছ? সামনে থেকে কেউ এসে তোমার পিঠে ছুরি মারলে চিনতে পারবে তো? হ্যা হ্যা।’’

‘‘পারব।’’

‘‘পেছন থেকে এসে যদি কেউ ছুরি মারে তাকেও চিনতে পারবে?’’

‘‘পারব!’’ খেঁকিয়ে ওঠে নূপুর। ‘‘খুলে দাও দরজা!’’

‘‘ওরে বাবা রে!’’ খোকন লাফায়। ‘‘দিদি তুমি উপরে এসো।’’

‘‘এল টি টি ই রাজীব গান্ধির পিঠে ছুরি মেরেছে বুঝি?’’ উপরে গিয়ে খোকনকে আমার প্রশ্ন।

‘‘না না সুইসাইড বোম দিয়ে হত্যা করে দিয়েছে। তুমি জানো তো শ্রীপেরুমবুদুরে ভোটের প্রচার করতে গিয়েছিল রাজীব গান্ধি?’’

‘‘না।’’

‘‘গিয়েছিল গো। সেখানেই ঘটেছে ঘটনাটি।’’

খোকনদের ঘরে টিভি আছে। ওরা প্রতিদিনের দেশের রাজনৈতিক খবরের সঙ্গে ওয়াকিবহাল থাকে। আমি থাকি না। আমাকে বিশেষ কোন ঘটনা নিয়ে বললে জানি। না হলে কখনও ওদের ঘরে টিভির সামনে বসলে বিশেষ তুচ্ছ সব ঘটনা আমার চোখে পড়ে এবং কানে ঢোকে। রাজীব গান্ধির হত্যার পরে নিয়মিত টিভির সামনে বসে অনেক তথ্য জেনেছি। জেনেছি শ্রীপেরুমবুদুরে প্রধানমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে ডায়াসের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন যেখানে ওঁর বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। যাওয়ার পথে শুভাকাঙ্ক্ষীরা, পার্টির সদস্যরা এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর গলায় মালা পরিয়েছে। তাদেরই মাঝখানে ছিল ধানু নামে ‘এল টি টি ই’-এর এক সদস্যা। তার কোমরে ছিল এক বেল্ট যার সঙ্গে বাঁধা ছিল আর ডি এক্স। ধানু নিচু হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পা ছোঁয়ার অভিনয় করতে গিয়ে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

নূপুর আরও একটি দিন এবং আরও একটি রাত ভ্যা ভ্যা করে করে চিল্লিয়ে ভোর হতেই ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তিনদিন পরে খোকনদের ঘরে রাজীব গান্ধির

অন্তিম সৎকার দেখছি—রাহুল গান্ধি চিতার চারিদিকে ঘুরে নিয়ে বাবার মুখে আগুন দিয়েছে। চিতার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সোনিয়া গান্ধি। প্রিয়াঙ্কা গান্ধি জড়িয়ে ধরে আছে মাকে। চিতা জ্বলতে শুরু করলে সোনিয়াও ঘোরেন চিতার চারপাশে। খোকন বলে, ‘‘দেখেছ, সোনিয়া গান্ধি লিপস্টিক পরেছে?’’

‘‘কোথায়? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।’’

‘‘পরেছে গো। হাল্কা করে।’’

‘‘পরেও যদি বা থাকে তাতে তোর কি?’’

‘‘না, আমার কিছু না,’’ হাসে খোকন। ‘‘বড়লোকের ব্যাপার। এদের আবার দুঃখ! সত্যিকারের দুঃখ হলে সাজতে পারত?’’

মাসিমা বলেন, ‘‘তুই বেশি জানিস। এরা সব হল ভি আই পি। এদের যে কোনও অবস্থাতে একটু ওরকম সাজতেই হয়।’’

সোনিয়া গান্ধির কথা ভেবে আমার মন উদাস হয়। সোনিয়া গান্ধি আমাদের মতো ভারতীয় নন। উনি জন্মসূত্রে ভারতীয় হননি। এখানে মা-বাবা, ভাইবোন নেই। কাকা-কাকি, জেঠাজেঠি নেই। এখানে তাঁর মা-বাবার বংশের বেঁচে থাকা কোন ছিটেফোঁটা আত্মীয়স্বজন নেই। সোনিয়া গান্ধি ইতালীর লুসিয়ানার মেয়ে। ইতালীর নাগরিক ছিলেন উনি। লন্ডনের কেন্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তখনকার সূচনা ও সম্প্রচারণ মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির ছেলে রাজীব গান্ধিকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। সেই ভালবাসার সূত্রে রাজীব গান্ধিকে বিয়ে করা, আপন করে নেওয়া ভারতকে। কিন্তু যাকে বিয়ে করে, যার হাত ধরে নিজের দেশ ছেড়ে তাঁর এই দেশে আসা আজ সে-ই নেই। ইন্দিরা গান্ধিও বেঁচে নেই। সঙ্গে রয়েছে মাত্র দুটি ছেলেমেয়ে এবং একরাশ অসুরক্ষা। নির্বাচনের আগে বিরোধী পার্টি হিসেবে প্রচারে নামলে যারা কংগ্রেসের বিপর্যয় চেয়ে বফর্স মামলাকে মোদ্দা করেছিল তাদেরই দাবি ছিল রাজীব গান্ধির ওপর থেকে স্পেশাল প্রোটেকশন ফোর্স সরিয়ে নেওয়া হোক। আমার মন ব্যাকুল হয়। রাজীব গান্ধির উপর থেকে স্পেশাল প্রোটেকশন ফোর্স সরিয়ে নেওয়া একদমই উচিত হয়নি। বিশেষত যখন এটা সবার জানাই ছিল যে শ্রীলঙ্কায় ইন্ডিয়ান পিস কিপিং ফোর্স পাঠানোর জন্য ‘এল টি টি ই’র সঙ্গে তাঁর শত্রুতা তৈরি হয়েছে। আমার মনে হয় রাজীব গান্ধির সঙ্গে ভীষণই অন্যায় হয়েছে। এই অন্যায়ের জন্য শুধুই কি ‘এল টি টি ই’কেই দোষী করা উচিত? নাকি যারা রাজীব গান্ধিকে প্রোটেকশন ফোর্স দিতে চায়নি তাদেরও?

অতিমেধাবী সে

আমার এম এ পরীক্ষার রেজাল্ট বের হতে না হতেই সেজদা কলকাতার ভাড়াবাড়িতে এল। সে তখন ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে সার্জেন্ট। ব্যাঙ্গালোরে পোস্টিং। সেজদা বালুরঘাটে গিয়েছিল। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া নেওয়াতে বড় সুবিধে হয়েছে। বালুরঘাটে আসা যাওয়ার পথে দু'চারদিন এখানে থাকা যায়। কোন বন্ধুর বাড়িতে ওঠার প্রয়োজন হয় না। বাড়ি যাওয়ার সময় সে বলে গিয়েছিল ফেরার সময় আমাকে ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যাবে। ওখানে আমার বিয়ের চেষ্টা করবে। আমি প্রথমে আপত্তি দেখিয়েছিলাম, ‘‘কি বলছিস! এখনই বিয়ে করতে যাব কেন?”

‘‘বিয়ে করবি না তো কি করবি?”

‘‘আরও পড়াশোনা করব।”

‘‘সেটা বিয়ের পরেও করা যাবে। সেভাবেই কথা বলে নিবি ছেলের সঙ্গে।”

‘‘বিয়ের পরে আর লেখাপড়া হয় না।”

‘‘কে বলেছে?”

‘‘কেউ বলেনি। আমি জানি।”

‘‘কিচ্ছু জানিস না তুই।”

এত তাড়াতাড়ি বিয়েতে আমার আপত্তি। আমি ভাড়া বাড়িতে আসার পর থেকেই বাড়িওয়ালি মাসিমাও আমার বিয়ে নিয়ে পড়েছেন। উনি এমনিতে খুব সরল মনের মানুষ। অনেক উঁচু মানসিকতার অধিকারিণী। আমি একজন অবিবাহিতা মেয়ে তাঁর ঘরে একা থাকছি, আমার ঘরে দিন নেই ক্ষণ নেই যখন-তখন ছেলেবন্ধুর প্রবেশ ঘটছে, তাদের সঙ্গে ঘরের দরজা বন্ধ রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি গল্প করছি সেসব নিয়ে তাঁর পুরো পরিবারের মুখে রা পর্যন্ত নেই। মাসিমার শুধু অনুযোগ আমি বিয়ে করছি না কেন। যেন আমার লেখাপড়া করার কোন প্রয়োজেন নেই, চাকরি করার কোন প্রয়োজন নেই, যেন বিয়ের পাত্র এবং বিয়ে আমার হাতের মুঠোয়—মুঠো খুলে ধরব কি ছেলে মালাবদলের মালা হাতে নিয়ে লাফ মেরে মাটিতে পড়বে, পরিয়ে দেবে মালা আমার গলায়, তার জন্য মা-বাবার অনুমতিরও দরকার পড়বে না।

খোকন যেমন মা-বাবা-দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে আমার ঘরে চলে আসে, মনের খুশিতে আড্ডা দিয়ে মন ভালো করে যায়, তেমন খোকনের সঙ্গে ঝগড়া হলে মাঝে মধ্যে মসিমাও আমার ঘরে আসেন। ছেলেকে নিয়ে যত রাজ্যের অভিযোগ ঝেড়ে হাল্কা করেন মন। সঙ্গে আশাও রাখেন। বলেন, ‘‘খোকনকে একটু বোঝাও না রূপু। তুমি তো ওর দিদি। তুমিই পারবে ওকে ঠিক করতে।” মাসিমার অভিযোগ ছেলের বি কম পরীক্ষা সামনে। কিন্তু সে মোটেও পড়াশোনা করছে না। সারাদিন টিউশন করে সময় নষ্ট করছে। কোন ভালো কথা বললে শোনে না। শুধু অশান্তি করে। উটকো রাগ ছেলের। বড় ছেলেকে নিয়ে মাসিমার কোন সমস্যা নেই। ভবিষ্যৎ তৈরি হয়ে গেছে তার। আমি খোকনের টিউশন করাতে খারাপ কিছু দেখি না। সে ঘরে

পরীক্ষার প্রস্তুতি যে সত্যিই নিচ্ছে না আমার তা বিশ্বাসও হয় না। আমি তো তাদের বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা থেকে দেখছি না কি ঘটছে সেখানে। বাড়ির অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটির শব্দও আমি শুনি না। সুতরাং ওকে কি বোঝাতে হবে তার বিষয়বস্তু আমার মাথায় ঢোকে না।

খোকনকে নিয়ে অভিযোগ শেষ হলে মাসিমা অন্যদের গল্পও করেন যেমন পাড়া-প্রতিবেশীর, আত্মীয়স্বজনের। তাদের মধ্যে যারা পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও আইবুড়ো তাদের নামোল্লোখ করে উনি বলেন, ‘‘সে-ও ঠিক তোমার মতো জানো তো রূপু? বিয়ে করবে না।’’

অবাক হই ভেবে যে আমার মতামত না জেনেই আমি বিয়ে করব না এমন ভাবনা মাসিমা কি করে পাকা করেন এবং সেই ভাবনা আমারই সামনে নির্দ্বিধায় কি করেই বা পেশ করেন! পেশও উনি এমনভাবে করেন যে আমি লজ্জা পেয়ে যাই। আমার মনে হয় আমিও বুঝি সেই পঁয়ত্রিশ বছরের মহিলাগুলোর মতো বুড়িয়ে গেছি। খারাপও লাগে, তবু লজ্জায় মুখ খুলতে পারি না, বলতে পারি না যে মাত্র একুশ ছাড়িয়ে বাইশে পা দিয়েছি। কিই বা এমন বয়স হয়েছে আমার! বলতে পারি না বলে মুখে শুধু একটা লাজুক হাসি টেনে বরদাস্ত করি মাসিমার কথা।

বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে ফেললেন মাসিমা। ছেলের বিয়ের পর আমার বিয়ের ব্যাপারে চিন্তা বেড়ে গেল তাঁর। সেই কারণেই বোধ হয় আমার ঘরে আসতে থাকা অসংখ্য পুরুষ বন্ধুদের উনি সহ্য করেন। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তারা ঘরে বসে থাকলেও কোন অভিযোগ রাখেন না। আশা রাখেন এদের মধ্যে থেকে একজনকে ঠিক আমি বেছে নেব।

নিজের বন্ধু ছাড়াও ছোটদারও কয়েকজন বন্ধুর আমার ঘরে যাতায়াত আছে। যেমন পকাইদা এবং সঞ্জয়দা। এঁরা সব ছোটদারই মতো উঁচু দরের চিন্তাভাবনার লোক। সমাজসেবক। এঁদের সঙ্গে কথা বলতে যে আমার সংকোচ হয়, এঁরা তা বোঝেন না। তাই আসেন। কাছাকাছি থাকেন বলেও হয়ত আসেন। এসে নিজেদের খুশিমত উঁচু দরের কথা বলে যান। কিংবা সাধারণ কথাই বলেন, কিন্তু আমার তা অসাধারণ এবং অনেক উন্নতমানের লাগে। এঁরা যে ভাবেই হাঁটুন, যেভাবেই কথা বলুন, যেভাবেই বসুন, যেভাবেই হাসুন সব ঠিক। এঁরা পা বাঁকিয়ে হাঁটলেও ঠিক। গায়ে নোংরা ছেঁড়া ফাটা জামা চড়িয়ে বিয়েবড়িতে গেলেও ঠিক, হাতের নখ কাটলে তো ঠিকই, না কাটলেও ঠিক। নখের নিচে কালো কালো ময়লা জমা হয়ে থাকলেও ঠিক। দাঁত ব্রাশ করলেও ঠিক, না করলেও ঠিক। এঁদের কাছে আমার সব ঠিকগুলো বেঠিক হয়ে যায়। মনে হয় ভুল করছি আমি। পকাইদা একদিন এসে নানা কথার ফাঁকে আমায় জিজ্ঞেস করেন, ‘‘তুমি রোজ স্নান করো?’’

স্বাভাবিকভাবেই আমার উত্তর ছিল, ‘‘হ্যাঁ।’’

‘‘আমি রোজ স্নান করি না।’’

‘‘কেন?’’

‘‘আঁতেলরা রোজ স্নানের পেছনে সময় নষ্ট করে।’’ শুনে আমি মুহূর্তে দুনিয়ার

কোটি কোটি রোজ স্নান করা মানুষের কথা ভুলে যাই। ভুলে গিয়ে পকাইদার সঙ্গে শুধু নিজের তুলনা করি। ভাবি আমি একটা আঁতেল। আমি রোজ স্নান করে সময় নষ্ট করি। পকাইদা তা করেন না। পকাইদাই হলেন আসল বুদ্ধিমান, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাদীপ্ত জগতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জানতে চাই, ‘‘আপনি কি একদিন বাদে বাদে স্নান করেন?’’

‘‘না।’’ হাই পাওয়ারের চশমার কাঁচের পেছনে আমি তার বিবর্ধিত চোখ দেখি। মাথাভর্তি দীর্ঘদিন চিরুনির স্পর্শ না পাওয়া ঘন কোঁকড়ানো চুল, মোটা অনতিদীর্ঘ গোঁফ এবং চিবুকভর্তি অন্ততপক্ষে তিন ইঞ্চি লম্বা ঘন কালো দাড়ির সঙ্গে মানিয়ে গিয়ে সেই চোখ আমাকে বলে তুমি বরং আইনস্টাইনকে বোঝার চেষ্টা করো, সহজ হবে।

‘‘তাহলে দু’দিন বাদে বাদে?’’ বিস্ময় আমার গলায়।

‘‘এবারও ঠিক বললে না। আমি মাসে একদিনই স্নান করি।’’

বেশ কয়েকদিন ধরে পকাইদার মাসে একবার করে স্নান করার গল্প একাই শুনছিলাম। তারপর একদিন সঞ্জয়দা উপস্থিত থেকে আমার সহশ্রোতা হয়েছিলেন। উনি বলেন, ‘‘জানো রূপু, যেদিন পকাইদা স্নান করেন, বাথরুমের বাইরে নালা বেয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ভেসে চলে যায়। অর্থাৎ যেদিন তুমি বাথরুমের বাইরের নালা বেয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ভেসে যেতে দেখবে সেদিন জানবে পকাইদা স্নান করছেন।’’

চুল আঁচড়ানোর ব্যাপারেও পকাইদার একই যুক্তি—প্রয়োজন কি! প্রতিদিন চুল আঁচড়ানো মানে আঁতেলদের মতো সময় নষ্ট করা। কলকাতায় এসে থেকে আমি অতিমেধাবী ছোটদা এবং তার বন্ধুদের মুখে ‘আঁতেল’ শব্দটা শুনছি। বুঝতে পারছি আঁতেল হল মানুষের এক দল যার সঙ্গে ছোটদার অতিমেধাবী দলের সদস্যদের সাজপোশাক, চলাফেরা, আচারব্যবহারে ব্যাপক ব্যবধান। সাজপোশাক, চলাফেরা, আচারব্যবহারে আমার তো প্রতিটি মানুষকেই একে অন্যের থেকে আলাদা লাগে। কিন্তু তাদের এই পার্থক্য সেই পার্থক্য নয়। অতিমেধাবীদের পুরো দলটাই কিছু সাধারণ ধর্মের বল্কল নিয়ে বাকি সবার থেকে আলাদা। বাকি সবার থেকে বললেও ভুল হবে। তাদের মতো আরও অনেককে যে রাস্তাঘাটে দেখা যায় না তা নয়। যেমন অনেকেই নোংরা জামা পরে ঘুরে বেড়ায়। আমাকে জানতে হবে তারা সার্ফ কেনার অক্ষমতাহেতু নোংরা জামা পড়ছে নাকি শখে। যদি শখে হয়, যদি বলে রোজ রোজ জামা ধোয়া মানে আঁতলেমি বই আর কিছুই নয় তাহলে বুঝতে হবে যে সে হল সেই অতিমেধাবী দলের। অনেকেই বোকা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমাকে জানতে হবে তারা সত্যিই কি বোকা? যদি তা না হয়, যদি তাদের বোকামির পোশাক এক ভড়ংমাত্র তাহলে বুঝতে হবে তারা হল সেই অতিমেধাবী দলের। অতিমেধাবী দলের বিশষত্ব এই দুটো জিনিসেই সীমাবদ্ধ নয়। বাকি জিনিসগুলো কি আমার এখনও জানা হয়নি।

একদিন পকাইদা জিজ্ঞেস করেন, ‘‘বড় দাড়ি কারা রাখে জানো?’’ যে উত্তরটি আমার ঠোঁটের কোণে এসে থেমে যায় তা হল, ‘‘মুসলিমরা।’’ উত্তরকে ঠোঁটের

কোণে থামিয়ে দিতে হয় কারণ আমি জানতাম হিন্দু, মুসলিম, শিখ, জৈন ইত্যাদি ধর্ম ধরে কথা বলা তাঁরা পছন্দ করেন না। শুনলে মুখে অপছন্দ করেন বলবেন না। বলবেন, ‘‘কি বলছ!’’ তাও এমন পড়ে আসা হতাশাময় গলায় যে আমি নিজেকে ধর্মান্ধ ভাবতে বাধ্য হব এবং লজ্জা পাব। তাই বলি, ‘‘যারা রাখতে পছন্দ করে তারা।’’

‘‘পছন্দ কেন করে?’’

‘‘কি করে জানব কেন পছন্দ করে?’’

‘‘সাধারণ বুদ্ধি কাজে লাগাও। পছন্দ করার পেছনে নিশ্চয় কারণ থাকবে!’’

‘‘জানি না। আমার সাধারণ বুদ্ধি কম।’’

পকাইদা মেঝেতে রাখা ঝোলা থেকে একটা কলম বের করে বললেন, ‘‘ধরো আমি কিছু লিখছি। লিখতে লিখতে কিছু ভাবছি। ভাবতে ভাবতে মনে হল একটা জিনিস দরকার। সেই জিনিসটা ব্যাগে আছে। আমি তখন দাড়িতে কলমটা গুঁজে রেখে ব্যাগে জিনিসটা খুঁজতে পারব।’’ বলতে বলতে দাড়িতে কলমটি গুঁজেও দিলেন উনি।

সঞ্জয়দার কথাবার্তা অনেকটা আলাদা। আলাদা হলেও আমি তাঁকে অতিমেধাবী দলের বাইরে ভাবতে পারি না। শুনেছি উনি সিডিউল কাস্ট। কিন্তু পড়াশোনা এবং চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কোন সুবিধে নেননি। হ্যাঁ, এটাও ছোটদার বন্ধুদের একটি বিশেষত্ব। সঞ্জয়দা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে চাকরি করেন। গেজেটেড অফিসার। গেজেটেড অফিসার হয়েও উনি শার্ট ইন না করে অফিসে যান। সঞ্জয়দার এই বৈশিষ্ট্যকে বিশাল ভালোমানুষি এবং নিরহংকারের প্রতীক হিসেবে মানা হয়। সবাই মানে, আমি না মেনে যাই কোথায়! ছোটদার বন্ধু হয়েও সঞ্জয়দা ছোটদার সঙ্গে গল্প করতে আসেন না। উনি আমার সঙ্গে গল্প করতে আসেন। অনেকক্ষণ বসেন, অনেক কথা বলেন। আমি শুনি, বলি কম। পাছে আমার কোন কথা আঁতেলের মতো শোনায় এই ভয়ে। যেমন একদিন উনি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘‘আচ্ছা রূপু বলো তো, তোমার বাড়িওয়ালা এত সৎ হয়েও এত বড় বাড়ি কেমন করে বানালেন?’’ আমি চুপ থেকেছি। সঞ্জয়দা আমাকে এক মিনিট সময় দিয়ে বলেছেন, ‘‘এত সোজা উত্তরটা দিতে পারলে না?’’

নিজেকে গণ্ডমূর্খ মনে হয়, তবুও মুখে তালা লাগিয়ে রাখি।

‘‘আমিই বলছি তাহলে।’’ কৌতূহল নিয়ে তাকাই সঞ্জয়দার মুখের দিকে।

‘‘উনি যদি এত সৎ না হতেন তাহলে পাঁচতলা বাড়ি বানাতেন। সৎ হওয়ায় তিনতলা বাড়ি বানিয়েছেন—মানে বানাতে পেরেছেন।’’

কখনও কখনও সকাল ন’টা কিংবা দশটাতেই চলে আসেন সঞ্জয়দা। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে হাত ঘড়িটার দিকে তাকান। বলেন, ‘‘অনেক বেলা হল। উঠি এবার।’’ তাঁর প্রশ্ন-উত্তরে পরিশ্রান্ত আমিও ভাবি সত্যিই অনেক বেলা হয়েছে, আমাকেও স্নান খাওয়া করতে হবে, এবার গল্পে ইতি টানা দরকার। তাই তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়ে দিই, ‘‘ঠিক আছে।’’

উঠে দাঁড়ান সঞ্জয়দা, ‘‘বলছ? রূপু, তুমি একদমই রোম্যান্টিক নও...”

হাল্কা হাসি আমার মুখে। সেই হাসিতে বোধ হয় প্রশ্ন ভেসে ওঠে, ‘‘কেমন এমন বলছেন?”

‘‘ভেবেছিলাম তুমি বলবে,

আরো একটু বসো তুমি, আরো একটু বলো।
পথিক, কেন অধীর হেন—নয়ন ছলোছলো।।
আমার কী যে শুনতে এলে তার কিছু কি আভাস পেলে—
নীরব কথা বুকে আমার করে টলোমলো।।”

সুর করে গান গাইতে শুরু করেন উনি। আমার হয়ে নিজের মুখে নিজের জন্য নিমন্ত্রণ যেচে নেন, বসে পড়েন। কাটিয়ে দেন আরও দু’ঘণ্টা। তারপর আবার হাত ঘড়ির দিকে তাকান। বলেন, ‘‘অনেক বেলা হল। উঠি এবার।” আমি অনুমতি দিই, ‘‘ঠিক আছে।”

আবার উঠে দাঁড়ান সঞ্জয়দা, ‘‘বলছ? হতাশ করলে আমায়। তুমি একদমই রোম্যান্টিক নও...” আবার হাল্কা হাসি আমার মুখে। সেই হাসিতে বোধ হয় একই প্রশ্ন ভেসে ওঠে, ‘‘কেমন এমন বলছেন?”

বলেন, ‘‘ভেবেছিলাম তুমি বলবে,

হায় অতিথি, এখনই কি হল তোমার যাবার বেলা।
দেখো আমার হৃদয়তলে সারা রাতের আসন মেলা।।
এসেছিলে দ্বিধাভরে, কিছু বুঝি চাবার তরে,
নীরব চোখে সন্ধ্যালোকে খেয়াল নিয়ে করলে খেলা।
জানালে না গানের ভাষায় এনেছিলে যে প্রত্যাশা।”

গাইতে গাইতে আবার বসে পড়েন সঞ্জয়দা। আবার বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। আবার উনি ঘড়িতে সময় পড়েন। মন যেতে চায়, আবার চায়ও না। দাঁড়িয়েও আশা করেন আমি তাঁকে আর একটুখানি সময়ের জন্য হলেও বসতে বলব। কিন্তু আমি বলি না। আমার শরীর থেকে প্রেমের সুবাস নিঃসৃত হয়ে পরিবেষ্টনকারী বাতাসকে আবিষ্ট করে না, কোন ইন্দ্রজালে আটকে ফেলতে চায় না অতিথিকে। অতিথি ঘরে এলেও তাঁর এবং আমার মধ্যে এক অনতিক্রম্য দূরত্ব বিরাজ করেই। সেই দূরত্ব আমাকে এতটাই শীতল রাখে যে আমি তাঁকে অনায়াসে সেই দূর থেকে আরও দূরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিতে পারি।

সঞ্জয়দা জিজ্ঞেস করেন, ‘‘ওই গানটা গাইতে পারো না?”

‘‘কোন গান?” আমি গায়িকা নই। বাবার গোঁড়ামিতে গায়িকা না হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। সঞ্জয়দা শিখেছেন গান। ওঁর গলায় প্রায় সারাক্ষণ আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনি। কখনো সখনো কদাচিৎকালে আধুনিক গান বেরিয়ে আসে।

উনি এবার গাইলেন, ‘‘ও একটু বসো চলে যেও না।

হ্যাঁ, একটু বসো চলে যেও না।
যেও না চলে চলে যেও না
চলে গেলে এক মধুরাত ফিরে পাবে না...”

গায়কের গলায় সুর কম, হতাশা বেশি। মনের খবর আমার কাছে নেই। কাল মধুর কিনা তাই-ই বা কে বলতে পারে! তবে সময় যে রাত তা প্রকৃতি ঘোষণা করে দিয়েছে অনেক আগেই। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেছে অনেকখানি। সঞ্জয়দার ভাই সারা পাড়া খুঁজে কোথাও না পেয়ে অনুমান লাগায় তাহলে উনি আমার কাছেই এসে থাকবেন। আমার কাছে এত সময় কাটানোর জন্য কোন অভিযোগ নেই ভাইয়ের মুখে। সে নিজে বিবাহিত। ভালবেসে বিয়ে করেছে। মা-বাবার চিন্তা বড় ছেলেকে নিয়ে। উনি বিয়ে করতে চান না। কোন মেয়েকে পছন্দ হয় না।

আমি বারকয়েক সঞ্জয়দার বাড়িতে গেছি। কেষ্টপুরেই। ভাড়াবাড়িতে থাকে পুরো পরিবার। বিশাল বড় বাড়ি, রাস্তার ধারেই। তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলেছি, দিদির সঙ্গে কথা বলেছি। মাসিমা, দিদি দু'জনকেই ভীষণ আন্তরিক মনে হয়েছে। তাঁদের সঙ্গেই আমি বরং বেশি সহজ। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমার নিজেকে আঁতেল মনে হওয়ার সমস্যা থাকে না। কিন্তু সেখানেও সঞ্জয়দা মাঝে মাঝে ঢুকে পড়েন, আমার স্বতঃস্ফূর্ততা কেড়ে নেন। আমার হয়ে নিজে উত্তর দেন। তাঁর অতিরিক্ত বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর আমাকে বোবা বানিয়ে দেয়। মাসিমা যদি জিজ্ঞেস করেন, ‘‘রূপু, তুমি কি নিজে রান্না করো?’’

সঞ্জয়দা বলেন, ‘‘হ্যাঁ।’’

‘‘কি রান্না করো তুমি?’’ প্রশ্ন আবার আমাকে।

‘‘মা, রূপু না ডিমের ঝোল আর আলু রান্না করে।’’ উত্তর আবার সঞ্জয়দার।

‘‘একই জিনিস রান্না করো রোজ?’’ প্রশ্ন আবার সেই আমাকেই।

‘‘না, মাঝে মাঝে যখন ডিমের ঝোল আর আলু খেয়ে খেয়ে সে বিরক্ত হয়ে যায় তখন আলু আর ডিমের ঝোল রান্না করে।’’ উত্তর আবার সেই সঞ্জয়দারই।

মাসিমা যদি জিজ্ঞেস করেন, ‘‘আইসক্রিম খাও?’’

আমার টনসিলের কথা মাথায় রেখে সঞ্জয়দা উত্তর দেন, ‘‘খায়, কিন্তু গরম করে খায়।’’

আমায় একা ঘরে ফিরতে দেন না দিদি। সঞ্জয়দাকে বলেন, ‘‘রূপুকে পৌঁছে দিয়ে আয়।’’

আমাদের মেলামেশার গভীরতা দেখে ছোটদা একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করে সঞ্জয়দাকে আমি বিয়ে করতে রাজি আছি কিনা। আমি সোজা না বলে দিই।

ছোটদা বলে, ‘‘আপত্তির কি আছে? ছেলেটি চমৎকার।

ছোটদার মুখে সঞ্জয়দার তারিফ শুনে এক মুহূর্তে অনেকগুলো ভাবনা আমার মাথায় খেলে যায়। নিঃসন্দেহে ছেলেটি ভালো। বড় ডিগ্রিধারী, বড় চাকুরিরত। কিন্তু আমি তাঁর উপযুক্ত নই। সঞ্জয়দাকে বিয়ে করলে নেলপেন্ট পরতে পারব না, লিপস্টিক পরতে পারব না, ভালো শাড়ি জামাকাপড় পরতে পারব না। নেলপেন্ট, লিপস্টিকের কথা নাহয় ছেড়ে দিলাম, সেসবের এমন কিছু সংগ্রহ আমার কাছে নেই কিন্তু আমার এত বছরের সুন্দর সুন্দর শাড়ি, চুড়িদার, স্কার্ট-ব্লাউজের কি হবে! সঞ্জয়দা যখন আমার ঘরে আসেন তখন আমি সাধারণত ঘরের জামাকাপড় পরে থাকি, যখন

সঞ্জয়দার বাড়ি যাই তখন পুরনো ম্যাড়মেড়ে চুড়িদার পরি। দু'য়েকদিনের মামলা, তাই সহ্য হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর বাড়িতে বসবাস করতে গেলে রঙচঙে শাড়ি পড়ার অনুমতি তো ছেড়েই দিলাম মিউজিয়ামের বিরল সংগ্রহ ভেবে যে সেগুলোকে রেখে দেব তাঁর জন্য আলমারি পর্যন্ত পাব না। দেখলেই নিশ্চয় উনি জিজ্ঞেস করে বসবেন, ‘‘এসব তোমার শাড়ি?’’ জানার কৌতূহল থাকবে অথচ এমন উদাসীনতা ছড়িয়ে দেবেন সেই প্রশ্নে যেন উত্তর পাওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই। তখন আমার নিজেকে বড় আঁতেল বলে মনে হবে। সঞ্জয়দার ঘরে পকাইদা, সুমিতদা, অমিতদা এবং ‘উৎস মানুষ’, ‘বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী’ এবং না জানি আর কোন কোন সংস্থার উচ্চমনোভাবাসম্পন্ন সব সদস্যদের যাতায়াত।

সহসা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, ‘‘না না, এ সম্ভব নয়।’’

ছোটদা তবু হাল ছাড়ে না। বলে, ‘‘এতটুকু ভালো লাগা থাকলে আমাকে বলতে পারিস। আমিই তোর হয়ে সঞ্জয়দাকে প্রস্তাব দেব।’’

‘‘আমি তাঁকে সেই চোখে কোনদিন দেখিনি। ছি ছি।’’

আমার ছি ছি শুনে সে চুপ হয়ে যায়। ছোটদার ঘটকালির ইচ্ছেতে জল ঢেলে দিলে সেজদা হাজির হয় আমার সামনে। তারও সেই একই ইচ্ছে। ঘটকালি। সে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে গিয়ে আমার বিয়ে দেবে।

ছেলে দেখা

সেজদা ব্যাঙ্গালোরে চলে যাওয়ার পর একদিন দুপুরে আমিও করমণ্ডল এক্সপ্রেসে চড়ে বসি। চেন্নাই পৌঁছই পরদিন সন্ধে সাড়ে পাঁচটায়। সে চেন্নাই আসে আমায় রিসিভ করতে। সেই রাতেই দশটার সময় আমরা ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ট্রেন ব্যাঙ্গালোর স্টেশনে গিয়ে থামে সকাল ছ'টায়। স্টেশন থেকে সেজদা আমার সুটকেস নিজে হাতে বহন করে একটা এয়ার ফোর্স কোয়ার্টারের সামনে পৌঁছয়। কলিং বেলের আওয়াজ শুনে একজন ভদ্রলোক দরজা খুলে দেন। ‘‘এসো, এসো,’’ উনি সাদর অভ্যর্থনা জানান আমাদের। ‘‘বসো। রাস্তায় কোন অসুবিধে হয়নি তো?’’

ভদ্রলোকের দেখিয়ে দেওয়া চেয়ারে বসার আগেই কিচেন থেকে বেরিয়ে আসেন একজন মহিলা। বলেন, ‘‘বাহ্, তোমার বোন তো দেখতে বেশ সুন্দর!’’

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন, ‘তুমি জার্নালিজম নিয়ে এম এ করেছ?’’

আমি হেসে মাথা নড়াই।

‘‘এখন এখানে এসেছ বিয়ের জন্য?’’

এবার আমি মাথা নড়াই না, শুধু হাসি।

ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয় সেজদা, ‘‘ইনি হলেন দাসদা। সার্জেন্ট। এ এম আই ই করছেন পাশ করলে এয়ার ফোর্স থেকে প্রিম্যাচিওর রিটায়ারমেন্ট নেবেন বলে, আর ইনি হলেন বউদি। নিজেদের লোক। এখানে তোর কোন অসুবিধে হবে না।’’

প্রাথমিক বাক্যালাপ সেরে দাসদা বেডরুমে যান। বউদি যান কিচেনে। স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা শুনে মনে হয় ওঁরা আমার ব্যাঙ্গালোরে আসা নিয়ে আগে থেকেই ওয়াকিবহাল, আমি যে ওঁদের বাড়িতে উঠব তা পূর্বনির্ধারিত। ওঁরা আমার অনেক কিছুই জানেন। আমি সেজদাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করি, ‘‘আমাকে কি এঁদের সঙ্গে থাকতে হবে?’’ নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখা মানুষ আমি। আত্মীয়স্বজনের মাঝখানে বাড়িতেও তাই রেখেছি, রুমমেটদের মাঝখানে হোস্টেলেও তাই, ভাড়াবাড়িতে তো বটেই। বন্ধুবান্ধব কম নেই, কিন্তু তারা আছে একটি নির্দিষ্ট পরিধির বাইরে। সেই পরিধি আমার আমিত্বের খুব কাছাকাছি হলেও আমিত্বের সঙ্গে মিশে যায়নি কখনও। দিনের অনির্দিষ্ট বেশ কিছু সময় একা আমাকে থাকতেই হবে। তখন কাছাকাছি কারও উপস্থিতি একদমই সহনযোগ্য নয়।

সেজদা বলে, ‘‘শুধু আজকের দিনটা। আমি একটা ঘর ভাড়াতে নিয়েছি। পরে ওখানে নিয়ে যাব।’’

বেশিক্ষণ বসল না সে। আমি একা বউদির সঙ্গে রয়ে গেলাম। দাসদা আমার সঙ্গে কথা বলা, আমাকে খাওয়ানো দাওয়ানো এবং সঙ্গ দেওয়ার পুরো দায়িত্ব স্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিয়ে পড়াশোনা নিয়ে মেতে যান।

দুপুরে বউদির মেয়ে স্কুল থেকে আসে। মেয়েটির নাম দোলা। ভারি মিষ্টি সে। ‘ইউ কে জি’তে পড়ে। মেয়ে এলে বউদি তাকে খাওয়াতে পড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

আমাকে অস্বস্তি নিয়ে সময় কাটাতে হয়। সেজদা অবিবাহিত হওয়ায় বিলেটে থাকে। শুনলাম সে একজন কপলের কোয়ার্টারে একটি বেডরুম মাসে আটশো টাকা ভাড়া দিয়ে আমার জন্য শেয়ারিং-এ নিয়েছে। সকালে আমাকে দাসদার কাছে জমা করার পর সারাদিন তার কোন দেখা নেই, যেন ভুলেই গিয়েছে আমি এখানে এসেছি।

ব্যাঙ্গালোরে আমার প্রথম সকাল, প্রথম দুপুর কেটে যায়। নামে সন্ধে। এয়ার ফোর্স ফ্যামিলি কোয়ার্টারের তিনতলার ব্যাল্কনিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ অনুভব করি। জীবনে এই প্রথম আমার পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আসা। কলকাতা ছাড়া ভারতের অন্য কোন বড় শহরে আসা। অবাঙালি সংস্কৃতির শহর ব্যাঙ্গালোর। শহরের বিন্দুমাত্র অংশ চিনে ওঠা হয়নি। রেল স্টেশন থেকে সোজা ডানে বাঁয়ে না তাকিয়ে মুরগেশপাল্যতে পৌঁছেছি। ঢুকে গেছি ডিফেন্স কোয়ার্টারে। তাতেই বুঝেছি ব্যাঙ্গালোর কলকাতার মতো মেট্রোপলিটন শহর নয়। এখানে লোকজনের ভিড় নেই, রাস্তাঘাটে মানুষের জটলা নেই, ছেলেমেয়েদের আড্ডা নেই, জনারণ্যে হারিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেমন করে তাহলে ব্যাঙ্গালোরে আমার থাকা সম্ভব! আমি বেশি লোকজন ভালবাসি না বটে, একা থাকতে পছন্দ করি বটে, তার মানে এই নয় যে শহর জনাকীর্ণ হবে না, অচেনা সবার মাঝখানে গা ঢাকা দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার সুযোগ পাব না। ঘরে একা থাকার অর্থ একা থাকা। অচেনা লোকের ভিড়ে ডুবে গিয়ে চেনা লোক থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াও একধরনের একা থাকাই হয় যাকে বলে জনারণ্যে নির্জনতা। কলকাতার এমন নির্জনতার মোহ আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। একদিনও হল না, ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল আমার মন।

বউদি পাশে এসে দাঁড়ান, ‘‘কি ভাবছ?’’

‘‘কই, কিছু না তো!’’

‘‘মন খারাপ করছে?’’

‘‘না তো!’’

‘‘সন্ধের অন্ধকারটা বড় খারাপ তাই না?’’

‘‘না না, তা নয়।’’

‘‘না, সন্ধের অন্ধকারটা খারাপ,’’ গলায় জোর টেনে বলেন বউদি। ‘‘সন্ধের অন্ধকারটা আমাকে রোজ আমার বুড়ি মায়ের কথা খুব খারাপভাবে মনে করিয়ে দেয়। অনেকদিন মাকে দেখিনি। খুব দেখতে ইচ্ছে করে। মেয়ের স্কুল আছে বলে যেতেও পারছি না। আমার মন কি বলে জানো?

‘‘কি?’’

‘‘এবার গিয়ে মাকে আর দেখতে পাব না।’’

‘‘মা কি অসুস্থ?’’

‘‘না, কিন্তু খুব দুর্বল—বয়সোচিত কারণে।’’

‘‘তা হোক। ঠিক দেখতে পাবেন।’’

‘‘তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।’’

কথা বলতে বলতে গাঢ় হয় সন্ধে। বউদি বলেন, ‘‘অন্ধকারেও তোমাকে খুব

ঝকঝকে লাগছে। তোমার গায়ের রঙ খুব সুন্দর। আমার রঙ দেখো। একেবারে মিশে গেছি প্রকৃতির সঙ্গে। মেয়েটিও আমার মতো কালো হয়েছে...সেটাই আমার দুঃখ।"

বউদি লম্বা চওড়ায় আমার প্রায় দু'গুণ, শ্যামবর্ণা। মেয়েও শ্যামলা। দুপুরেই উনি বেশ কয়েকবার গায়ের রঙ নিয়ে নিজের মনের কষ্ট ব্যক্ত করেছেন এবং আমি প্রত্যেকবারই বলেছি কালো ফর্সা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। বস্তুত আমার চোখে তাদের গায়ের রঙ এতটাও চাপা লাগছে না।

বউদি তবু চিন্তামুক্ত হতে পারেন না। বলেন, "আমার মেয়ের জন্য ভালো বর পাব না।"

মনে পড়ে দিদি কালো ছিল বলে বাড়িতে মা-বাবাকে দিদির বিয়ে নিয়ে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু সে তো বেশ কয়েক বছর আগের কথা। গ্রামের কথা। শহরের লোকেরা নিশ্চয় এসব মানসিক প্রতিবন্ধকতার ঊর্ধ্বে। তাছাড়া দাসদার মেয়ে বিবাহযোগ্যা হতে হতে আরও দেড় যুগ কেটে যাবে। মেয়ে চাকরি করবে। মানুষের চিন্তাভাবনার আরও পরিবর্তন ঘটবে।

বউদি জিজ্ঞেস করেন, "তুমি হিন্দি জানো?"

"না।"

"হিন্দিটা শিখে নাও। লোকের সঙ্গে নির্বিঘ্নে ভাব বিনিময় করতে পারবে। বিয়ের পরে এখানে এসে প্রথম প্রথম আমার খুব খারাপ লাগত। ভাষাটা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পেরে খারাপ লাগা অনেকটা কেটে গেছে।"

রাতে আরও কয়েকজন মহিলা পাশাপাশি কোয়ার্টার থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। ভালো লাগে তাদের ব্যবহার, তাদের একতা, তাদের আন্তরিকতা। সেজদা এল আরও পরে। দাসদার ঘরে ডিনার করিয়ে সে আমাকে নতুন ঠিকানায় নিয়ে যায়। ঘরে একটা চার বাই ছয় চারপায়াতে ফিতে বেঁধে তার উপর চাদর পেতে তৈরি করা হয়েছে বিছানা। একটা নুতন আলনা ঢুকেছে জামাকাপড়ের জন্য। গ্যাস স্টোভের পাশে মুদি, সবজির বাড়াবাড়ি রকমের সমাহার আমি রান্না করে খেতে পারব বলে। সব কিছুই ঠিকঠাক আছে তবে থাকার ব্যবস্থা শুধু একজনের। সেজদাকে জিজ্ঞেস করি সে কোথায় থাকবে। সে বলে, বিলেটে।

আমি চাই সে আমার সঙ্গে থাকুক। কিন্তু সে বলে অবিবাহিত ছেলেদের রাতে বিলেটের বাইরে থাকার অনুমতি দেওয়া হয় না। একা থাকতে হবে ভেবে, একার জন্য রান্না করতে হবে ভেবে মন খারাপ করে। সেজদা বলে, রোজ রাতে এসে সে আমার সঙ্গে খাবার খাবে। পরদিন সন্ধে থেকেই আমি রান্না করে তারই জন্য অপেক্ষা করি। কিন্তু সে এসে আমার তাড়া দেয় "তৈরি হয়ে নে।"

"কেন? কোথায় যাব?"

"কামাত হোটেলে।"

"কি খাব?"

"গেলেই বুঝতে পারবি। তবে যা খাবি তা জীবনে ভুলতে পারবি না।" ব্যাঙ্গালোরে

তখন কামাত হোটেল খুব চলছে। আমরা মালাই কোফতা, পনীর কোফতা এবং নান অর্ডার করি। প্রথমবারের চেষ্টাতেই কামাত হোটেলের মালাই কোফতা আমার প্রিয় ডিশ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে আমার নাকে লাগাম বেঁধে দেয়। রাতে রান্নার পালা মোটামুটি চুকিয়ে দিয়ে আমি প্রতি রাতে কামাত হোটেলে চরকিপাক খেতে থাকি।

বাড়িওয়ালির সঙ্গে দু'সপ্তাহ কেটে গেল। সে একজন অনতিদীর্ঘ স্থূলাঙ্গী মহিলা, গায়ের চামড়া খসখসে, দেখতে না ভালো না খারাপ, একটি তিন বছরের ছেলের মা। ছেলেটির সঙ্গে আমি ভাব জমানোর চেষ্টা করেছিলাম। নাম জিজ্ঞেস করেছিলোম তার। সে বলেছে, ''বুদা।''

''মায়ের নাম কি?''

''বুদা।''

''বাবার নাম?''

''বুদা।''

''কবিতা আবৃতি করতে পারো?''

তারও একই উত্তর পেয়েছি, ''বুদা।''

ছেলেটি জালানায় দাঁড়িয়ে বাইরের লোকজন দেখে এবং তাদের 'বুদা' বলে সম্বোধন করে। বুদা ছাড়া সে অন্য কিছু বলে না। আমি দাস বউদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''অধিকারীর ছেলেটি শুধু বুদা বলে কেন?''

''অধিকারী?''

''অধিকারীই তো।''

''কোন অধিকারী?''

''আমি যাদের বাড়িতে আছি।''

''ও, হিড়িম্বার কথা বলছ?'' দাস বউদি বলেন, ''ওই মহিলাটিকে তো আমরা হিড়িম্বা বলে ডাকি।''

আমার সীমিত জ্ঞান বলে হিড়িম্বা হল হিড়িম্ব ভগ্নী এবং ভীমপুত্র ঘটোৎকচের মাতা। মহিলার এমন নামকরণের কারণ জানার কৌতূহল আমার। কিন্তু বউদি আমার কৌতূহল নেভান না। বরং আরও বাড়িয়ে দেন, ''কয়েকদিন থাকো তার ঘরে, বুঝতে পারবে।''

দু'সপ্তাহ আমি কপল অধিকারী এবং তার স্ত্রী হিড়িম্বাকে এক গতানুগতিক ছকে ফেলা দিন অতিবাহিত করতে দেখেছি। কপল অধিকারী সকাল ছ'টায় ডিউটি যান, দুপুর দুটোর দিকে ফেরেন, ছেলেকে আদর করে স্নান সেরে দুপুরের আহার সমাপ্ত করেন। তারপর স্ত্রীয়ের সঙ্গে ঘণ্টা তিনেকের সহবাস সেরে বিকেলে সপরিবারে ঘুরতে বেরোন। রাতে ফিরে একটু টিভি দেখা, খাবার খাওয়া, ঘুমোতে যাওয়া। কখনো সন্ধের অবকাশে দু'য়েকটি পরিবার আসে অধিকারীর বাড়িতে। বিকেলে পিটি থাকলে কপল অধিকারীর দুপুরে স্ত্রীয়ের সঙ্গে সহবাস সংক্ষিপ্ত হয়। মাত্র ঘণ্টাখানেকের বিশ্রামের পরেই বেরিয়ে যান। ফেরেন সন্ধের আগে। দু'সপ্তাহের মধ্যে আমি অনেকবার

দাসদার বাড়ি গেছি। গিয়ে বুঝেছি র‍্যাঙ্ক নির্বিশেষে সকল এয়ারম্যানদের জীবনধারা মোটামুটি একইরকম। হেরফের বলতে শুধু কিছু এয়ারম্যানের স্ত্রী দুপুরে ঘুমোয় না, কোয়ার্টারের বাইরে চারপায়া খাটিয়ে উলকাঁটাতে সোয়েটার বোনে, না হলে অন্যের কোয়ার্টারে ঢুকে নিছক গল্পগুজব করে। আমি দাস বউদির বাড়িতে গিয়ে অন্যান্য মহিলার সঙ্গে তাঁর এমন গল্পের স্বাদ নিয়েছি।

দু'সপ্তাহের মধ্যে দাস বউদিও আমার ঘরে কয়েকবার এসেছেন, নিজে হাতে রান্না করা সবজি দিয়ে গেছেন ভালবেসে। দু'সপ্তাহের মধ্যে আমার একটি বান্ধবীও হয়েছে। আমারই বয়সি। নাম রুমা। এয়ারম্যানের সঙ্গে নুতন বিয়ে হয়েছে। সেই দু'সপ্তাহের মধ্যে সেজদার অনুপ্রেরণা পেয়ে রুমার সঙ্গে বেরিয়ে আমি ব্যাঙ্গালোর শহরটাকে কিছুটা চিনেও নিয়েছি।

দু'সপ্তাহ পরে সেজদা আমার বিয়ের প্রথম প্রস্তাব পায়। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে বিজ্ঞাপন দিয়ে। বিজ্ঞাপন দেখে ছেলে নিজেই একটা পোস্টকার্ড ড্রপ করেছে। নাম বিজয় সরকার, ন্যাশনাল এয়ারোনটিক্যাল লেবরেট্রির সায়েন্টিস্ট। খড়গপুর আই আই টি থেকে বি টেক করা। মাইনে ছ'হাজার। ছেলের পৈত্রিক বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের হাবড়াতে। ব্যাঙ্গালোরে একা কোয়ার্টারে থাকে। আমার ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার দু'সপ্তাহ পরে সেজদা একদিন একটা পোস্টকার্ড হাতে বহন করে আমার কাছে নিয়ে আসে। বলে, ''মোট সতেরোটি চিঠি পেয়েছি। এটাই প্রথম। এটাই সবথেকে ভালো প্রপোজাল। কিন্তু...,'' দ্বিধাভরা বিরতি।

''কিন্তু কি?''

''কিন্তু একটাই সমস্যা আছে।''

আমি হা হয়ে সেজদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

''ছেলেটির হাইট কম। পাঁচ দুই। আমার চেয়েও এক ইঞ্চি বেঁটে।'' সেজদা বলে, ''আমি ছেলেটির সঙ্গে দেখা করেছি। আমার হাইটের সঙ্গে ওর হাইট মেপে দেখেছি।''

ছেলেটির হাইট আমাকেও চিন্তায় ফেলে। আমাদের বাড়িতে বেঁটে সদস্যের সংখ্যা বেশি। বাবা বেঁটে, মা বেঁটে, দিদি বেঁটে, দাদা বেঁটে, সেজদা এবং ছোটদাও বেঁটে। আমি তো বেঁটেই। আমার উচ্চতা টেনেটুনে পাঁচ ফুট হবে। হয়ত বা হবেও না। কিন্তু লোকচোখে পাঁচের নিচে নেমে যেতে ইচ্ছে করে না বলে বলি পাঁচ। আমাদের বাড়িতে সবথেকে লম্বা সদস্য হল মেজদা। উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। মেজদাকে আমরা লম্বা বলে মানি এবং তার জন্য গর্ব অনুভব করি অর্থাৎ ছেলের উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচ হলেই আমাদের পরিবারে তাকে লম্বা বলে গণ্য করা হবে। আমাদের পরিবারে লম্বা বেঁটের মাপকাঠি আলাদা। এই পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির ছেলেটিকে বিয়ে করলে বছর কয়েকের মধ্যে আমার ঘরে যে নতুন আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটবে সে ছেলে হলে তো কিছুতেই পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতার যোগ্যতা নিয়ে লম্বার দলে নিজের নাম নথিভুক্ত করতে পারবে না।

সেজদা তবু মনস্থির করে ফেলে, ''ছেলেটি আই আই টি থেকে পাশ করেও সায়েন্টিস্ট হয়েও মোটেও অহংকারী নয়। একটা খোলা পোস্টকার্ডে মাত্র কয়েক

লাইন লিখে ছেড়ে দিয়েছে। এমন ছেলে আর পাওয়া যাবে না। অন্তত একবার দেখা করে নে। না তো যে কোন সময়ই বলা যাবে।” এক সন্ধ্যায় আমরা ছেলেটির কোয়ার্টারে যেচে জলখাবারের নিমন্ত্রণ নিলাম। জানানো হল আমাদের সঙ্গে দাসদা এবং তাঁর পরিবারও থাকবেন। ছেলের কোয়ার্টারে সভাসদ হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তাঁর এক বন্ধু। দেখে এলাম লিফট ছাড়া চারতলায় তার এক বেডরুম হল কিচেন। কথা বলে এলাম তাদের সঙ্গে। আমি বলিনি কথা। আমার হয়ে বাকি সবাই বলেছে। মন্দ নয় ছেলে। কম কথা বলে, ভদ্র, গোছানো এবং যত্নশীল। পরের দুটো বিশেষণ দাস বউদির দেওয়া। উনি আমার ব্যাঙ্গালোরের অভিভাবক হয়ে পাত্রের বাড়ি গেছেন—পাত্রের হাবভাব, কথাবার্তা, চালচলন, ঘরবাড়ি ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ফিরে এসে বলেছেন, ‘‘আমার কিন্তু খুব পছন্দ হয়েছে। তুমি যেমন সুন্দর, তোমার উপযুক্ত পাত্র হল বিজয় সরকার।”

দাস বউদির পছন্দে কোন খাদ মিশে থাকলে তা বের করে নিয়ে আসার লক্ষ্য রেখে বলি, ‘‘আপনার চেয়ে তো বেঁটে সে।”

‘‘তাতে কি হয়েছে! দেখেছ কেমন গোছানো ছেলে? ঘরে সোফা, খাট, ডাবল সিলিন্ডারের গ্যাস ক্যানেকশন কি নেই!”

‘‘দেখা যাবে তার ছেলেমেয়েকে লাফ দিয়ে দিয়ে সেই সোফায়, খাটে চড়তে হচ্ছে।”

‘‘তা কেন হবে? মা-বাবা বেঁটে হলেই যে তাদের ছেলেমেয়েকেও বেঁটে হতেই হবে এমন কথা তো কোথাও লেখা নেই!”

লেখা আছে। নিশ্চয় লেখা আছে। বায়োলজিতে। শুধু লেখাই নেই। মেন্ডেলের একক সংকর জননের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে সেখানে। সেই ব্যাখ্যায় আমরা দেখেছি F_2 জনুর সকল খর্ব গাছ স্বনিষেকের ফলে F_3 জনুতে কেবলমাত্র খর্ব গাছই উৎপন্ন করে। এরা খর্বতা গুণের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ। এটা প্রাণীর ক্ষেত্রেও সত্যি। মানুষের স্বনিষেক হয় না। পরনিষেক হয়। দুটো বিশুদ্ধ খর্ব মানুষের মধ্যে নিষেক ঘটলে তাদের বংশধরাও খর্ব হতে বাধ্য।

বউদি বলেন, ‘‘বিজয় সরকার কিন্তু তোমাকে খুব পছন্দ করে। সে মাঝে মাঝে তোমাকে আড়চোখে দেখছিল। তুমি অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলে বলে বুঝতে পারনি। আমি লক্ষ্য করেছি।”

উনি জিজ্ঞেস করেন, ‘‘তুমি এত কম কথা বলো কেন?”

কি উত্তর দেব ভেবে পাই না। বেশি কথা বলতে ভালো লাগে না। তাই কম কথা বলি। এটা আবার বলে বোঝানোর কি আছে!

‘‘অবশ্য তুমি কম কথা বলো বলেই লোককে বেশি আকৃষ্ট করো। লোকের মধ্যে তোমাকে নিয়ে জানার কৌতূহল জাগে।”

আমি মুখ বন্ধ রেখে বউদির কথা শুনি। সেজদাও শোনে। দাসদাও। দাসদাও ছেলেটিকে পছন্দ বলে তাঁর মতামত জাহির করেন। বউদি যোগ করতে থাকেন আরও কথা, ‘‘তুমি যখন কাশছিলে ছেলেটি খুব উতলা হয়ে পড়েছিল। উঠে গিয়ে

ব্যাল্কনির পর্দাটা কেমন টেনে দিল দেখলে? কত দায়িত্বশীল। তোমাকে খুব সুখে রাখবে দেখো।”

সবার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েও দোলাচলে ভুগতে থাকি।

কয়েকদিন পরের কথা। সেজদা এসে বলল, “বিজয় সরকারকে একদিন ডিনারে ডাকলে কেমন হয়?”

সেই বিকেলে সেজদা অনেক মুদি, অনেক সবজি বাজার করল। সবজি কাটতে, ধুতে, মশলা বাটতে অনেক সাহায্য করল আমায়। রান্নার মান নিয়ে আমি খুব খুশি ছিলাম না। আমার মনে হল পালং শাক ভালো ধোয়া হয়নি, বালু বালু লাগছে শাক। ছেলেটির ভালো লাগল। মনে হল ঝিঙে আলুর পোস্ত গোটা গোটাই রইল কিন্তু ছেলেটির ভালো লাগল। মাছের ঝোল মায়ের মতো সুস্বাদু হল না তবু ছেলেটির ভালোই লাগল। মাছের মাথা দিয়ে মুগডালেরও তথৈবচ অবস্থা, সেটাও ছেলেটির খারাপ লাগল না। আমার রান্না খেয়ে মুগ্ধ হল সে। বলল মা দিদিমার রান্নার মতো পরিণত হাতের রান্না নাকি আমার।

সেই রাতের পর বেশ কিছুদিন বিজয় সরকারকে নিয়ে আমি আর মুখ খুলতে চাইনি। বউদি যদি জিজ্ঞেস করেন, “কি ভাবলে?” আমি বলি, “ভাবিনি এখনও।” সেজদা জিজ্ঞেস করে, “কি রে একেবারে চুপ হয়ে গেলি যে?” আমি বলি, “সময় দরকার।”

“তুই কি অন্য কোন ছেলে দেখতে চাইছিস?”

“সুযোগ পেলে আপত্তি নেই।” সেজদা বিলেট থেকে সতেরোখানা চিঠির বান্ডিল নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দেয়। সেখান থেকে দুটো চিঠি বের করি। একটি ছেলে তামিল। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্গালোরেই বাড়ি। অন্যটি ডাক্তার, থাকে পণ্ডিচেরিতে। ঠিক হল ছেলেদুটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

হিড়িম্বার খাঁচা

ব্যাঙ্গালোরে আমার প্রথম মাসের অর্ধেকটা হিড়িম্বার সঙ্গে কোনোরকমে কেটেছে। আড়ি, কাটাকাটির সম্পর্ককে বাঁচিয়ে। হিড়িম্বা মাঝে মাঝে তার তিন বছরের ছেলে নিয়ে আমার ঘরে আসে। ছেলের মুখ যত কম চলে হাত তত বেশি। যেন সব্যসাচী। মা যখন আমার সঙ্গে কথা বলে সে কোল থেকে জোর করে নেমে যায়। নেমে আমার ঘরে দৌরাত্ম্য করে। একদিন দেখি সে টেবিলের উপর থেকে আয়নাটা নামালো। বুদা বুদা করে মুখ দেখতে গিয়ে ভাঙল আয়না। আরেকদিন গ্যাস স্টোভ থেকে সিলিন্ডারের পাইপটাই খুলে দিল—গায়ে এত জোর। আরেকদিন আলনা থেকে আমার একটা থান শাড়ি টেনে নিচে ফেলল। আমি ওটা ওঠানোর আগেই সদ্য মোছা মেঝেতে ঘষাঘষি করে নোংরা করে দিল। শাড়ি নোংরা করার দিন আমি মনে মনে ক্ষুণ্ণই হয়েছিলাম কিন্তু ওপরে তা বুঝতে দিইনি। একদিন হিড়িম্বা আমাকে একটা বাটিতে তার রান্না মাংস দিয়ে গিয়েছিল। মহানন্দে খেতে গিয়ে দেখি ভেতরে কাঁচা। রক্ত দেখা যায়। ফেলে দিতে হল সেই মাংস। হিড়িম্বা জানতে চাইল, কেমন লাগল। কাঁচা রক্তের ঘেন্না ভেতরে পুষে রেখে বললাম, দারুণ। যা হোক করে জোড়াতালি দিয়ে চলছিলাম। তবু সে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করল। কথা বন্ধ করার কারণ আমি পরে জেনেছিলাম—বিজয় সরকার। হিড়িম্বার স্বামী অর্থাৎ কপল অধিকারী সেজদার কাছে খেদ প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক খেদ প্রকাশ বলব না, অভিযোগ করেছিলেন—বিজয় সরকারকে ডিনারে ডাকার জন্য অধিকারীর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি। আমি এমন অভিযোগের মাথামুণ্ডু খুঁজে পাই না। তাঁর কোয়ার্টারের একটি ঘর আমরা ভাড়াতে নিয়েছি। যতদিন ঘরের ভাড়া দেব ততদিন নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে পারব ঘর। নিজেদের মতো করে ব্যবহারের মধ্যে তাতে দিনের বেলায় যখন খুশি রান্না করা, দিনে রাতে যখন খুশি ঘুমনো, গেস্টকে আসতে বলা, একসঙ্গে লাঞ্চ, ডিনার করা এ সবই তো পড়ে! এসব আমাদের ন্যূনতম অধিকার। ঘরে হৈ হট্টগোল না করলেই হল, মারামারি না করলেই হল, উঁচু ভলিউমে জ্যাজ না চালালেই হল, ডিস্কো নাচ না নাচলেই হল যাতে অধিকারীর অসুবিধে হয় এবং ঘরের দেওয়াল, দরজা, জানালা ভাঙচোর না করলেই হল যার জন্য অধিকারীকে ক্ষতিপূরণ ভরতে হয়। আমাকে আমার ন্যূনতম অধিকার চর্চা করতে না দেওয়ার অর্থ হল অনধিকারচর্চা করা। আমার ভাগ্যই খারাপ। যতই লোককে বিরক্ত না করে নীরবে, নির্ঝঞ্ঝাটে থাকব ভাবি ততই লোকজন আমার সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়াই-এ নেমে পড়ে। আমার ওপর অনধিকারচর্চা করে।

হিড়িম্বার ব্যবহার দিনে দিনে ঝড়ের গতিতে উগ্র হতে থাকে। সে আমার স্নানের জন্য, জামাকাপড় কাচার জন্য বাথরুম ছাড়ে না, দুপুর দুটোতে ওর বর ডিউটি থেকে ফিরে স্নান সারা পর্যন্ত ধরে রাখে বাথরুম-পায়খানা। সকাল থেকে একবারও প্রস্রাব করতে না পেরে আমার তলপেট টনটন করে। আমি কোয়ার্টারের বাইরে বেরোলেই দেখি সে বেগে, সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয়, বলতে চাওয়া যে আর

ফিরে এসো না, তোমার জন্য এই দরজা আর কখনো খুলবে না। ভেতরে থাকলে ছেলেকে অকারণ মারধর করে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে দেয় যেন ছেলে আমার দিকে তাকালেই খারাপ হয়ে যাবে। আমাকে শুনিয়ে ছেলেকে নানা কটূক্তি করে। আমাকে শুনিয়ে নয়তো কি! একমাত্র বুদা ছাড়া আর কোন শব্দ তার মাথায় ঢোকে বলে মনে তো হয় না। আমিই শুনি হিড়িম্বার কথা। কথার গূঢ় অর্থের কিছু বোধগম্য হয়, কিছু অবোধ্য থাকে। যতটুকু বুঝি তার মধ্যে আমাদের একদিনের মধ্যেই ঘর ছেড়ে দিতে বলার ইঙ্গিত পাই। বাড়িতে কোন অতিথি এলে তাদেরকেও হিড়িম্বা আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলে, ''আমার তো বাবা আঠারো বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, উনিশ বছরে বিট্টু হয়েছে। এই ভালো, তাড়াতাড়ি ছেলে মানুষ করে ফেলতে পারব।'' যেন বিশ্বসুন্দরী, মা-বাপ মেয়ের রূপ যৌবন বাড়িতে সামলে রাখতে পারছিলেন না। কপল অধিকারীরও হামবড়া ভাব, চোখে মুখে বিশ্বসুন্দরীকে লুফে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় জিতে যাওয়ার অহংকার। তবে উনি যা করেন বোবা হয়ে করেন।

সেজদাকে হিড়িম্বার ব্যাপারে বললে সে গা করে না। এয়ার ফোর্স স্টেশনে সবাই আমাদের ভাড়া দেবে বলে ঘর খালি করে বসে নেই। তার ডিউটি আছে। ডিউটির পরে প্রতিদিন আমাকে সময় দিতে হচ্ছে, চেনাতে হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর শহর। বাজারহাট করতে হচ্ছে, জামাকাপড় কিনতে যেতে হচ্ছে, শরীর একটু খারাপ করলেই ছুটতে হচ্ছে ডাক্তারের কাছে, ডিনারের জন্য প্রায়ই বাইরে নিয়ে যেতে হচ্ছে, আমার বিয়ের জন্য পাত্রপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। নতুন ঘর খোঁজার অতিরিক্ত সময় কোথায়! তাছাড়া আমার বয়কট নীতি এখানে একদমই কাজ করবে না। ব্যাঙ্গালোর আমার কাছে এক সম্পূর্ণ নতুন শহর। কলকাতার চেয়ে অনেক কম জনসংখ্যা ব্যাঙ্গালোরের। বাঙালির সংখ্যা সীমিত। সেই সীমিত বাঙালির একটি নির্দিষ্ট অনুপাত ভাসমান। তারা এয়ার ফোর্সে বা অন্য কোন সংস্থায় বদলির চাকরি করে। কাজেই কলকাতার মতো রাস্তায় বেরোলে বাঙালির ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে 'এই যে দাদা দেখেশুনে চলতে পারেন না?' এমন রাগালাপের মাধ্যমে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হবে, ধীরে ধীরে বাড়বে বন্ধুত্ব, বাড়িতে অথবা হোটেলে অথবা মেসে আমাদের যাতায়াত শুরু হবে, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কোন চায়ের স্টলের সামনে রাখা বেঞ্চে বসব দু'জনে, দোকানদারকে বলব দাদা এক কাপ চা দিন তো, দোকানদার অর্ধেক ভরা চায়ের গ্লাস হাতে ধরিয়ে দিতেই আরেকটা খালি গ্লাসের অর্ডার হবে, তাতে ভাগে হবে যাবে সেই অর্ধেক গ্লাস কেনা চা যার দাম দেওয়া তখনও বাকি, দু'মিনিট অন্তর অন্তর দু'বুঁদ চায়ের সিপ টেনে ভালবাসায় সম্পৃক্ত হয়ে কেটে যাবে দু'ঘণ্টা—এমন ভাবেই চলবে দিনের পর দিন অথবা যতদিন মন চায় ততদিন—এটা হতে পারে না। ঝঞ্ঝাট সৃষ্টিকারী বাঙালিকে এড়িয়ে গিয়ে অন্য বাঙালি গোষ্ঠী পাওয়া যাবে না ব্যাঙ্গালোরে। মনকে দূরে রাখা যাবে না ঝগড়া বিড়ম্বনার অশান্তি থেকে। 'দাস বউদি'কে যদিও অনেকটা কাছের লাগে, তথাপি আমাকে নিয়ে হিড়িম্বা দ্বারা বাজে প্রচার হলে শেষ পর্যন্ত কোনদিকের জল কোনদিকে গড়াবে, 'দাস বউদি'র ঘর থেকেই যে আমার কুটুম্বিতা উঠে যাবে তা-ই বা কে জানে! এত বছর হোস্টেলে থেকে

হোস্টেলের মেয়েদের পলিটিক্স বুঝে উঠতে পারলাম না। আর এ তো কলোনির লোকের চলনধারা। এখানকার মেয়েরা শুধুমাত্র মেয়েই নয়—তারা কারও বউ এবং কারও মা। এই মেয়েবউগুলোর নিজের স্বার্থের সঙ্গে জুড়ে আছে তাদের স্বামীর স্বার্থ, সন্তানের স্বার্থ। এখানে হোস্টেল সুপারের মতো কোন একজন ব্যক্তি মাথার উপর বসে নেই যে চাইলে তার কাছে নালিশ করে বোঝাপড়ার চাবিকাঠি হাসিল করা যেতে পারে। এখানে সেই পরম ক্ষমতার অধিকারী কারা আমার জানা নেই। অভিযোগ করার অধিকারই বা আমার কোথায়! আমি তো এসেছি এক অবিবাহিত এয়ারম্যানের বোন হয়ে। যাই হোক, হিড়িম্বার সঙ্গে আমার বিবাদ আমাকে এই বিশ্বাস দিয়েছে যে অনেক মানুষের সঙ্গে বোঝাপড়া নিয়ে থাকার গুণাবলী আমার মধ্যে অবর্তমান। আমি কেবলমাত্র এককভাবে, অথবা সর্বাধিকভাবে একক পরিবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে দিন পার করে দিতে পারি। আমার অন্তরিন্দ্রিয়ের কোন মেকি বহিরাবরণ নেই। তাই যে কেউ বাইরে থেকেই মনের প্রতিটি অক্ষরের বিন্যাস পড়ে ফেলতে পারে। বিন্যাস পছন্দ না হলে বাইরে ভেতরে একইরকম স্বচ্ছ এবং পাঠপোযুক্ত আমার বিরুদ্ধে শুরু করে দিতে পারে অভিযান।

'দাস বউদি'কে বলেছিলাম হিড়িম্বার মুখ বেঁকে যাওয়ার কথা। শুনে উনি হেসেছেন, "দেখলে তো? বলেছিলাম না কয়েকদিন গেলেই বুঝতে পারবে?" আর কিছু বলেননি। পরে আরেকদিন বাঁকা মুখের কেমন প্রগতি হয়েছে বলতে চাইলে শুধু মুচকি হেসে ছেড়ে দিয়েছেন। তৃতীয়দিন আর হিড়িম্বাকে নিয়ে মুখ খুলতে সাহস পাইনি পাছে বউদির মুখে থেকে সেই হাসিটুকুও গায়েব হয়ে যায় এই ভয়ে। তারাই ভালো যারা অন্তরে বাহিরে আলাদা, বলে মিষ্টি চলে কটু, যারা সামনে আদর করে পেছনে ছুরি মারে। সেজদা অবিবাহিত সাধু পুরুষ। সে আমাকে বোঝায়, "এমনিতেই ক'দিনই বা আর এখানে থাকার প্রয়োজন হবে...!" আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি হিড়িম্বা আমার সৎ মা, আমার বিয়ে হচ্ছে, আমি যাচ্ছি শ্বশুরবাড়ি, যাওয়ার পথে সৎ মায়ের ঋণ শোধ করতে বাঁ হাত দিয়ে পেছনে চাল ফেলছি না। ঋণ তো আমাকে শোধ করতেই হবে—পা দিয়ে। পা-টা পেছনে ছুঁড়েই আবার সামনে বাড়িয়ে দিচ্ছি। সেই পা আর কোনদিন এমুখো হবে না। এদিকে হবু বর হিসেবে আমার কাউকে পছন্দও হচ্ছে না। তামিল ছেলেটিকে তার বাড়িতে গিয়ে দেখে এসেছি। ছেলেটি ভালো, তবে কালো। ওর বাড়ির সবাই কালো—মা-বাবা, দিদি-জামাইবাবু এমনকি দিদি-জামাইবাবুর ছোট বাচ্চা মেয়েটি পর্যন্ত। এখানে মেন্ডেলের সূত্র মেনে দুটি বিশুদ্ধ খর্ব মানুষের মধ্যে নিষেকের ফলে খর্ব সন্তানের জন্মের মতো দুটি বিশুদ্ধ কালো মানুষের নিষেক থেকে কালো সন্তানের জন্মের ভয় কম। আমি যথেষ্ট ফর্সা। ফর্সা বলেই ওদের আমাকে খুব পছন্দ কিন্তু ভাষা আলাদা হওয়ায় এবং রীতি-রেওয়াজের পার্থক্যহেতু খাপ খাওয়াতে পারার সমস্যা থাকবে ভেবে আমিই পিছিয়ে যাই। আমি ওদের কথাই বুঝব না। রীতি-রেওয়াজ বোঝার প্রশ্ন পরে। ভাষার পার্থক্যকে ছেলে অবশ্য একদমই গুরুত্ব দিতে চায় না। ছেলের বক্তব্য শরীরের ভাষার চেয়ে বড় কোন ভাষা নেই। আদিম মানুষ যখন মুখের ভাষা জানত না, 'আমি তোমাকে ভালবাসি' শব্দোচ্চারণের

মাধ্যমে একে অন্যের প্রতি প্রেম জাহির করতে পারত না তখন শুধুমাত্র অঙ্গভঙ্গীই এমন কাজ সম্পন্ন করেছে। আজ আমরা সভ্য। ভাষার ব্যাকরণ হৃদয়াঙ্গমের মাধ্যমে অলংকরময় করে তুলেছি আমাদের ভাব প্রকাশের কৌশলকে। কিন্তু এই ছন্দময়, অলংকারময় ভাবপ্রকাশ শুধুমাত্র মানুষেরই উপার্জিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অন্য কোন প্রাণীর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নেই। থাকবেও না কোনদিন। তারা এই ছন্দ, অলংকার বোঝে না। বুঝবেও না কোনদিন। কোটি কোটি বছর ধরে তারা আদিম পদ্ধতিতেই তাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে আসছে। এই কৌশলে কোনই পরিবর্তন নেই যেমন পরিবর্তন নেই জীবান্ত জীবাশ্মের শারীরিক কাঠামোতে।

ছেলের দিদি বলেন আমার মনের কথা বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব তাঁদের, এ নিয়ে আমাকে উতলা হতে হবে না। তবু এত বড় দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে বিয়েতে হ্যাঁ করতে পারিনি। সেজদাকে বলেছি, ‘পণ্ডিচেরির ছেলেটিকে একবার দেখলে কেমন হয়?”

পণ্ডিচেরির ছেলের হয়ে চিঠিটি লিখেছিলেন আসলে ছেলের মা। সাগ্রহে না অনাগ্রহে জানি না। সেজদা তাঁর চিঠির উত্তর দেয় এবং প্রত্যুত্তর পায়। ছেলের মাকে মেয়ে দেখতে আসতে বলা হয়েছিল কিন্তু উনি আমাদের ছেলে দেখার আমন্ত্রণ জানান। অগত্যা এক রাতে সেজদা এবং আমি বাসে রওনা হই পণ্ডিচেরির উদ্দেশ্যে। দিদির সময় দেখেছি ছেলেপক্ষ একের পর এক বাড়ি এসে মেয়ে দেখে যায় এবং প্রত্যাখ্যান করে। আমার সময় উল্টো। আমি নিজে যাচ্ছি ছেলের বাড়ি এবং পিছিয়ে আসছি, না হলে একটু ভাবার সময় চাই বলে ঝুলিয়ে রাখছি। আমি ছেলে বেঁটে, ছেলে মোটা, ছেলে টেকো, ছেলে কালো বলে তাদের খবর পাঠাই না। এমন রুক্ষ আমি নই। ওটাকে অভদ্রতা মনে হয়। আমার খেলা হল ভদ্র খেলা। আমি নিজেরই কোন না কোন দুর্বলতা তুলে ধরছি ওদের সামনে, অর্থাৎ বুঝিয়ে দিচ্ছি যে আমিই উপযুক্ত নই। বিয়ে আমি করব, ছেলের সঙ্গে ঘর বাঁধব আজীবন সংসার করার ইচ্ছে নিয়ে। মানুষটা খুব পছন্দের না হলে তার সঙ্গে জীবনের এতটা লম্বা সময় টানা যায় না। যা হোক, দুটো ভদ্র খেলা খেলে নিজের রূপ গুণের ওপর আমার আস্থা খুব বেড়ে যায়। সেই অগাধ আস্থা নিয়ে সকালবেলা সেজদার সঙ্গে পণ্ডিচেরি পৌঁছে এক হোটেলে উঠি। তারপর সুতো দিয়ে হাঁস-লতা-পাতার কাজ করা আকাশি রঙের জর্জেটের শাড়ি পরে ছেলের বাড়ি যাই এবং সেখানে যথেষ্ট অভদ্র আচরণ সহ্য করি।

পণ্ডিচেরির ছেলেটি নাকি ডাক্তার। তারা নাকি দুই ভাই, সে নাকি বড়। ছেলের উচ্চতা মাঝারি, গায়ের রঙ শ্যামলা এবং মাথায় টাক। ছোট ভাইকে দেখিনি। বাড়িতে ছেলের সঙ্গে তার মা-বাবা বর্তমান ছিলেন। পুরনো চাকচিক্যহীন বাড়ি। বাড়ির সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে তাঁদের মুখদর্শন করেছি। মা-বাবাও কৃষ্ণবর্ণ। বাঙালি হলেও দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘদিনের বসবাসের ফলে গায়ের রঙ চেপে গেছে এবং লালিত্য কমে গেছে ত্বকের। শুধু ত্বকেরই নয়, তাঁদের মনেরও লালিত্য কম। সেজদা অবশ্য তা মানেনি। সে কারও মধ্যেই খারাপ কিছু দেখে না। মুখে কারোর বিরুদ্ধেই কোন

অভিযোগ নেই, কারোর কোন নিন্দে নেই। অভিযোজনের ট্যাবলেট খেয়ে ব্যক্তিত্বকে তরল করে রেখে দিয়েছে সে। যেই পাত্রেই ঢালো—এঁটে যাবে সেখানে, আজীবন রাখো—(পচে) থেকে যাবে সেখানে। অবশ্য আমার ব্যাপারে ব্যতিক্রমী মনোভাব তার। আমি পাত্রে সে আঁটে না। ছলকে বেরিয়ে যায়। আমি দেখছি পণ্ডিচেরির মা-বাবা-ছেলে অন্তরে বাহিরে বেশ জটিল। বিশেষত মা এবং ছেলে। গুণী গুণী ভাব, গুণের অভাব। ধনী ধনী ভাব, ধনের অভাব।

চার-পাঁচটি চেয়ার এবং একটি টি টেবিল ছাড়া কেবলমাত্র একটি টিভি বসার ঘরের শোভা বর্ধন করেছে। চেয়ারে আমাদের বসতে বলে দাঁড়িয়ে থাকে ছেলে, তাই তার উচ্চতা বুঝতে পারি। বাবা বসে থাকায় উনি কতটা লম্বা হতে পারেন তা অনুমান করতে পেরেছি মাত্র। মা দাঁড়িয়ে আমাদের বিদায় দিয়েছিলেন। তাই বুঝেছিলাম উনি প্রস্থে যেমন কম দৈর্ঘ্যে তেমন বেশি। লাবণ্যহীন মুখশ্রী।

আমাদের বসতে বলে ওঁরা তিনজন কিছু সময় বিনা কথায় পার করে দেন। মনে হয় পাত্রী এবং পাত্রীপক্ষ দেখে মোটেও খুশি নন। সেজদাই শেষ পর্যন্ত মুখ খোলে, ‘‘এই হল আমার বোন, যার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।’’

ছেলের মা বলেন, ‘‘বুঝেছি।’’ মায়ের প্রথম প্রশ্ন আমাকে, ‘‘রান্না জানো?’’

ভাতের হাঁড়ি ঠেলার দায়িত্ব পালন করতে শ্বশুরবাড়ি না যাওয়ার পাকা সিদ্ধান্ত মনে চেপে রেখে বলি, ‘‘হ্যাঁ।’’ মনে পড়ে বিজয় সরকার নিয়ে উদাসীনতা দেখালে সেজদা একদিন টেবিল চাপড়ে আমায় বলেছিল, ‘‘সবকিছু জেনে, বিচার করে আমি বলছি উপযুক্ত ছেলে। তোর ওকে হ্যাঁ বলে দেওয়া উচিত।’’

আমি বলেছিলাম, ‘‘না সবকিছু জানা হয়নি।’’

‘‘কি বাকি আছে আর? বলেই তো দিয়েছে বিয়ের পরে চাইলে তুই কোয়ালিফিকেশন বাড়াতে পারিস।’’

‘‘আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে হবে।’’

‘‘আর কি? চাকরির কথা। তাতেও তো হ্যাঁ বলেছে। চাকরি তুই করবি।’’

‘‘সেটা না। অন্য কথা।’’

‘‘আরে বল না।’’

‘‘আমি রোজ রান্না করতে পারব না।’’

‘‘ও, এই ব্যাপার! আরেকদিন ছেলেটির সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করে নে।’’

আরেকদিন গিয়েছিলাম ছেলেটির কোয়ার্টারে। সেজদা বলেছিল, ‘‘ও তোমাকে কিছু বলতে চায়।’’

‘‘বলুন।’’

‘‘আমার রান্না করতে ভালো লাগে না।’’

সেজদা যোগ করে, ‘‘বাড়িতে আসলে কখনো রান্না করেনি। কলকাতায় এসে তো হোস্টেলেই থেকেছে। ব্যাঙ্গালোরে এসে...দেখো না...প্রতিদিনই আমরা বাইরে খেতে যাচ্ছি।’’

ছেলের উত্তর, ‘‘রোজ বাইরের খাবার খাওয়া তো ঠিক নয়। সে না হয় সপ্তাহে

দুই থেকে তিনদিন বাইরে যাওয়া যাবে। তবে চিন্তার কিছু নেই, আমিও রান্না জানি।”

আর এখানে টেকো ডাক্তারের মা বলেন, “আমাদের বাড়িতে কিন্তু রান্না করতে হবে।”

শুনে বিদ্যুতের ঝটকা খায় সেজদা। চারজন লোকের রান্না প্রতিদিন—ঘরে এঁরা ছেলের বউ চান নাকি কাজের ঝি! “আপনাদের রান্নার লোক নেই?” জিজ্ঞেস করে সে।

“আছে। কিন্তু সে কখন আসে কখন আসে না তার কোন ঠিক নেই। তাই এটা ধরেই চলতে হবে যে রান্না থেকে একদিনও ছুটি পাওয়া যাবে না।”

স্ত্রীর কথা শুনে হাসেন ছেলের বাবা। মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করেন, “গাড়ি চালাতে পারো?”

“ব্যাঙ্গালোরে আসার পর আমি কয়েকদিন আমার ভেসপা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। প্রায় শিখেই ফেলেছে। আর দু’য়েকবার বেরোলেই হাত পাকা হয়ে যাবে,” আমার হয়ে সেজদাই জবাব দেয়।

“স্কুটারের কথা জিজ্ঞেস করিনি। চারচাকার কথা জিজ্ঞেস করেছি,” ব্যঙ্গের হাসি হাসেন ছেলের মা।

“ওহ্ না। তবে শেখাটা আর এমন কি বড় ব্যাপার!” সেজদার থতমত খাওয়া উত্তর।

“আমাদের বাড়িতে আসতে চাইলে জুতো সারাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবকিছুই জানতে হবে। আমার বাড়ির বউকে যেমন রান্নায় পারদর্শী হতে হবে তেমনই গাড়ি চালানোতে।”

“কি গাড়ি আপনার?”

“প্রিমিয়ার পদ্মিনী। মেরুন রঙের।”

“গ্যারাজে আছে বুঝি।”

“হ্যাঁ। আমাদের গ্যারাজে নয়, মেকানিকের গ্যারাজে। সার্ভিসিং-এর জন্য দেওয়া হয়েছে।”

প্রিমিয়ার পদ্মিনী মান্ধাতা আমলের গাড়ি হলে কি হবে, তার তেজ অনেক। বিশেষত মেরুন রঙের গাড়ির। যাদেরই মেরুন রঙের প্রিমিয়ার পদ্মিনী আছে তাদের অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না দেখেছি। দশ বছর আগে গাজল থেকে দিদিকে দেখতে আসা পার্টিরও একইরকম হাবভাব ছিল।

চোখে না দেখা মেরুন প্রিমিয়ার পদ্মিনীর তেজের ঝটকা সামলে ওঠার আগে আরেকটা ঝটকা পেলাম। ছেলের কাছ থেকে। ছেলে জিজ্ঞেস করল, “তুমি ঘরে লোকজন ভালবাস তো? আমার কিন্তু অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। বন্ধুবান্ধব বলতে বন্ধু এবং বান্ধবী। তারা কেউ আমার ক্লাসমেট, কেউ আমার কলীগ। আমরা খুব ফ্রী মেলামেশা করি। তোমাকে তাদের মেনে নিয়ে চলতে হবে।”

বাসে রাতে টানা তেরো ঘণ্টা জার্নির পর বিশ্রাম হয়নি। তার ওপর এত ছিঁড়ে খাওয়া কথার জ্বালা। মনে হচ্ছিল কোন হায়নার গর্তে ঢুকে পড়েছি। চারিদিক থেকে

আমাকে আক্রমণ করছে হায়না। একসঙ্গে খাবলে নিয়ে খেতে চাইছে জীবন্ত আমার হাত, পা, কোমরের মাংস। ক্লান্ত থাকলেও প্রতিঝটকা দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারতাম, কিন্তু সেজদার উপস্থিতি আমাকে বাধা দিল। আমি মুখ খুললেই তার মানসম্মান ঘা খাবে। তাই উত্তর দেওয়া বা না দেওয়ার ভারটা ওর ওপরই ছেড়ে দিই।

পণ্ডিচেরিতে আমার পছন্দ অপছন্দ নিয়ে আলোচনার কোন সুযোগই আমি পাইনি। কথা বেশি বলেছিল ছেলে এবং ছেলের মা। তাদের মধ্যে আমাকে বা আমার পরিবারকে জানার কোন আগ্রহই ছিল না। আগ্রহ ছিল নিজেদেরকে নিয়ে বলার। তবু আমাকে নিয়ে কিছুটা জেনে ফেলেছে এবং তা ওই নিজেদেরকে নিয়ে ঢোল পেটাতে গিয়েই।

কলকাতায় ছোটদার বিজ্ঞানচেতনার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে বেশিদিন না থাকলেও চেয়ে না চেয়ে আমার মধ্যেও কিছু ভালো এবং খারাপ লাগা জন্ম নিয়েছে। যেমন আমি অনেক ব্যাপারেই অস্বীকার করার উপায় নেই এমন প্রয়োজন বুঝে চলতে শিখেছি। আমার মনে হয় না মহাসমারোহে বিয়ে করার পেছনে কোন যুক্তি আছে। বাবা আমার বিয়ের উদ্দেশ্যে কিছু টাকা রেখেছেন বলে আমি শুনেছি—সেটা সত্যি হলে সেই টাকাটা আমার হাতে চাই—হাতে না হলেও 'এফ ডি'র রূপে চাই। ছেলেমেয়ের ঘটা করে জন্মদিন পালনেরও বিরোধী আমি। ছোটদার মতো। এব্যাপারে বিজয় সরকার অবশ্য সহমত নয়। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে আমি মাঝামাঝি কোন একটা জায়গাতে এসে থামব ঠিক করেছি। ওকে বিয়ে করি বা না করি পণ্ডিচেরির হায়নার গর্তে না পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার হিড়িম্বার খাঁচায় ঢোকার জন্য জন্য রওনা হই। শিকার হিসেবে হায়নাও নিশ্চয় আমাকে অপছন্দ করেছে। শিক্ষা এবং আধুনিকতা বলতে তাঁদের ধারণা আমার থেকে অনেক আলাদা।

বাবার ছেলের বিয়ে

ব্যাঙ্গালোর থেকে আমি কলকাতায় ফিরব। তার কয়েকদিন পরে বিজয় সরকারেরও ছুটিতে বাড়ি আসার কথা। ঠিক হল বালিগঞ্জে বড়মামার বাড়িতে বিজয় সরকারের মা-বাবাকে ডাকা হবে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে।

গতবার সেজদা বালুরঘাটে গিয়েছিল ওর নিজের জন্য দেখা চকভৃগুর একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে পাকা করতে। ছুটি প্রায় শেষ করে ব্যাঙ্গালোরে ফেরার পথে আমার কেষ্টপুরের ঘরে নীরস চিত্তে তার পদার্পণ। মুখ চুনোপুঁটির মতো কেন হল জিজ্ঞেস করাতে সে বলে, বালুরঘাটে কাজে সফলতা আসেনি। সেজোমামা-দূত খবর পেয়েছেন—মেয়েটির নাকি প্রেমিক আছে।"

বিয়ের আগে অনেকেরই অনেক প্রেমিক থাকে...*আমারও আছে।* "...এটা এমন কি গুরুতর ব্যাপার!"

"মা-বাবা ভয় পাচ্ছেন। বলছেন ব্যাপার গুরুতর হতেই পারে। হতেই পারে ওরা চুপচুপ করে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে নিয়েছে। অন্য কারণ দেখিয়ে আমরা কিছুদিন সময় চেয়েছি। অনেক কিছু ভেবে দেখার আছে।"

"খবর তো মিথ্যেও হতে পারে।"

"তা ঠিক। কিন্তু কি করে বোঝা যাবে সত্যি না মিথ্যে? মেয়ের পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞেস করা যায় না। আর করলেও তারা এক কথায় অস্বীকার করবে। কি করি?"

"মেয়েটিকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করতে হবে। সে সত্যি না বললেও তার প্রতিক্রিয়া থেকে অনুমান লাগাতে পারব।"

"ভালো আইডিয়া। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব?"

"মেয়েটিকে বাড়ির বাইরে কোথাও দেখা করতে বলতে হবে।"

"এই প্রস্তাবটা আমি নিজে ওকে দিলে ভালো দেখাবে না। বালুরঘাটে এমন কেউ নেই ও যে তাকে এই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। মনে হচ্ছে কাজটা তোকেই করতে হবে এবং তোকেও সঙ্গে থাকতে হবে।"

ভাবি সঙ্গে তো আমাকে থাকতেই হবে। বাড়ি থেকে গতানুগতিক ধারায় সম্বন্ধ করে বিয়ের কথা এগোচ্ছে। বালুরঘাট ছোট জায়গা। পাত্র-পাত্রীর বিবাহপূর্বক একান্তে সাক্ষাৎ দৃষ্টিকটু এবং সমালোচনাযোগ্য। সফরের দিশা পাল্টে গেল সেজদার। ব্যাঙ্গালোরের কথা আপাতত ভুলে সে পুনরায় বালুরঘাটমুখী। সঙ্গে আমি। আমরা বালুরঘাটে পৌঁছনোর আগেই পাত্রীর বাড়িতে খবর পৌঁছে যায় কলকাতা থেকে পাত্রের অতি আধুনিক বোন আসছে। সেও তাকে দেখবে।

আমাদের পরিবারের সদস্যরা একদিকে আমাকে অত্যাধুনিক বলে উপহাস করে, আমার অত্যাধুনিকতাকে তাচ্ছিল্যের বোমাতে ক্ষতবিক্ষত করে, অন্যদিকে সেই অত্যাধুনিকতারই মাপকাঠিতে যাচাই করে নিজেদের মান, ইচ্ছে প্রকাশ করে সেই

স্রোতেই পা রেখে চলার। দিদির মেয়ের জামাকাপড় কেনার সময় আমার প্রয়োজন হয়। মেজদার মেয়ের নামকরণের সময় আমার প্রয়োজন হয়। বিয়ের দশ মাস পর মেজদা মেয়ের বাবা হয়েছে। তিনদিনের মেয়ে তার মায়ের সঙ্গে হসপিটাল থেকে আমাদের বাড়ির সামনের সদর রাস্তা দিয়ে তার পাখির বাচ্চার মতো কঙ্কালসার দেহে আদর-যত্নে মাংস চড়াতে, হাত-পা ছোঁড়া শিখতে, চোখে চোখ রেখে দেখা শিখতে, হাসা শিখতে গঙ্গারামপুরে মামাবাড়ি গেছে। মেজদা দু'মাসের ছুটি নিয়ে সপ্তাহের পাঁচদিন শ্বশুরবাড়ি দুইদিন বাপের বাড়ি করছে। তারই মাঝখান কলকাতা থেকে বাড়ি গেলে মেজদার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমাকে পেয়ে মেজদা বসেছে পেটের ভেতর গুটলী পেকে ওঠা সমস্যার সমাধান করতে। হাতে রাইটিং প্যাড এবং পেন। ''মেয়ের কি নাম রাখি বল তো?'' আমি বালুরঘাট গার্লস হাই স্কুলে পড়ার সময়ই কোণার ঘরের বইয়ের আলমারি থেকে দিদি আমার নাম সংগ্রহের খাতা আবিষ্কার করার খ্যাতি অর্জন করে। আবিষ্কারের সূত্র ধরে ওই খাতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নিজের অধিকার। দু'বছর না ঘুরতেই খাতায় নামের নতুন সংযোজন থেকে নিজের মেয়ের জন্য 'সুকল্পা' নামটি বাছাই করে নেয়। যেহেতু খাতা আবিষ্কারের খ্যাতি মেজদার নেই, জোর করে নাম বেছে নেওয়ার দাবি সে করতে পারে না। তাই বিনম্র অনুরোধ, ''একটা নাম দে।''

মেজদা বলে, ''তোর বউদি সুচরিতা, অনুপমা কি সব নাম ভেবে রেখেছে।'' বউয়ের পছন্দের বহুপ্রচলিত নামগুলি উচ্চারণ করতে গিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে তার মুখ। যদিওবা নবাগতার সুবদন দেখে ওঠার সৌভাগ্য তখন পর্যন্ত আমার হয়নি, তার উদ্দেশ্য একটি নামই উচ্চারণ করেছি—শিঞ্জিনী। সেটাই মনে ধরেছে, সেটাই মনোনীত হয়েছে।

নির্দিষ্ট দিনে সেজোমামাই আমাদের নিয়ে গেলেন মেয়ের বাড়িতে। আমার খাতিরে যথেষ্ট আপ্যায়ন হল ছেলেপক্ষের। যথেষ্ট খাওয়া-দাওয়া হল। ভোজন শেষে পেট ফুলিয়ে আমি মেয়েটিকে আলাদা ডেকে তার সামনে সেজদার হয়ে প্রস্তাব রাখি। প্রস্তাব পেয়ে মেয়েটি খুব অপ্রস্তুত হয়। বলে, ''কি করে তা সম্ভব! যদি কেউ দেখে ফেলে?''

''দেখে ফেললে ক্ষতি কি? আমি তো থাকছি সঙ্গে।''

''তা হলেও বা। তোমার দাদাও তো থাকবেন তাই না? লোকে কি বলবে!''

''লোকের তো কিছু বলাই নেই! জানার কৌতূহল নিলে লোকে সত্যি কথাটাই জানবে।''

''কোন সত্যি কথা?'' ফ্যাকাসে গলা মেয়ের।

''বিয়ের কথা হচ্ছে, তাই পাত্রের বোনকে মাঝখানে রেখে পাত্রপাত্রী পরস্পরকে ভালো করে বুঝে নিতে চাইছে।''

''তবু...''

''আমাদের তো এমনিতেই কত ছেলে বন্ধু থাকে। তাদেরও সঙ্গেও তো আমরা

বাইরে বসি।”

“সে অন্য কথা।”

“অন্য কথা বটে। তবে সেটাও খারাপ কথা নয়, এটাও খারাপ কথা নয়।”

সহসা কোন জবাব দিতে পারে না মেয়ে। শুধু কেঁপে ওঠে। ভয় পেল মনে হয়, “বাবাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।”

মেয়ের বাবা জানালেন সম্ভব নয়। আমরা বললাম, এটা সম্ভব না হলে বিয়েও সম্ভব নয়।

দু'দিনের মধ্যেই সেজোমামা-দূত বার্তা নিয়ে এলেন মেয়ের বাড়ি থেকে প্রচার হচ্ছে ছেলেটির চরিত্র সন্দেহজনক। বিয়ের আগেই মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চায়। তার দু'দিনের মধ্যেই সেই সেজোমামা-দূতই প্রচার করলেন—মেয়েটি আগে থেকেই বিবাহিতা। তাই পরেও ভালো ছেলে পেয়ে মা-বাবা লুকিয়ে মেয়ের আবার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

সেজদা ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে শুধু আমার বিয়ের চেষ্টা করবে ভাবতেই আমার কষ্ট হচ্ছিল। আমি ওকে বলেছিলাম ওর নিজের বিয়ের জন্যও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে বিজ্ঞাপন দিতে। দিয়েওছিল বিজ্ঞাপন। পেয়েওছিল কয়েকটি চিঠি। সেখান থেকে বাছাই করে চেন্নাই-এ কোন আধবাঙালি মেয়ের বাঙালি বাবার সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল। বাবার একটি চিঠি আমাকে পড়ে শুনিয়েছিল সেজদা। চিঠির সারপদার্থটি এরকম—“আমার স্ত্রী তেলেগু। আমাদের তিন মেয়ে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোটটি পিএইচ ডি করছে। মেজো মেয়ের বিয়ের জন্য আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি। সে মাস্টার্স করেছে। বর্তমানে ট্রানস্লেটরের কাজ করছে। উটিতে আছে। তুমি তাকেও চিঠি লিখতে পারো। কিন্তু যেহেতু আমার মেয়েরা বিশুদ্ধ বাঙালি নয়, বাংলার বাইরেই তাদের জন্ম এবং বাংলার বাইরেই তদের বড় হাওয়া তাই তারা বাংলা বলতে পারলেও পড়তে লিখতে পারে না। কাজেই তোমাকে চিঠি লিখতে হলে ইংরেজিতেই লিখতে হবে। আমি আশা করছি তুমি ইংরেজিতে চিঠি লিখতে সক্ষম...”

আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতা ফেরার কয়েকদিন পরে সেজদাও এল কলকাতায়। বড়মামার ডুপ্লেক্স বাড়িতে বিজয় সরকার এবং তার বাড়ির লোকজন আসবে। সকাল থেকে আমরা স্নান সেরে তাদের অপেক্ষায় ছিলাম। বাকিরা সব নিচে, আমি উপরে বেডরুমে। মামীমা আমাকে নিজের একটি সুতির শাড়ি দিয়েছেন। সেটা আটপৌঢ়ে করে পরে আছি। তারা এল, একটু দেরিতে। মাত্র দু'জন—ছেলে এবং ছেলের মেজো ভাই। মেজো ভাই বিবাহিত। বাবা, মা অথবা বড় অভিভাবক জাতীয় কেউ আসেননি। মামীমা কারণ জিজ্ঞেস করে জেনেছেন তাদের বাড়িতে শোকের ছায়া। ছেলের ছোট ভাই যে কিনা শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিল মারা গেছে মাত্র দিন তিনেক আছে।

বিজয় সরকার এবং বিজয় সরকারের ভাইকে লিভিং রুমে বসতে দিয়ে সেজদা

এবং বড়মামা তাদের সঙ্গে ওখানেই বসেন। মামীমা আমাকে ডেকে নিয়ে যান কিচেনে। বলেন, ‘‘যা ওদেরকে জলখাবারটা দিয়ে আয়।’’ বাসন্তী নেই। তার শ্বশুরবাড়ি হয়েছে, থাকতে গেছে সেখানে। ঘরে অন্য কাজের লোক আছে, তবু উনি আমাকে দিয়ে জলখাবার পরিবেশন করাতে চাইছেন। আমাকে দেখে ছেলের ভাই আমার পাশে এসে দাঁড়ায়, উচ্চতা মাপে। বলে, ‘‘ঠিক আছে। দাদার সঙ্গে মানিয়ে যাবে।’’ জলখাবার দিয়ে নিচে এলে মামীমা বলেন, ‘‘দেখেছিস ওরা তোকে কত পছন্দ করে? ঘরে এত বড় একটা অঘটন ঘটে গেছে তবু এখানে আসা ক্যান্সেল করেনি। তুই কিন্তু এই বিয়েতে না করবি না রূপু।’’

‘‘কে বলেছে না করব?’’

‘‘মিন্টু বলছিল হাইট কম বলে তোর নাকি আপত্তি? মনে রাখিস, এত শিক্ষিত ছেলে কিন্তু আর পাওয়া যাবে না।’’

মামীমা বড়লোক বাড়ির নাক উঁচু মেয়ে। উনি আমার যতই যত্ন করুন, যতই অভিভাবকত্ব দেখান আমার ওপর, যতই ধমক দিন আমাকে কাছের মনে হয় না। তাঁর যত্ন, অভিভাবকত্ব, ধমক তাঁর বাবার বাড়ির এবং আমার বাবার বাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থার সমুদ্রসমান ব্যবধানকে শূন্য করে দিতে পারে না। মানুষের পকেট যত ভারি হয় পছন্দের মানও তত উঁচু হয়। অনেক পয়সাওয়ালা ছেলে এসে দিদিকে দেখে গেছে কিন্তু পছন্দ করেনি—কালো, বেঁটে, নাক বোঁচা ইত্যাদি বলে নির্দ্বিধায় নাকচ করে দিয়েছে। আসলে তারা মেয়েপক্ষকে তাদের সমগোত্রীয় বলে মনেই করেনি। তারা সবাই এমনটি নাও করতে পারত যদি আমার বাবার পকেটে টাকা থাকত, ক্ষমতা থাকত বিশাল পরিমাণ যৌতুক দেওয়ার। বাবা নিজে যথেষ্ট শিক্ষিত হয়েও শেষপর্যন্ত একটা সামান্য গ্র্যাজুয়েট, অজপাড়াগাঁর জুনিয়র স্কুলের নিম্নমধ্যবিত্ত সহশিক্ষকের হাতে তাঁর বড় মেয়ের হাত সঁপে দিতে একপ্রকার বাধ্যই হয়েছেন। সারাজীবন ধরে জাতপাত মেনেও হার মানতে হয়েছে গোয়ালা ঘরের ছেলের কাছে। কারণ একটাই—দুর্বল পকেট। আমার বিশ্বাস বাবা যদি আর কয়েকটি দিন আগে তাঁর চাকরি ফিরে পেতেন তাহলে এই বিয়ে হত না। বাবা চাকরি ফিরে পেয়েছেন যখন বাজবে বলে বাড়ির দরজায় সানাই প্রায় পৌঁছে গেছে তখন।

অর্থনৈতিক প্রাচুর্যে বড় হওয়া দুলাল ঘোষের বউ বিজয় সরকারকে পছন্দ করায় আমার মনের বিজয় সরকারকে নিয়ে সেই একমাত্র দোলাচালের অবসান ঘটে। ভাবি বিয়েটা তাহলে তাড়াতাড়িই হয়ে যাক। তাহলে তাড়াতাড়ি স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করতে পারব।

দুপুরে খেতে বসে ছেলের মেজো ভাই সেজদাকে বলে, ‘‘আমি ছেলের চাইতে ছোট হলেও আপনারা আমাকেই অভিভাবক ভাবতে পারেন। মেয়ে আমার খুব পছন্দ। আমার পছন্দের বাইরে কেউ কোন কথা বলবে না। আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে আপনার বাবাকে চিঠি দেব কবে বিয়ের দিন ঠিক করতে আসব জানার জন্য।’’

মামা জিজ্ঞেস করেন, ‘‘তোমাদের বাড়ি হাবড়া স্টেশন থেকে কত দূরে।’’

‘‘দূরে নয়, স্টেশনের পাশেই।’’

সেজদা বিজয় সরকারকে জিজ্ঞেস করে, ‘‘তুমি যে বললে স্টেশন থেকে রিকশা করে যেতে হবে!’’

‘‘ওহ্, দাদা তাহলে আমাদের পুরনো বাড়ির কথা বলেছে। আমাদের দুটো বাড়ি আছে,’’ হাসে ছেলের ভাই।

অতিথি চলে গেলে সেজদা আমাকে বলে, ‘‘বলেছিলাম না ছেলেটি বড় নিরহংকারী। দুটো বাড়ি আছে একবারও বলেনি।’’

কলকাতা থেকে সেজদা একমাসের ছুটি কাটাতে বাড়ি যায়। আমি অপেক্ষা করতে থাকি কবে সে চিঠি দেবে ছেলেপক্ষ অমুক তারিখে বালুরঘাটে আসছে, তুই-ও চলে আয় বলে। যে মেয়ের বিয়ের কথা চলছে সে নিজে কলকাতায় বসে থাকলে দৃষ্টিকটূ লাগে। তাছাড়া ছেলের মা-বাবা তাকে একবারের জন্য হলেও তো দেখতে চাইবেন। দিন গুনি। বাঁচা দিনের সংখ্যা তিরিশ থেকে কমে পঁচিশ হয়, পঁচিশ থেকে কুড়ি, কুড়ি থেকে পনেরো, পনেরো থেকে আরও কমতে কমতে শূন্য হয়ে যায়। বাড়ি থেকে কোন চিঠি আসে না। মাস শেষে হলে অবশেষে সেজদা নিজেই আসে। সে ব্যাঙ্গালোরে ফিরে যাবে। ছুটি আর বেঁচে নেই।

এসেই সেজদা তার সুটকেস রেখে মেঝেতে আমার বিছানার এক কোণায় বসে। আমাকে ডাকে, ‘‘শোন শোন শোন।’’ জিজ্ঞাসা আমারও চোখে, ‘‘কি ব্যাপার? আমাকে বালুরঘাটে যেতে বললি না যে! তোরা কি আমাকে না জানিয়েই আমার বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলেছিস?’’

সেজদা বলে, ‘‘বিজয় সরকারের বাবা আমাদের বাবাকে লিখেছেন যে ওঁদের কাস্টের সঙ্গে আমাদের কাস্ট মিলছে না। তাতে অবশ্য ওঁদের কোন আপত্তি নেই। উনি লিখেছেন কাস্ট আলাদা জেনেও যদি আমরা রাজি থাকি তাহলে ওঁরা বিয়ের তারিখ ঠিক করতে আসবেন। কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না।’’

‘‘কি কাস্ট ওরা?’’

‘‘নমঃশূদ্র।’’

‘‘দিদির তো গোয়ালার ঘরে বিয়ে হয়েছে। বাবাকে বলিসনি?’’

‘‘বলেছি। বাবা বলেছেন গোয়ালা তবু মানা যায়। নমঃশূদ্র পর্যন্ত নামা যাবে না।’’

‘‘আমি বাবাকে বলে দেখব। বিয়েটা তো আমার তাই না?’’ ছেলেটির সঙ্গে আমি থাকব, ওর বাড়িতে সারাজীবন আমারই যাতায়াত থাকবে, ওর আত্মীয়ের সঙ্গে মেলামেশা হবে আমারই।’’

‘‘তুই আর কিছু বলতে যাস না। লাভ তো হবেই না। আরও রেগে যাবেন। তুই তো বাবাকে জানিস। উনি ছেলের বাবাকে ওনার অমত জানিয়ে দিয়েছেন।’’

বজ্রাঘাত হয় আমার মাথায়। এই বিয়ে শেষ মুহূর্তে শুধুমাত্র কাস্ট আলাদা বলে ভেঙে যাবে—কল্পনার বাইরে। সেজদাকে জিজ্ঞেস করি, ‘‘ছেলের কাস্ট কি তুইও বাড়ি গিয়েই জেনেছিস?’’

‘‘না, কলকাতায় জেনেছিলাম।’’

"তখন আমাকে বলিসনি কেন?"

"আজকাল এ সব তো প্রায় উঠেই গেছে। আমি ভেবেছিলাম বাবাকে বুঝিয়ে বললে বাবা আর না করবেন না।"

"বাহ্, নিজের ভাবনার ওপর এত ভরসা? এখন সে ভরসা কোথায় গেল?"

"নমঃশূদ্র ছাড়া অন্য কাস্ট হলে রাজি করিয়ে নিতে পারতাম।"

"আমাকে আগে জানালে আমিও বাড়ি যেতাম। সবার সঙ্গে আমিও বাবাকে রাজি করার চেষ্টা করতাম। সেই সুযোগটাও পেলাম না। বাবা তো ইতিমধ্যে তাঁর কড়া অমত জানিয়েই দিয়েছেন।"

সেজদা চুপ।

"যদি নমঃশূদ্র জাতটা আমাদের কাছে এতটাই অস্পৃশ্য তাহলে ছেলের জাত না জেনে ব্যাঙ্গালোর থেকেই তুই নিজেও এই বিয়েতে এত জোর কেন দিয়েছিলি?"

সেজদা চুপ।

মুখ বন্ধ রেখেই ব্যাঙ্গালোরে চলে যায় সেজদা। আমার ওপর হতাশার বৃষ্টি ঝড়িয়ে যায়। বৃষ্টি শুরু হয়েছে বালুরঘাটে। বালুরঘাট থেকে বৃষ্টির সঙ্গে বয়ে এসেছে মেঘের গর্জন। মেঘের গর্জন বলছে—*এই বিয়ে হবে না।*

কালো মেঘ কাটানোর জন্য, মেঘের গর্জন কমানোর জন্য বাতাস বয়েছিল বালুরঘাটে। সেজদা বইয়েছে বাতাস—*রাজি হয়ে যান বাবা। এত ভালো ছেলে আর পাবেন না। এতদূর এগিয়ে না বললে ওরা কি ভাববে?* সেই বাতাসে মেঘের গর্জন কম হয়নি। বরং বেড়েছে। বাজ পড়েছে—*একবার বলে দিয়েছি না। এর ওপর আর কোন কথা নেই।*

তারপর বাতাস ছেড়েছেন মা—*এই এক মানুষ, 'না তো না'। 'না'কে হ্যাঁ' করবে কারও বাপের সাধ্যি নাই। এত দেখতে গেলে মেয়ের আর বিয়া হোবে না। নালে ভাকলা, বটুনে খুঁজে বেড়াতে হোবে ছেলে।*

আমি দেখতে পাচ্ছি দাদা চুপ। কোণার ঘর থেকে কলপাড়ে যাতায়াতের পথে দাদা শোনেন আমার বিয়ে নিয়ে কিছু একটা গম্ভীর আলোচনা হচ্ছে কিন্তু কিছু বলেন না। ঢুকে যান নিজের ঘরে। আমি দেখতে পাচ্ছি দিদিকে। বাবাকে বোঝাতে অক্ষম মা এবং সেজদা একপা দু'পা করে বাইরের বারান্দা থেকে ভেতরের বারান্দায় এলে সে বাইরের বারান্দায় বাবার দিকে এক পলক ফেলে দাঁত চেপে সেজদাকে বলছে, "বাবাকে রাগায়ে আর লাভ নাই, তালে এই মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়াও ভ্যাঙ্গে য্যাবে দেখবি।" আমি জেনেছি, সেজদাই বলেছে বাবার কাছে চেন্নাই-এর মেয়েটির সঙ্গে নিজের বিয়ের কথাও পেড়েছে সে। তাতেও বাবার আপত্তি, কারণ মেয়েটি মাহিষ্য।

থেমে গেল আমার বিয়ের কথা, মরে গেল আমার বিয়ের কথা, একই জায়গায়। সেখানেই সমাধি হয়ে গেল তার।

সমাধি খুঁড়ে সেই কথাকে বের করার চেষ্টা আমি করেছিলাম। চিঠিতে বাবাকে বোঝাতে চাওয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছিলাম। জানিয়েছিলাম কতটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে

ফেলেছি, কিভাবে বিবাহোত্তর জীবনকে সাজাবো তার পরিকল্পনা করে ফেলেছি, কিভাবে নিজেকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যাব সে বিষয়ে ছেলেটির সঙ্গে আলোচনাও সেরে ফেলেছি। লিখেছিলাম, এমনটি তো কোন সংবিধানে লেখা নেই যে নমঃশূদ্র হলে সে স্ত্রীর দেখভাল ঠিকমতো করতে পারবে না অথবা টাকা পয়সার প্রাচুর্য আসবে না তার জীবনে, সম্মান প্রতিপত্তি আসবে না। বরং দেখবেন নমঃশূদ্রকে বিয়ে করেই আমি অনেক বেশি সুখে আছি, জীবন উপভোগ করছি অনেক বেশি, অনেক বেশি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছি।

বাবা কয়েক লাইনের উত্তরে আমাকে অতি-আধুনিক আখ্যা দিলেন। অবজ্ঞা দিয়ে, পরিহাস দিয়ে নর্দমার ময়লায় মিশিয়ে দিতে চাইলেন আমার অতি-আধুনিকতাকে। বললেন, এ বিষয়ে আমি যেন ওনাকে আর কোনদিন কোন অনুরোধ না করি।

কয়েকদিনের মধ্যে সেজদার বিয়ে হয়ে গেল। সেই একই মেয়ের সঙ্গে। সেই বিয়েকে সম্ভব করার জন্য দিদি বাবাকে অনেক সুপারিশ করেছিল শুনেছি। শুনেছি চিঠির মাধ্যমে সেই মেয়ের সঙ্গে অতি অল্প সময়েই সেজদার প্রেম হয়ে গিয়েছিল। ব্যাঙ্গালোরে ফিরেই সে সাততাড়াতাড়ি মেয়ের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। মেয়ে, মেয়ের বাবা এবং মেয়ের ছোট বোনকে নিয়ে বালুরঘাটে পৌঁছে গিয়েছিল এই দূরন্ত আশা নিয়ে যে বাবা মেয়ের অভিভাবকের সঙ্গে ন্যূনতম ভদ্রতার খাতিরে বেশি কড়াভাবে কথা বলতে পারবেন না। শুনেছি তবু বাবার প্রচণ্ড আপত্তি ছিল কিন্তু তাঁকে প্রচণ্ড বুঝিয়ে, প্রচণ্ড অনুরোধ করে, প্রচণ্ড জোরাজুরি করে রাজি করা হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে একই যাত্রায় বাড়ির দু'প্রান্তে ছেলে এবং মেয়েপক্ষের দুটো ছাঁদনাতলা বানিয়ে সম্পন্ন হয়েছে বিয়ে। নিমন্ত্রণ আমি পাইনি। বিয়ের পর বিয়ের খবর পেয়েছি।

সেজদার এমন বিয়ে আমাকে যেমন খুশি দিয়েছে তেমন হতাশাও। আমি কলকাতায় আসার পর বেশ কিছু বছর কেটে গেছে। সেই বছরগুলো আমার বয়স বাড়িয়েছে, আমার মানসিক পরিস্ফূরণ ঘটিয়েছে, আমার নামের সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও জুড়ে দিয়েছে কিন্তু আমার ভালো লাগা ভালো থাকা নিয়ে, আমার বিচার ভাবনা চাওয়া না চাওয়া নিয়ে আমার প্রয়োজন নিয়ে, এক কথায় আমার সমগ্র আমাকে নিয়ে বাড়ির কোন গুরুজনেরই মনোভাবের একটুও পরিবর্তন ঘটায়নি। একই আছে মনোভাব।

অসময়ের তারা

"মেহবুব মেহবুব, অমন কোরো না মেহবুব। ভয় করছে আমার। ধরো আমায় মেহবুব, প্লীজ ধরো। পড়ে যাব আমি। এই দানবটা ফেলে দেবে আমায়।" এত আবেদন করছি মেহবুবকে, তবু মেহবুবের কোন বিকার নেই। আমি মেহবুবের হাতের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছি। পাচ্ছি না হাত। মেহবুব আমার পাশেই আমার গা ঘেঁষে বসে আছে তবু। কেননা আমাকে ধরতে দেবে না বলে সে হাত টেনে রেখে দিয়েছে নিজের কোলের উপর। তার মুখে হয়ত খুব হাল্কা হাসি আছে কিন্তু আমি তা দেখতে পাচ্ছি না। চশমার আড়ালে ওর চোখ কি বলছে তা পড়ার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি ওর মুখের দিকে তাকাতেই পারছি না। আমার চোখ উপর নিচে সর্বাধিক প্রসারিত হয়ে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে।

মেহবুবের সঙ্গে আমি ময়দানে এসেছি। নাগরদোলায় চড়েছি। আমার মোটেও ইচ্ছে ছিল না চড়ার। ওকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে ছোটবেলা থেকেই ওই জিনিসটাকে আমি অসম্ভব ভয় পাই। মেহবুবই জেদ করে আমায় চড়িয়েছে। বলেছে, "ভয়ের কিছু নেই, আমি তোমার সঙ্গে আছি। ভালো লাগবে দেখো।" মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছে সে। আমি একটুও মজা পাচ্ছি না। ওর ওপর খুব রাগ হচ্ছে। চিৎকার করতে করতে ভাবছি যদি এ যাত্রায় বেঁচে যাই নিচে নেমে প্রথমেই বলব, পুরো চিনে নিলাম তোমাকে। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব শেষ। আড়ি আড়ি আড়ি।

তিনবার সাঁই সাঁই ঘূর্ণিপাক খাইয়ে দানবটা বোঝালো সে আমাকে সত্যি সত্যি ফেলবে না। শুধু ভয় দেখাচ্ছে। ভয়টাই হল মজা। তবু মেহবুবের ব্যাপারে নেওয়া সিদ্ধান্তে আমি অটুট রইলাম। ওর আচরণটাই আমার ভালো লাগেনি। দানব আমাকে বুঝিয়েছে তাই আমি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি। যদি না বোঝাতো তাহলে কি হত? পঞ্চমবার উপরে গিয়ে মেহবুব আমার হাত ধরল। আমি না করলাম না অথচ সিদ্ধান্তও পাল্টালাম না। দানবটাকে আরও একবার ঘুরতে দিয়ে সে আমার হাতটি তার কোলের ওপর টেনে নিল। জিজ্ঞেস করল, "রূপু, কেমন লাগছে?'

আমি কিছু বলি না। যে হাতটি পাওয়ার জন্য একটু আগেই কাতর হয়ে পড়েছিলাম সেই হাতকে এত কাছে পেয়েও অস্বস্তি হয়, সেদিনের মতো অস্বস্তি যেদিন সে আমাকে স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে ফটো তুলেছিল।

সেবার মেহবুব প্রথমবার এসেছিল বাংলাদেশ থেকে। এবারের মতো আমার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। ঘটনাক্রমে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল তার। পরিচয় হয়েছিল। আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতকোত্তর ছাত্রী। গত তিন চার বছরে মণিকা ও চৈতালির থেকে এক এক করে বিচ্ছিন্ন হয়ে সারা সপ্তাহ একা ক্লাসে আসি, একা ক্লাস করি। ইচ্ছে করে না তবু। পুরনো বন্ধুত্বকে ভুলতে না চেয়ে সপ্তাহশেষে মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আমরা দেখা করি এবং আড্ডা দিই। মাঝখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে—মণিকার বিয়ে হয়েছে, একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। যাই হোক,

এক বিকেলে কলেজ স্ট্রিট চত্বরে কফি হাউজে তিনতলার ব্যাল্কনিতে এমনই এক গল্পের আসরে যোগ দিতে আসে সে। অচানক আমাদের টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, ‘‘আমি কি এখানে বসতে পারি?’’

পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি উচ্চতার যুবকটি সেদিন পরেছিল প্যান্ট-শার্ট, ঢিলে কোর্ট, বুট এবং টুপি। তার চোখে ছিল সরু সোনালি ফ্রেমের চশমা এবং তার সঙ্গে ছিল একজন বন্ধু। আমি চকিত পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখেছিলাম চিত্তাকর্ষক চেহারা যুবকের। সে বলেছিল, ‘‘আমার নাম মেহবুব, বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে ঘুরতে এসেছি। এখানে পরিচিত কেউ নেই। তাই মনে হল আপনাদের সঙ্গে আলাপ করি...যদি অবশ্য আপনাদের কোন আপত্তি না থাকে।’’

চৈতালি, মণিকার ইচ্ছে অনিচ্ছেকে একদমই পাত্তা না দিয়ে উত্তর আমিই দিয়েছিলাম, ‘‘আপত্তির কি আছে!’’

‘‘আপনাদের নাম?’’

নাম বলেছিলাম আমরা।

‘‘কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী বুঝি?’’

‘‘আমরা নই। ও,’’ আমাকে দেখিয়ে দেয় মণিকা।

‘‘এখানে কোথায় আছেন আপনি?’’ আমার প্রশ্ন।

‘‘পার্ক সার্কাসের একটি হোটেলে।’’

সন্ধে হয়ে আসছিল। চৈতালি এবং মণিকা উঠতে চাইল। ওদের দু’জনকে অনেকদূর যেতে হবে। আমার বাসস্থান কাছেই—রাজাবাজার ভি ই এস উইমেন’স হোস্টেল। মেহবুবের বন্ধু, মেহবুব এবং আমি অনেকক্ষণ কথা বলি। ঠিক করে নিই পরদিন আমরা কোথায় কিভাবে মিলিত হব।

মেহবুব এবং আমি শুধু পরদিনই নয়, পরপর কয়েকদিন দেখা করছি। প্রত্যেকবারই সে বন্ধুকে ছেড়ে একা এসেছে। আমরা সল্ট লেকের ঝিলমিলে ঘুরতে গেছি, টয় ট্রেন চড়েছি, পার্কে বসে গল্প করেছি, কাটিয়ে দিয়েছি বসন্তের সারাটা দুপুর। আমরা বিড়লা প্লানেটোরিয়ামে গেছি, কৃত্রিম আকাশ-তারা-গ্রহ দেখেছি, স্বপ্নে স্বপ্নে বিস্মৃত হয়েছি মন খারাপ করা একটি বিকেল। আমরা মেট্রো ট্রেনেও চড়েছি, দাঁড়িয়ে বসে সফর করেছি, স্টেশনে স্টেশনে নেমে গিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, আমি তাকে বুঝিয়েছি কলকাতার এই অনবদ্য বৈশিষ্ট্যটি কত প্রশংসনীয়।

সেবার বাংলাদেশে ফেরার আগে মেহবুব আমার একটি ফটোকে স্মৃতি হিসেবে চেয়েছিল। আমি আপত্তি করেছিলাম। সে বলেছিল, ‘‘ভয় পাচ্ছো আমি তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারি ভেবে?’’

ভয় তো ছিলই। মাত্র তিন-চারদিন একটা মানুষকে চেনার জন্য একবারেই অপর্যাপ্ত সময়। সে বাংলাদেশের। সেখানকার সংবিধান ভারতের মতো এত উদার নয়। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি সরিয়ে দিয়েছেন জিয়াউর রহমান এবং ১৯৮৮ সালে মহম্মদ এরশাদ দেশকে মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষণা করেই দিয়েছেন। মেহবুবের পকেটে আমার ফটো পেলে হিন্দু-বিরোধী এরশাদ কি করবে

কে জানে! ভয়কে গোপন রেখে ওকে বলি, ‘‘না, তা নয়...”

‘‘তাই-ই। রূপু তুমি আসলে ভয়-ই পাচ্ছো। আমার ওপর ভরসা রাখতে পারছ না।” মেহবুব আমার মনের কথা পড়ে ফেলেছে জেনে মোটেও খুশী হলাম না। ভাবছি কি করি। আজ এই বিশ্বাস নিয়ে যদি সে ফেরত যায় তাহলে আমাদের এই ক’দিনের মেলামেশার স্বাদ মিঠা থেকে পরিবর্তিত হয়ে বড্ড তিক্ত হয়ে যাবে। না না, তা হতে পারে না। আমি মৃদু প্রতিবাদ করি, ‘‘তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। তোমাকে আমার ভয় কীসের মেহবুব? কিন্তু আমার কাছে যেসব ফটো আছে তার একটিও ভালো নয়। যেমন-তেমন ফটো তো তোমাকে আমি দিতে পারি না বলো?”

‘‘তাহলে তুলে নাও একটা ফটো।”

‘‘কি বলছ! কাল রবিবার। তুমি তো পরশু সকালেই চলে যাচ্ছ।”

‘‘যদি আমি আরও তিনদিন এখানে থাকতাম তাহলে তুলতে?”

‘‘নিশ্চয়ই!”

‘‘সত্যিই কোন আপত্তি থাকত না?”

‘‘একদমই না।”

‘‘আমার সঙ্গে ওঠাতে ফটো?”

‘‘ওহো মেহবুব, তোমার সঙ্গেই ওঠাতাম।”

‘‘তাহলে চলো।”

‘‘কোথায়?”

‘‘স্টুডিওতে।”

‘‘কি লাভ? তুমি তো ফটো দেখতেই পাবে না।”

‘‘আমি তোমাকে আমার ঠিকানা দিয়ে যাব। ডাক মারফৎ পাঠিয়ে দিও।”

আমি না করতে পারি না। অনেক বাহানা দেখিয়েছি। এখন আর কোন বাহানা খাটবে না। স্টুডিওতে যাই। দাঁড়াই দু’জনে পাশাপাশি। ফটোগ্রাফার ক্যামেরা হাতে ধরে আমাদের দু’জনকে ফোকাসে নিয়ে আসতে চায়, ‘‘আরেকটু কাছাকাছি আসুন আপনারা।” আমি একই জায়গায় স্থবির পিলারের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। মেহবুব আমার কাছে আসে।

‘‘আরেকটু...”

আরও কাছে আসে মেহবুব।

‘‘ঠিক আছে,” ফটোগ্রাফার ক্যামেরায় ক্লিক করতে গিয়ে থেমে যায়। ‘‘এইভাবেই কি থাকবেন?”

‘‘মানে?” আমি বুঝতে পারি না সে কি বলতে চাইছে।

‘‘মানে আপনার প্রেমিক আপনার কাঁধে হাত রাখলে ভালো দেখাতো।”

সে হাল্কা করে জড়িয়ে ধরে আমাকে। আমার দূরের কাঁধে হাত রাখে।

তিনদিন পরে ফটো নিতে গিয়ে জানতে পারি মেহবুব রবিবারেই তিনকপি ফটো এবং নেগেটিভ নিয়ে গেছে। স্টুডিয়োর লোকটি বলে, ‘‘উনি বলেছেন উনি আপনাকে ফটো পাঠিয়ে দেবেন।” মেহেবুব এটা জানিয়ে দিয়ে ভালো করেছে। না হলে আমি

তাকে বিশ্বাসঘাতক ভাবতাম, ভয় পেতাম, মনে হত খুব ভুল করে ফেলেছি। দিন পনেরো বাদে আমি তার চিঠি পাই,

রূপু, আশা করি ভালো আছ। আমার ওপর একদম রাগ করবে না কেমন? অপেক্ষা করতে পারিনি, তাই তুমি সেদিন চলে যাওয়ার পরে আমি স্টুডিয়োর লোকটির কাছে গিয়ে যেভাবেই হোক পরদিনই আমাকে ফটোগুলো ওয়াশ করে দিতে অনুরোধ করি। তোমাকে একটা কপি এবং নেগেটিভ পাঠালাম। দু'কপি আমার কাছে রইল। আবার দেখা হবে।

ইতি,
মেহেবুব।

ব্যাঙ্গালোরের ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার ঘটনা আমাকে বড় একা করে দিয়েছে। বড় অসহায় করে দিয়েছে, বড় হতাশ। আমার একাকীত্ব, অসহায়তা, হতাশা বাড়িওয়ালা মেসোমশায় বোঝেন, বাড়িওয়ালি মাসিমা বোঝেন, খোকনও হয়ত একটু একটু বোঝে—আর কেউ বোঝে না। ঘরে থাকলে আমার বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করে না, বাইরে বেরোলে ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। বসে থাকলে বসেই থাকি, শুয়ে থাকলে শুয়েই। রাতে বিছানায় যাই। রাত কখনো নিদ্রায় কাটে, কখনো অনিদ্রায়। রাত যেভাবেই কাটুক সকালে বিছানা ছাড়ি না। কখনো কখনো দুপুরবেলায় দেখি ঘরের দরজার কড়া খুব জোরে জোরে নড়ছে। নড়ানো হচ্ছে। খুললে খোকনের হাসিমুখের দর্শন হয়। খোকন জিজ্ঞেস করে, "কি ব্যাপার দিদি? বেঁচে আছ নাকি মরে গেছ?" মুখের হ্যা হ্যা হাসি অটুট, "দুপুর হয়ে গেল তবু দরজা খুলছ না দেখে মা বলল গিয়ে দেখ দিদি উল্টোপাল্টা কিছু করে বসল না তো! হ্যা হ্যা, মা ভয় পেয়েছে তুমি হয়ত সুইসাইড করেছ। হ্যা হ্যা।"

খোকন উপরে চলে যায়। একটু পরেই আবার নিচে নেমে আসে, "শোনো, তোমাকে বেশি খাটতে হবে না বুঝলে? মা মাছের ঝোল, তরকারি দেবে। তুমি শুধু ভাতটা রান্না করে নিও। হ্যা হ্যা..."

"শুধু হ্যা হ্যা করছিস কেন?"

"আগেরবার হেসেছিলাম তুমি সুইসাইড করেছ ভেবে মা ভয় পেয়েছে বলে। এবার হাসলাম অন্য কারণে। বললাম না যে তুমি ভাত রান্না করে নিও—ভাত আবার রান্না হয় নাকি! চাল রান্না হয়। চাল রান্না হয়ে ভাত হয়, হ্যা হ্যা।"

খোকনের বত্রিশ পাটি দাঁতের হাসি দেখতে দেখতে নির্বিকার চিত্তে কিছুটা সময় আমি পার করে দিই। সময় হাল্কা লাগে নাকি একইরকম কঠিন তখন বুঝি না। পরে বুঝি হাল্কা যখন দিদি আরও কঠিন সময় নিয়ে আমার কেষ্টপুরের বাড়িতে হাজির হয়। দিদির সঙ্গে হাজির হন আধপাগল জামাইবাবুও। শুনলাম বিয়ের আগেও উনি মাথার গণ্ডগোলে একবার ভুগেছেন। তবে তখন কি করে সুস্থ হয়েছিলেন তার সঠিক খবর আমাদের কারও কাছে নেই। এবার নালাগোলা, বালুরঘাটের সব ডাক্তারের

ব্রেন নিংড়ে ওষুধ খেয়েও কোন লাভ হয়নি। শেষে কলকাতায় জ্যোতিকে দেখানো হবে ঠিক হয়েছে। জ্যোতি মানে ডক্টর জ্যোর্তিময় সমাজদার। ছোটদার বন্ধু।

দিদির পরপরই মেজোমামাও এলেন কেষ্টপুরে। দিদি যেচে বিজয় সরকারের কথা পাড়ল আমার কাছে, ‘‘ওই ছেলেটার সঙ্গে তোর কোন যোগাযোগ আসে নাকি?”

‘‘না।”

‘‘যোগাযোগ রাখবি না। এই বিয়া হোবে না।”

মেজোমামা অবশ্য তেমন বলেন না। উনি বলেন, ‘‘আমি তো জামাইবাবুর (বাবার) না করে দেওয়ার কথা পরে জেনেছি। তোরা ভুল করেছিস। তোদের আমার এবং ছোটদা (অর্থাৎ বড়মামা)র সঙ্গে আলোচনা করতে হত। আমরা তোর বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম এবং উনি একান্তই রাজি না হলে আমরাই করতাম কন্যাদান। পরে বাবা ঠিক মেনে নিতেন।”

‘‘না, বাবা মানত না,” কঠিন দিদির গলা।

‘‘কেন? না মানার কি আছে? ছেলের বেলা তো ঠিক মেনে নিয়েছেন।”

‘ওরা মাহিষ্য ছিল, কিন্তু এই ছেলেটা নমঃশূদ্র।”

‘‘এঃ, মাহিষ্য আর নমঃশূদ্র কি! জাত আলাদা মানে আলাদা।”

মামার কথা শুনে আমি আবার নড়ে উঠি। আকণ্ঠ আবেগ জেগে ওঠে আমার ভেতর। মামাকে বলি, ‘‘এখন আবার বাবাকে বলে দেখুন না।”

দিদি আমাকে ধমকায়, ‘‘খবরদার! বড় বাড়াবাড়ি করিচ্ছিস। বাবার অমতে বিয়া হলে পরে বাবা যদি কিসু করে বসে তালে তার জন্য আমি তোকেই দায়ী করব।”

‘‘আর আমি যদি তোকে দায়ী করে সুইসাইড করি?”

‘‘মারব এক থাপ্পড়!” দিদির বেপরোয়া হাত প্রায় উঠে আসে আমার গালে। ‘‘তোর সুইসাইড করার কি আছে? আমাকে দায়ী করবে! আস্পর্ধা কত!” ভয়ংকর হয়ে ওঠে সে।

সত্যি, আমায় সুইসাইড করতে প্ররোচিত করবে এমন কোনও ব্যথা কেউ তো কখনও আমাকে দেয়নি। দিদি তো নয়ই। আমার বিয়ের বিরুদ্ধে গিয়েও নয়। সুইসাইড আমার কাছে এক বিলাসিতা। সুতরাং এই সুইসাইডকে সেই সুইসাইড বলে মানা হবে না। ভাবা হবে দিদি আমাকে আসলে বিলাসিতা করতে প্ররোচিত করেছে। বিলাসিতা করতে প্ররোচিত করা কোন আইনত অপরাধ নয়। তার জন্য সে শাস্তি পেতেই পারে না। দিদি বলে, ‘‘বাড়িতে য্যায়ে থাক। বিয়ার জন্যে অন্য ছেলে খোঁজা হোবে।”

কলকাতা ছেড়ে দিয়ে বাড়ি গিয়ে থাকার ইচ্ছে আমার নেই। জীবনে কোন লক্ষ্য না রেখে আমার বড় হওয়া, লেখাপড়া শেখা, ডিগ্রি হাসিলের প্রয়াস। বাড়ি ছেড়েছিলাম বাড়ি ছাড়ব বলে, মায়ের কাজ ও হিজিবিজি শাসন থেকে বাঁচব বলে, ছোট এবং মেয়ে হওয়ার অসহনীয় চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারব বলে। বাড়ি ছেড়েছিলাম বালুরঘাট কলেজের তার ছাত্রছাত্রীদের জুওলজি অনার্স পড়তে সুযোগ

দিতে পারার অক্ষমতাকে হাতিয়ার করে। সেই বালুরঘাটে, সেই বাড়িতে আমি কি করে ফিরে যাই! দিদি নিজে যে যন্ত্রণা ওই বাড়িতে পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রণা আমি পেয়েছি। বেশি পাপ করেছি আমি—মাহিনগর গ্রামের এক চূড়ান্ত রক্ষণশীল রাগী হেডমাস্টারের পরিবারে জন্মতালিকায় আর পাঁচ ভাইবোনের নিচে থেকেও মান-সম্মানে তাদের সমকক্ষ হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি, নিজের স্বাধীন অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে মুখে মুখে লড়াই করেছি।

ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার আগেই আমি 'পি এস সি' এবং 'এস এস সি' পরীক্ষার ফর্ম ভরেছিলাম। বিয়ে ভাঙার পর 'এল আই সি', 'ব্যাংক পি ও' এবং আরও অন্যান্য পরীক্ষার ফর্মও ভরি। ভাঙা মন নিয়ে প্রস্তুতি চলে। 'ডব্লু বি সি এস'-এর জন্যও বসব ভাবছি। তার জন্য কোন কোচিং ক্লাসে ভর্তি হতে পারলে ভালো হত। নতুবা কোন সিরিয়াস বন্ধুদের গ্রুপ দরকার যেখানে মিলেমিশে পড়াশোনা করা যাবে। কিন্তু এমন গ্রুপ কোথায়! 'ডব্লু বি সি এস' তো কোন যেমন-তেমন পরীক্ষা নয়। দু'য়েকদিন পরে পরেই প্রদীপদার মেসে যাই, তাঁর সঙ্গে ইংরেজি নিয়ে বসি। কলেজ স্ট্রিট থেকে খান্না পাবলিশারের যত কম্পেটিটিভ পরীক্ষার বই আছে সব কিনে নিয়ে গিয়ে সমাধান করি। আর কার কাছে কেমন জানি না, আমার কাছে অদ্ভুত সহনশীল ওই মানুষটা। আমার জন্য অগাধ সময় তার। আমার সব ব্যাপারে অশেষ আগ্রহ, আমার সমস্যা সমাধানে অকূল আনন্দ, আমাকে সাহায্য করাতে অসীম পরিতৃপ্তি। আমার সঙ্গে রাস্তার চায়ের স্টলের সামনে বেঞ্চে বসে চা সিঙ্গারা খেতে খেতে অম্লান হাসি আমি দেখি তাঁর মুখে। আমার সব অফিশিয়াল এবং ব্যক্তিগত চিঠির জন্য প্রদীপদার মেসের ঠিকানাই আমি ব্যবহার করি। 'ডব্লু বি সি এস' পরীক্ষা দিয়ে কোন অফিসারের চাকরি হোক অথবা স্টাফ সিলেকশন পরীক্ষা দিয়ে কোন কেরানির চাকরি কিছু তো একটা পেতেই হবে। মাহিনগরে মায়ের রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ি ঠেলার চাইতে কেরানির চাকরি অনেক ভালো। আমি দিদিকে জানিয়ে দিই ওর আদেশ আমি মানতে পারব না।

"বাড়িতেই য্যাতে হোবে তোকে। আমি বাবাকে বলব। পড়াশুনা হয়ে গেসে। এখন আর এখানে থাকার কি দরকার!"

"চাকরির চেষ্টা করছি।"

"বাপ্‌রে! চাকরির চেষ্টা করতে হোবে না।"

চাকরি করার স্বপ্ন দিদিরও ছিল। বালুরঘাটে সরকারি চাকরির জন্য অল্পস্বল্প পরীক্ষা সে নিজেও দিয়েছে। পাশ করেনি, তাই চাকরি হয়নি। তারপর সে হাত ধুয়েমুছে বিয়ের জন্য অপেক্ষা করেছে। আমার চাকরির প্রয়োজন সে বোঝে না। দিদিকে আমি চিনছি ধীরে ধীরে। সঠিকভাবে। দিদি চাইছে না আমি ভালো থাকি, ওর চেয়ে ভালো থাকি। দিদি আমার চেয়ে অনেক বড়। ওর আমার বয়সের ব্যবধান এগারো বছরের। এগারো বছরের বড় হলে দিদি সাধারণত আর দিদির মতো থাকে না। দিদি হয়ে যায় মা'র মতো। কিন্তু আমার দিদি প্রথম থেকেই আলাদা। আমি আগে ছোট ছিলাম, এখন বড় হয়েছি। কারও মানতে চাওয়া বা না চাওয়ার ওপর আমার বড়

হওয়া নির্ভর করছে না—এই সত্যিটাই এক কঠিন সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবার জন্য, আমার জন্য তো বটেই। কলকাতায় এসে দিদিও তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে। স্বভাবের ছাঁচে পড়ে আমি ওর সঙ্গে মধুর করে কথা বলছি না। চাইছিই না কথা বলতে। হামেশার মতো এখনও তা তার বদহজম হয়ে যাচ্ছে। স্নান করতে যাওয়া থেকে শুরু করে রান্না করা, শোওয়া, বসা, ওঠা সবকিছুতেই সে আমাকে তার চণ্ডনায়িকা মূর্তি দেখিয়ে চলেছে।

কেষ্টপুরে এসে জামাইবাবুর ঘরে থাকার একেবারেই ইচ্ছে নেই। সবসময় তাঁর ছুটে বাইরে যাওয়ার উপক্রম। রাজীব গান্ধির হত্যার সময় নূপুর বাড়ির দরজা খুলে পালিয়ে যাওয়ার জন্য পাগল হয়েছিল, এখন জামাইবাবু পাগল হয়ে বাড়ির দরজা খুলে পালিয়ে যেতে চাইছেন। আমার ওপর চোখ রাঙাতে গিয়ে দিদি তাঁকে সামলাতে ব্যর্থ। শেষে দেখি খোকন নেমে এসেছে সামলানোর দায়িত্ব নিয়ে। বলছে, ‘‘একি জামাইবাবু, আমরা তো মঙ্গল গ্রহে রকেটে করে যাব ঠিক করেছি। আপনি যাবেন না আমাদের সঙ্গে?’’

‘‘যাব তো।’’

‘‘আপনি এখন বেরিয়ে গেলে কি করে হবে?’’

‘‘বোরোবো না।’’

‘‘কি কি খাবার দাবার নিয়ে যাবেন তার লিস্ট তৈরি করুন।’’

‘‘রসগোল্লা নিয়ে যাব।’’

‘‘বাহ্, ভালো কথা।’’

সহসা জামাইবাবুর মত পরিবর্তন হয়ে যায়, ‘‘না, রসগোল্লা নিয়ে যাওয়া যাবে না।’’

‘‘কেন?’’

‘‘রসগোল্লা রকেট থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে।’’

‘‘তা কেন হবে! রসগোল্লাও রকেটের মধ্যে একই স্পীডে যাবে।’’

‘‘তা ঠিক,’’ ফিজিক্স-এর শিক্ষক হওয়ায় জামাইবাবু মাথা গণ্ডগোল অবস্থাতেও স্পীড, রিলেটিভ ভেলোসিটির ব্যাপারটা মোটামুটি বোঝেন। ‘‘রকেটের মধ্যে কোথায় রাখবে রসগোল্লার ভাঁড়?’’ জিজ্ঞেস করেন উনি।

‘‘এক কোণায় রেখে দেব।’’

‘‘ঠিক আছে।’’ তারপর জামাইবাবুকে অন্য এক চিন্তা পেয়ে বসে। আসামে তখন আলফা অর্থাৎ ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসাম নিয়ে তুমুল হইচই। পুরো ভারতবর্ষ কাঁপিয়ে রেখেছে আলফা। আলফার মূল লক্ষ্য হল ভারত থেকে আসামকে আলাদা করা। আলফার মতে আসাম কখনও ভারতের কোন প্রদেশ ছিল না। কিন্তু ইতিহাস বলে আসামের পুরোটাই সর্বদা ভারতের রাজা বাদশা দিয়ে শাসিত হয়ে এসেছে। একসময় আসাম পাল সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। পালের পর দেব রাজবংশ আসামের অধিকাংশ অঞ্চল শাসন করে। আসামের বাঙালি রাজা বৈদ্য দেব বারাণসীর কামাউলি থেকে ব্রাহ্মণদেরকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নিয়ে এসেছিলেন।

আলফা মূলত একটি আহম অর্গানাইজেশন এবং আহমের সদস্যরা আসামের স্থানীয় লোক নয়। আহমরা আসলে চীনের মঙ্গোলীয় জাতি থেকে উদ্ভূত। আহমরা ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে আসামে প্রবেশ করেছে। আসামের সবাই কিন্তু স্বাধীনতা চায় না। ওখানকার স্থানীয় বোড়ো জাতি তাদের জন্য আলাদা রাজ্য চাইছে। কোচ এবং বারাক উপত্যকার বাঙালিদেরও একই দাবি। যাই হোক, অনেক নিরীহ জনসাধারণকে মেরে ফেলায় ১৯৯০ সালে ভারত সরকার আলফাকে একটি টেররিস্ট অর্গানাইজেশন ঘোষণা করে ব্যান করে দিয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে মিলিটারি অপারেশন শুরু করেছে।

জামাইবাবু খোকনকে জিজ্ঞেস করেন, ‘‘আলফা আবার রকেটে চড়ে বসবে না তো?’’

‘‘না না।’’

নিশ্চিন্ত হয়ে জামাইবাবু খোকনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে আবার দরজার দিকে ছোটেন। বাইরে বেরোতেই হবে তাঁকে। খোকন বলে, ‘‘বাইরে গেলে কিন্তু আলফা আপনাকে ধরে ফেলবে।’’

মুহূর্তে ভুলে গেছেন উনি আলফার কথা। ‘‘কোন আলফা? বাচ্চাদের পড়াতে হবে আলফা বিটা গামা।’’

জ্যোতির্ময়দা এসে ওঁর মাথার ভূত কিছুটা নামান। কিছুটা সুস্থ হন উনি। ওষুধ ভরা বাক্স নিয়ে ফিরে যান বালুরঘাটে।

ককেদিনের মধ্যেই বাবার চিঠি পাই—এখানে চলে আয়। অন্য কোথাও তোর বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে। বুঝলাম দিদির পরামর্শে এই চিঠি। বাবাকে জানাই বাড়িতে এখন যাওয়া সম্ভব নয়। আপনারা বিয়ের চেষ্টা করতে থাকুন। প্রয়োজন হলে আমি বালুরঘাটে গিয়ে আসব।

‘এল আই সি’র একটা পরীক্ষা দিলাম—ইংরেজি এবং অঙ্ক। আমার পেছনে একটি ছেলে বসেছিল। কমার্স নিয়ে ডিগ্রি করেছে। ‘এল অ্যান্ড টি’তে চাকরি করে। মনে হল অঙ্কে বেশ দুর্বল। বারবার আমাকে বিরক্ত করছিল এই অঙ্কটা কি করে করতে হবে ওই অঙ্কটা কি করে করতে হবে বলে। ওকে বলতে গিয়ে আমি নিজে দশ নম্বরের শেষের অঙ্কটা ভুল করি।

পরীক্ষাশেষে বাইরে বেরিয়ে ছেলেটির নাম জানি—সঞ্জয় সরকার। জানি সে আমারই সঙ্গে গ্র্যাজুয়েশন করেছে, অর্থাৎ আমারই বয়সি। সে বলে, ‘‘তুমি অঙ্কে তুখোড় তাই না?’’

আমি হাসি, ‘‘যেমন তুমি ইংরেজিতে।’’

‘‘কেন এমন মনে হল তোমার?’’

‘‘দেখলে না একটা সিনোনিম তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হল?’’ বলার জন্য বলেছি। ছেলেটি আমারই মতো বাংলা মিডিয়ামের। ইংরেজিতে আমি এতটাও দুর্বল নই যে সে বারবার আমার কাছে জিতে যাবে। ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার আগে এবং ব্যাঙ্গালোর

থেকে ফেরার পরে আমি প্রদীপদার সাহচর্যে ইংরেজি ভাষাটা অনেকখানি রপ্ত করে ফেলেছি। আজগুবি আজগুবি বিষয়ের ওপরে আমার এবং প্রদীপদার মধ্যে অনেক রচনা লেখার প্রতিযোগিতা হয়েছে যেখানে আমরা দু'জনে প্রতিযোগী এবং বিচারক একা প্রদীপদা।

সঞ্জয় সরকার সোদপুরে থাকে। সে আমাকে কোথায় থাকি জিজ্ঞেস করলে সত্যি কথাই বলি। আর কোন কথা হয় না ওর সঙ্গে। মাস খানেকের মধ্যে বিদ্যাসাগর কলেজে আর একটা পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখি সেখানেও সঞ্জয় সরকারের আমার ঠিক পেছনেই সীট পড়েছে। সেদিন পরীক্ষার পরে আমরা একটু বেশি সময় একসঙ্গে কাটাই। সঞ্জয় সরকার আমার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি না করি না। আমার বুক তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আগুন নিভিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে তাকে। আগুন নেভাতে বাড়ির কেউ আমাকে সাহায্য করবে না। বাড়ির লোকই তো জ্বালিয়েছে আগুন। সঞ্জয় সরকারের সঙ্গে কয়েকদিন শহরের মধ্যেই ঘুরতে বেরোই—পার্ক স্ট্রিট, ভিক্টোরিয়া, নিক্কো পার্ক এমনকি সাদামাটা কলেজ স্ট্রিটেও। একসঙ্গে হাঁটা, একসঙ্গে ঝালমুড়ি খাওয়া, আইসক্রীম খাওয়া, একসঙ্গে ফিরতে ফিরতে আলাদা হয়ে যাওয়া। আলাদা হওয়ার জায়গা থেকে সঞ্জয় সরকার আমাকে আমার গন্তব্যস্থলের বাসে উঠিয়ে দেয়, দিয়ে নিজে ওঠে। না করলেও শোনে না। আমার প্রতি দায়িত্ববোধ দেখায়। এমনই দায়িত্ববোধ দেখাতে দেখাতে একদিন রাতে শিয়ালদা ফ্লাই ওভারের কাছে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে সে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আমি 'হ্যাঁ' বলতে পারি না। কারণ 'এল আই সি'র পরীক্ষার পরেই সে 'এল অ্যান্ড টি'র চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। আমি ওকে 'না'ও বলতে পারি না। বাড়ি থেকে যেভাবে আমার ওপর বালুরঘাটে ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে তা থেকে মুক্তি পেতে কিভাবে কখন কার সাহায্যের প্রয়োজন হয় কে বলতে পারে! আমি সঞ্জয় সরকারকে আমার সমস্যার কিছু কথা সংক্ষেপে বলি। সঞ্জয় সরকার বলে, "বুঝতে পেরেছি তোমার এখন একটা ফিনিশড গুডের দরকার। চিন্তা করো না। আমার চাকরি পেতে বেশিদিন লাগবে না।" সেই রাতেও সঞ্জয় সরকার আমাকে বাসে উঠিয়ে দেয়। দেওয়ার আগে বলে, "মনে রেখো এখন থেকে আমি হলাম তোমার সবসময়ের সঙ্গী।"

সঞ্জয় সরকারকে আমার ছোকরা ছোকরা লাগে। আজকাল অনেক সমবয়সি ছেলেমেয়েরা প্রেম করে বিয়ে করছে। ক্লাসমেটদের মধ্যে প্রেম হলে অনেকসময় দেখা যায় মেয়েরা ছেলের চেয়ে বড়। সুদীপ্তদাও প্রেম করেছে ওর ক্লাসমেট অপর্ণার সঙ্গে। শুনেছি অপর্ণা সুদীপ্তদার থেকে দু'মাসের বড়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা ছেড়ে দিলে আমাদের বাস্তব জীবনে আমার চোখের সামনে মেয়ে বড় ছেলে ছোটর প্রথম দৃষ্টান্ত অপর্ণা এবং সুদীপ্তদা। বাসে উঠিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করলেও সঞ্জয় সরকারকে আমার দায়িত্বশীল মনে হয় না। সঞ্জয় সরকার ভালো গল্প লেখে, একটি গল্প নিয়ে এসে সে আমাকে পড়ে শুনিয়েছে। গল্প আমিও লিখি, আমিও ওকে পড়ে শুনিয়েছি আমার লেখা তিনটে গল্প। সঞ্জয় বলেছে, "তুমি এত সুন্দর লেখো। চলো

তোমাকে আমি একজন প্রকাশকের কাছে নিয়ে যাব। ওঁর যাজন নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বেরোয়। উনি তোমার গল্প ছাপবেন।"

"তুমি তাহলে তোমার গল্প ওখানে ছাপছ না কেন?"

"আমি তো শুধু লিখতে ভালো লাগে বলে লিখেছি। লেখক হওয়ার কোন স্বপ্ন আমার নেই।"

"লেখক হওয়ার স্বপ্ন কেউ দেখে না। লেখকরা তোমারই মতো লিখতে ভালো লাগে বলেই লেখেন।"

"যদি তাই হয় তাহলে প্রকাশ করার জন্য পাগল হয় কেন?"

"বারে, তাঁরা চাইবেন না পাঠক তাঁদের লেখা পড়ুক? চিত্তবিনোদন করুক? অথবা সমাজ এবং রাজনীতিতে কি ঘটে চলেছে তা নিয়ে অবগত থাকুক? তুমি পারো—লেখাকে বাক্সবন্দী করে রাখো।"

সঞ্জয় সরকার হাসে। বলে, "ওই তো মাত্র দুটো ছোট গল্প লিখেছি। আরও লিখতে পারলে তবে না!"

যাজনে গিয়ে প্রকাশকের সঙ্গে আলাপ করা ছাড়া আর কোন কাজ হল না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার খুশিতে সঞ্জয় সরকার পরিদন একটা সাড়ে সাতশো এম এল-এর রামের বোতল নিয়ে আমার ঘরে এল। সোডাওয়াটার ছাড়া এমনকি জল ছাড়া গিলে ফেলল সেগুলো। তারপর বোতল খালি করে ভুল বকতে বকতে বিদায় নিল।

পরদিন আবার এল সে। আমাকে ওর দ্বিতীয় গল্পটা পড়ে শোনালো। "কেমন লাগল?"

"মন্দ নয়, তবে আগের গল্পটা বেশি ভালো ছিল।"

"তোমার আরেকটা গল্প পড়ে শোনাও।"

"এখন নয়।"

"কেন?"

"এমনি।"

"না শোনাও।"

"না।"

"তাহলে কবিতা পড়ে শোনাও।"

"অন্যদিন।" আমার মুড একদমই ঠিক নেই। বাবার আরেকটা চিঠি পেয়েছি। লিখেছেন উনি রিটায়ার করেছেন, আমাকে টাকা পাঠাতে পারবেন না।

সঞ্জয় সরকার আমার পাশে রাখা কবিতার খাতাটি টেনে নেয়। সেখান থেকে আজেবাজে কবিতা পড়তে শুরু করে। আমি রেগে গিয়ে এক ঝটকায় ওর হাত থেকে নিয়ে নিই খাতা। সে এবার আমার সঙ্গে কাড়কাড়ি শুরু করে। আমি খাতাকে বাঁচাতে পাশের ঘরে ছুটে যাই। সঞ্জয় সরকারও ছোটে আমার পেছনে। কিন্তু এবার সে খাতায় কোন আগ্রহ দেখায় না। সোজা জড়িয়ে ধরে আমাকে। শক্ত করে। আমি ওর দু'বাহুর বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে অসফল হই। তাই আমার

নিজের দু'হাত বুকের সামনে ঠেলে দিয়ে ওর আমার মাঝে প্রাণপণে এক দূরত্ব স্থাপন করি। অনেক ধস্তাধস্তি করেও তার পক্ষে সেই দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব হয় না। কয়েক সেকেন্ড পরে সে আমাকে ছেড়ে দেয়। আমরা আমার বেডরুমে আসি। মনে হয় সঞ্জয় সরকারকে একটা চড় মেরে বিদায় করি। কিন্তু তাতে তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি হবে, চড়-চাপটের শব্দ হয়ত বাড়িওয়ালা পাবেন এসব ভেবে সামলে নিই নিজেকে।

সঞ্জয় সরকার বলে, ‘‘এত আপত্তি কেন? আমরা বিয়ে করছি তো।’’

‘‘সে অনেক দূরের কথা।’’

‘‘দূরের কথা নয়। একটা চাকরি পেলেই করব।’’

‘‘সেটাও অনেক দূরের কথা।’’

‘‘কেন? বিশ্বাস নেই আমার ওপর? নাকি তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও না?’’

বিয়ে নিয়ে মৌখিক তর্কে না গিয়ে আমি ওকে বলি, ‘‘কবিতা পড়তে চেয়েছিলে. পড়ো,’’ কাড়াকাড়ির ধকলে অর্ধেক ছিঁড়ে যাওয়া খাতার একটা পাতা খুলে তার সামনে ধরি। তাতে লেখা আছে—

বিয়ে করবো না, বলিনি তা।
আমি শরীরের বিয়ের আগে মনের বিয়ে চাই।
তাছাড়া মনের বিয়ে ছাড়া তো শরীরের বিয়ে হয় না।
যদি না মানো তাহলে বলি,
আগে আমি একবার দেহদান করেছি।
পারবে আমাকে হৃদয় দিতে?

‘‘মনের বিয়ে তো আমাদের হয়েই গেছে,’’ কবিতা পড়ে বক্তব্য সঞ্জয় সরকারের।

‘‘সাকার করা হয়নি সেই বিয়েকে।’’

‘‘কি করে সাকার করতে হয়?’’

‘‘রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে।’’

‘‘আঃ,’’ হতাশায় ডান হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে মাথার ব্রহ্মতালুর সমস্ত চুলকে পেছনে ঠেলে দেয় সে। উঠে দাঁড়ায়, চলে যায়। পরদিন নতুন এক প্রশ্ন নিয়ে আবার উপস্থিত হয়, ‘‘তুমি কি আগে কারও সঙ্গে কোন শারীরিক সম্পর্ক করেছ?’’

আমি চুপ। নিজেকে নিয়ে এমন প্রশ্ন-উত্তরের অধিবেশন একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত।

‘‘তোমার কয়েকটা ফটো দাও।’’

‘‘কি করবে ফটো নিয়ে?’’

‘‘আমার কাছে রেখে দেব। ফটোতে তোমাকে প্রতিদিন দেখব।’’

‘‘কি হবে দেখে?’’

‘‘বোঝ না কি হবে? অনুভূতি...অনুভূতি...ভালবাসার অনুভূতি পাব। সকালে ঘুম থেকে উঠে...ব্রেকফাস্টের সময়...রাস্তাঘাটে...পরীক্ষার হলে...দুপুরে খাওয়ার সময়...বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে...রাতে ঘুমোতে গিয়ে। রাতে তোমার ভালবাসার অনুভূতি না পেলে আমার ঘুম আসবে না।’’

“কিন্তু...”

“কিন্তু কি?”

“আমি আমার ফটো কাউকে দিই না।”

“তুমি তোমার ফটো এতদিন পর্যন্ত কাউকেই দাওনি?”

বলি ‘না’ কথাটা একেবারেই সত্যি নয় তবু। ফটো আমি একবার একজনকে দিয়েছিলাম। মেহবুব।

সঞ্জয় সরকার আমার অ্যালবাম থেকে কয়েকটি ফোটো বের করে নিয়ে যাবে বলে। আমি বাধা দিই, কাড়াকাড়ি করতে চায়। আমিও আরও বেশি করে বাধা দিই, ফটো না পেয়ে সে রেগেবেগে চলে যায়। আমি বুঝে যাই সঞ্জয় সরকারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক টিকবে না। সত্যিই টিকল না সম্পর্ক। ওর আসা বন্ধ হল।

মেহবুব আজ আমার তোমাকে খুব মনে পড়ছে। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে। মুখে বলোনি, কিন্তু মনে মনে আমায় চেয়েছিলে খুব। না হলে তুমি সেদিন আমাদের প্রথম সাক্ষাতের পরেই ঝিলমিলে বসে বসন্তের সেই দুপুরে কেন জিজ্ঞেস করবে, “আচ্ছা রূপু, আমি যদি তোমাকে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে রাখতে চাই তুমি কি থাকতে পারবে সেখানে?” আমি সেদিন এক কথায় উত্তর দিয়েছিলাম, “না।” তুমি আর কিছু বলোনি। তুমিও বুঝে গিয়েছিলে এটা সম্ভব নয়, টানাটানি করে লাভ নেই। তাই সেদিন স্টুডিয়োর লোকটি তোমাকে আমার প্রেমিক ভাবলেও তুমি বাইরে বেরিয়ে কিছুই বললে না। তোমার মনের গভীরতা আমায় মুগ্ধ করেছে। অন্য ছেলে হলে কেলিয়ে কেলিয়ে হাসত, “হ্যা হ্যা...।” বলত, “শুনেছ লোকটা কি বলল? আমি নাকি তোমার প্রেমিক।” তুমি আমাকে কিছু বলোনি, তাই বলে আমাকে সহজে ভুলে যেতে চেয়েছ তা-ও নয়। তুমি আমাকে চিঠি লিখেছ নিয়মিত। ইন্ডিয়াতে আবার এসেছ শুধুমাত্র আমার সঙ্গে দেখা করতে। এক বছর ধরে শুধু আমার ফটো দেখেই মন শান্ত থাকেনি তোমার। তাই, তাই মেহবুব সেদিন নাগরদোলাতে তুমি আমার সঙ্গে অমন করলেও শেষপর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে আড়ি নিতে পারিনি। হেরে গেছি। যাক আর কিছু তোমার জন্য করতে না পারি এটুকু বন্ধন তো রাখতে পেরেছি। জানি না আর কখনও তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে কিনা, তোমার খোদার কাছে এই-ই দোয়া চাইব যে উনি যেন তোমাকে ভালো রাখেন, সুখে রাখেন।

গৌতমও আমাকে চিঠি লেখে। সাধারণ চিঠি। ‘তুমি কেমন আছ? আমি ভালো আছি। আমাদের এখানে এই হয়েছে, ওই হয়েছে, তোমার কথা খুব মনে পড়ছে’—এসব। অমিতাভের কথাও জানতে চায় সে। গৌতম একদিকে আমায় সতর্ক করতে থাকে আমি যেন অমিতাভের সঙ্গে কোনমতেই আর যোগাযোগ না রাখি, অন্যদিকে আশাও করে আমি অমিতাভের খবর জেনে তাকে দেব। গৌতমের চাওয়া বা না চাওয়ার দিকে দৃষ্টিপাত না করে আমার নিজের চাওয়া থেকেই অমিতাভ

নামের লোকটিকে পুরোপুরি আমার জীবন থেকে বিলুপ্ত হতে দিইনি। তার ঘরের সেই কেসটি এখনও চলছে। কবে তার নিষ্পত্তি হবে নাকি আদৌ হবে না কে জনে। অমিতাভ মাঝে মাঝে বলে হাতিবাগানের এই ঘরটি ছেড়ে সে ব্যারাকপুরে চলে যাবে। সেখানে তার কাকারাও আছেন। তাঁরাও বলেছেন এসব মামলা-মোকদ্দমা ছেড়ে দিতে। বলে কিন্তু যায়ও না। কার মোহে এখানে টিকে আছে বুঝতে পারি না। সে কি সুমিতা নাকি দেবযানী নাকি মিনু? নাকি কাকলি আবার ফিরে এসেছে তার জীবনে? যদি তাই-ই হয় তাহলে আমি কয়েকদিন ওর ঘরে না গেলে তার আবেগপূর্ণ চিঠি পাই কেন!

তুমি এলে না
কেন এলে না?
তোমার স্বপ্ন আমার তরী একই স্রোতে ভাসিয়েছিলাম।
ডুবেছিল তা—এ নয় কোন ছলনা।
উদাসী হাওয়ার গান গেয়ে যাই,
কোথায় আমার সুখের চাবি?
নিমেষে হারিয়ে গেলে?
শুধু তোমারই অপেক্ষায় কাটিয়েছিলাম।
অহর্নিশিতে।

আর যদি সে এখনও আমাকে ভালবাসে তাহলে ওর ঘরে গেলে আগের মতোই কেন দেখা পাই সুপ্রিয়া, মালবিকা, লিসা, আরতির! একদিন ওকে বলি, ‘‘আমাকে আর ডেকো না। তোমাতে আমার আর কোন আগ্রহ নেই।’’

‘‘কেন?’’

‘‘আমি প্রেম করছি।’’

শুনে চোখ বড় হয়ে যায় অমিতাভর, ‘‘কার সঙ্গে?’’

‘‘তোমারই বন্ধু সে।’’

‘‘আমার বন্ধু! জয়ন্ত? তার তো বিয়ে হয়ে গেছে...’’

‘‘আর কেউ নেই? ঠিক করে মনে করে দেখো।’’

‘‘আর আছে সুমিত। কিন্তু সুমিতের সঙ্গে তোমার প্রেম হতে পারে না।’’

‘‘কেন?’’

‘‘আরে সুমিত তো ছোটবেলা থেকে প্রেম করছে পিয়ালি নামের একটি মেয়ের সঙ্গে।’’

‘‘ছোটবেলা থেকে প্রেম করছে তো এতদিনও বিয়ে করেনি কেন? বয়স তো বত্রিশ-তেত্রিশ হয়ে গেল?’’

‘‘ওই যে ওর বাড়ি থেকে রাজি হচ্ছে না। সুমিত বলেছে অন্য মেয়েকে সে বিয়ে করবে না। বরং সারাজীবন আইবুড়ো থাকবে। সুমিতকে বাদ দিলে রইল মৃণাল। কিন্তু...’’

‘‘কিন্তু কি?’’

"শুনছি আগামি মাসে মৃণালের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হবে।"

"আর কেউ নেই?"

"আছে কিন্তু তুমি তাদের চেনো না।"

"গৌতমের কথা ভুলে গেলে?"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ, গৌতম। গৌতমের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল। কিন্তু সে তো ত্রিপুরাতে থাকে। তুমি ত্রিপুরাতে গিয়ে থাকবে?"

অদ্ভুত! সে আমাকে নিয়ে এত বিরহের কবিতা লেখে অথচ মিথ্যে হলেও বা আমি ওর বন্ধু গৌতমের সঙ্গে প্রেম করছি জেনেও মনে কোন জ্বলন নেই।

কয়েকদিন পরেই গৌতমের কলকাতায় আসার কথা। কিন্তু তার আগে এল ছোটদা। নেরিস্ট থেকে সে বালুরঘাটে গিয়েছিল। বালুরঘাট থেকে কলকাতা হয়ে আবার নেরিস্টে ফিরে যাবে। ছোটদা এসে বলল, "তোর জন্য একটা খারাপ খবর আছে। বাবা বলে দিয়েছেন তোর যদি বাড়ি ফিরে যেতে আপত্তি থাকে তাহলে কলকাতার সব খরচা তোকেই ম্যানেজ করতে হবে।"

"এত টাকা কি করে ম্যানেজ করব? সল্ট লেকের মেয়েটির ক্লাস টেনের বোর্ডের পরীক্ষা হয়ে গেছে। ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার কারণে অন্য টিউশনও বন্ধ হয়ে গেছে। খোকনকে বলেছিলাম একটি টিউশন দেওয়ার কথা। কিন্তু সে বলেছে ওকে ছেড়ে কেউ আমার কাছে আসতে চাইছে না। ওর কাছে অনেকদিন ধরে পড়ছে তাই। কেবলমাত্র একটা ক্লাস ফোরের ছাত্র পেয়েছি। সেখান থেকে দেড়শো টাকা আসে। আমার কম্পেটিটিভ পরীক্ষার ফর্ম আর ফী ভরতেই খরচ হয়ে যায় তা।"

ছোটদা একটু ভেবে নেয়। বলে, "তুই যতদিন চাকরি না পাচ্ছিস আমি তোকে ঘরভাড়াটা দেব। বাকিটা নিজে অ্যাডজাস্ট করতে পারবি তো?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে। তাহলে আর কিছু না ভেবে পরীক্ষাগুলো দিয়ে যা।"

মাথা থেকে এক বড় বোঝা নামল। কয়েকমাস ধরে আমার কলকাতায় থাকা না থাকা নিয়ে বাড়ির সঙ্গে চলা টানাহেঁচড়ার অবসান ঘটল তাহলে।

ছোটদা চলে যাওয়ার দু'দিনের মধ্যে আমার জন্য আরেকটা সুখবর তৈরি হল। এইচ এস বি সি ব্যাংকে আমার একটা লিখিত পরীক্ষা ছিল—তার রেজাল্ট বেরিয়েছে। আমি পাশ করেছি তাতে। মোট সাড়ে তিনশো পরীক্ষার্থী ছিল, তার মধ্যে মাত্র বাইশ জনকে বাছা হয়েছে। সামনে তাদের গ্রুপ ডিসকাশন আছে। ইংরেজিতে। বিষয় আমার কাছে কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হল ভাষা। ইংরেজিতে লেখা আমার কাছে যত সহজ বলা ততটাই কঠিন। কোন স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসে ভর্তি হব কিনা ভাবছি। হলেও বা, একমাসে কি এমন আর বাজিমাৎ করতে পারব! গৌতমকে একেবারেই সময় দেওয়া যাবে না মনে হচ্ছে। প্রদীপদা মোটামুটি ইংরেজি বলেন। ওঁর সঙ্গে এবার ইংরেজিতে কথা বলার প্রতিযোগিতা লাগাতে হবে। আলোচনা করে দেখি কি বলেন। এলোপাথাড়ি ভাবতে ভাবতে আরও এক সপ্তাহ কেটে যায়। এক সপ্তাহ পরে একদিন বিকেলে প্রদীপদার কাছেই যাওয়ার ইচ্ছেতে তৈরি হচ্ছি,

এমন সময় মাসিমা আমায় ডাকেন, ‘‘রূপু, বিলুর চিঠি এসেছে গো। এই দেখো তোমাকেও লিখেছে।’’ হাতে একটা চিট ধরিয়ে দেন উনি। তাতে পড়ি ছোটদার কথা, ‘‘ঘরের ভাড়া আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তুই ঘরটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেড়ে দে। আমি মেসোমশায়কেও এব্যাপারে বিস্তারিত লিখেছি। তাই বাকিটা উনিই তোকে বুঝিয়ে বলবেন।’’

আমি দিশেহারা। মাসিমা চিন্তাগ্রস্ত, ‘‘বিলু বলেছে তোমাকে ঘরটা সামনের মাসেই ছেড়ে দিতে হবে। দেখো তো কি সমস্যা! তুমি এমনিতেই মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছ। আমরা জানি তুমি চাকরির চেষ্টা করছ। কি করে তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলি বলো দিকিনি?’’ সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে পড়েন মাসিমা। ‘‘মেসোমশায় বলেছেন তুমি এখানেই থাকো। তোমাকে ভাড়া দিতে হবে না। তোমার বাড়ির লোকজন কেমন গো? বিয়েটাও ভেঙে দিলেন।’’

আমি ভাবছি ছোটদা কেন এমন করল! ক’দিন আগেই সে আমাকে নিশ্চিন্ত করে গিয়েছিল। মাঝখানে কি এমন ঘটল যে ক’দিন পরেই সে তার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলল! প্রদীপদার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, ‘‘এখন আমার কি করা উচিত?’’

‘‘কি আর করবে! উনি থাকতে দিয়েছেন। থাকো।’’

‘‘এটা অন্যায় হবে না?’’

‘‘অন্যায় কেন! উনি তো নিজেই বলেছেন,’’ প্রদীপদা এ বিষয়ে মাথা ঘামাতে চান না। ‘‘চলো চা খেয়ে আসি।’’

‘‘আমার কাছে পয়সা নেই।’’ এর আগে চা খেতে গিয়ে মাত্র দু’য়েকবারই আমি দাম দিয়ে থাকব তবু এবার যে সে সম্ভাবনা একেবারেই শূন্য তা জানিয়ে দিই।

আমার কথা শুনে মুচকি হাসেন প্রদীপদা, ‘‘তোমাকে পয়সা দিতে হবে না।’’

আমার মনে হল শুধু চা কেন! সিঙ্গারা কিংবা অন্য কিছু ভারি খাবার খেতে পারলে ভালো হত। তাহলে রাতের খাওয়ার খরচটা বাঁচাতে পারতাম। প্রদীপদার টাকাপয়সার অবস্থা আমার মতো সঙিন নয়। মেসে বিনে পয়সায় থাকছেন এবং টিউশন করে পেট ভরছেন। তাঁর জামাকাপড়, জুতোর পেছনে ব্যয় নেই বললেই চলে। ধূমপানের নেশা আছে কিন্তু তা বিড়ি দিয়েই সেরে ফেলা হয়।

চা খেতে খেতে প্রদীপদাকে গ্রুপ ডিসকাশনের ব্যাপারটা জানাই। বলি, ‘‘তোমাকে আমায় স্পোকেন ইংলিশ শেখাতে হবে।’’

‘‘আপত্তি নেই। কিন্তু একটা শর্ত আছে।’’

‘‘কি শর্ত?’’

‘‘আমাকে একটা জিনিস দিতে হবে।’’

‘‘কি জিনিস?’’

‘‘দুটো শূন্য।’’

হা করে তাকিয়ে থাকি প্রদীপদার মুখের দিকে। মাথার উপর দিয়ে চলে যায় শূন্য।

‘‘বুঝলে না?’’

"না।"

"ভাবো, ভাবো...একটা বড় শূন্যের উপরে একটা ছোট শূন্য... কি হতে পারে?"

ইঙ্গিত পেয়ে হয়ত বুঝতে পেরেছি হয়ত বা নয়। যদি মনে হচ্ছে বুঝতে পেরেছি লজ্জায় প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞেস করে যাচাই করে নিতে পারছি না কতটা প্রখর আমার আই কিউ। তাই বোকা হয়েই বসে থাকি।

"এই সাধারণ জ্ঞানটুকু না থাকলে কি করে গ্রুপ ডিসকাশনে পাশ হবে? স্পোকেন ইংলিশ শিখেও তো কোন লাভ হবে না মনে হচ্ছে," হাসেন প্রদীপদা। আমি হজম করি সেই হাসি। প্রদীপদা যাই বলুন আমি জানি ইংরেজি ভাষাটাকে মেরামত করে নিতে না পারলে গ্রুপ ডিসকাশনে আমি আটকে যাবই। জড়ানো জিভের উপর ভাঙা ভাঙা ইংরেজির কচকচানি আমাকে কোনই সাহায্য করতে পারবে না। বিশেষত সেই জন্যই আমার প্রদীপদাকে দরকার। নিজেকে বোকা স্বীকার করেই যতদিন সম্ভব যতটা সম্ভব প্রদীপদার সাহায্যের চাদর আমার মাথার উপর টানতেই হবে।

ক'দিনের মধ্যেই 'এল আই সি'র পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়। চার্টে আমার নাম নেই। সঞ্জয় সরকারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কেটে যাওয়ার পরে সে শুধু একবারই এসেছিল জানাতে যে পরীক্ষায় সে পাশ করেছে। আমার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে সে চাকরিটা পেল। আমি পেলাম না। প্রদীপদার শর্ত সঠিক না বুঝে এবং না বোঝার কারণে না মেনে তাঁর কাছে মাঝে মাঝে যাচ্ছি ইংরেজি ভাষার তালিম নিতে। গৌতম ত্রিপুরা থেকে এসেছে। পরপর দু'দিন কেষ্টপুরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। হাতে একদমই টাকাপয়সা নেই। নানা প্রাইভেট কম্পানিতে চাকরির চেষ্টা করছি। ঘরে বেশি থাকছিই না। মাঝখানে একদিন হাতিবাগানে জার্নালিজমের ক্লাসমেট জেসিকার সঙ্গে দেখা। সেও বড়বাজারের দিকে কোন একটা প্রাইভেট কম্পানিতে কাজ করছে। মাইনে বারোশো টাকা। জেসিকা খুব খুশি। "জব এক্সপেরিয়েন্স ছাড়া ঢুকে শুরুতেই চার অঙ্কের মাইনে পাচ্ছি। খারাপ কি বল!" গলায় গদগদ স্বর টেনে সে বলে। খারাপ কেন হবে! ওকে দেখে আমার মনের ইচ্ছে অদম্য হয়। আজও ক্যামাক স্ট্রিটে একটা ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছি। ফিমেল অফিস অ্যাসিসট্যান্টের পোস্ট। মাইনে জেসিকার সমান, বারোশো টাকা। ইন্টারভিউ মানে শুধু বায়োডেটা জমা করে মুখ দেখিয়ে আসা। বলেছে পরে জানাবে। আরও এগারোটি মেয়ে এসেছিল। অ্যাকাউন্ট্যান্টকে জিজ্ঞেস করে জানলাম গত এক সপ্তাহ ধরে ইন্টারভিউ চলছে। প্রতিদিন পনেরো ষোলোটা করে মেয়ে এসে বায়োডেটা জমা করে যাচ্ছে।

বিকেলে ঘরে ফিরতেই গৌতম এল। বিছানায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় বেরোচ্ছ রোজ রোজ?"

"বিশেষ কোথাও না।"

"অমিতাভর ওখানে যাচ্ছ নাকি?"

"না না।"

তার চোখের ভাষা বলে সে বিশ্বাস করেনি। আমিও তাকে বিশ্বাস দেওয়ার জন্য

উঠেপড়ে লাগি না। গৌতমের সঙ্গে আসলে আমি বেশি কথাই বলি না। বলতে পারি না। প্রদীপদার কাছে আমি অনেক সহজ। সুদীপ্ত, অরুণ, আনিসুর সবার কাছেই সহজ। এমনকি বাদলের সঙ্গেও কথা বলতে আমি অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম না। অমিতাভ, যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে গৌতমের এত কৌতূহল সেই অমিতাভর সঙ্গেও না। গৌতমের সঙ্গে সহজ হতে আমি বাধা অনুভব করি, যেমন বিজয় সরকারের সঙ্গে করতাম। এদের সামনে আমি যেন এক অন্য আমি—ঠিক লজ্জাবতী নয়—মিতভাষী, অন্তর্মুখী, গম্ভীর একটি মেয়ে।

আমার ‘না না’ শুনে গৌতম কয়েক সেকেন্ড আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কি যেন ভাবল। তারপর টেবিল চাপড়ানোর মতো করে বিছানা চাপড়ে বলল, ‘‘চলো কোথাও থেকে ঘুরে আসি।’’

‘‘খুব ক্লান্ত আজ।’’

‘‘তোমাকে হাঁটতে হবে না। এখান থেকেই ট্যাক্সি ধরে নেব।’’

আমরা যাই মিন্টো পার্কে। একটা সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চে বসি পাশাপাশি। আমি পরে আছি ফিকে সবুজ রঙের সিল্ক শাড়ি। সন্ধে নামল বলে। কখন অন্ধকার এসে শহরকে ঢেকে ফেলে এই ভেবে রাস্তার লাইটপোস্টগুলো ঝুঁকি না নিয়ে আগে থেকেই আলো বিতরণ শুরু করে দিয়েছে। সেই আলোতে আমি বুঝতে পারছি গৌতমের চোখ আমার দিকে। দেখছে আমায়। দেখছে, চোখ সরিয়ে নিচ্ছে, আবার দেখছে, আবার চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। আমার অস্বস্তি হচ্ছে। তবু আমি ওকে কিছু বলতে পারছি না। কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছি না যা ওকে বলা যায়। একবার ভাবলাম বলি, ‘‘ওভাবে কি দেখছেন?’’ মন বাধা দেয়—না বলা যাবে না। যদি সে বলে ‘আমি তোমাকে দেখছি না তো! আমি তো সামনের ওই গাছটাকে দেখছি’ খুব লজ্জা পাব। মনে হবে বোকা বোকা কথা বলে ফেলেছি। একবার ভাবলাম বলি, ‘‘চলুন উঠি, বড্ড মশা কাটছে।’’ মন আবারও বাধা দেয়—এটাও বলা যাবে না। উত্তরে যদি সে বলে ‘তাই নাকি? আমার কাছে সরে এসে বসো, আমি তাড়িয়ে দেব মশা’ তাহলে কি করব? কাছে গিয়ে বসব? না না, পারব না। তাই নীরবতার সঙ্গে হাত মেলাই।

সে বলে, ‘‘সন্তোষপুরে একটা জমি কিনেছি। বাড়ি বানাব। কলকাতায় এসে ছুটিগুলো কাটিয়ে যেতে পারব তাহলে। অন্যের বাড়িতে কতদিন আর থাকা যায়!’’

নীরবতা।

‘‘কলকাতা আমার খুব ভালো লাগে।’’

নীরবতা।

‘‘তোমার কলকাতা ভালো লাগে না?’’

‘‘লাগে।’’

‘‘আর কোন শহর ভালো লাগে?

‘‘কলকাতা ছাড়া অন্য অনেক শহর তো ঘোরা হয়নি। শুধু ব্যাঙ্গালোরে গেছি।’

‘‘কেমন লেগেছে ব্যাঙ্গালোর?’’

"খারাপ নয়।"

"গোয়াতে যাওনি কখনও?"

"না।"

"আমারও যাওয়া হয়নি। কিন্তু খুব ইচ্ছে যাওয়ার। ঠিক করেছি ওখানে আমি হানিমুন করতে যাব, প্রথমবার।"

নীরবতা।

"কিছু বললে না যে!"

এবারও আমি চুপ। ভাবি ওর ইচ্ছে, ওর স্বপ্ন—আমার কি বলার আছে! নিশ্চয় বলা যায় না 'হ্যা হ্যা, ভালো কথা। যান, বউয়ের সঙ্গে গিয়ে ঘুরে আসুন'।

"কি হল?"

"কই? কিছু না তো!"

"তুমি যাবে আমার সঙ্গে?"

"আমি কেন?"

"আমি তোমাকেই নিয়ে যেতে চাই গোয়াতে।"

আমি চুপ। মাত্র কয়েকদিন আগে অমিতাভকে বলা মিথ্যে কথাটা সহসা সত্যি হয়ে আসতে চাইছে আমার জীবনে। কেমন করে এটা সম্ভব! আমি তো তাকে শুধু বলার জন্য বলেছিলাম, বলে ভুলেও গিয়েছিলাম। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি, 'রূপু, তুমি কি সত্যিই গৌতমের সঙ্গে পার্কে বসে আছ নাকি ঘরে একা বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছ?' *না, স্বপ্ন নয়। উজ্জ্বলা বলেছিল, মনে হচ্ছে তোমাকে গৌতমদার ভালো লেগেছে। দেখে নিও, এই ছেলেটিই তোমাকে প্রপোজ করবে।*

"শুনেছ কি বললাম?"

"হুঁ।"

"আমি হ্যাঁ কি না জানতে চাইছি।"

হঠাৎ করে এমন প্রশ্ন এবং এখনই 'হ্যাঁ' বা 'না'তে উত্তর পাওয়ার তাড়া। কি করে দিই উত্তর! তাকে আমি ভালমত জানলাম না। ভাবার জন্য, তাকে জানার জন্য দু'য়েকদিন সময় চেয়ে নেব সেও সম্ভব নয়। আজ বাদে কাল সে আবার ত্রিপুরাতে চলে যাবে। মেহবুবের বাংলাদেশের মতো ত্রিপুরাও আমার অদেখা, অচেনা এক জায়গা। বাংলাদেশে যেতে খুব বেশি টাকা না লাগলেও পাসপোর্ট, ভিসা লাগে। ত্রিপুরাতে যেতে পাসপোর্ট, ভিসা লাগে না, বেশি টাকা লাগে। ফ্লাইট ছাড়া ওখানে যাওয়া যাবে না। গৌতমের আগে আমি বাদল এবং নূপুরকে ফ্লাইটেই ত্রিপুরায় যাতায়াত করতে দেখেছি।

"আপনি পরের বার কলকাতায় এলে ...," কম্পিত গলা আমার।

"এখন নয় কেন?"

"এমনি।"

আমার হঠাৎ মনে হল বালিগঞ্জে বড়মামার বাড়ি গেলে মন্দ হয় না। মিন্টো পার্ক তো বালিগঞ্জ থেকে এমন কিছু দূরে নয়। নিয়ে গেলাম গৌতমকে। এই প্রথম

মামার বাড়িতে কোন ছেলেকে নিয়ে আমার প্রবেশ। দেখলাম মামিমা লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান সুদর্শন যুবকটিকে দেখে খুশিই হলেন। অনেক আদর আপ্যায়ন করলেন। আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, ‘‘ছেলেটি তো বেশ। তোদের মধ্যে কি বিয়ের কোন কথাবার্তা হয়েছে?’’

‘‘কি প্রলাপ বকছ!’’

রাতে গৌতম আমাকে ট্যাক্সি করে কেষ্টপুরে পৌঁছে দেয়। বলে, ‘‘কাল সকাল দশটায় তোমাকে নিতে আসব। তুমি দমদম এয়ারপোর্টে আমাকে সী-অফ করতে যাবে।’’

ভরসা দেওয়ার চেষ্টা করে সে, ‘‘তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমি অমিতাভর বন্ধু বটে, কিন্তু অমিতাভর সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। জানো কিনা জানি না আগরতলার এম এল এ অমল দাশগুপ্ত আমার কাকু। তাঁর কোন ছেলেমেয়ে নেই। আমি আমাদের বংশের একমাত্র সন্তান। কাকু-কাকিমা আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি যখন আগরতলাতে যাই, রাতে বাইরে বেরোলে তাঁরা আমার ফেরার অপেক্ষা করেন, আমাকে ছেড়ে খাবার পর্যন্ত খান না।’’

পরদিন সকালে গৌতম এসে দেখে আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি।

খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে, ‘‘কি গো, এখনও ঘুমচ্ছো? নাও নাও তাড়াতাড়ি শাড়ি পরে নাও।’’ দেরি হয়ে যায়।

বাড়ির বাইরে গিয়ে গৌতম একটা রিকশাতে চড়ে, আমাকে পাশে বসায়। জিজ্ঞেস করি, ‘‘আপনার কোন লাগেজ নেই।’’

‘‘আছে।’’

‘‘কোথায়?’’

‘‘ট্যাক্সিতে?’’

‘‘কোথায় ট্যাক্সি?’’

‘‘ভি আই পি রোডে।’’

‘‘ট্যাক্সি ড্রাইভার কি আপনার চেনা?’’

‘‘না।’’

‘‘যদি সে লাগেজ নিয়ে পালিয়ে যায়?’’

‘‘পালাবে না।’’

‘‘কি করে বুঝলেন?’’

‘‘সে ঘুমোতে ভালবাসে। আমি ওকে ট্যাক্সিতে ঘুমোতে বলে এসেছি।’’

আমি হাসি।

‘‘শুধু তাই-ই নয়। বলেছি ঘুমনোর জন্য সে দু’গুন টাকা পাবে।’’

ভি আই পি রোডে পৌঁছে দেখি ট্যাক্সি আছে, ট্যাক্সি ড্রাইভার নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে পাওয়া যায় দূরে একটি গাছের নিচে। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। হাত-পা-চুল ধরে টানাটানি করে জাগানো হয় ড্রাইভারকে। এত দূরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে, ট্যাক্সির গরমে শুধু ঘুমই হয়, নাক ডাকা হয় না।

এয়ারপোর্টে চেকিং এর আগে অনেকক্ষণ বাইরে আমার পাশে বসে থাকে গৌতম। একদমই কাছে। ঘনিষ্ঠ হয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে। মনে হয় সে আমায় বোঝাতে চাইছে কলকাতা এবং ত্রিপুরার মধ্যেকার ব্যবধান প্রকৃতপক্ষে শূন্য। মনে হয় সে আমার মন পড়তে চাইছে। মনের সব 'না'গুলোকে তার হ্যাঁ-বাচক রাস্তায় চালাতে চাইছে। চালিয়ে নিচ্ছেও সে সেই রাস্তায়। তার মতো করে। দু'পাশে সুরক্ষার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সেই রাস্তা। তবু আমার ভয় করে। সে অবশ্য বলছে, "এত ভীতু হলে চলবে না। তোমার বাড়িতে না মেনে নিলেও আমার কোন অসুবিধে নেই। আমি যে কোন অবস্থাতেই তোমাকে গ্রহণ করতে রাজি আছি। এখানে কোন সমস্যা দেখা দিলেই ফ্লাইটের টিকিট কেটে সোজা আগরতলা এয়ারপোর্ট পৌঁছে যাবে। আমি আসব রিসিভ করতে। এয়ারপোর্ট থেকে তোমাকে নিয়ে সোজা চলে যাব আমাদের বাড়ি।" গৌতম জানে না যে আমার নিজের পা-টাই আসলে ভাঙা।

আমার প্রথম চাকরির অভিজ্ঞতাটি বেশ খারাপ। জয়েন করেছিলাম সেই ক্যামাক স্ট্রিটে, কামাডিয়া'র কম্পানিতে। কম্পানি ট্রান্সফরমার তৈরি করে। প্রোডাকশন ইউনিট অন্য জায়গাতে। ক্যামাক স্ট্রিটে অফিস। চাকরিটি যে অতি সহজেই হয়ে গিয়েছিল তা নয়। ইন্টারভিউ দিয়ে আসার এক সপ্তাহ পর থেকেই আমি ফলো আপ শুরু করেছিলাম। প্রথমবার যখন ফলো আপে গেলাম তখন বস কামাডিয়া অফিসে ছিলেন না। অ্যাকাউন্ট্যান্ট বলেছিলেন, "উনি নাগপুরে গেছেন। এখনও কাউকে সিলেক্ট করেননি। কয়েকদিন বাদে আসবেন। তারপর বোঝা যাবে।" সেই কয়েকদিনের মধ্যে আরেকটা ইন্টারভিউ-এ গিয়েছিলাম। ভিডিওকনের একটি শোরুম একজন রিসেপশনিস্ট চেয়েছিল। চাকরি সামান্য, একটি পোস্ট কিন্তু লাইনে প্রার্থী দাঁড়িয়েছিল অন্ততপক্ষে আড়াইশো জন। ইন্টারভিউ শুরু হয়েছিল সকাল এগারোটায়। লাইন পড়েছিল সকাল আটটা থেকে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম শেষের দিকে। আমি পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই বিকেল চারটের দিকে অন্য কাউকে সিলেক্ট করে নিয়েছিল ওরা। যারা আমার কাছেই সামনে পেছনে দাঁড়িয়েছিল তাদের মুখে শুনলাম ইন্টারভিউটা আসলে লোকদেখানো। সিলেকশন তো আগেই হয়ে ছিল। কোন একজনকে তারা নাকি বলতে শুনেছে ক্যাশ-এর লোকটি মেয়েটির পরিচিত।

দিন দশেক পরে কামাডিয়ার অফিসে গিয়ে দেখি তখনও কামাডিয়ার কেবিন ফাঁকা। কিন্তু অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টের চেয়ারে একটি মেয়ে বসে আছে। অ্যাকাউন্ট্যান্ট বললেন, "বস মাঝে একবার এসে এই মেয়েটিকে অ্যাপয়েন্ট করে আবার নাগপুরে গেছেন। আপনি দিন পনেরো পরে আসুন।"

"এসে আর কি হবে? পোস্ট তো আর খালি নেই," মনমরা উত্তর।

"আসুন তো," গম্ভীর হয়ে উনি আমাকে আদেশ দেন।

সেই পনেরো দিনের মধ্যে খবরের কাগজ দেখে ফিলিপ্স-এর শোরুমের জন্য ইন্টারভিউ দিতে গেলাম। সেখানে ইন্টারভিউ শুরু হওয়ার কথা ছিল দশটায়। আটটায়

গিয়ে শুনি সকাল ছ'টা থেকে লাইন পড়েছে। লাইনে দাঁড়িয়ে সাত-আট ঘণ্টা বিভিন্ন মহিলার গল্প শুনলাম। কেউ আগের এমনই কোন শোরুম থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে, কেউ গৃহবধূ, প্রথমবার চাকরির চেষ্টায় বাইরে এসেছে, কেউ শিশুসদনের অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগাতে চাইছে। গল্প শুনতে শুনতে রাত হয়ে এল, বন্ধ হল ইন্টারভিউ-এর দরজা।

সেই পনেরো দিনের মধ্যে 'এইচ এস বি সি' ব্যাংকের গ্রুপ ডিসকাশনে আমি ছাঁটাই হলাম। সেই পনেরো দিনের মধ্যে ডেইলি স্টেটসম্যানের এক সিনিয়র রিপোর্টারের সঙ্গে আমার বাসে আলাপ হল, আমি তাঁকে চাকরির প্রয়োজনের কথা বললাম, উনি আমাকে তাঁর অফিসে দেখা করতে বললেন, আমি গেলাম এবং গিয়ে বুঝলাম উনি আমার চাকরিতে কম এবং আমার সঙ্গে বন্ধুত্বে বেশি আগ্রহ রাখছেন।

সেই পনেরো দিন পরে অ্যাকাউন্ট্যান্টের কথামতো আমি আবার কামাডিয়ার অফিসে গেলাম। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টের চেয়ার খালি দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "মেয়েটি কি অফিস ছেড়ে দিয়েছে?"

"না, ওকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"কেন?"

"কাজ পারে না তাই। আপনাকে বসের পছন্দ হয়েছ। কথা বলুন। হয়ে যাবে চাকরি।"

"কি কি কাজ করতে হবে?"

"সবই করতে হবে, যেমন ফাইল ঠিকমতো সাজিয়ে রাখতে হবে, পার্টির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিন তারিখ লিখে রাখতে হবে, ক্লায়েন্ট এলে তাদের বসতে দিতে হবে, কিছু চিঠিপত্র লিখতে হবে...টাইপ জানেন তো?"

"না," টাইপ না জানার লজ্জায় চুপসে যাই।

"চিন্তার কিছু নেই। টাইপ মেশিন আপনার টেবিলেই আছে। একা একাই শিখে নিতে পারবেন," আশ্বস্ত করেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

বসের কেবিনে ডাক পড়ল। কামাডিয়া আমায় দেখে হাসলেন। প্রথমদিন লক্ষ্য করিনি। আজ করলাম বিশেষত হাসলে কামাডিয়াকে অনেকটা বানরের মতো দেখতে লাগে। উনি আমাকে সামনের চেয়ারটিতে বসতে বললেন। বসলাম কিন্তু বসতে না বসতেই উঠতে হল। কেননা ওঁর যা বলার তা উনি একবাক্যে বলে ফেলেছেন—কালকে থেকে এসো। তারপর দাঁত না বের করা আকর্ণবিস্তৃত হাসির বাইরে আর কোন কথা বাঁচিয়ে রাখেননি যা শোনার জন্য ও বোঝার জন্য আমাকে বসে থাকতে হবে। 'ঠিক আছে' বলে আমি উঠে দাঁড়াই। বসের কেবিন থেকে বেরিয়ে অ্যাকাউন্ট্যান্টকে বলি, "থ্যাংক ইউ।"

"দেখুন আগে কতদিন চাকরিটা রাখতে পারেন।"

"কেন এমন বলছেন?"

"এখানে কারও চাকরি বেশিদিন টেকে না।"

খুশির খবর ঠিক তৈরি হতে হতেও হল না। দুশ্চিন্তা সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরি। দুশ্চিন্তা নিয়ে পরদিন অফিসে যাই। দুশ্চিন্তা নিয়েই বসি টেবিলে। টেবিলটা বসের কেবিনের দরজার ঠিক সামনে। অফিসে উনি, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, অফিস বয় এবং আমি। আর কেউ নেই। মাঝে মাঝে দেখি লোকজন কামাডিয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাদের আমি বসার জায়গা দেখিয়ে দেওয়ার আগেই তারা বসে যায়। তাদের দিকে আমি ভালো করে তাকিয়ে ওঠার আগেই তারা আমাকে ভালো করে দেখে নিতে চায়। তাদের আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আমাকে নিয়ে তাদের মুখে জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে। তারা সব বসের পুরনো ক্লায়েন্ট। অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাছে তারা সব পুরনো মুখ যেমন তাদের কাছে অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তারা আশা করে আমি না, ওই ভদ্রলোকই যেন তাদের আসার খবর বসকে দেন।

অফিসে জয়েন করে আমি অ্যাকাউন্ট্যান্টের নাম জেনেছি—অসিত দাস। সংক্ষেপে দাস বলেই ডাকা হয় তাঁকে। প্রথমদিনই কামাডিয়া দাসকে বলে দিয়েছিলেন উনি যেন আমাকে টাইপিংটা শিখিয়ে দেন। তাই উনি টাইপিং শিখিয়েছেন। দু'দিন ছেড়ে তিন দিনের দিন সকালে কামাডিয়া নাগপুরে গেছেন এক সপ্তাহের জন্য। যাওয়ার আগে যেহেতু আমাকে আর কিছু শেখাতে বলেননি, দাস আমাকে আর কিছু শেখানোর আগ্রহ দেখান না। বস ফিরে এলেন নাগপুর থেকে। এসে উনি নিজেও আমাকে আর কোন কাজ শেখানোর নাম করেন না। খুব ব্যস্ত থাকেন। বস মাঝে মাঝে ড্রাইভার নিয়ে চটপট বেরিয়ে যান, আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরে কেবিনে ঢুকে পড়েন। মাঝে মাঝে দাসকে ডাকেন কেবিনে, অনেকক্ষণ ধরে কি সব হিসেব নিকেশ করেন তাঁর সঙ্গে, মাঝে মাঝে তাঁকে দিয়েই আমাকে দু'য়েকটি চিঠি টাইপ করতে বলেন। সময় নিলেও আমি মোটামুটি সঠিকভাবেই টাইপ করে দিই চিঠি। কামাডিয়া আবার কলকাতার বাইরে যান, আবার ফেরেন। আবার তিন চারদিন একইভাবে কেটে যায়। লোকজন আসে, বসে, আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। কেন তাকিয়ে থাকে, কি ভাবে তারা আমাকে নিয়ে জানি না তবে আমার মনে হয় ওরা আমার চেয়ে অফিসটাকে অনেক বেশি জানে, অনেক বেশি বোঝে। দু'দণ্ডের জন্য এলেও ওরা অফিসে আমার চেয়ে অনেক বেশি সাবলীল। এখানে ওরা জড়তা ছাড়া চলাফেরা করে আর আমি বসে থাকি জড়তা নিয়ে। ওদের তাকিয়ে থাকাতে আমাকে কেমন একটা অস্বস্তি গ্রাস করতে থাকে। ভাবি এই কারণেই বুঝি মেয়েরা এখানে টিকতে পারে না। দাস আমাকে মিথ্যে কথা বলেছেন—আগের মেয়েটিকে বস ছাড়াননি, মেয়েটি নিজেই অফিস ছেড়ে দিয়েছে এইসব লোকের অশোভন চাহনি সহ্য করতে না পেরে।

এক রবিবারে অমিতাভ আসে আমার ঘরে। বলে, ‘‘একটা বিশেষ কারণে তোমার কাছে এলাম।’’

‘‘টাকার দরকার তো?’’ জানি বিশেষ কোন কারণ বলতে অমিতাভ টাকাই বোঝে।

‘‘তুমি চাকরি করছ আমাকে জানাওনি তো!’’

‘‘সবে তো ঢুকেছি। সময় পেলাম কোথায়!’’

“তাই? চাকরিটা ছেড়ে দাও।”

“কেন? তুমি আমায় টাকা দেবে বুঝি?”

“আমি তো পাঁচশো টাকা মাইনে পাই। নিজের খরচাই চলে না। সেখান থেকে তোমাকে আর কি দেব?”

“তাহলে?”

সিগারেট ধরায় অমিতাভ। সদ্য জ্বলা সিগারেটে একটা লম্বা তৃপ্তির টান দিয়ে বলে, “লোকটা ভালো না।”

“কোন লোক?”

“তোমার বস।”

“তুমি কি করে জানলে আমি কোন অফিসে আছি?”

“আমার পরিচিত একজন সেখানে গিয়েছিল। সে তোমাকে দেখেছে।”

“সে আমাকে চিনল কি করে?”

“সে আমার বাড়ির কাছেই থাকে। তোমাকে আমার ঘরে আসতে দেখেছে, তাই চেনে।”

“লোকটা ভালো না মানে?”

“ভালো না মানে ভালো না।”

“সে তার ব্যক্তিগত জীবন কিভাবে কাটাচ্ছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা করার কি প্রয়োজন? ছাড়ো এসব কথা। তুমি লোকটিই বা কীসের ভালো! তোমার ঘরে গেলে সকালে শুভ্রাকে দেখি, দুপুরে সুমিতাকে, বিকেলে দেবযানীকে, রাতে মিনুকে। শুধু তাই নয়...”

“গৌতম জানে তুমি চাকরি করছ?”

আমার মনে পড়ে অমিতাভকে আমি গৌতমের সঙ্গে প্রেম করার কথা মিথ্যে মিথ্যে বলেছিলাম। চাকরি নিয়ে চর্চা ভালো লাগছিল না। কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার এই সময়। বললাম, “গৌতমের সঙ্গে প্রেম করছি জেনে তোমার একটুও খারাপ লাগেনি তাই না?”

“খারাপ লাগার কি আছে! আমি জানি তুমি ত্রিপুরাতে গিয়ে থাকতে পারবে না। শেষপর্যন্ত পিছিয়ে আসবে।”

“পিছিয়ে এসে কার কাছে যাব? তোমার কাছে? সেই আশা নিয়ে তুমি থাকো। তাও আবার একশো মেয়ে দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে।”

সিগারেটে শেষ টান দেয় অমিতাভ। হাসি হাসি মুখ কিন্তু আদপে হাসি নেই, “দশটা টাকা দাও তো।”

এবার আসল কথায় এসেছ । “আমার কাছে টাকা নেই।”

“মাইনে পাওনি?”

“না।”

“কতদিন আগে জয়েন করেছ?”

“মাত্র উনিশ দিন হয়েছে।”

"ওহ্, আর কয়েকদিন বাদেই মাইনে পেয়ে যাবে। দাও না টাকা। চুল কাটতে হবে।"

"চুল তো ছেঁটেই এসেছ দেখছি।"

আমার কথা শুনে চমকে ওঠে সে। মাথায় হাত বুলিয়ে হাসতে হাসতে বলে, "হ্যাঁ গতকাল সুমিতের কাছ থেকে টাকা ধার করে ছেঁটেছি। ওটা ওকে ফেরত দিতে হবে।"

টাকা নিয়ে ভালবাসি বলে আমাকে বিভ্রান্ত করে চলে যায় সে।

অমিতাভ যা-ই বলুক কামাডিয়া লোকটিকে আমার মন্দ লাগে না। তবু অফিসে যেতে ইচ্ছে করে না। কারণ সেখানে আমার কাজ কম। ভালো না লাগার আরেকটি বিশেষ কারণ হল কামাডিয়ার ক্লায়েন্টগুলো। ভাবছি কামাডিয়াকে বলব ওদের বলে দিতে ওরা যেন আমার দিকে অমনভাবে তাকিয়ে না থাকে। যদি কামাডিয়া না বলে আগের মেয়েটির মতো আমাকেও অফিস ছেড়ে দিতে হবে। খুঁজতে হবে অন্য চাকরি। আবার দাঁড়াতে হবে সেই ভিডিওকনের শোরুমের ইন্টারভিউয়ের লাইনে, ফিলিপস-এর শোরুমের ইন্টারভিউয়ের লাইনে বা অনুরূপ অন্য কোথাও। আবার আমার ডাক আসার আগেই অন্য মেয়ের সিলেকশন হয়ে যাবে অথবা রাত হওয়ায় বন্ধ হয়ে যাবে অফিসের দরজা, আবার বাসে বা ট্রামে বা রাস্তায় কারও সঙ্গে আলাপ হবে, তাকে বলব আমার একটা চাকরি দরকার, সে বলবে আমার অফিসে এসো, আমি যাব কিন্তু সে আমার চাকরির কথায় না গিয়ে বলবে চলো কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি, কি করে তুমি এই ভরা যৌবন নিয়ে একা থাকো? উপভোগ করো জীবন। শরীর আমার, যৌবন আমার, চিন্তা তার, আফসোস তার। তা হোক, পরেরটা পরে ভাবব, অন্য চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত ঘরে না খেয়ে কাটাবো তাও মঞ্জুর। নইলে ক্লায়েন্টগুলোর চোখের খিদে শেষ করে দেবে আমায়।

কামাডিয়ার অফিস ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারার আগেই দিদি আবার এল আমার কেষ্টপুরের বাড়িতে। জ্যোতির্ময়দার ওষুধ খেয়েও জামাইবাবু বেশিদিন সুস্থ থাকলেন না। আবার তাঁকে দেখানোর প্রয়োজন এল সেই জ্যোতির্ময়দাকেই। দিদির মেয়ের বয়স এখন ছয়। তার একটি ছেলেও হয়েছে। ছেলের নাম শুভ। এবার সে শুভকে নিয়ে এসেছে। বাড়িতে পা রেখেই দিদি শুরু করে—জামাইবাবুর বাথরুম দরকার, উনি স্নান করবেন। জামাইবাবুর পরে শুভর জন্য বাথরুম দরকার, শুভকে পরিষ্কার করতে হবে, সে প্যান্টে হেগে ফেলেছে। দিদির নিজেরও বাথরুম দরকার, তাকেও স্নান সারতে হবে। রান্নাঘর দরকার দিদির। রান্নাঘরে একটাই স্টোভ, গুটিকয়েক বাসনপত্র যা আছে তা তারই লাগবে। শুভর জন্য জল গরম করতে হবে, দুধ গুলতে হবে তাতে। সামান্য যেসব শাকসবজি কেনা আছে রান্না করতে হবে। জামাইবাবু খাবেন। একমাত্র আমার ঘরটি ছাড়া সব ঘরের ওপর মেনে নিই ওদের আধিপত্য। ওদের সবার বাথরুমের প্রয়োজন মিটলে তবেই আমি যেতে পারব বাথরুমে। তাই স্নান না করেই আমাকে অফিস যেতে হবে। রান্নাঘরের ক্ষেত্রেও

একই ব্যাপার—ওদের সবার প্রয়োজনশেষে ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ হলে আমি খুলতে পারব সেই দরজা। রান্না করতে পারব। কিন্তু যেহেতু অফিস আমার ঘরের সমস্যা বুঝে বসে থাকবে না, বেরিয়ে যেতে হবে খালি পেটেই। কলহ আমার নিতান্তই অপছন্দের জিনিস, তাই নীরবতা দিয়ে সামনা করি প্রতিকূলতার। নীরব হতে হতে দিদির সঙ্গে আমার কথা বন্ধ হয়। জামাইবাবুকেও উপেক্ষা করি। আমার ব্যবহার সবসময়ের মতো এখনও দিদির কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তার রাগে গজগজ মুখ দেখি। মাঝে মাঝে সেই রাগ বোমা হয়ে বেরিয়ে আসে। লক্ষ্য করে আমাকেই। এখানে মা নেই যে দশবারের মধ্যে একবার হলেও সেই বোমার আঘাত থেকে আমাকে রক্ষা করবেন। কোনই সুরক্ষা আবরণ নেই আমার চারপাশে। পুরোপুরি অনাবৃত আমি।

অফিস থেকে প্রদীপদার মেস হয়ে ঘরে ফিরি। মেসে যাওয়ার কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে—একটু পড়াশোনা, একটু চিঠিপত্রের খোঁজ নেওয়া, একটু দিনের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা। দিনের ঘটনাবলীর পর্যালোচেনায় এই মুহূর্তে অফিসের বাইরে দিদি ছাড়া আর কারও কথা আমার মুখে আসছে না। তার অকারণ খবরদারিতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। ঘরে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

প্রদীপদা অবশ্য আমার দিদি সংক্রান্ত সমস্যাকে একদমই পাত্তা দিতে চান না। হেসে বলেন, ‘‘অকারণ খবরদারি উনি করতেই পারেন, উনি তোমার দিদি।’’ উনি অনুমানের ওপর ভিত্তি করে অভিযোগ লাগান, ‘‘তুমি নিশ্চয় ওনার কাজে মোটেও সাহায্য করছ না?’’

‘‘কি সাহায্য করার প্রয়োজন আছে বলে তোমার মনে হয়?’’

‘‘ওই যেমন বাজারহাট করে দেওয়া...’’

কেষ্টপুরের বাড়িতে যখন দিদি আসে তখন মনে হয় দিদিই বাড়িটি ভাড়াতে নিয়েছে, দয়া করে থাকতে দিয়েছে আমায়। বাজারহাট আমি করতেই পারতাম, কিন্তু এড়িয়ে গেছি। করতে গিয়ে দেখব টাকাপয়সা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। এমনিতেই অনেক মানসিক চাপ রয়েছে। আমি প্রদীপদার কাছে আমার নিরুপায় অবস্থা ব্যাখ্যা করি।

‘‘বাচ্চাটাকে আদর করো?’’

শুভ, বাচ্চা ছেলেটি মাঝে মাঝে আমার ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসে। মাথা তুলে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। আমার মন ব্যাকুল হয় ওকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করার জন্য। কিন্তু সাহস হয় না, হয়ত দিদি ‘ওকে ছুবি না’ বলে খেঁকিয়ে উঠবে। প্রদীপদার কাছে এব্যাপারেও নিজেরই অসহায়তা তুলে ধরার চেষ্টা করি।

‘‘আমি বুঝতে পারছি কিন্তু উনি তোমাকে বুঝবেন না। যেভাবেই হোক খোশামোদ করে তোমাকে চলতেই হবে।’’

অমিতাভ যা-ই বলুক, প্রদীপদা আমাকে অফিস ছাড়ার কথাও বলেন না। তাঁর বক্তব্য, ‘‘এখনই অফিস ছেড়ে পালানোর কি আছে! দেখোই না কি হয়।’’

রাগে ফেটে পড়ি প্রদীপদার ওপর, ‘‘তুমি আমাকে শুধু সহ্য করার শিক্ষা দিয়ে

যাও, শক্ত হওয়ার শিক্ষা দিয়ে যাও, মেরে ফেলতে চাও আমার সব আবেগগুলোকে। আমি কি তাহলে রক্ত মাংসের মানুষ থেকে পরিবর্তিত হয়ে একটি পাথরের কিংবা ধাতব মূর্তি হয়ে যাব? তাহলেই কি তুমি খুশি হবে?”

আমার রাগ দেখেও, রাগের কথা শুনেও প্রদীপদা রাগেন না। ঠোঁটের উপর হাসিকে একইভাবে টিকিয়ে রেখে বলেন, “জীবনকে জানা এখনও তোমার অনেক বাকি। সিরিয়াসলি ভেবে দেখেছ তোমার কলকাতায় থাকার, পরীক্ষায় বসার খরচাটা কোত্থেকে আসবে?”

সেদিন প্রদীপদার মেস থেকে আমি গৌতমের চিঠি নিয়ে ঘরে ফিরি। চিঠি গৌতম নিজে লেখেনি, তার সমবয়সি কোন মামাকে দিয়ে লিখিয়েছে। আমি ওর প্রস্তাবে হ্যাঁ বা না সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় চেয়েছিলাম। কিন্তু চিঠি পড়ে তার প্রয়োজন হবে না বলে মনে হল। ফুলস্কেপ দু'পাতা ভরা মামার বিশাল বড় চিঠির সারপদার্থটি হল,

“বনানী, গৌতমের মুখে তোমার অনেক কথা শুনেছি। শুনেছি সে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। তুমি ওকে তোমার মামা-মামিমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে ভালো করেছ। তোমাদের পরিবারের অনেক কিছু তাতে স্পষ্ট হয়েছে। বুঝতে পেরেছি যে তুমি অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছ। অভিজাত পরিবারে তোমার জন্ম হয়েছে। অভিজাত পরিবারে লালনপালন হয়েছে। গৌতম হয়ত নিজের মুখে তার নিজের সম্পর্কে অনেক কথা তোমাকে বলতে পারেনি। তাই আমাকে বলতে হচ্ছে—গৌতম দক্ষিণ ত্রিপুরাতে জোলাইবাড়ি নামে একটি অজপাড়াগাঁর ছেলে। আগরতলাতে তার কাকু-কাকিমা আছেন বটে কিন্তু সে তো থাকে সেই জোলাইবাড়িতেই। তুমি কি সেখানে থাকতে পারবে? মানিয়ে নিতে পারবে তাদের পরিবারের সঙ্গে নিজেকে? গৌতম ভয় পাচ্ছে হয়ত পারবে না। এমতবস্থায় তোমাকে খুব ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সিদ্ধান্ত হ্যাঁ হলে আজীবন গৌতমের সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিতে হবে। স্নেহাশিস নিও।”

কি করে দেব প্রতিশ্রুতি! হাওয়াই জাহাজে উড়ে গিয়ে বলব, ‘এই আমি তোমার বাড়িতে এসে খুঁটি গাড়লাম। তোমাকে ছেড়ে, এই বাড়ি ছেড়ে কোনদিনও কোথাও যাব না?’ আর বললেই যে দু'দিন বাদে তাঁরা আমার সেই খুঁটি উপড়ে ফেলে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন না তার ভরসা আমায় কে দেবে? ভয় তো আমারও আছে। আমি জানি আমার নিজের পছন্দ করা কোন ছেলেকে বাড়ির কেউ সাগ্রহে গ্রহণ করবে না। সুতরাং ভবিষ্যতে সেই ছেলের সঙ্গে আমার বনিবনা না হলে ফিরে এসে ওঠার জন্য কলকাতার ফুটপাথ ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকবে না। আত্মীয়-পরিজন আজও যে খুব পাশে রয়েছে তা নয়। তবু তাদের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্নও তো হয়ে যাইনি। কখনও মনে হয় এই পাতলা সুতোটি কেটে গেলেই বা কি এমন আর ক্ষতি হয়ে যাবে! আবার কখনও মনে হয় পাতলা হলে কি হবে, এই সুতো অনেক শক্ত। কখনও অগাধ জলে পড়ে হাবুডুবু খেলে এই সুতোই আমাকে তীরে টেনে নিয়ে এসে বাঁচাবে। কখনও মন মনকেই উপহাস করে, “তোমার এখনকার অবস্থাটি

কি? এটাকে অগাধ জলে পড়ে হাবুডুবু খাওয়া বলে না তো কি বলে?" কখনও মন মনকেই সেই উপহাসের উত্তর দেয়, "হয়ত এখনও আরও খারাপ দিন দেখা বাকি আছে।"

সেদিন সকালে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিলাম যে স্নান করেই অফিসে যাব। আটটায় বাথরুমে গিয়ে দেখি বালতিতে জল ভরা আছে। জলের উপর আয়রনের হলুদ স্তর। কেষ্টপুরের জলে আয়রন অনেক। আয়রন মাসিমাদের বাড়ির দরজা-ঘেঁষা কলপাড়কে হলুদ রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে, বাথরুমের মেঝেকে হলুদ রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে, বাড়ির বাইরের বারান্দা-ঘেঁষা নালীটিকেও রাঙাতে ছাড়েনি আয়রন। হ্যান্ড পাম্পটি নিজেও আয়রনের করুণা থেকে বঞ্চিত হয়নি।

বালতির জল ফেলে আমি কলপাড়ে আবার নতুন জল ভরতে যাই। হঠাৎ দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করে, "বালতির জলটা ফেললি ক্যান?" গলা তার রীতিমত মোটা এবং ভারি।

"জলটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"

"না খারাপ হয়নি। আমি অর (জামাইবাবুর) স্নানের জন্যে ভরে র‍্যাখছিলাম।"

"আমি স্নান করে আবার ভরে রাখব।"

আমার উত্তর পেয়ে দিদি মোটেও খুশি নয়, "তোর এখন স্নানের কি দরকার?"

"আমাকে অফিস যেতে হবে।"

"অফিসে তো তুই স্নান না করেই যাস।"

"অন্যদিন সুযোগ পাই না তাই করি না। আজ করব।"

"তুই অকে অপমান করার জন্যে জলটা ফেলছিস।" অকে মানে জামাইবাবুকে।

"বললাম তো স্নান করে ভরে রাখব।"

"স্নান করে ভরে র‍্যাখলেই হয় না। এত আস্পর্ধা তোর অকে অপমান করিস? বিষ্ণুকে বলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে এই বাড়ি থ্যাকে ব্যার করে দিব।"

"তা কি করে সম্ভব। বাড়ির ভাড়া তো ছোটদা দেয় না!"

"না দিলে কি হোবে! এই বাড়িটা ও-ই নিসল ভাড়াতে। সাহস কত! মুখে মুখে তর্ক!" বাড়িওয়ালি মাসিমাকে ডাকে সে, "দেখছেন কি বলে! ছোটদা ভাড়া দেয় না! ভাড়া এ দেয় নাকি! আপনারা দয়া করে থাকতে দিয়েছেন বলেই তো থাকছে।"

মাসিমা কোন উত্তর দিতে পারেন না। দিদির শাসানি চলতে থাকে আমার ওপর, "ব্যারায় যা এই বাড়ি থ্যাকে...।"

বেরিয়ে তো গিয়েছিলাম কিন্তু অফিসের জন্য নয়। রাস্তায় এলোমেলো হাঁটছিলাম, একটি অসহায় মেয়ে হয়ে। মনে হচ্ছিল এই পৃথিবীতে সেই মেয়েটি একদমই একা। আত্মীয়স্বজন, পরিবার-পরিজন কেউ নেই তার সঙ্গে। তার সঙ্গে শুধু 'আমি' আছি। হ্যাঁ, শুধু আমি। সেই 'আমি'টা বেশ কিছু সময়ের জন্য খুব বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। আজকের রাতটা তার কাছে কত ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে জেনেও সে মেয়েটিকে

একদমই সাহায্য করতে পারছিল না, কোন দিশা দেখাতে পারছিল না। ভাবছিল মণিকার বাড়ি যাওয়া যাবে না। মণিকা এখন বাপের বাড়িতে থাকে না। তার নতুন আস্তানা হল সল্টলেকের শ্বশুরবাড়ি। মণিকার বরের সঙ্গেই মেয়েটির বিশেষ আলাপ নেই, কথাবার্তা নেই। বাকিরা তো পরে আসে। কোনরকম পূর্বাভাষ ছাড়া হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের ক্রন্দনরত মুখ দেখিয়ে বলা যায় না 'মণিকা রে, ওকে রাতে আশ্রয় দে' অথবা তাকে এটাও বলা যায় না 'মণিকা তোর বাপের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দে।'

সেই বেশ কিছু সময় পরে সে সেই মেয়েটিকে চৈতালির কথা মনে করিয়ে দেয়।

চৈতালির বাড়িতে আমার হঠাৎ হঠাৎ চলে যাওয়াটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাই সে আমাকে দরজায় দেখে অবাক হয় না। অবাক হয় যখন আমি ভেতরে ঢুকে বলি, আমি এখানে কয়েকদিন থাকতে চাই।

"থাক। তাতে দ্বিধার কি আছে! কিন্তু কেন রে? কোন সমস্যা হয়েছে?"

সমস্যার কথা বলতে চেয়ে বলতে পারছি না। চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

"কি হয়েছে? কাঁদছিস কেন? বল।"

মাসিমা রান্নাঘর থেকে জিজ্ঞেস করেন, "কি হয়েছে রে চৈতি?"

"বনানী এখানে এসেছে কয়েকদিন থাকবে বলে। কিন্তু কি সমস্যা হয়েছে বলতে চাইছে না। শুধু কাঁদছে।"

"ওমা তাই নাকি!" রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে স্নেহভরা বুক নিয়ে কাছে আসেন মাসিমা, "আমরা সবাই তোর নিজের লোক। মা রে, বল কি হয়েছে।"

তবু আমার মুখ খোলে না। মেসোমশায় আশপাশে ঘুরঘুর করেন। আমি বললে উনি শুনবেন কিন্তু বলার জন্য জোর করবেন না। কয়েকদিন কেন, কয়েকমাস মেসোমশায়ের বাড়িতে থাকলেও তাঁর কোন আপত্তি থাকবে না।

চৈতালি মাকে বলে, "থাক, জোর করো না। ওর যখন বলতে ইচ্ছে করবে তখন বলবে।"

আমি বসে থাকি, কাঁদি, খাব না খাব না করে কাটিয়ে দিই সারাদিন। সন্ধের পরে একতলা বাড়ির ছাদে চাঁদের আলোতে একটু একটু করে ঠাণ্ডা হই, একটু একটু করে মনের যন্ত্রণা বাইরে বের করি। সবশেষে জানাই ছোটবেলা থেকে এরা আমার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করে এসেছে—শাসানো, ধমকানো, দাবিয়ে রাখা, আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা-ইচ্ছেকে না জানতে চাওয়া, আমার প্রয়োজনকে না মানা—এক কথায় আমার সত্তার স্বাধীনতাকে পায়ের তলায় চাপা দিয়ে রাখা।

"সে কি রে! আগে তো এসব কথা কখনো বলিসনি! আমার তো মনে হত তুই তোর দাদা-দিদিদের খুব প্রিয়। মনে আছে দুর্গা পুজোয় মিষ্টির টাকা চাওয়ার কথা। সেই ভালবাসাটা কি মিথ্যে ছিল?"

"একদমই না।"

"তবে?"

"সেইসব ছিল সাময়িক ভালবাসা। অনেক অত্যাচারের মধ্যে একটা ভালবাসা।

বাঁদরকে লাঠি দেখিয়ে নাচ নাচিয়ে ভালবাসার মতো ভালবাসা। আসল প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকে আমি অতি পরিমিত সাহায্য পেয়েছি। আর যখন পেয়েছি, বেশিরভাগ সময়ই তা আশাতীতভাবে এসেছে—পাবই এই বিশ্বাস নিয়ে পাইনি। তাদের বিয়ের পর সেই সম্ভাবনা আরও কমে শূন্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।”

চৈতালি বলে, “খুব খারাপ লাগছে। আজ প্রথমবার তোকে অন্যভাবে জানছি। তোর অন্য চেহারা এসেছে সামনে। অনুভব করছি এই বনানী সেই বনানী নয়, এক প্রাণোচ্ছল কিশোরী নয়। এ এক অন্য মেয়ে। একে আমি পরিচয়ের পর থেকে আজকের এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত আর কখনও দেখিনি। আগে কখনও দেখিনি বলে এটাকে তার সত্যিকারের রূপ বলে বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু বিশ্বাস তো আমাকে করতেই হবে—গত পাঁচ ছয় বছর ধরে আমাদের বন্ধুত্বে যে গভীরতা তৈরি হয়েছে তাতে এত বড় মিথ্যে তো ঢুকে যেতে পারে না।”

বিয়ের পর পাল্টে গেছে মেজদা। বউ-পাগল হয়েছে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। চিঠিপত্র নেই। বাড়িতে দেখা হলে অতি পরিমিত কথাবার্তা বলে সে আমার সঙ্গে। তা নিয়ে আমার কোন অভিযোগ অবশ্য নেই। অভিযোগ ছিল না কখনও। মায়ের ছিল অভিযোগ। মেজদা পাল্টে যাওয়ায় তাঁর স্বার্থে ঘা পড়েছে—ছেলেকে আগের মতো করে পাচ্ছেন না। দাপাদাপির শেষ নেই। থাকে সে দিল্লিতে, তবু মায়ের দিন মোটেও শান্তিতে কাটে না। উনি দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে মাহিনগরের বাড়িতে বসে স্মৃতিচারণা করেন। মেজদার বিয়ের আগের দেওয়া স্মৃতি, বিয়ের পরের দেওয়া স্মৃতি। দুই স্মৃতিভাণ্ডারের মধ্যে তুলনা করতে গেলে মিল খুব কম পাওয়া যায়, অমিল বেশি। অমিলগুলো মায়ের মনে জ্বালা ধরায়। মেজদা যখন ছুটি নিয়ে বাড়ি আসে সেই ছুটির কয়েকটা দিনে মায়ের মনের জ্বালা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। দাদাদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া অনেক। কেউ কারও বিরুদ্ধে মায়ের কাছে অভিযোগ শুনতে রাজি নয়। আমি শুনি অভিযোগ। মা বলেন, “গতবার যখন পিনু বাড়িতে অ্যালো, তুই তো জানিস না, কি ব্যবহার তার—আমার সামনে, এমনকি তোর ব্যাটার সামনে—তোর ব্যাটাতো ওইখানটাতে দাঁড়ায় সিলো—ওঁই কি করল—পাঁজাকোলা করে বউকে উঠ্যায়ে ঘরে নিয়ে গেল। লজ্জা শরম বলে কিসু আর ব্যাচে নাই।”

শুনে আমার উত্তর হয়, “তাতে কি হয়েছে! নতুন বিয়ের পরে ওরকম একটু আধুট হয়।”

“বউ তো কাজই করে না। র‍্যাতে খাওয়া হল কি সুড়সুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। বাসনপত্র বারান্দায় ওইরকমই পড়ে থ্যাকল। ক্যান, পিনু বউকে কোতে পারে না যে কাজগুল্যা করে আসো, র‍্যাত হয়ে গেসে, মা একা করলে ভালো দেখায় না?”

উত্তরে আমার কিছু বলার থাকে না। তবু বলি, “ঠিক আছে।”

আমার কাছ থেকে কোন অভিযোগে সমর্থন না পেয়ে মা বেশ অসন্তুষ্ট, “না, ঠিক নাই। সেদিন কি কথায় কথায় আমি বললাম তুই এই রান্নাটা ভালো করিস

আর সেটা শুনে বউয়ের সামনে ওঁই ক্রিটিসাইজ করে কি কোলো জ্যানিস?”

“কি?”

“হুঁ, বুনু আবার রান্না পারে নাকি! রূপালী অনেক ভালো রান্না করে। এটাতে তোকে কত ছোট করা হল!”

গোনাগাঁথা কয়েকটি পদ ছাড়া আর কিছু রান্না আমি আসলে শিখিইনি। তাই শুনে আমার একটুও খারাপ লাগে না। বলি, “হয়ত হল। কিন্তু এসব নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা হয় না।”

“রূপালী ভালো রান্না করে! কই রান্না করে তো একদিনও খাওয়ালো না!”

তার উত্তরেও আমার কিছু বলার থাকে না। তবু বলি, “ঠিক আছে।”

এবার মা একেবারে তেতে ওঠেন, “ঠিক আছে! ওঁই তোকে আর আগের মতো ভালবাসে না।”

তাতেও আমার উত্তর হয় ঠিক আছে—বিয়ের পরে এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সেজদার বিয়েটা হয়েছে ‘হয় তোর নয় আমার’ করে। আমাকে বিয়ের জন্য উস্কিয়ে দিয়ে, আমার বিয়ে প্রায় ঠিক করে ফেলে, ভেঙে শেষপর্যন্ত সে নিজের বিয়ে নিয়ে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিল। সেই বিশেষ মুহূর্তে আমার বিয়েকে সফল করতে হলে নিজের পছন্দের মেয়েটিকে হারাতে হবে এই ভয়ে। সেই বিয়েতে না আমার উপস্থিতি পর্যন্ত চেয়েছে সে, না সেই বিয়ের পরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। বড় হয়ে আরও বেশি করে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে সব। কোন ভালবাসা নেই, আবেগ নেই, স্নেহ নেই, আফসোস নেই, অনুতাপ নেই। ‘সংশোধন’ শব্দটার কোন স্থানই নেই তাদের অভিধানে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটাকেই এড়িয়ে চলছে তারা।

তিনদিন পরে, রবিবারে আমি চৈতালিদের বাড়ি থেকে কেষ্টপুরে আসি। চৈতালি আমাকে তার বাড়িতে থাকার অনুমতি দিলেও সেখানে থাকাটা যে খুব সহজ হয়েছে তা নয়। আগে যখন থেকেছি তখন শর্ত ছিল অন্য---কুটুম্বিতা। এখন শর্ত হল—প্রয়োজন। অনেক মানুষ যখন বাধ্য হয়ে অন্যের এমন দ্বারস্থ হয়, বিশেষত যারা বেশি স্বাভিমানী তারা বেশি অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে। অন্যের তাকে নিয়ে বলা ছোট ছোট ভালো কথা বড় বড় খারাপ কথা হয়ে মনে আঁচড় কাটে, অন্যের তাকে নিয়ে এতটুকু উদ্বেগ বাড়াবাড়ি রকমের স্বাধীনতা খণ্ডন বলে মনে হয়, অন্যের তার প্রতি এতটুকু উদাসীনতা উপেক্ষা কিংবা গা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু হতে পারে বলে ভাবাই যায় না। পরের দু’দিন অফিস আমি চৈতালির বাড়ি থেকেই করেছি। চৈতালিও ব্যস্ত থেকেছে তার টিউশন নিয়ে। আসন বিছিয়ে গল্প করার সময় আমারও কম, তারও কম। সময় আমার কম থাকার অজুহাত মানা যায় কিন্তু চৈতালির কম থাকলে চলে না। আমার মেজাজ খারাপ মানা যায় কিন্তু চৈতালির মেজাজ ভালো না থাকলেই বিপদ। ঘরে আমার সমস্যা হয়েছে কিন্তু তাদের পরিবারে এই সময় যেন কোন আপদ-বিপদ আসতেই পারে না। এটা কোনক্ষেত্রেই হতে

পারে না যে তারা আমাকে আমার মতো করে থাকার সুযোগ দিচ্ছে। একদিন পর থেকেই আমার মনে হতে থাকে আমি বুঝি বোঝা হয়ে গেছি তাদের কাছে। মেসোমশায় সেই একই আছেন, আমার সঙ্গে একইভাবে কথা বলছেন—লাজুক বন্ধুর মতো। মাসিমাও সেই একই আছেন, একইভাবে পাশে এসে বসছেন—ভালবাসাভরা গায়ে-পড়া বন্ধুর মতো। মনকে বোঝাই আদর নিশ্চয় তাহলে একই আছে—তবু অভিমান হয়, আন্তরিকতা নিশ্চয় একই আছে—তবু অভিমান হয়। আমার অভিমান চৈতালির ওপর। চৈতালির থেকে হামেশা আমার অনেক আশা, চৈতালির থেকে হামেশা আমার অনেক না পাওয়ার হতাশা, চৈতালির ওপরই হামেশা আমার অনেক রাগ এবং অভিমান। আমার মনে হয় আমি বিশেষত এই মুহূর্তে চৈতালির কাছ থেকে যেমন ব্যবহার আশা করছি তা পাচ্ছি না, মনে হয় চৈতালি বুঝি চাইছে না আমি ওর বাড়িতে থাকি। অথচ মুখ খুলে বলতেও পারছি না কেমন ব্যবহার আমি আশা করছি, কি করলে আমার আড়ষ্টতা কাটবে, মিশে যেতে পারব আমি ওই পরিবারটির সঙ্গে। নিজেই জানি না কি আশা করছি। শুধু চাপা অভিমান নিয়ে কাটাই এবং আসার আগে অভিমান আমার অহেতুক আত্মসম্মানকে জাগিয়ে দেয়। হিসেব করে তিন দিনের জন্য তিনশ টাকা ধরিয়ে দিতে চাই ওর হাতে।

আমার কাছ থেকে এমন ধাক্কা পাওয়ার জন্য চৈতালি মোটেও প্রস্তুত ছিল না। ‘‘কি করছিস এটা?’’ গালে আচমকা চড় খেয়ে মানুষের যেমন অবস্থা হয় তেমন অবস্থা ওর।

‘‘এখানে থেকেছি...’’ ধৃষ্টতা দেখিয়ে ফেলার অপরাধবোধ কথা শেষ করতে দেয় না আমায়।

‘‘এটা কি হোটেল?’’

আমি চুপ।

‘‘বল, এটা কি হোটেল রে?’’

‘‘জানি না।’’

‘‘জানিস না এটা হোটেল কিনা?’’

‘‘না।’’

‘‘না মানে?’’

‘‘হোটেল নয়।’’

‘‘তাহলে টাকা দিচ্ছিস কেন?’’

‘‘এমনি...তোদের বিরক্ত করলাম বলে।’’

‘‘যদি তাই-ই মনে করিস যে আমাদের বিরক্ত করেছিস তাহলে সেটাই অনেক। এরপর আর টাকা দিয়ে অপমান করিস না প্লীজ। ওটা ব্যাগে ঢোকা। মা জানলে কষ্ট পাবেন।’’

মাসিমা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, ‘‘এই তো এখনই মেয়েটি আমাকে ‘আসছি’ বলে প্রণাম করে এল। এইটুকু সময়ের মধ্যে আবার ওর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলি!’’

‘‘ঝগড়া আমি শুরু করলাম নাকি সে! জিজ্ঞেস করে দেখো কি করেছে?’’

‘‘কি করেছিস?’’ আমাকে জিজ্ঞেস করেন মাসিমা।

নির্বাক আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকি।

চৈতালি বলে, ‘‘এখন বলবে কেন! ও আমাদের এখানে থেকেছে, খেয়েছে তার দাম টাকা দিয়ে শোধ দিতে চায়। এত অহংকারী মেয়ে!’’

‘‘ওমা, এটা আবার কি কথা! এমন কেউ কখনও করে নাকি!’’ মাসিমা নিশ্চয় ভেতরে ভেতরে আহত হয়েছেন। কিন্তু যেহেতু উনি একজন পরিণত মানুষ তাই মনের ক্ষত মেটাতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহবর্ষণ করেন, ‘‘পাগল মেয়ে। যা, ঘরে যা। আবার মন খারাপ হলে এখানে চলে আসবি কেমন?’’

বাড়িতে ঢুকতেই তালাবন্ধ ঘর চোখে পড়ে। কি করা উচিত ভাবতে অক্ষম মাথা নিয়ে সিঁড়িতে বসি। আওয়াজ পেয়ে বাড়িওয়ালি নেমে আসেন, ‘‘তুমি এসেছ। এই নাও চাবি। দীপু আমাদের কাছে ছেড়ে গেছে।’’ দরজা খুলি। ভেতরে যাই। উনিও ঢোকেন আমার পেছন পেছন, ‘‘বাব্বা, তোমার দিদির কি রাগ গো! আমারই ভয় করছিল সে তোমার গায়ে হাত উঠিয়ে না বসে। মন খারাপ করো না। শোনো, রাতে তোমাকে আর রান্না করতে হবে না। আমার ঘরে গিয়ে খেয়ে নিও।’’

রাতে ওপরে যাই না। রান্নাও কিছু করি না। মাসিমা আসেন খাবার নিয়ে। বলেন, ‘‘যদি কিছু মনে না করো তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করব...বলছিলাম কি...তোমার তো অনেক বন্ধু আসে দেখি। কাউকে পছন্দ হয় না? বিয়ের কথা হয় না কারও সঙ্গে?’’

‘‘ওরা সবাই আমার বন্ধু। শুধুই বন্ধু।’’

‘‘তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ো। কাল আবার অফিসে যাবে তো?’’

কামাডিয়ার অফিসে আমার একমাস পূর্ণ হতে তখনও কয়েকদিন বাকি। তবু আমার মাইনে হয়ে গেছে। অফিসে নয়, অফিসের বাইরে। একদিনের কথা—তখন দুপুর আড়াইটে হবে—একটা চিঠি টাইপ করার মাঝখানে কামাডিয়া কেবিন থেকে বেরিয়ে আমার সামনে এক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়ান, ‘‘প্লেনের টিকিটটা করে আনতে হবে,’’ বলেই দাসের টেবিলে যান, দাসের সঙ্গে কথা বলে আমার টেবিলের সামনে দিয়ে অফিসের দরজা খোলেন বেরোবেন বলে। আমাকে উনি আর কিছু বলেন না, টাকাও দেন না। কানে আমার বাজে, ‘প্লেনের টিকিটটা করে আনতে হবে,’ কিন্তু বুঝতে পারি না তার জন্য কোথায় যেতে হবে, কে দেবে টাকা, কিভাবে যাব, কিভাবে পাব টিকিট। কাজ বড় নয় কিন্তু এসব টিকিট করার কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই। স্পষ্টই হল না যে উনি এব্যাপারে আমাকে আসলে কতটুকু দায়িত্ব দিতে চাইছেন। সুতরাং টাইপিং-এর কাজে পুনরায় মন দিই।

আমাকে উঠতে না দেখে দাস বলেন, ‘‘আপনাকে যেতে হবে।’’

‘‘কোথায়? এয়ারপোর্টে? কিন্তু উনি তো টাকা দিলেন না।’’

“ড্রাইভার আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। ড্রাইভারের কাছে আছে টাকা। সে-ই আপনাকে সব বলে দেবে।”

আমি আর দেরি করি না। কাঁধের ব্যাগটা নিয়ে নিচে যাই, গাড়িতে বসি। ড্রাইভার কিছু না বলে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। অচেনা সব অলিগলির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে সে একটা ট্র্যাভেল এজেন্সির সামনে দাঁড়ায়, টাকা দিয়ে টিকিট বানিয়ে নিয়ে আসে। আমি গাড়িতেই বসে থাকি। শুধু সেই টিকিট নিচ থেকে কামাডিয়ার কেবিনে বহন করে নিয়ে আসা ছাড়া আমাকে আর কোন কাজ করতে হয় না।

তার তিনদিন পরে দাস আমায় বলেন, “আপনি নিচে গিয়ে গাড়িতে বসুন। বস বলেছে। কোন কাজ আছে।”

আমি বসি গাড়িতে। একটু পরে কামাডিয়াও আসেন। গাড়ি চলে আগের দিনের মতো। অচেনা অলিগলির মধ্যে দিয়ে। অলিগলি থেকে গাড়ি বেরোয়। বেরিয়ে পার্ক স্ট্রিট নেয়। পার্ক স্ট্রিট থেকে ফ্রী-স্কুল স্ট্রিটে ঢোকে গাড়ি। ‘মোকাম্বো’র সামনে থামে। কামাডিয়া বলেন, “এসো, এখানে একটু বসি। তারপর আমরা কাজের জায়গায় যাব।”

মোকাম্বোতে কামাডিয়া এবং আমি টেবিলে মুখোমুখি বসে। কামাডিয়া হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করেন, “কেমন লাগছে অফিস?”

সোজা ‘ভালো লাগছে না’ বলতে দ্বিধা হয়। বলি, “একটু বেশি কাজ শিখতে চাইছিলাম।”

“শিখে যাবে। আমি দাসকে বলে দেব। এখন টাইপিংটা করে যাও। এই ক’দিনে টাইপিং ভালোই শিখে নিয়েছ তো দেখছি। এত তাড়াতাড়ি মেয়েরা শেখে না।” মুখে দাঁত না বের করা সেই প্রশস্ত হাসি যে হাসি হাসলে কামাডিয়াকে দেখতে বানরের মতো লাগে।

“আপনি কলকাতার বাইরে গেলে সারাদিন বসে বসে তো ওটাই প্র্যাকটিস করি।”

“হাঁ, তা ঠিক।” হাসি তার মুখ থেকে সরে না।

একটু পরে টেবিলে কামাডিয়ার সামনে মদের গ্লাস রাখে ওয়েটার। বোতল থেকে সোডাওয়াটার ঢালে তাতে। বরফের টুকরোও যোগ করে। আমার সামনেও একটি কাঁচের গ্লাস। তাতে ভরা আছে কালচে রঙের তরল। মোকাম্বোর সঙ্গে আজ আমার প্রথম পরিচয়। প্রথম পরিচয়ের দিনে আমি তাকে একটা বার-কাম-রেস্টরেন্ট হিসেবে জানি। বস্তুত বার শব্দটিও আমার কাছে একেবারেই নতুন। নতুন বার শব্দটিকে পুরনো মদ-এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বারের সংজ্ঞা রচনাও করে ফেলি। আকণ্ঠ বিস্ময় নিয়ে তাকাই চারদিকে। আরও কয়েকটি টেবিলের প্রত্যেকটিতে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। তাদের চোখে আমার মতো বার-কাম-রেস্টরেন্ট নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। তারা আমাকে-কামাডিয়াকে নিয়ে কোন কৌতূহলও রাখে না, জানে না আমার নাম-ধাম-ঠিকানা। তারা আমার কোনকিছুই জানে না—আমার পরিবারের লোকজনের কথা, আমার ‘এম এস সি’তে ভর্তির সুযোগ না পাওয়ার কথা, আমার জার্নালিজম নিয়ে পড়ার কথা, ব্যাঙ্গালোরের বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কথা, ছোটদার চিঠির

কথা, দিদির হিটলারের মতো আচরণের কথা। এরা কেউ জানে না আমার কলকাতায় থাকার জন্য, চাকরির পরীক্ষাগুলোতে বসার জন্য টাকার প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন মেটাতেই আমি কামাডিয়ার অফিসে। কামাডিয়াই আমাকে আজ এখানে নিয়ে এসেছেন। সবাই এখানকার আদবকায়দা জানা নিয়মিত পরিব্রাজক, অতি নিম্নস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। ওদের দিকে তাকালে বোঝা যায় ওরা কথা বলছে, শোনা যায় না কথা। আমার সংশয় মেটাতে কামাডিয়া বলেন, ‘‘আমি একটু খাই। ভয়ের কিছু নেই। লাঞ্চ করে আবার আমরা অফিসে যাব।’’ টেবিলে ডিমের কারি, মাছের কারি, নান, ফিঙ্গার চিপস এবং আরও কি কি সব খাবার এসে যায়। ‘‘তোমারটাতে শুধু থাম্বস আপ আছে। কোন অসুবিধে হবে না,’’ আমার মনে সাহস জোগান কামাডিয়া।

কামাডিয়ার ভাষার গ্লাসের থাম্বস আপ নামক তরল পদার্থটি খেয়ে আমি টলছিলাম। বাকি খাবার কতটা খেয়েছিলাম মনে নেই, শুধু মনে আছে কামাডিয়া হাসছিলেন—হাসছিলেন, শুধুই হাসছিলেন আমার দিকে চেয়ে। মুখটা কখনো যেন হাওয়ায় ভেসে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছিল—দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিকে হয়ে হয়ে আসছিল সেই হাসি, আবার কখনো হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো আমার চোখের একদমই সামনে এসে পড়ছিল সেই মুখ। কাছে এলেই তা প্রচণ্ড ভয়ংকর হয়ে উঠছিল, কেননা তখন তাঁর সেই ঠোঁট বন্ধ করা হাসি এক বিশাল বড় ‘হা’তে পরিণত হচ্ছিল। অজগর সাপের মতো সেই ‘হা’ যেন গিলে ফেলতে চাইছিল আমায়। আমি সেই ‘হা’এর সামনে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র, অতি দুর্বল অনুভব করছিলাম। সেই ‘হা’কে বাধা দিতে চেয়েও বাধা দিতে পারছিলাম না, সেই ‘হা’ থেকে দূরে পালাতে চেয়েও পালাতে পারছিলাম না...বড্ড ঝিমঝিম করছিল মাথা। নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল শরীর।

পালাবো ভেবে টেবিল ছেড়ে উঠতে গিয়ে টেবিলের উপরই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম। শাড়ির উপর বাকি তরলটা ছিটকে ফেলে নিচে কার্পেটের উপর উল্টে পড়েছিল গ্লাস। আমি অনুসরণ করছিলাম গ্লাসকে। কার্পেটের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল আমার মুখ। কামাডিয়া ওয়েটারকে ডেকেছিলেন। ওয়েটার ছুটে এসে ধরে ফেলেছিল আমায়।

কামাডিয়া বলেছিল—বলেছিলেন নয় বলেছিল—কামাডিয়া বলেছিল, ‘‘কাছেই আমার একটা বন্ধুর বাড়ি আছে। চলো সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করবে।’’

‘‘তার প্রয়োজন নেই,’’ মৃদু আপত্তি ছিল আমার।

‘‘বিশ্রাম নিয়ে আমরা কাজে বেরোবো।’’

‘‘বরং অফিসে ফিরে যাই,’’ মৃদু অনুরোধ।

‘‘আজ আর অফিসে যেতে হবে না।’’

দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছিল শরীরের স্নায়ু, পেশী। ইচ্ছে না থাকলেও কামাডিয়ার বন্ধুর বাড়িতে যাব না বলে গোঁ ধরে বসে থাকতে পারিনি। জোর করতে পারিনি অফিসে যাব বলে। ভুলে গিয়েছিলাম বাড়ির ঠিকানাও।

সন্ধের আগে আগে মাথা যখন আবার কাজ করার ক্ষমতা ফিরে পেল দেখলাম

কামাডিয়ার বন্ধুর বাড়িতেই আমি আছি। বিছানায় শুয়ে। আমার পাশে আছে কামাডিয়া। স্নান সেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ি পরতে পরতে ভাবছিলাম আমার এখন কি করা উচিত। কি করব? কি করতে পারি? আত্মহত্যা? কিভাবে করব আত্মহত্যা? গলায় দড়ি বেঁধে নাকি রেললাইনে গলা পেতে দিয়ে? না, পারব না। খুব ভীতু আমি। এত শোকও আমার মনে মরার সাহস জোগাতে পারে না। তাহলে কি ফুটপাথে বসে কাটিয়ে দেব রাত? যেন রাত কখনও সকাল হবে না। যেন ফুটপাথের লোকগুলো রাতে আমাকে ভালো করে দেখতে না পেলেও, চিনতে না পারলেও দিনের আলোতে কৌতূহল ফুটে উঠবে না তাদের মুখে। রাত পেরিয়ে গেলে সকাল তো হবেই। জানতে তো তারা চাইবেই আমি কে। কি বলব তাদের? বলব আমি একটি বাংলাদেশী মেয়ে? মা-বাবার অত্যাচারে পালিয়ে এসেছি? তোমাদের কাছে আশ্রয় চাই? তারা নিশ্চয় আমায় জিজ্ঞেস করবে কি অত্যাচার করত মা-বাবা? বাংলাদেশের কোথায় বাড়ি তোমাদের? কি উত্তর দেব? তারা আরও কি কি প্রশ্ন করবে কে জানে! আমাকে না জানি আরও কত উত্তর খুঁজে বেড়াতে হবে। তারাই বা কেন আমার কাছে তাদের সততা ধরে রাখবে? ছেড়ে দেবে আমায় একটিও কামড় না মেরে? আমি তাদের কে? আজকে কামাডিয়াই যদি...

আয়নায় কামাডিয়ার মুখ দেখতে পাই। সে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে সেই প্রশস্ত হাসি, শয়তান বানরের মতো লাগছে তাকে দেখতে। আমাকে দেবে বলে তার হাতে ধরা আছে সতেরোশো টাকা।

বাড়িওয়ালি মাসিমা আমার বিয়ে নিয়ে আরও বেশি উতলা হয়ে পড়েছেন। উনি আমাকে প্রায়ই বলেন, "তুমি এত শান্তশিষ্ট মেয়ে, চুপচাপ থাকতে ভালবাস, তোমার কপালে কেন এত দুর্ভোগ?" আমার অনেক গোপন কথা না জেনেও উনি আমার জন্য কষ্ট পান। কিন্তু প্রদীপদা একেবারেই নির্বিকার। কামাডিয়ার কথাও আমি প্রদীপদাকে বলেছি। হাত-পা আছড়েছি, "দেখেছ, বলেছিলাম চাকরিটা ছেড়ে দিই। দিলে এমন হত না।" উনি এবারও আমাকে সমর্থন করেন না। কোনকিছুই তাঁর অস্বাভাবিক লাগে না। কখনোই তাঁর মনে হয় না যে কোনকিছুতেই আমার গায়ে জ্বালা ধরা উচিত, আমার আত্মসম্মানে বারি পড়া উচিত। সেই একই হাসি মুখের ওপর ভেসে উঠেছে, "ছেড়ে দিলে কি এই এক্সপেরিএন্সটা হত। জীবনে অনেকভাবে অনেক সংঘর্ষ করতে হয়। যদি না করতে পেরেছ তাহলে বাড়ি ফিরে যাও।"

বাড়িতে তো আমি ফিরে যাব না। মাসিমাকে খুশি করার জন্য বিয়ে করতে আমারও আপত্তি নেই, কিন্তু বিয়েটা করব কাকে! যদি কাউকে ভালবাসি সে বিশ্বাস দিতে পারে না আর যে বিশ্বাস দিতে চায় তাকে আমি নিজেই ভালবাসতে পারি না। ভালবাসব ভাবলেই তো যে কাউকে ভালবাসা যায় না। ভালবাসা হয়ে যায়—ভালবাসা যদি হওয়ারই থাকে তাহলে ভালবাসব না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকলেও তাকে আটকানো যায় না। আমার বর্তমান অবস্থায় বিয়ের কথা মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হওয়া

উচিত নয়—একটা সরকারি চাকরির বেশি প্রয়োজন। কিন্তু চাকরির জন্যই প্রয়োজন একটা সাহায্যের হাত। লোকে জীবিকা খোঁজে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সংস্থান করতে, তাই বলে ফুটপাথে থেকে ন্যাংটো হয়েও তো জীবিকার সন্ধানে ছুটে বেড়ানো যায় না। একটা নিরাপদ আশ্রয় চাই, দিনে অন্ততপক্ষে দু'বেলা আহার চাই এবং এই চাওয়াগুলোকে পূরণ করতে টাকা চাই। ছোটদা চিঠিতে লিখেছিল যে আমি বালুরঘাট থেকেই চাকরির চেষ্টা করতে পারি। সে জানত বালুরঘাটে বেশিরভাগ পরীক্ষারই সেন্টার নেই, তবু। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা পর্যন্ত ওকে আমাকে রায়গঞ্জে গিয়ে দিতে হয়েছে। বালুরঘাট থেকে কলকাতা, শিলিগুড়ি বা অন্য কোথাও গিয়ে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। মাসে একটা, দুটো, তিনটে যতগুলো ডেট পাব ততবারই প্রশ্ন আসবে আমি মেয়ে, কার সঙ্গে যাব, কিভাবে যাব এবং কোথায় থাকব? প্রশ্ন আসবে কত টাকা খরচা হবে? খরচার হিসেব করে ভাবা হবে যাওয়াটা বাতিল করা যায় কিনা এবং আমি জানি বাতিলই হবে আমার যাওয়া। মা ভাববেন মেয়েকে লেখাপড়া করানো হয়েছে, গায়ের রঙও পরিষ্কার আছে, বাড়িতে আরও শাসিয়ে ধমকিয়ে ভয় দেখিয়ে নম্রতা শেখালে এবং ঝাড়-ঝাঁটা, কাপড় কাচা, রান্নাবান্নাতে পটু করে দিলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারও ভাগ্যে জুটে যেতে পারে। তারপর দেখব পরীক্ষা দিয়ে যাওয়া তো পরের প্রশ্ন, ফর্ম ভরার জন্যই টাকা পাচ্ছি না। আমি ছোট, এম এ পাশ করেও সেই ছোটই। টিউশন করারও অনুমতি পাব না। অনুমতি পেলেও বা, টিউশনের টাকায় ফর্ম ফিল-আপ করলেও বা, পরীক্ষা দিতে যেতে না পারলে কি লাভ! ওই বাড়িতে আমার প্রয়োজন একমাত্র আমি ছাড়া বাকি সবার যুক্তি, উদাসীনতা, রাগ এবং ইচ্ছে দ্বারা পরিচালিত হয়। এসবের মাঝখানে আমার কোন মঙ্গল হতে পারে না। দাদা বেশি কথা বলেন না, কোন আলোচনার ধারেপাশে নেই উনি। কখনো ইচ্ছে হলে নিজের ঘর থেকে কলপাড়ে যাতায়াতের পথে একবার মতামত ছুঁড়ে দেন—মানার হলে মানো না মানার হলে মেনো না, জোর করতে পারেন না বা চান না। জামাইবাবুর সঙ্গে কথা না বলতে চাওয়ার ধৃষ্টতা দেখানোর জন্য রাগের মাত্রা আরও চড়িয়ে দিদি যদি বাবাকে বলে, 'অর চাকরির দরকার নাই,' বাবা ভাববেন আমার চাকরির দরকার নেই। যদি সে বলে 'ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার খোঁজার কি দরকার? দিল্লি-ব্যাঙ্গালোরে য্যাতে হোবে না, মোটামুটি চাকরি করে এমন একটা ছেলে দেখে বিয়া দিয়ে দ্যান,' বাবা তাই-ই করবেন—বসন্তা কিংবা বুনিয়াদপুর কিংবা বটুনে ছেলে খুঁজতে বেরোবেন। বটুনে ছেলে খুঁজতে গিয়ে সেই গৌতম ঘোষই যে ঘুরে ফিরে আমার সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়তে আসবে না তা-ই বা কে জানে! আর তা না হলে বাবা বড়জোর রায়গঞ্জ বা কালিয়াগঞ্জ পর্যন্ত তাঁর খোঁজার হাত লম্বা করবেন। বাড়ির জামাইবাবুসহ আট অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে মাহিনগর থেকে বুনিয়াদপুর বা বটুন বা রায়গঞ্জে শ্বশুরবাড়িতে আমার বদলি হবে। সেখানে দলিত, পিষিত, অনুগত হয়ে চলতে না পারলে অভিযোগ উঠবে। না না, পাগল হয়ে যাব আমি।

সেদিনের পরে আর আমি কামাডিয়ার অফিসে যাইনি। কিন্তু আমি তার অফিস ছাড়লেও সে নিজে আমাকে ছেড়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কয়েকদিনের মধ্যে

তার সঙ্গে আমার নানা জায়গায় বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। পার্ক স্ট্রিটে, এম জি রোডে, এমনকি উল্টোডাঙ্গাতেও কামাডিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। সেই সব দিনে সে নিজে গড়ি চালিয়েছে। আমাকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। নেমে আমায় ডেকেছে। আমি যাইনি। ভয়ে ভয়ে থাকি কি হয় কি হয় ভেবে। ধীরে ধীরে যখন কামাডিয়ার সঙ্গে আমার হঠাৎ হঠাৎ দেখা হওয়া বন্ধ হল, ভয় কম হল, কম হতে হতে উধাও হয়ে গেল ভয় তখন আমি উল্টে সাহসী হতে লাগলাম। নিজের মধ্যে একরকমের লালচণ্ড মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ঘুরে বেড়াতে লাগলাম মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়ে। আমার এক মন দুই মনে ভাগ হয়ে গেল—একটা ভালো এবং আরেকটা খারাপ যেমন ছোটবেলায় একবার হয়েছিল যখন দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম—নদীর জলে ডুবন্ত কালুকে বাঁচাবো নাকি চোখের সামনে তাকে মরতে দেব—ভেবেছিলাম কালুকে মরতে দেখলে আমার অন্তরাত্মা নিষ্ঠুর আনন্দ পাবে। একেই বুঝি বলে যেমন কর্ম তেমন ফল। সেদিন শেষপর্যন্ত কালুকে মারিনি কিন্তু মারতে তো চেয়েছিলাম—একবারের জন্য হলেও চেয়েছিলাম আর সেই কারণেই বুঝি—না, 'বুঝি' নয়—নিশ্চয় সেই কারণেই আজ আমার খারাপ মনটি আমাকেই মারতে চাইছে। বলছে, ‘‘মন্দ কি ছিল! সরকারি চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত এভাবেই তো চলতে পারত।’’ কিন্তু এখন কামাডিয়া নেই, আমাকে খুঁজে খুঁজে, ডেকে ডেকে আশা ছেড়ে দিয়েছে সে। কামাডিয়া নেই বলে তার কাছ থেকে পাওয়া টাকা থেকে আমি বাড়িভাড়া দিইনি। রেখে দিয়েছি সেই টাকা আমার খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচের জন্য। জানি না কবে আবার টাকা হাতে আসবে। কামাডিয়া নেই তবু আমার খারাপ মন হাল ছাড়ল না। মন আমাকে মারার জন্য অন্য রাস্তা নিল। কলকাতার রাস্তাঘাটে কেউ আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইলে সে আপত্তি করল না। কেউ আমাকে বার-এ নিয়ে যেতে চাইলে সে আপত্তি করল না। কেউ আমাকে মদ খাওয়াতে চাইলেও সে আপত্তি করল না। পার্ক স্ট্রিটে ম্যাগনোলিয়া, বার-বি-কিউ, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-তে ডিউক এমনকি ফ্রী স্কুল স্ট্রিটের সেই মোকাম্বোতেও নিয়মিত আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালো মন। রাতের খাওয়াটা আমি সেখানেই সেরে নিয়েছি। খারাপ মনের কাছে পরাজিত হয়ে আমার মনের দ্বন্দ্ব যে মিটেছে তা নয়। খারাপ মনের কাছে পরাজিত হয়ে ভালো মন যে কখনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়নি তা নয়। ভালো মন বারবার আমায় বলেছে, ‘‘বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও। না হলে শেষ হয়ে যাবে তুমি।’’

এক রাতে বাড়ি ফিরতেই মেসোমশায় দরজা খুলে দিলেন। উনি আমার আগে আগে হেঁটে এক হাতে লুঙ্গি সামান্য উঠিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চড়ছিলেন। চড়তে চড়তে হঠাৎ থেমে গিয়ে পেছন ফিরে বললেন, ‘‘আজকে রাজু রায় বলে একটি ছেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কাল সকালে আবার আসবে বলে গেছে।’’

‘‘রাজু রায়! রাজু রায় বলে তো আমি কাউকে চিনি না।’’ আমি বুঝতে পারছি কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। ভুলটা কোথায় হচ্ছে তার ধারণাও আমি বোধ হয়

লাগিয়ে ফেলেছি। তবু ভাবছি যেন সে-ই হয়, যেন সে-ই হয়।

"রাজু রায়-ই তো বোধ হয় বলল। গোরখপুর থেকে নাকি এসেছে।"

"ও, তাহলে রাজু রায় নয়, রাজুদা বলে থাকবে।"

"হতে পারে। কাল সকাল ন'টায় আসবে।"

কৌতূহল সামলাতে পারি না। মেসোমশায় দু'বার বলেছেন কাল সকালে সে আসবে। দু'বারই আমি ভালো করে শুনে নিয়েছি। বাড়িওয়ালার কাছে রাজুর যত খবর আছে তার সবটাই আমার প্রয়োজন। এখনই। দেরি আর সয় না। কাঁধের ব্যাগটা বিছানাতে রেখেই দোতলায় ছুটি। মাসিমাকে জিজ্ঞেস করি, "আর কিছু বলেনি সে?"

"হ্যাঁ বলেছে—এয়ার ফোর্সে চাকরি করে।"

"আর?"

"তোমার দাদার নাকি বন্ধু—যে দাদা ব্যাঙ্গালোরে থাকেন—যাঁর কাছে তুমি গিয়েছিলে।"

"আর?"

"এখানে সন্তোষপুরে আছে।"

"আর?"

"আর কিছু না।" এবার মাসিমা সরাসরি আমাকে তাঁর বাসনা জানান, "এই ছেলেটি দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর। আমি চাই তুমি একে বিয়ে করো।"

ব্যাঙ্গালোরে রাজুর চিঠি পাওয়ার পর আমি সেজদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ছেলেটি কেমন?" সেজদা মুখ থেকে ছিক করে আওয়াজ বের করে এক কথায় আমাকে থামিয়ে দিয়েছিল, "কোন প্রসপেক্ট নেই।" তখন সে বিজয় সরকারের মোহে অন্ধ। রাজুর ব্যাপারে তার অমন নিরাসক্তি দেখে আমি পরে আর কোনদিন ওকে নিয়ে কিছু ভাবতেই পারিনি। তবু আজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি তার জন্য। অপেক্ষা করছি কখন রাত পেরোবে, সকাল হবে। মনে হচ্ছে সকাল হলেই একটি খুব কাছের মুখ দেখতে পাব।

কিছুটা রাত জেগে কাটানোতে শরীরের ক্লান্তি অপেক্ষাকে হার মানিয়ে দিল। জাগালো আমাকে আটটার দিকে। তাড়াতাড়ি দাঁত মেজে স্নান সেরে ফেলার জন্য বাথরুমে ঢুকলাম। পরে বিছানা গোছানোর কথা। স্নান করতে করতে হঠাৎ খোকনের গলা শুনতে পেলাম, "আসুন আসুন। আপনিই তো গতকাল এসেছিলেন তাই না?"

আগন্তুকের স্বরযন্ত্র থেকে বেরোনো কোন আওয়াজ আমার কানে বাজে না। খোকন ডাকে, "দিদি তাড়াতাড়ি বেরোও, রাজুদা এসেছেন।"

পাঁচ মিনিট বাদে বেরিয়ে দেখি রাজু আমার বিছানার মাথার দিকটাতে দেওয়ালে হেলান দিয়ে হাসি হাসি মুখ নিয়ে বসে আছে। মশারি খুলে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে এক পাশে।

ওকে জিজ্ঞেস করি, "তুমি আমার ঠিকানা পেলে কি করে?"

"প্রদীপদার কাছে।" রাজু ভেবেছিল আমার চিঠির ঠিকানাটাই হল আমার ঘরের

ঠিকানা।

"সন্তোষপুরে কার বাড়িতে উঠেছ?"

"বন্ধুর বাড়িতে।"

"কতদিন আছ?"

"দু'তিনদিন।"

"কলকাতায় কেন এসেছ?"

"বাড়ি গিয়েছিলাম। মনে হল গোরখপুরে ফেরার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করি।"

উত্তর দেওয়ার পালা শেষ হলে রাজু আমাকে প্রশ্ন করে, "তুমি মেঝেতে ঘুমোও?"

"দেখতেই তো পাচ্ছ।"

"তা ঠিক। কিন্তু তুমি এভাবে থাকতে পারো জানতাম না। কি খাবে ব্রেকফাস্টে?"

"কিছু না।"

"ব্রেকফাস্ট করো না?"

"না।"

"কেন?"

টাকা নেই। "এমনি।"

"ঘরে রান্নার কিছু নেই?"

"ডিম আছে।"

"চলো, আমি রান্না করব।"

"তুমি রান্না জানো?"

"হ্যাঁ।"

ডিমের ঝোল আর ভাত খাই আমরা। একেবারে দুপুরের খাবার। তারপর দু'জনে বেরিয়ে পড়ি।

ভিক্টোরিয়াতে ঘাসের উপর রাজু এবং আমি পাশাপাশি বসি। আমার মনে হচ্ছে ওর চেহারা অনেকটা ভেঙে গেছে। আগের মতো সুদর্শন লাগছে না দেখতে। ভাবছি মাসিমার যদি রাজুর এই চেহারাই ভালো লাগে তাহলে আগের চেহারা যা আমি মেজদার বিয়েতে দেখেছিলাম তা দেখলে কি বলতেন। সেজদা বলেছে ছেলেটির কোন প্রসপেক্ট নেই—হতে পারে এই কথাটিই ওর চেহারাকে আমার চোখে এমন ম্লান করে দিয়েছে। এয়ার ফোর্সে গ্রাউন্ড টেকনিশিয়ানদের সে অতি সাধারণ ভবিষ্যৎ তা আমি মেজদার মুখেও শুনেছি। মেজদা পনেরো বছরে ভি আর এস নেবে। মেরিটের জোরে সিভিলে কোন ভালো চাকরি পাবে বলেই আমাদের সবার বিশ্বাস। সেজদার বন্ড আছে কুড়ি বছরের, কিন্তু তার ভি আর এস নেওয়ার ইচ্ছে পনেরো বছরেরও আগে। এল এল বি কমপ্লিট করে কোর্টে প্র্যাকটিস করবে সে। সেজদাকে এল এল বি করতে আমিই উৎসাহিত করেছিলাম। আমি রাজুর কাছে তার চাকরি নিয়ে দু'য়েকটি কথা জানতে চাই। এয়ার ফোর্সে তার অভিজ্ঞতা কেমন জানতে চাই। জানতে চাই কতদূর সে পড়াশোনা করেছে, ভবিষ্যতে অন্য কিছু করার পরিকল্পনা

আছে কিনা। কথার ছলে সব। তারপর জিজ্ঞেস করি, ‘‘তুমি ড্রিঙ্কস করো?’’

‘‘কখনো সখনো।’’

‘‘তুমি চেন স্মোকার বুঝি?’’

‘‘চেন স্মোকার নই। দিনে চার পাঁচটা সিগারেট খাই।’’

‘‘ইংরেজিতে কথা বলতে পারো?’’

‘‘পারি, তবে ভাষণ দেওয়ার মতো নয়।’’

রাজু ঘরে ফেরার জন্য উঠে পড়ে। হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে, আমাকে সাহায্য করতে চায় দাঁড়াতে। আমি বাসে কেষ্টপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। তার সন্তোষপুরে যাওয়ার কথা—উল্টো দিশায়, কিন্ত সে ওঠে আমারই বাসে। আমাকে কেষ্টপুরে পৌঁছে দেবে ভেবে। গৌতমও কলকাতায় এসে সন্তোষপুরেই উঠেছিল, সেই রাতে বালিগঞ্জে মামার বাড়ি থেকে আমাকে কেষ্টপুরে পৌঁছে দিয়ে তবে ফিরেছিল সন্তোষপুরে। কলকাতা শহর আমি তাদের দু’জনের চেয়ে বেশি চিনি। ছেলেরা মেয়েদের দুর্বল ভেবে যেটাই করে না কেন, বাড়াবাড়ি রকমের করে। একজন যদি মেয়েদের অতিরিক্ত সুরক্ষার আচ্ছাদনে মুড়িয়ে রাখতে চায় অন্যজন সেই আচ্ছাদন অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে অনাবৃত করে লুটে সব নিয়ে চলে যায়। কোনটাই সহ্য হয় না। দুটোই বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাকে নষ্ট করে দেয়। বাসে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা রাজুকে আমার খুব অসহ্য লাগে। ‘পৌঁছে দিতে হবে না, নামো নামো’ বলতে বলতে ইউনিভার্সিটির গেটের সামনে তাকে জোর করে নামিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। একবারও বলি না ‘কাল আবার এসো।’ তবু পরদিন সকালে সে আবার এল। বিছানায় সেই একই জায়গায় বসল। তার আকস্মিক আগমনে আমি বিরক্ত হলাম। তবু কি করে যে এমন হল—

বলল, ‘‘জানো আমি আমার বন্ধুকে তোমার গল্প করছিলাম। সে আমাকে পরামর্শ দিয়েছে—তোর যদি ওকে এতই ভালো লাগে তাহলে কাল গিয়ে বলে দে।’’

‘‘তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে চাইছ?’’

মুচকি হেসে সে মাথা ঝাঁকায়।

‘‘আমার কোন আপত্তি নেই।’’ কিন্তু যেহেতু বিয়ে বলে কথা, কথা এখানেই শেষ হয় না। আমাকে জিজ্ঞেস করতে হয়, ‘‘তোমার মা-বাবা রাজি হবেন?’’

‘‘বাবু অনেকদিন ধরেই আমার জন্য মেয়ে খোঁজাখুঁজি করছিল। এবার ডোমকলের একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে পাকা করে ফেলে এমন অবস্থা। আমি গিয়ে না করে দিয়েছি। বাবু বলেছে তোমার পছন্দের কেউ থাকলে জানাও। এবার বলে দেব।’’

রাজু হয়ত জানে না যে ওর বাড়ি থেকে মত পাওয়া যতটা সহজ আমার বাড়ি থেকে ততটাই কঠিন। হতেই পারে আমি মতই পেলাম না। হতেই পারে বাড়ির অমতে আমাকে বিয়ে করতে হল। বিশেষত সেই জন্যই আমার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ওর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা প্রয়োজন। সব বলি ওকে। না, সব বলি না—শুধু বাড়ি এবং টাকার সমস্যার কথা বলি। সে বলে, ‘‘এই ঘরটি এখনই ছেড়ো না। ঘরের না দেওয়া ভাড়াগুলো আমি গোরখপুরে গিয়ে পাঠিয়ে দেব।

দেখছি কত তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারি।”

তারপরেও আমার কিছু শর্ত থাকে।

—তোমাকে মদ ছাড়তে হবে।

—ঠিক আছে।

—সিগারেট ছাড়তে হবে।

—ঠিক আছে।

—কেয়ালিফিকেশন বাড়াতে হবে।

—কাকাতিয়া ইউনিভার্সিটিতে কয়েক বছর ধরে ওয়ান সিটিং বি এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ফর্ম ফিল-আপ করছি। পরীক্ষায় বসা আর হয়ে উঠছে না।

—এবার বসবে।

—ঠিক আছে।

—শুধু বি এ পাশ করলেই হবে না। ‘এ এম আই ই’ করবে এবং এয়ার ফোর্সে পনেরো বছর হলেই ভি আর এস নিয়ে সিভিলে ভালো চাকরির চেষ্টা করবে।

—ঠিক আছে।

—পারবে তো?

—না পারার কি আছে?

আমাদের বাড়ি মুদিখানা কিংবা জামাকাপড়ের ব্যবসা বোঝে না। পড়াশোনা বোঝে। মেয়ের জন্য ডিগ্রিধারী ছেলে চায় বাড়ি, অবশ্য ডিগ্রিধারী ছেলে নমঃশূদ্র হলে চলবে না। বাড়ির ছেলেরা নিজের নিজের সময় বুঝে ডিগ্রির পেছনে ছুটছে। আমিও ছুটেছি। আমার ডিগ্রি থেকেও মান নেই, কারণ আমি মেয়ে। যাকে বিয়ে করব সে ছেলে হলেও ডিগ্রি না থাকলে তারও মান থাকবে না। আমি চাই না সে জামাকাপড়ের ব্যবসা করে ধনী হোক, চাই সে ডিগ্রি বাড়িয়ে ভালো চাকরি পাক। ভালো মাইনে থেকে ভালো পয়সা আসুক ঘরে। আমি চাই আমি নিজেও স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাই।

পরদিনই রাজুর গোরখপুরে চলে যাওয়ার কথা। সে আর দেরি না করে বিকেলেই তার জামাইবাবু, সুধাকর বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আশ্বস্ত করে আমায় এই বলে যে চিন্তার কিছু নেই, উনি খুব সরল মনের মানুষ।

জামাইবাবু থাকেন সূর্য সেন স্ট্রিটের একটি মেসে কিন্তু আমাদের দেখা হয় কলেজ স্কয়ারের সুইমিং পুলের পাশে। কথা হয়। কথাশেষে রাজু এবং আমি আলাদা হয়ে যাই। সুধাকর বিশ্বাসের আদেশানুসারে আমি বাবাকে চিঠি লিখি। বাবারও চিঠি পাই। অনেক প্রশ্ন থাকে সেই চিঠিতে। রাজুর নাম জেনেও তার নাম উল্লেখ করেননি উনি। লিখেছেন ‘ছেলে’ বলে।

—ছেলের কি কাস্ট?

—কতদূর লেখাপড়া করেছে?

—এয়ার ফোর্সে কোন পোস্টে আছে?

—মাইনে কত?

—কয় ভাইবোন?

—ভাইবোন থাকলে তারা সব বড় না ছোট এবং কি করে?

—বাবা-মা বেঁচে আছেন?

—বেঁচে থাকলে কি করেন বাবা?

—জামাইবাবুর নাম কি?

উত্তর লিখি ঃ

কাস্টঃ মাহিষ্য। *বাবার জন্য এক বিশাল ধাক্কা।*

কোয়ালিফিকেশনঃ ইন্টারমিডিয়েট। *বিশাল ধাক্কা।*

পোস্টঃ গ্রাউন্ড টেকনিশিয়ান। *বিশাল ধাক্কা। বাবা জানেন বাবার ছেলেরাও বর্তমানে একই পদাধিকারী হলেও আগামী পাঁচ বছরের তারা তাদের পরিচয়ের উত্তরণ ঘটিয়ে উজ্জ্বল করবে তাঁর মুখ।*

মাইনে ঃ দু'হাজার। *বিশাল ধাক্কা। কারণ ওই একই। ছেলের মেধা কেমন না জানায় তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাই যায় না।*

ভাইবোন ঃ পাঁচ। ছেলে সবার ছোট।

—বড়দা বেকার। *বিশাল ধাক্কা। বাবার বড় ছেলে ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। চাইলে অনেক ভালো চাকরি করতে পারত কিন্তু খামখেয়ালিপনা নিয়ে স্কুলে শিক্ষকতা করছে।*

—মেজদা রেলে চাকরি করেন। *চলবে।*

—ছোটদা ব্যাংকে চাকরি করেন। *চলবে।*

—দাদারা সবাই বিবাহিত। *হওয়াই উচিত। তাঁর বড় ছেলে মেধার কবলে পড়ে বিয়ের ব্যাপারে অনাসক্ত। তাই অবিবাহিত। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।*

—জামাইবাবুর নাম সুধাকর বিশ্বাস। কলকাতা হাই কোর্টে প্র্যাকটিস করেন। তার উপার্জন কত জানি না। *চলবে।*

বাবা-মাঃ জীবিত। মা গৃহবধূ। বাবা অবসরপ্রাপ্ত। উনি রেলে কমার্শিয়াল কন্ট্রোলার ছিলেন। *চলবে।*

চিঠি পোস্ট করার সাহস হয় না। ঠিক করি এবার আমার যা বলার বাড়িতে গিয়েই সামনাসামনি বলব। প্রথমবারের মতো, শেষবারের মতো।

রাজু চলে যায়। গিয়ে একমাস ডুব মেরে বসে থাকে। একটাও চিঠি পাই না। ভয় হয়, সে হয়ত তার সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেছে। তবু সঠিক খবর পেতে সূর্য সেন স্ট্রিটে তার জামাইবাবুর মেসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। উনি বলেন, খোঁজ নিয়ে জানাবেন। কয়েকদিন পর আবার যাই। না, কোনই সংবাদ নেই। আমি তখন আমার সিদ্ধান্তে স্থির। অন্ধকারের স্রোত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতেই হবে নিজেকে।

অনিরুদ্ধ আসে আমার জীবনে। অনিরুদ্ধের সঙ্গে আমার আলাপ দীপু, অপু, তপু না শিবু নাকি তার দাদা দেবু কারও মাধ্যমে হয়ে থাকবে। কলেজ স্ট্রিটেই।

বিভিন্ন রকমের সদস্যের সমাবেশ সেই গ্রুপে। কেউ পড়াশোনা করে, কেউ চাকরির সঙ্গে সঙ্গে প্রেম করে—প্রেম করতে করতে দৈহিক নেওয়া দেওয়া হয়ে যায় প্রেমিকার সঙ্গে, কেউ চাকরি না করেই সাত আট বছরের ছেলের বাপ, কেই সংসার গড়ে, কেউ সংসার করে, কেউ ভাঙে সংসার। অনিরুদ্ধ কোন একটা প্রাইভেট কম্পানিতে সুপারভাইজারের কাজ করে। মাইনে সাড়ে তিন হাজার টাকা। ব্যাঙ্গালোর থেকে ফেরার পরের একটি বছর আমায় অশেষ যন্ত্রণা দিয়েছে। এই এক বছরে মুড়িমুড়কির মতো অনেক ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে—বাসে, ট্রামে, কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের দোকানে, পরীক্ষার ফর্ম ফিল-আপ করতে গিয়ে। প্রেম-ভালবাসা-বিয়ের অনেক প্রস্তাব পেয়েছি কিন্তু গ্রহণ করিনি একটাও। নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি কাউকে। ভয় পেয়েছি—যদি সে প্রতারণা করে! মনে হয়েছে আজ সে যদি সে অকপটে আমাকে তার ভালবাসা নিবেদন করতে পারে কাল অন্য মেয়েকেও পারবে। আমার বিশ্বাস কম, আস্থা কম, ভরসা কম—হয় তাদের ওপর নয় নিজের ওপর। রাজুকে বিশ্বাস করেছিলাম এই ভেবে যে সে সেজদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমাদের বাড়ির সঙ্গে তার আগে থেকেই জানাশোনা, অন্ততপক্ষে সে আমায় বিয়ে করে ঠকাবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুলের উপলব্ধি তার আগেই হয়েছে, ঠকানোর আগেই ঠকিয়ে দিয়েছে। তাই আমার বিশ্বাসের পরিধি বিস্তার করছি অনিরুদ্ধর ওপর।

সেদিন সন্ধের পর কলেজ স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে বাসের অপেক্ষা করছিলাম। অনিরুদ্ধ ছিল পাশে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘‘তুমি প্রেম করো?’’

‘‘না।’’

‘‘কেন?’’

‘‘মনের মতো ছেলে পাইনি।’’

তারপর আমিও তাকে একই প্রশ্ন করেছিলাম। সে-ও বলেছিল, না।

‘‘কেন?’’

‘‘মনের মতো মেয়ে পাইনি।’’

‘‘এখন করতে পারো তো।’’

‘‘কার সঙ্গে?’’

‘‘মেয়ে তো তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।’’

অনিরুদ্ধ কোন জবাব দেয়নি। একটা কালো মেঘের ফালি উড়ে এসে ঢেকে দিয়েছিল তার মুখ। আমি বাসে উঠে গিয়েছিলাম। সে আমাকে সী-অফ পর্যন্ত করেনি। পরদিন আবার আমাদের দেখা হয়েছিল। তার মুখের উপর সেই কালো মেঘটি তখনও ছিল। তবু আমরা আবার একসঙ্গে কফি হাউসে বসেছিলাম, নানা গল্প করেছিলাম, আবার আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম বাসের জন্য। সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘‘তুমি কি সত্যিই আমাকে ভালবাসতে চাও?’’

আমি বাঁচতে চাই। আমি জানি তোমার ভালবাসা পাওয়ার প্রয়োজন আছে, আমার প্রয়োজন আছে বাঁচার। তুমি আমাকে বাঁচাবে, আমি তোমাকে ভালবাসব। বাসবোই ভালো। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমি ভালবাসা অনুভব করব তোমার প্রতি।

বাবা না হয়েও তুমিই হবে আমার জন্মদাতা। তুমি জন্মদাতা যদি আমাকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমি কেন চাইব না! ‘‘সত্যি।’’

অনিরুদ্ধর মুখ থেকে মেঘ সরে গিয়েছিল, ‘‘কয়েকদিন থেকে আমি নিজেই ভাবছিলাম তোমাকে প্রস্তাবটা দেব।’’

‘‘তবে দিলে না কেন?’’

‘‘ভয় পাচ্ছিলাম তুমি যদি না করে দাও।’’

সেই অনিরুদ্ধের সঙ্গে আমার আরও কয়েকদিন দেখা হয়েছে। ওর মেসে গেছি, একসঙ্গে দুপুরের খাবার খেয়েছি, প্রায় অচেনা মানুষটিকে একটু একটু চেনার চেষ্টা করেছি আর ভেবেছি রাজু হলে এসবের প্রয়োজন হত না।

রাজুর চিঠি পাই। দুপুরবেলা বাড়িওয়ালির বেডরুমে বসে আমার টিভি দেখার মাঝখানে খোকন নিচ থেকে সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে উঠে আসে। হাতে একটা খাম, ‘‘দিদি রাজুদার চিঠি এসেছে গো।’’ আমি এক লাফে খোকনের কাছে। হাত বাড়াই, ‘‘দে আমাকে।’’

‘‘না দেব না। হ্যা হ্যা...’’

‘‘আমার চিঠি নিয়ে তুই কি করবি?’’

‘‘বিশেষ কিছু না, শুধু দেখব,’’ বারান্দায় আলোর দিশা বেছে নিয়ে চোখের সামনে খামটা ধরে সে। হাই পাওয়ারের চশমার ভেতর থেকে দেখার চেষ্টা করে কি আছে তার মধ্যে। পেয়েও যায় দেখতে, ‘‘মা রাজুদা দিদিকে চেক পাঠিয়েছে, হ্যা হ্যা...’’

খোকনের হাত থেকে আমি খামটা খাবলে নিজের হাতে নিই। খুলে দেখি সত্যি সত্যিই তার মধ্যে একটা দেড় হাজার টাকার চেক। তিনমাসের বাড়িভাড়া। লিখেছে, তার বাবার এই বিয়েতে কোন আপত্তি নেই কিন্তু উনি চাইছেন আমার বাবা যেন তাদের বাড়িতে গিয়ে এ বিষয়ে কথা বলেন।

অনিরুদ্ধকে ভুলে গিয়ে দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর সকালে আমি বাড়ি পৌঁছই। মাকে মাধ্যম করে জানতে চাই বাবার মতামত। মা বলেন, ‘‘তোর ব্যাটা বলল, তুই নাকি ছেলের কি কাস্ট ব্যাটাকে জানাসনি।’’

‘‘বলো মাহিষ্য।’’

পুরোদিন বাবার কোন প্রতিক্রিয়া জানলাম না। মুখ খুললেন না মা। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘কি বলল বাবা?’’

‘‘তোর ব্যাটা জানতে চাচ্ছে রাজু লেখাপড়া কতদূর কোরসে?’’

‘‘ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত।’’

‘‘ব্যস? আর কিসু পড়েনি? রাজু তো মিন্টার বন্ধু। মিন্টা-ই তো বি এ পাশ করে চাকরিতে ঢুকসে।’’

‘‘মিন্টা বি এ পাশ করে ঢুকসে, রাজু বি এ পাশ না করে ঢুকসে। কি হয়েছে তাতে?’’

‘‘কি আবার হোবে!’’ মা মিনমিন করেন, তোর ব্যাটা রাজি হোবে বলে মনে

হচ্ছে না।"

"আমি ওর কাছ থেকে দেড় হাজার টাকা নিয়ে ঘরভাড়া দিয়েছি। এখন ওকে বিয়ে না করাটা অন্যায় হবে।"

"অন্যায়ের কি আসে? ফেরত দিয়ে দে।"

"কে দেবে আমায় টাকা?"

"আমি দিব।"

"তারপরের বাড়িভাড়া কে দেবে?"

"বাড়িভাড়ার কি দরকার? ব্যাটা কোচ্ছে তুই বাড়িতে চলে আয়।"

"আমি আসব না। দেখো, ব্যাঙ্গালোরের ছেলেটির সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু রাজুর সঙ্গে আছে। তোমরা রাজি না হলেও আমি একেই বিয়ে করব।"

"দাঁড়া। তোর ব্যাটা কোসে কালকে মতামত দিবে।"

পরদিন আবার মাকে জিজ্ঞেস করি। মা বলেন, "আমার তো কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তোর ব্যাটা গোঁ ধরে বসে আসে।"

রাগে হতাশায় নবমীর রাতে কলকাতার বাস ধরব বলে বেরিয়ে পড়ি। পুজোর ছুটি কাটাতে ছোটদাও এসেছিল বাড়িতে। রাজুকে নিয়ে কয়েকদিন টেনশনের মাঝখানে নির্বাক থেকে বাসস্ট্যান্ডে আমাকে ছাড়তে যাওয়ার অপ্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করছে সে। বাস ছাড়তে কিছু সময় বাকি। আমরা বাসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। ছোটদা বলল, "তুই যদি রাজুকে একান্তই বিয়ে করতে চাস তাহলে বলি আমার কোন আপত্তি নেই। তবু তোকে একটা কথা বলব। যদি বাড়ির অমতে এভাবেই বিয়ে করার ছিল তাহলে ব্যাঙ্গালোরের ছেলেটিকে করলে বেশি খুশি হতাম।"

আমার কিছু বলার নেই বলে চুপ থাকি। "আরেকটা কথা...," আরও কিছু বলার আছে ছোটদার। "একজন বলছিল তোকে নাকি কলকাতায় অনেকের সঙ্গে ঘুরতে দেখা গেছে।"

সেই অনেকের লিস্টটা এতই বড় ছিল যে সেদিন সময়াভাবে ছোটদার সামনে পেশ করা সম্ভব হয়নি। ড্রাইভার উঠে পড়েছিল বাসে। শুধু বলেছিলাম, "কে বলেছে আমি জানি। আমি তাকে ভিক্টোরিয়াতে একটি মেয়ের সঙ্গে ছাতার আড়ালে ওইসব করতে দেখেছিলাম। সে জানতে পেরেছিল যে আমি তাকে দেখে ফেলেছি।"

সেদিন আমি ছোটদাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম সে কেন কলকাতায় এসে আমাকে বাড়িভাড়া পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে নেরিস্টে পৌঁছনোর পরই তা ভুলে গেল? বলতে চেয়েছিলাম ওর কোন বন্ধু যে একটা নামিদামি বাংলা সংবাদপত্রে কাজ করে একান্ত প্রয়োজন জেনেও আমাকে চাকরি পেতে সাহায্য করেনি। সেদিন আমি ছোটদাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম একটা বড় শূন্যের উপরে ছোট শূন্য কি হতে পারে? ছোটদাকে সেদিন আমার আরও কিছু বলার ছিল। গদ্যে পদ্যে—

পাঁচজনের সাথে ঘুরতে দেখে অনেকে আমাকে দুশ্চরিত্রা বলে।

আমার ধারণা তাদের হিসেবে ভুল আছে।
সমালোচকদের নিয়ে সে সংখ্যা দাঁড়ায়
অন্তত পঁচিশ।

ছোটদাকে কাছে আমার জিজ্ঞাস্য ছিল—
তাহলে কি তারা আমাকে পতিতা বলবে?

রাজুর কাছে এসব কথা আমি গোপন রেখেছি। ওকে বলিনি আমি সত্যি সত্যিই পতিতা হয়ে যাচ্ছিলাম। অফিসের সেই বাঁদরমুখোটা আমার সঙ্গে অনেক খারাপ করেছে—নরকের সিঁড়ি দেখিয়েছে আমাকে। গোপন রেখেছি বলে আমার একবারও মনে হয়নি যে আমি তাকে ধোঁকা দিচ্ছি। আমি জানি আমার মনের কথা। সবার চেয়ে ভালো জানি। আমি জানি একবার তার হাত ধরলে আমার অতীত আমার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উপর একটিও আঁচড় কাটার দুঃসাহস করতে পারবে না। অবশ্য তাকেও দিতে হবে সারাজীবন আমার সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি।

বিয়ে

রাজু বলেছিল জলপাইগুড়িতে ওর একটি প্রেমিকা ছিল। মেয়েটি ওরই বয়সি, সঞ্চয়িতা তার নাম। রাজু তাকে চুমু খেয়েছিল, কখনো পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার কথাও ভেবেছিল তারা।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "পালিয়ে গিয়ে কেন? আমাকে নিয়ে তো তুমি পালানোর কথা ভাবছ না!"

"সঞ্চয়িতা আমাদের আত্মীয়া। সম্পর্কে আমার মাসি তাই।"

"ভেবেছিলে তো করলে না কেন বিয়ে?"

"আরে, ওটা এমনি এমনি ভেবেছিলাম।"

"এমনি এমনি ভাবলে চুমু খেয়েছিলে কেন তাকে?"

"এমনি এমনি খেয়েছিলাম।"

দশমীর দিন কলকাতায় এসে আমি রাজুকে জানাই পাত্র হিসেবে বাবার তাকে পছন্দ হয়নি। সে লেখে আমি যেন কেষ্টপুরের বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও না যাই। সে কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতায় আসছে।

কলকাতায় পৌঁছেই সবার প্রথমে সে সূর্য সেন স্ট্রিটে জামাইবাবু ওরফে সুধাকর বিশ্বাস ওরফে সাগরদার সঙ্গে দেখা করে আসে।

সোৎসাহে জিজ্ঞেস করি, "কি বললেন তোমার সাগরদা?"

"সেসব জেনে আর কি হবে? ছাড়ো।"

"বলোই না।"

"তুমি নাকি মেসে অনেকবার দেখা করতে গেছ?"

"অনেকবার না তো! দু'বার গেছি।"

"কেন?"

"অনেকদিন তোমার কোন খবর পাইনি বলে।"

"সাগরদা বলছে, এই মেয়েকে ছেড়ে দাও। মেয়েটি ভালো না। কলকাতার রাস্তায় রাতের বেলা একা একা ঘুরে বেড়ায়।"

খুব আহত হই, "ছেড়ে দাও তাহলে।"

"না ছাড়ব না। সাগরদাকে আমি জানিয়ে দিয়েছি এবারই তোমার সঙ্গে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে ফিরব। বাড়ি থেকে কেউ আসতে চাইলে আসবে, না আসতে চাইলে না আসবে।"

'এন বি এস টি সি'র বাসে বাড়িতে চিঠি পাঠাই—রাজুকে বিয়ে করছি, তোমরা এসো। পরদিনই চিঠি বাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার কথা। দু'জনার বাড়ি থেকেই কেউ না কেউ আসবে এই বৃথা আশা নিয়ে আমাদের আরও এক সপ্তাহ কাটে।

সেই অপেক্ষারত এক সপ্তাহ রাজু আমাকে ভালবাসার মধু দিয়ে স্নান করায়, ঝরিয়ে দেয় আমার ওপর অসংখ্য রঙিন ফুল। জীবনে প্রথমবার মনে হয় আমি একা নই, আমার পাশে কেউ আছে এবং সেই 'কেউ'টা যে কেউ নয়—সেই 'কেউ'টা

হল অর্ধেক আমি। অর্ধেক আমি অথচ আমি নই, আমার খুব কাছের কোন সত্তা। প্রত্যেক সকালে সে সন্তোষপুর থেকে আমার কাছে আসে। আমরা একসঙ্গে রান্না করি, খাই, গল্প করি, ঘুরতে যাই। ঘোরা শেষ হলে সে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আবার সন্তোষপুরে ফেরে। মনে হয় আমাদের সাত পাকে বাঁধা পড়তে আর বাকি নেই। মাসিমারও একই অবস্থা। আগে উনি ড্রেন পরিষ্কার করতে এসে কলপাড়ে স্নান সেরে উপরে যেতেন। এখন সেখানে স্নান করতে দ্বিধা বোধ করেন। মাসিমার ভাষায় জামাই আছে বলে দ্বিধা। অনুমতি চান আমার বাথরুম ব্যবহার করার।

বাইরে স্বামী-স্ত্রীর মতো রইলেও ভেতরে আমাদের মধ্যে দূরত্ব থাকে। আমার একবারও মনে হয় না এই দূরত্ব বিয়ের আগে একটু তো কম করা যেতেই পারে। তার স্পর্শ পাওয়ার এতটুতু আকাঙ্ক্ষা জাগে না আমার মনে। কিন্তু রাজু তা পারে না। এক দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে সে বসে আমার বিছানায়, সেই একই জায়গায়—দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। আমি পাশে শোওয়া। চিৎ হয়ে। আমাদের মাঝখানে একহাত সমান খালি জায়গা। রাজুর মধ্যে সেই ব্যবধান অতিক্রম করার মৃদু ইচ্ছে জাগে। দ্বিধা নিয়ে একটু হেসে জিজ্ঞেস করে, "তোমার বুকে একটু হাত দেব?" কি আশ্চর্য! তাকে আমি না করতে পারি না। একে যদি খারাপ হওয়া বলে তাহলে ওই পর্যন্তই সে খারাপ হয়, আমি খারাপ হই।

কালীপুজোর চারদিন আগে একুশে অক্টোবর শিয়ালদায় একটা ম্যারেজ অফিসে গিয়ে আমরা বিয়ে করি। হিন্দু মতে। অ্যাপ্লিকেশন ফর রেজিস্ট্রেশন অফ ম্যারেজ আন্ডার দ্য হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, ১৯৫৫ ভরা হয় সেদিন, মালাবদল হয় সেদিন। রাজু আমার মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেয় এবং ম্যারেজ সার্টিফিটেকও সেদিনেরই তারিখেই তৈরি হয়। অ্যাপ্লিকেশন ভরার সময় রেজিস্ট্রার জিজ্ঞেস করেন, "পাত্রীর নাম?"

আমি বলি, "বনানী শিকদার।"

"পাত্রীর পিতার নাম?"

"শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র শিকদার।"

"পাত্রীর বয়স?"

"তেইশ বছর।"

"পাত্রীর বর্তমান ঠিকানা?"

বলা হয় সেটাও।

আমার পর রাজুর পালা—

"পাত্রের নাম?"

রাজু বলে, "সজল বিশ্বাস।"

"পাত্রের পিতার নাম?"

"সুধীর কুমার মণ্ডল।"

"পিতার নাম আবার বলেন," কলম থেমে যায় রেজিস্ট্রারের।

"সুধীর কুমার মণ্ডল।"

"মণ্ডল?" রেজিস্ট্রারের মুখ নড়ে, কলম নড়ে না। কমল যেন ফর্মের উপর

ফেভিকল দিয়ে সেঁটে গেছে।

‘‘হ্যাঁ, মণ্ডল।’’

‘‘ভুল হচ্ছে কোথাও। ছেলে বিশ্বাস আর বাবা মণ্ডল কেমন করে হয়?’’

‘‘আমাদের তাই-ই হয়েছে। আপনি লিখুন।’’

তবু রেজিস্ট্রার থ মেরে দাঁড়িয়ে থাকেন। বিয়ে বুঝি আমাদের আর হয় না। আমি রেজিস্ট্রারকে বলি, ‘‘মণ্ডল পদবীটা পছন্দ হয়নি বলে এরা সব ভাইবোনেরা মায়ের পদবী নিয়েছে।’’

‘‘মা তাঁর পদবী চেঞ্জ করেননি?’’

‘‘করেছেন। বাবা এবং মায়ের পদবী এক।’’

‘‘বাহ্, বাবা-মা মণ্ডল আর ছেলেমেয়েরা বিশ্বাস!’’ এক কথা ফেটিয়েই চলেন উনি।

‘‘আপনি প্লীজ লিখুন,’’ করুণ আবেদন আমার।

কারও বাড়ি থেকে কেউ আসেনি। বিয়ের অনুষ্ঠানে পাত্র, পাত্রী এবং রেজিস্ট্রার ছাড়া আর মাত্র দু’জন উপস্থিত—আমার সাক্ষী চৈতালী এবং রাজুর সাক্ষী তার আরেক এন্ট্রিমেট নির্মল পালের ভাই।

শিশির মঞ্চে নাটক দেখে রাত সাড়ে দশটায় বাড়ির কলিং বেল বাজাই। মাসিমা নেমে এসে দরজা খোলেন, ‘‘বাব্বা, এলে অবশেষে।’’

খোকন আমাদের পেছন পেছন বাড়ি ঢুকতে চায়। কিন্তু মাসিমা তাকে বাইরে থেকেই পাঠিয়ে দেন মিষ্টি কিনতে। উনি আমাদের উপরে ডেকে নিয়ে যান। বলেন, ‘‘এখন আর রান্নাবান্না করতে হবে না। আমাদের এখানেই যা হোক খেয়ে নাও।’’ লুচি ভেজে তা আলুর দম এবং খোকনের নিয়ে আসা মিষ্টির সঙ্গে পরিবেশন করেন মাসিমা। খোকন বলে, ‘‘হ্যা হ্যা, দেখেছ মা, আমি ঠিকই অনুমান করেছি—দিদিরা আজ বিয়ে করেই ফিরছে। তাই এত দেরি।’’ সেই রাতে রাজু প্রথম আমার সঙ্গে থাকে। সেই রাতেই আমাদের ফুলশয্যা হয়। অধুরা ফুলশয্যা।

পরদিন রাজু আমাকে কল্যাণীতে নিয়ে যায় তার পুরনো প্রেমিকা সঞ্চয়িতার সঙ্গে দেখা করাতে। কল্যাণীতে সে বি এড করতে গেছে। লম্বা, কালো, রোগা-পেটা চেহারার মেয়েটির শরীর শাড়ি পরেও ফাঁপে না। পরার ঢঙও খারাপ—গোড়ালির তিন ইঞ্চি উঁচুতে নিচে না নামার প্রতিজ্ঞা নিয়ে উঠে আছে শাড়ি। তাতে তার কোন বিকার নেই। মনে হয় শাড়ির জেদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলতেই সে অভ্যস্ত। দেখে আমার বিশ্বাসই হয় না যে এই মেয়ে তার প্রেম কলতানে রাজুকে কখনো ভাসিয়ে থাকতে পারে।

দুপুরে একটা হোটেলে বসে আমরা খাবার খাই। সঞ্চয়িতার সামনেই রাজু আমার পেট টিপে জিজ্ঞেস করে, ‘‘কি রূপু, রাত পর্যন্ত চলবে তো?’’ অন্যসময় লোকসমক্ষে এমন স্পর্শ নিশ্চয় আমি উপভোগ করতাম না। কিন্তু এখন করছি। বলতে ইচ্ছে করছে সঞ্চয়িতাকে, ‘‘দেখলে তো, ভালবাসার প্রতিযোগিতায় কেমন তোমাকে তুড়ি মেরে হারিয়ে দিলাম?’’

সে রাজুকে বলে, ‘‘কাল সন্ধে ছ’টায় শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছব। সেখান থেকে রাত দশটায় আমার জলপাইগুড়ির ট্রেন আছে। পারলে দেখা করতে এসো।’’

রাজুর কোন আপত্তি নেই। সঞ্চয়িতা আমাকে অনুরোধ করে না, তুমিও এসো এবং রাজুও সঞ্চয়িতাকে বলে না, আমি রূপুকে সঙ্গে নিয়ে যাব। মুহূর্ত আগেই আমার নিজের মধ্যে গড়ে ওঠা আত্মবিশ্বাস, আত্ম-অহংকার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তবু ভাবি দিনের কিছুটা সময় এখনও বেঁচে আছে, পুরো রাত বেঁচে আছে, রাজু নিশ্চয়ই সেই ভাঙা টুকরোগুলোকে জোড়া লাগিয়ে দেবে—বলবে, ‘‘তুমি আমি দু’জনেই যাব।’’ কিন্তু সে তা না করে আমায় ভালবাসতে চায়। ভালবাসেও। আমি পারি না সেই ভালবাসায় ডুবে যেতে। কানে অনবরত সঞ্চয়িতার কথার অনুরণন অস্থির করে তোলে আমাকে—দেখা করতে এসো—দেখা করতে এসো।

পরদিন সকালে রাজু যখন বাথরুমে, খোকন এসে আমার ঘুম ভাঙায়। বলে, ‘‘দিদি, সিঁদুর পরে তোমাকে কিন্তু দারুণ লাগছে দেখতে। রাজুদার সঙ্গে ফটো উঠিয়েছো?’’

‘‘না রে।’’

‘‘সে কি গো! রাজুদার এত সুন্দর ফুজিকা ক্যামেরা আছে তবু...। দাও দাও ক্যামেরা দাও। আমি উঠিয়ে দিচ্ছি ফটো।’’

রাজুকে বাথরুম থেকে তাড়া দিয়ে বের করে ফটো উঠিয়ে দেয় খোকন।

মন ঠিক নেই। ওই এক অশান্তি। সঞ্চয়িতাকে নিয়ে কোন কথা হয় না আমাদের। পরস্পরের মধ্যে শব্দোচারণ না হলেও সারাদিনে রাজু এবং সঞ্চয়িতার একশোটি সংলাপ বেজে ওঠে আমার বুকে, চোখের সামনে চলচ্চিত্র হয়ে ভেসে ওঠে একশো ছবি।

—ভালো আছিস?

—না।

—কেন? কি হয়েছে?

—বিয়ে করার আগে একবারও আমার কথা মনে পড়ল না?

—পড়েছিল।

—তাহলে কেন এমন করলে?

—করিনি। হয়ে গেল। তাছাড়া...

—তাছাড়া কি?

—আমাদের বিয়েতে বাড়ি থেকে মত পেতাম না।

—ঠিকই তো হয়েছিল আমরা পালিয়ে যাব। আসলে সেটা নয়...আমি দেখতে খুব খারাপ তাই না?

—দেখাতে কি আছে? পাগলী একটা। রাজু বলেছে সে সঞ্চয়িতাকে ভালবেসে মাঝে মাঝে পাগলী বলত।

—হুঁ...

—চল কোথাও গিয়ে বসি।

—আর বসে কি হবে?

—কেন?

—সবই তো শেষ হয়ে গেল।

—শেষ কিছুই হয়নি। আমাদের মধ্যে যোগাযোগ তো থাকছেই।

আমি দেখতে পাই একটি রেস্টরেন্টে রাজু এবং সঞ্চয়িতা বসল পাশাপাশি। দু'জনে কথা বলছে, খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে, খুব সূক্ষ্ম আওয়াজে। সেই আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছি না। তবে তাদের শরীরের ভাষা বলছে তারা দু'জন একে অন্যের খুব কাছে যেতে চাইছে। আমার শরীর কাঁপছে, মন কাঁপছে। দুর্বল হয়ে পড়ছে শরীর মন—আমি কি তাহলে ভুল করেছি! জীবনের এক মোক্ষম বাঁকে এসে ভুল রাস্তায় পা রেখে ফেলেছি! বাড়ির বিপক্ষে গিয়ে—ওই গোঁড়া, মেজাজি হেডমাস্টার আজীবনের জন্য আমার সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্ক যে ছিন্ন করে দিয়েছেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কি করি!

রাজু আমার মনের উথালপাতাল বোঝে না। সে শার্ট-প্যান্ট পরে বেরিয়ে যায়। বড় দিশেহারা লাগে, বড় অসহায়। এখন কি করি, কি করি ভাবতে ভাবতে আমিও গায়ে শাড়ি জড়িয়ে নিই। ঠিকানা পার্ক স্ট্রিটের ম্যাগনোলিয়া।

ঘরে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শাড়ি চেঞ্জ না করেই। মদ খাওয়া ক্লান্তির রেশ পুরো শরীরে। রাত এগারোটার দিকে রাজু এসে আমাকে জাগায়, ''কোথায় গিয়েছিলে?''

সে কথা এড়িয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করি, ''দেখা হল?''

''না।''

''তাহলে এত দেরি করলে যে?''

''অপেক্ষা করলাম। খুঁজলাম অনেক। কিন্তু দেখতে পেলাম না।'' রাজুর উত্তর আমাকে বিন্দুমাত্র শান্তি দেয় না। বিশ্বাস হয় না যে সত্যি সত্যিই তাদের দেখা হয়নি। আর যদি জোর করে বিশ্বাস করার চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পাই রাজু কল্যাণী থেকে শিয়ালদায় আসা সেই ট্রেনটি খালি হওয়া পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে সঞ্চয়িতার জন্য অপেক্ষা করছে, না পেয়ে পুরো স্টেশন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, দার্জিলিং মেলের প্যাসেঞ্জার লিস্ট পড়ছে। প্যাসেঞ্জার লিস্ট-এ তো তার নাম পাওয়া উচিত। যদি না-ও পায় নাম, সম্ভাবনা কম তবু যদি মেনে নিতেই হয় যে মেয়েটি মিথ্যে বলেছে, রাজু ব্যাকুল হয়ে এত সময় ধরে একা ঘুরে বেড়িয়েছে তাতে তো কোন মিথ্যে নেই। আমি সেই রাজুর চারপাশে সঞ্চয়িতার প্রতি এক অসম্ভব দুর্বলতার খাঁচা দেখি। সেই খাঁচা ভেদ করে তার অশরীরি আত্মার কতখানি ভালবাসা আমার কাছে পৌঁছতে পারছে আমি বুঝতে পারি না।

''কিচেনে খাওয়ার রাখা আছে,'' জানিয়ে দিই ওকে।

''আমি খেয়ে এসেছি। তুমি খেয়ে নাও।''

একা একা? ''আমার ইচ্ছে করছে না।''

''শাড়ি চেঞ্জ করো।''

“পরে করব।”

“কেন?”

“এমনি।”

রাজু পাশে এসে বসে, “তুমি ড্রিঙ্কস করেছ?”

আমি চুপ।

“কেন করেছ ড্রিঙ্কস?”

বোঝোনি? আমি চুপ।

“ওঠো ওঠো। চলো আমি তোমাকে চেঞ্জ করতে হেল্প করছি।” কাঁধের পিনে হাত দিয়ে বলে, “একি, শাড়ি ছিঁড়ে ফেলেছ তো!”

বাস থেকে নামতে গিয়ে হয়েছে। তোমারই জন্য। তুমি-ই আমাকে ঠিক থাকতে দাওনি। তোমার ঘরে ঢোকার মুখে দরজাতেই ধাক্কা খেয়েছি।

দু'দিন বাদে রাজু গোরখপুরে ফিরে যায়। তার দু'দিন বাদে কালী পুজো। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে বাতি। ঘরের বাইরে বারান্দাগুলো নেমে পড়েছে সাজের প্রতিযোগিতায়। রাস্তাঘাটে, পুজো প্যান্ডেলে ঝকমক করছে বিভিন্ন রঙের আলোর নকশা। পটকা ফাটছে। একমাত্র আমার মন ছেয়ে আছে অন্ধকারে। সেখানে কোন খুশির ঝংকার নেই।